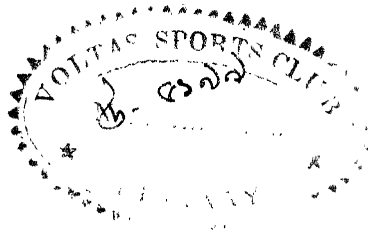
চরিত্র



প্রফুল্ল রায়


৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩,

CHARITRA

A Bengali Novel

By

PRAFULLA ROY

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
এস্. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
গৌতম রায

২য় সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭

দাম
২৮·০০

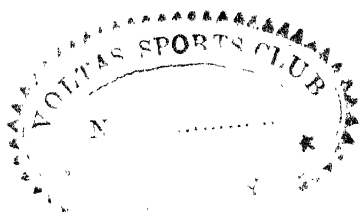
এই উপন্যাসের সব চরিত্র ও ঘটনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

যাঁদের প্রীতি ও আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ

শ্রীমতী আরতি সেনগুপ্ত

শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

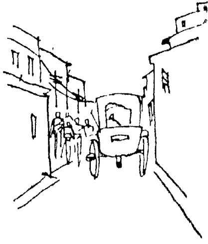
সহৃদয়েষু



আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থকারের অন্যান্য বই ঃ

করুণাধারায় এসো

আপন মনে



কলকাতা করপোরেশনের সীমানা ছাড়িয়ে উত্তরে আট-দশ কিলোমিটার গেলে অ্যাসফাল্টের চওড়া হাইওয়ের দু-ধারে বিশাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট। যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক—চটকল, কটন মিল, কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি। আর আছে সাবানের কারখানা, কাচের কারখানা, কাগজের কারখানা, ইত্যাদি ইত্যাদি। সরু এবং মোটা অগুনতি চিমনি সটান উঠে গিয়ে এখানকার আকাশে বিঁধে আছে; গলগল করে অনবরত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছেড়ে বাতাসকে বিষাক্ত করে দিচ্ছে। কারখানাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন টাউনশিপ, ঝকঝকে সব বাড়ি-ঘর। তবে এখানে বেশির ভাগই বস্তি। টালি, পেটানো টিন, ভাঙাচোরা অ্যাসবেস্টস, পীচবোর্ড আর তেরপল দিয়ে তৈরী মানুষের এই সব নোংরা কুৎসিত দমচাপা বাড়িঘর গ্রেটার ক্যালকাটার গায়ে দগদগে ঘায়ের মতো ছড়িয়ে আছে।

এইরকম একটা বস্তির সামনে দিয়ে হাইওয়ে গেছে। রাস্তাটার ওধারে ফাঁকা মাঠমতো অনেকটা জায়গা। জায়গাটার এক ধারে এই মুহূর্তে একটা বড়-সড় মঞ্চ দেখা যাচ্ছে। সেটার সামনের দিকে পর্দা ফেলা। আর ওধারে হাজার কয়েক লোক—কাচ্চা-বাচ্চা যুবক-যুবতী থেকে শুরু করে বুড়ো-বুড়ী পর্যন্ত গাদাগাদি করে বসে আছে।

ক'দিন ধরেই এ অঞ্চলে সাইকেল-রিকশা করে মাইকে জানানো হচ্ছিল, আজ সন্ধ্যায় এই মাঠে গ্রেট ম্যাজিসিয়ান স্বাধীনকুমার যাদুর খেলা দেখাবে। এর জন্য টিকিট লাগবে না। মাইক ছাড়া রঙীন কাগজে হাজার হাজার ছাপানো হ্যাণ্ডবিলও চারপাশের বস্তি আর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপগুলোতে বিলানো হয়েছে।

ফলে দুপুর পেরুতে না পেরুতেই চারদিক থেকে গাদা গাদা মানুষ এই মাঠটায় ভিড় জমাতে শুরু করেছে।

সময়টা নভেম্বরের শেষাশেষি। পশ্চিম দিকের বাড়ি-ঘর, বস্তি আর

কারখানার বিরাট বিরাট শেডগুলোর ওদিকটায় আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকি নেমে গেছে, সূর্যটা এতক্ষণ একটা সরু সুতোয় সেখানে ঝুলছিল। একট সুতোটাকে কেউ ছিঁড়ে দিল; আর টুপ করে সূর্যটা আকাশের গা থে কোথায় যেন খসে পড়ল। এখন চারপাশে আবছা মতো অন্ধকার। গ্রে ক্যালকাটার এই অংশটা সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে সারা গায়ে একখানা উল বাহার শাড়ি জড়িয়ে রয়েছে যেন।

নভেম্বরের শেষাশেষি এই সময়টায় বিকেল থেকেই বাতাসে হিমের গন্ মিশতে শুরু করে। এখন বেশ শীত শীত লাগছে। কাছের এবং দূ টাউনশিপ আর বস্তিগুলোতে আলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে।

খোলা মাঠে মঞ্চের সামনের লোকগুলো সেই বিকেল থেকে শিরদাঁড়া টান করে ম্যাজিক দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে বসে আছে। ক্রমশঃ তারা অসহি হয়ে উঠতে লাগল। মাঠের নানা দিক থেকে হইচই চিৎকার শুরু হয়ে গে আর ঠিক সেই সময় মঞ্চের পর্দা উঠে গেল।

মিউনিসিপ্যালিটির ল্যাম্প পোস্ট থেকে তার লাগিয়ে ইলেকট্রিক কা শান নেওয়া হয়েছিল। আলোকিত মঞ্চে দেখা গেল, মাথায় রাজমুকুটের ম পাগড়ি এবং ঝলমলে জরির পোশাক পরা ম্যাজিসিয়ান স্বাধীনকুমার দাঁড়িয়ে।

প্রায় ছ' ফুটের মতো হাইট যাদুকরের, বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। মুখ লম্বা গায়ের রং ফর্সাও না, আবার কালোও না—দুইয়ের মাঝামাঝি। টা মতো চ্যাটালো বুক, চওড়া কাঁধ, শরীরে এক গ্রামও অনাবশ্যক চর্বি নে তাকানোমাত্র টের পাওয়া যায়, সে রীতিমতো সুপুরুষ।

যাদুকরকে দেখে দর্শকদের চেঁচামেচি এবং উত্তেজনা থেমে গেল। ম একেবারে সামনের দিকে কয়েকজন মিউজিসিয়ান বসেছিল। ম্যাজিক শো সঙ্গে সঙ্গে তারা বাজাবে। এরই ভূমিকা হিসেবে ঢিমেতালে তারা অর্কে একটা গৎ বাজাতে লাগল।

যাদুকর স্বাধীনকুমার দারুণ স্মার্ট ভঙ্গিতে মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁ দর্শকদের উদ্দেশে বলল, 'ভাইয়েরা, বোনেরা, বাবুরা, বিবিরা—মায়েরা, বা মিস্টাররা, মিসেসরা—আপনারা এখানে আমার ম্যাজিক দেখার জন্যে এসে সেই বিকেল থেকে বসে বসে লাখ লাখ মশার কামড় খাচ্ছেন। সে লাখ লাখ, কোটি কোটি ধন্যবাদ। এবার আসল কথায় আসা যাক। যাদুকর স্বাধীনকুমার, আপনাদের নিজের লোক—বিলকুল আপনা আদম এখনই শো স্টার্ট করব। যে খেল আজ দেখাব তাতে আপনাদের চো তারা স্রেফ ব্রহ্মতালুতে গিয়ে সেট করে যাবে। আজ আপনাদের আমি ভ্যানিশ করার খেলা দেখাব। এক এক রকমের জিনিস আপনাদের কাছে

আসব। দেখবেন, চোখের সামনে থেকে এক এক করে সব হাপিস হয়ে যাচ্ছে। একেবারে পয়লা এই তাসই ধরুন—' বলতে বলতে বাঁ হাতটা তুলে ধরল সে। সেখানে রয়েছে একটা তাসের প্যাকেট।

স্বাধীনকুমার প্যাকেট থেকে তাসগুলো বার করে আবার বলতে লাগল, 'এতে রয়েছে বাহান্নখানা প্যাক্তি। দেখুন, কিভাবে ওগুলো হাপিস হয়ে যায়।' বলেই বাঁ হাত থেকে ডান হাত দিয়ে একটা তাস তুলে নিল সে। তারপর মন্ত্র পড়ার মতো বলতে লাগল, 'গিলি গিলি গিলি—ফুস হয়ে যা।' ডান হাতের তাসটাকে সে ওপরে ছুড়ে দিল।

এদিকে মিউজিসিয়ানরা ঝড়ের গতিতে অর্কেস্ট্রা বাজিয়ে চলেছে। অবাক্ হয়ে মঞ্চের সামনের কয়েক হাজার লোক দেখল, তাসটা আর নীচে পড়ল না, হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

এইভাবে একটা একটা করে বাহান্নখানা তাস ভ্যানিশ করে দেবার পর—পায়রা, গাধা, জামাকাপড়, ঘড়ি, টাকা—সব উধাও করে দিল স্বাধীনকুমার। প্রতিটি আইটেমের পর মাঠের চারপাশ থেকে চড়বড়িয়ে হাততালির শব্দ উঠতে লাগল। হাততালিটা থামতেই চায় না।

পায়রা, তাস, গাধা ইত্যাদির পর কাচের বিরাট একটা বাক্সের ভিতর এক সুন্দরী যুবতীকে পুরে মঞ্চে নিয়ে এল যাদুকর। উঁচু এবং বড় একটা টেবিলের ওপর যুবতীসুদ্ধ বাক্সটা রেখে যাদুকর বলতে লাগল, 'এই যে ইয়াং গার্লটিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইনি এক রূপকুমারী, প্রিন্সেস অফ প্রতাপনগর। এতক্ষণ পায়রা, গাধা, তাস—এই সব হাওয়া হয়ে যেতে দেখেছেন। এবার দেখুন রাজকুমারী ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছেন। গিলি গিলি গিলি—' বলতে বলতে একটা পাতলা সিল্কের চাদর দিয়ে রাজকুমারীর বাক্সটা ঢেকে দিল।

দর্শকদের চোখের পাতা পড়ছিল না। শ্বাসরুদ্ধের মতো তারা মঞ্চের দিকে তাকিয়ে আছে।

এদিকে অর্কেস্ট্রা জলদ তালে বেজে যাচ্ছে। মঞ্চে এতক্ষণ খুব বেশী পাওয়ারের চড়া আলো জ্বলছিল। এখন তার জায়গায় স্তিমিত নীলাভ আলোয় মঞ্চ ভরে আছে। সেখানে সব কিছু এখন রহস্যময়।

স্বাধীনকুমার দর্শকদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'এই খেলাটা টেরিফিক কঠিন; আমার বেস্ট খেলা। এখন কেউ একটাও কথা বলবেন না, কোন রকম শব্দ করবেন না। তাহলে রাজকুমারীর ক্ষতি হয়ে যাবে; মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। চুপচাপ মন পবিত্র করে দেখে যান কেমন করে যোগবলে আমি এই রাজকুমারীকে অদৃশ্য করে দিচ্ছি। গিলি গিলি গিলি—' বলতে বলতে কাচের বাক্সটার কাছে চলে গেল সে। সেটার চার ধারে ঘুরতে ঘুরতে বিড়

বিড় করে কী মন্ত্র পড়তে লাগল। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে একটা হাত বাক্সটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে অদ্ভুত ভূতুড়ে গলায় বলতে লাগল, 'রাজকুমারী, আপনি আস্তে আস্তে ওপরে উঠে যান, উঠে যান—'

মনে হচ্ছে, স্বাধীনকুমার যেন দশ ফুট দূরে মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলছে না, অনেক অনেক দূরে—হয়ত অন্য কোন গ্রহ থেকে তার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। শুনতে শুনতে দর্শকদের গায়ে কাঁটা দিতে লাগল। এখন মঞ্চ এত স্তব্ধ যে একটা কাঠি পড়লেও তার শব্দ শোনা যায়।

যাদুকর সমানে একই রকম স্বরে বলে যাচ্ছে, 'রাজকুমারী, ওপরে উঠে যান, ওপরে উঠে যান—' এই সময় অর্কেস্ট্রা খুব নীচু খাদে বেজে যাচ্ছে।

মিনিট কয়েক এভাবে বলার পর হঠাৎ চাদর-ঢাকা কাচের বাক্স নড়ে উঠল। তারপর আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে উঠতে শূন্যে এক জায়গায় স্থির হয়ে রইল।

দর্শকদের চোখের তারা যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে। দম বন্ধ করে তারা দেখতে লাগল, স্বাধীনকুমার হঠাৎ শূন্যে ঝুলন্ত সেই কাচের বাক্সটার ওপর থেকে একটানে সিল্কের চাদরটা সরিয়ে নিল। আশ্চর্য ব্যাপার, কাচের বাক্স বা রাজকুমারী, এখন কিছুই নেই। হাওয়ায় সব মিলিয়ে গেছে।

খেলার শেষে এবার যে হাততালি শুরু হল, সেটা থামল দশ মিনিট পর। দর্শকরা চিৎকার করে জানাতে লাগল, এমন যাদুর খেলা তারা জীবনে দেখে নি।

অভিনন্দন এবং হাততালির তোড় কমে গেলে স্বাধীনকুমার বলল, 'আমার খেলা আজকের মতো এখানেই শেষ। আবার কখনও যদি সুযোগ পাই আবার আপনাদের খেলা দেখিয়ে যাব। বাবুরা, বিবিরা, মায়েরা, বাবারা, মিস্টাররা, মিসেসরা—বিদায় নেবার আগে আপনাদের সবার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে।'

দর্শকরা চিৎকার করে বলতে লাগল, 'বলুন বলুন।'

'আমার একটা কথা আপনাদের রাখতে হবে।'

'নিশ্চয়ই রাখব। ফোকটে আপনি আমাদের এত আনন্দ দিয়েছেন। যা বলবেন তা-ই করব।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না স্বাধীনকুমার। খনিকক্ষণ চুপ করে থেকে মনে মনে কী ভেবে নিল। তারপর শুরু করল, 'আমি আপনাদের আজ যা দেখালাম সেগুলো সবই ভ্যানিশ করার খেলা। আপনারা দেখেছেন তাস, গাধা, জামা-কাপড় এমন কি বিউটিফুল রাজকন্যা পর্যন্ত আমি হাপিস করে দিয়েছি। এ সবই যাদুর খেলা, স্রেফ হাত-সাফাই। কিন্তু আমার চাইতে আরো অনেক বড় একজন ম্যাজিসিয়ান আছে।'

চারপাশ থেকে চিৎকার উঠল, 'কে? কে?'

হাত তুলে সবাইকে থামাতে থামাতে স্বাধীনকুমার বলল, 'একটু ওয়েট

করুন, থোড়েসে ধৈর্য ধরুন। তার নাম নিশ্চয়ই বলব। তার আগে আমার দু-একটা কথা শুনে নিন।' কয়েক সেকেণ্ড দম নিয়ে ফের শুরু করল সে, 'আমি যার কথা বলছি সেই ম্যাজিসিয়ান আমার মতো স্টেজে দাঁড়িয়ে হাপিস করার খেলা দেখায় না। সে সত্যি সত্যি অনেক রিয়েল জিনিস ভ্যানিশ করে দিতে পারে।'

লোকগুলোর উত্তেজনা এবং কৌতূহল ক্রমাগত বাড়ছিলই। তারা জিরাফের মতো গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী কী ভ্যানিশ করতে পারে?'

'আপনাদের দুঃখ, কষ্ট, অভাব—এই সব।'

'বলেন কি মশায়! এত ক্ষ্যামতা কার? সেই মাকড়াটা কে?'

'আছে আছে। খুব কাছেই আছে। এখুনি তাকে আপনাদের কাছে প্রেজেন্ট করে দিচ্ছি। আপনারা কিন্তু কথা দিয়েছেন, আমি যা বলব তা-ই করবেন।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ করব তো। আগে মালটাকে নিয়ে আসুন।'

মঞ্চের পেছন দিকে যে চটের দেয়ালটা, সেখানে ক'টা পোস্টার পীচবোর্ডে সেঁটে উলটে রাখা হয়েছিল। বড় বড় পা ফেলে যাদুকর স্বাধীনকুমার সেখানে গিয়ে পোস্টারগুলো সিধে করে আবার সামনে এগিয়ে এল। সেগুলোতে লেখা আছে:

'আগামী বিধানসভার নির্বাচনে মহীধর তরফদার আপনার ভোটপ্রার্থী। দয়াকরে তাঁকে ভোট দিয়ে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন।'

দর্শকদের ভেতর থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'ওরে শলা, মহীধর মাকড়া ভোটের মিটিং করবার জন্যে ম্যাজিকওলা ধরে এনেছে! মাল বহুত খচড়া।'

সঙ্গে সঙ্গে হইচই চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল।

স্বাধীনকুমার দু' হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে বলতে লাগল, 'আপনারা কিন্তু কথা দিয়েছেন, আমি যা বলব তাই শুনবেন।'

লোকগুলো বলল, 'কিন্তু মহীধর শলা যে টেরিফিক হারামী। ঠিক আছে, আপনাকে যখন কথা দিয়েছি, মালকে নিয়ে আসুন। তার বক্তৃতা-ফক্তৃতা শুনে বাড়ি যাই।'

স্বাধীনকুমার একটু হেসে বলল, 'বহোত বহোত সুক্রিয়া।' তারপর উইংসের ফাঁক দিয়ে মঞ্চের পেছন দিকে চলে এল। সেখানে আগামী নির্বাচনে ভোট-প্রার্থী বেঁটে মোটা ঘাড়ে-গর্দানে-ঠাসা মহীধর তরফদার তার দু' গণ্ডা চামচে সুদ্ধ অন্ধকারে বসে বসে ঝাঁক ঝাঁক অ্যানোফিলিস মশার কামড় খাচ্ছিল। স্বাধীনকুমারকে দেখামাত্র দৌড়ে এসে তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে গ্যাদগেদে গলায় বলল, 'তোমার জবাব নেই; একেবারে কামাল করে দিয়েছ মাইরি।'

স্বাধীনকুমার বাঁ চোখটা কুঁচকে বলল, 'বলছেন?'

'আলবত! এখানে দশবার ইলেকশান মিটিং করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু

চারপাশের লোকগুলো এ্যায়সা হারামজাদা যে একটা মিটিং-ও করতে দেয় নি। ইট আর পেটো ঝেড়ে মিটিং-এর বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে। তোমার জন্যে শেষ পর্যন্ত মিটিং-টা করতে পারলাম।'

'আপনি যা একখানা জিনিস—ওয়াগন ব্রেকারদেরও গুরু, চোলাইয়ের চালানদার—কী একখানা ব্যাকগ্রাউণ্ড! পেটো ঝেড়ে ওরা ভালই করেছে। যাক, আমার ফীস-টা দিয়ে মিটিং-এ 'ইন' করুন গিয়ে। দেরি করলে লোকজন হাপিস হয়ে যাবে। জনসভা তখন আপনার কাছে শোকসভা হয়ে যাবে। দিন—' বলে হাত বাড়িয়ে দিল।

মানি-ব্যাগ খুলে ব্যস্তভাবে নগদ এক হাজার টাকা বার করে স্বাধীনকুমারকে দিতে দিতে মহীধর বলল, 'যা উপকার করলে, কী আর বলব! লাইফে এ ঋণ শোধ করা যাবে না। ছেলেবেলা থেকে এম-এল-এ হবার বড্ড শখ আমার —হেঁ-হেঁ-হেঁ—'

টাকাটা গুনে নিয়ে পকেটে পুরতে পুরতে স্বাধীনকুমার বলল, 'আবার কোনও সারভিসের দরকার হলে বলবেন।'

'তোমাকে আমার সব সময় দরকার। এ বছর আমি হয়ত এম-এল-এ হয়ে যাব। পরের বার এম-পি হবার জন্যে কনটেস্ট করব। অত উঁচুতে চড়তে হলে তোমার মতো একখানা ল্যাডার চাই।'

স্বাধীনকুমার উত্তর দিল না। স্টেজের পেছন দিকে একটা কিট-ব্যাগে তার ট্রাউজার, বুশ শার্ট-টার্ট ছিল। যাদুকরের পোশাক বদলে সেগুলো পরে নিল সে। তারপর মহীধরকে বলল, 'আচ্ছা, চলি স্যার।'

কিছুক্ষণ পর হাইওয়েতে এসে একটা সাইকেল রিকশায় উঠল স্বাধীনকুমার। এখান থেকে তিন মাইল দক্ষিণে একটা বস্তিতে থাকে সে। আপাতত সেখানেই চলেছে। ঠিক সেখানে না, বস্তির ঠিক গা ঘেঁষে যে বাংলা মদের দোকানটা রয়েছে, সে যাচ্ছে সেখানে। সূর্য ডুববার পর একটা সেকেণ্ডও সে বাইরে থাকে না; সোজা কাণ্ট্রি লিকারের ঐ শুঁড়িখানাটায় গিয়ে ঢোকে। আজ মহীধর তরফদারের ইলেকশন মিটিং-এর জন্য ম্যাজিক দেখাতে এসে অনেক দেরি হয়ে গেল। জিভের ডগা থেকে স্টম্যাক পর্যন্ত জায়গাটা এখন শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে উঠেছে। পাকা এক বোতল সোনার বাংলা গলায় না ঢালা পর্যন্ত এই মুহূর্তে সে আর কিছু ভাবতে পারছে না।

হাইওয়ে দিয়ে সাইকেল-রিকশায় যেতে যেতে মহীধর তরফদারের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনতে পেল স্বাধীনকুমার। সেই সঙ্গে চড়বড়িয়ে হাততালির শব্দ। লোকটা অডিয়েন্সকে কবজা করে ফেলেছে। মনে মনে স্বাধীনকুমার উচ্চারণ করল, 'শালা মাকড়া!'



যাদুকর স্বাধীনকুমারের আসল নামটা সে নিজেই জানে না। ছেলেবেলায় বেশ কয়েকটা বছর তার কেটেছে পুরুলিয়ার এক অরফ্যানেজে। সেখানকার ফাদার ফারমোর তার নাম দিয়েছিলেন পরমেশ্বর। ওয়ার্ল্ডে তিন শ' কোটি মানুষের মধ্যে কোন্ দু'জন তার মা-বাপ, এ খবর পরমেশ্বরের জানা নেই। বাপ-মায়ের পরিচয় না থাকার জন্য বড় হয়ে ছেলেটা মেলানকলিয়াতে ভুগবে, তাই মানুষের স্টেজ থেকে অনেক ওপরে তুলে খোদ ভগবানের নামেই ওর নামকরণ করে দিয়েছেন ফাদার ফারমোর। কনসোলেশন প্রাইজ। ঐ নামটা নিজের সঙ্গে জুড়ে অনেক দিন আগে অরফ্যানেজ ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল সে। পালানোর ব্যাপারটা এখন নয়, পরে। তবে এটুকু বলা যায়, ঐ একমেব পরমেশ্বর নামটা নিয়েই সে খুশি থাকে নি। সুবিধামতো আরো ডজন ডজন নাম নিজের সঙ্গে জুড়ে নিয়েছে। যেমন যাদুকর হিসেবে তার নাম স্বাধীনকুমার। ক্রিমিন্যাল কেসে যে রকম থাকে, সুদেশ ওরফে লক্ষ্মণ, ওরফে যোশেফ, ওরফে ধীরুভাই, ওরফে নগিনলাল বুলাকীরাম, ওরফে ফিরোজ—পরমেশ্বরের ব্যাপার অনেকটা সেই রকম। যাদুকর হিসেবে কিছুক্ষণ আগে সে ছিল স্বাধীনকুমার। এখন আবার অরিজিন্যাল পরমেশ্বর হয়ে গেছে। বারো ঘণ্টা পর কাল সকালে তার নাম হয়ত হবে আলফানসো। অর্থাৎ কথাটা দাঁড়াল এই, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে যত রকমের জাত আছে, পঞ্জাবী-গুজরাটি-মারাঠি-বাঙালী-কেরলী-মাইশোরী-কোঙ্কনী-পার্শী ইত্যাদি, যে কোন সময় তার যে কোনটা হয়ে উঠতে পারে পরমেশ্বর। তখন তার পোশাক এবং মেক-আপ দেখলে মনে হবে একেবারে হানড্রেড পারসেণ্ট সর্দারজী কিংবা বিহারী অথবা উত্তর প্রদেশের ভাইয়া বা গোয়াঞ্চি পিদ্রু। শুধু তা-ই না, দরকার মতো সে হিন্দু, মুসলমান, ক্রীশ্চান, শিখ, জৈন, অ্যাথেয়িস্ট বা প্যানথেয়িস্টও হয়ে যেতে পারে।

পরমেশ্বরর সম্পর্কে এতক্ষণ যা বলা হয়েছে তাতে তার ইমেজ খুব সম্ভব তেমন পরিষ্কার হয়ে ওঠে নি। সেটা আরেকটু স্পষ্ট করা দরকার।

আসলে পরমেশ্বর নামে এই ক্যারেক্টারখানা যে কী, এক কথায় বা একটিমাত্র সেনটেন্সে বলে বোঝানো যাবে না। কখনও মনে হয় সে একজন উৎকৃষ্ট চীট বা জালিয়াত, কখনও মনে হয় ধর্মযাজক, কখনও মনে হয় ধড়িবাজ, জোচ্চোর, কখনও দাতাকর্ণ, কখনও বা জঘন্য ক্রিমিন্যাল। সকালে যদি মনে হয় ভগবান নিজের হাতে তাকে তৈরি করে এই ওয়াল্ডে পাঠিয়েছেন, দুপুরেই সে আইডিয়া পালটে ফেলতে হবে। তখন মনে হবে এই লোকটা হল ওয়াল্ডের টপমোস্ট মিসক্রিয়ান্ট ; খোদ শয়তান খুব যত্ন করে অনেকটা সময় নিয়ে একে বানিয়েছেন। শয়তানের হাতের তৈরী এমন হ্যাণ্ডিক্র্যাফটের নমুনা হোল ওয়াল্ডে দু-চারটের বেশি নেই। মোদ্দা ব্যাপারটা হল, একটা মানুষের ভেতর নানা ধরনের অনেকগুলো ক্যারেক্টার পুরে দিলে যা দাঁড়ায় পরমেশ্বর হল তাই।

তার কাজ হল জনগণের সেবা। সারভিস টু দি পীপ্‌ল। কারো জাল পাশপোর্ট দরকার, কারো ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি প্রয়োজন, ব্যাঙ্ক ডাকাতির জন্য কেউ হয়ত ব্লু-প্রিন্ট চায়, জেল থেকে মেয়াদ ফুরোবার আগেই কাউকে কায়দা করে বার করে আনতে হবে—এমনি নানা ব্যাপারে পরমেশ্বর সাহায্য করে থাকে। এটাই তার প্রফেশান। অবশ্য কাজের দায়িত্ব এবং ঝুঁকি অনুযায়ী তার ফী কম-বেশী হয়ে থাকে।

সারভিস টু দি নেশন অর্থাৎ জাতির সেবার জন্য পরমেশ্বরকে অনেক-রকম তালিম নিতে হয়েছে। যেমন কুংফু, ক্যারাটে, ম্যাজিক, রেসলিং, মোটর রেস, হর্স রাইডিং, জুয়া, বোমা বানানো, ইত্যাদি ইত্যাদি। পীপ্‌লের সেবা তো সোজা ব্যাপার নয়।

খুব সম্ভব, পরমেশ্বরের ভাবমূর্তি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যাচ্ছে।

এখন পরমেশ্বরের দিকে আবার চোখ ফেরানো যেতে পারে। ম্যাজিক দেখিয়ে সেই যে সে সাইকেল-রিকশায় উঠেছিল, তারপর ঘণ্টাখানেক পার হয়ে গেছে। এখনও সে ঐ রিকশাতেই বসে আছে।

এই মুহূর্তে পরমেশ্বর যেখানে এসে পড়েছে সে জায়গাটা খুবই নির্জন। দু'ধারে ক্বচিৎ এক-আধটা বাড়ি চোখে পড়ে। রাস্তায় আলো না থাকায় চারদিক অন্ধকার। অনেকক্ষণ পর পর অন্য প্রভিন্সের দু-একটা ট্রাক কি টেম্পো হেড লাইট জ্বালিয়ে ঝড়ের বেগে হুস-হাস করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আরো মিনিট পাঁচেক যাবার পর শর্ট কাট করার জন্য সাইকেল-রিকশাওলা তার গাড়িটাকে হাইওয়ে থেকে একটা সরু রাস্তায় নামিয়ে নিয়ে গেল।

এই রাস্তাটা আরো ফাঁকা। এতক্ষণ তবু দু-চারটে ট্রাক-ফ্রাক দেখা যাচ্ছিল, এখানে তার কিছুই নেই। দু' ধারে ফাঁকা মাঠে ঝোপঝাড়, ভুতুড়ে চেহারার গাছপালা, মাঝে মাঝে কচুরিপানায় ঠাসা মরা খাল, খালের ওপর সিলুয়েট ছবির মতো বাঁশের সাঁকো, ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরমেশ্বর দু' ধারের দৃশ্যাবলী দেখছিল না। তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান, কতক্ষণে সেই জগদীশ সাহার বাংলা মালের দোকানটায় পেঁছুবে। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে দু ঘণ্টা আগে, এখনও গলায় এক ড্রপ সোনার বাংলা পড়ে নি। জিভ আর আলটাগরা শুকিয়ে ব্লটিং-পেপার হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া তার সারভিসের জন্য কেউ না কেউ এতক্ষণে ওখানে এসে বসে আছে। সোসাইটিখানা দিনকে দিন যা হয়ে উঠেছে তাতে অনেকের কাছেই তার মতো লোকের ভীষণ দরকার। বাইরে চকচকে ভদ্র সিটিজেন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ফেরেববাজ, বদমাশ, ব্ল্যাক-মার্কেটীয়ার, স্মাগলার—এমন লোকের সংখ্যা রোজ হুড় হুড় করে বেড়ে যাচ্ছে। ফলে পরমেশ্বরের প্রফেশান এখন দারুণ জমজমাট। এভাবে চললে ফিউচারে গিয়ে যে কী দাঁড়াবে ভাবতেও আনন্দে ব্লাড-প্রেসার চড়ে যায়।

পরমেশ্বর খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। দারুণ স্পীডে চালাতে চালাতে আচমকা ব্রেক কষে সাইকেল-রিকশাটা থেমে গেল।

পরমেশ্বর হুড়মুড় করে সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছিল। ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'কী হল রে মাকড়া?'

চাপা সন্ত্রস্ত গলায় রিকশাওলা বলল, 'সাব, ওহী দেখিয়ে—' বলেই ভয়ে ভয়ে কাঁপা গলায় সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল। গলার স্বরের মতো তার সারা শরীরও ভয়ানক কাঁপছে।

এতক্ষণে আকাশের কপাল ফুঁড়ে টিকলির মতো একটা চাঁদ বেরিয়ে এসেছে। আবছা আলোয় পরমেশ্বর দেখতে পেল দু' শো গজ দূরে একটা দামী লিমুজিন দাঁড়িয়ে আছে। আর চার-পাঁচটা লোক সেটা ঘিরে রয়েছে। তাদের হাতে ঝকঝকে ছোরার ফলা। ওদেরই মধ্যে দু-একজন লিমুজিনের দরজা খুলে ভেতর থেকে কাউকে টেনে বার করার চেষ্টা করছে। ভেতরের লোকটা নিশ্চয়ই বেরুতে চাইছে না। তাই টানা হ্যাঁচড়া চলছে।

দেখা মাত্রই পরমেশ্বর টের পেয়ে গেল 'হাইওয়ে রবার'-এর গ্যাং। এদের কথা আগেই শুনেছে সে। এখান দিয়ে কেউ দামী গাড়ি-টাড়ি করে গেলে

ওরা চান্স পেলেই থামিয়ে দেয়। টাকা পয়সা থাকলে কেড়ে কুড়ে নেয়। বাধা দিতে গিয়ে দু-একটা মার্ডারও হয়ে গেছে। এখান থেকে থানা-টানা অনেক দূরে, তা ছাড়া পুলিসের ভ্যান পেট্রোল-টেট্রোলও দেয় না। ফলে হাইওয়ের হারামীগুলো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

আগের মতোই চাপা এবং কাঁপা গলায় রিকশাওলা বলল, 'সাব, গাড়ি বড়া সড়ক পর ঘুমা লেঙ্গে?'

অর্থাৎ সামনের দিকে ডাকাত-টাকাতদের লাফরায় না গিয়ে রিকশা ঘুরিয়ে সে হাইওয়ে ধরে যেতে চাইছে। তাতে মাইল দুয়েক বেশী ঘুরতে হবে। প্রাণ হাতে নিয়ে শর্ট-কাট করতে যাওয়াটা কোন কাজের কথা নয়। তার চাইতে ঘুরপথ ঢের ভালো।

পরমেশ্বর এক সেকেণ্ড কী ভাবল। তারপর বলল, 'নেহী—'

অবাক্ হয়ে রিকশাওলাটা বলল, 'তব্?'

'সিদে চল—' সোজা ডাকুদের গ্যাং-টার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল পরমেশ্বর।

শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না রিকশাওলাটা। তার চোখের ঘোলাটে তারা দুটো পাক্কা একটি মিনিট ফিক্সড হয়ে রইল। মনে হল, মাকড়াটার হাত-পায়ের হাড় আলগা হয়ে যাচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে ধুপ করে উঁচু সীটটা থেকে লাট খেয়ে নীচে পড়ে যাবে। লাট খেতে খেতেই যেন গলার একেবারে নীচু পর্দা থেকে তীক্ষ্ম গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'নেহী সাব, হাম নেহী সাকে। উ লোক খতম কর দেগা—'

'মাকড়া একেবারে ডরপোক। শ্লা চূহা কাঁহিকা। ঠিক আছে, তুই এখানে আমার ব্যাগটা নিয়ে বসে থাক। আমি ঐ খচড়াগুলোকে একটু দেখে আসি।'

রিকশাওলা বলল, 'কেন যাচ্ছেন সাব?'

সাইকেল-রিকশা থেকে নেমে পড়েছিল পরমেশ্বর। বলল, 'ওদের কারো সঙ্গে আমার বোনের শাদী দেব। বাতচিত করে দেখি একটা জিজাজী পাই কিনা—' বলতে বলতে এগিয়ে গেল।

কাছাকাছি আসতে গ্যাংটাকে ভাল করে দেখা গেল। বয়স কারো একটা খুব বেশী না। সবার পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। সবাই পোশাকই প্রায় একরকম—বেল-বটম, কোমরে চওড়া বেল্ট, দৌড়বার সুবিধার জন্য কেডস। ওদের কেউ কেউ বেশ লম্বা, কেউ মাঝারি মাপের বা বেঁটে। গায়ের রঙও আলাদা আলাদা—ফর্সা, কালো বা বাদামী। তবে পোশাক ছাড়া ওদের আরেক দিক থেকে মিল রয়েছে। সেগুলো হল গালের মাঝামাঝি পর্যন্ত চওড়া জুলপি, ঠোঁটের পাশ দিয়ে ঝুলে আসা গোঁফ আর কাঁধ পর্যন্ত লম্বা লম্বা চুল।

এতক্ষণে টানাটানি করে গাড়ির ভেতর থেকে দুটি লোককে নামিয়ে ফেলেছে ওরা। দুজনের একজন হল শোফার; সাদা পোশাক আর টুপি দেখে তাকে চেনা যায়। দ্বিতীয় লোকটির বয়স ষাটের কাছাকাছি। ভারী মাংসল চেহারা, গায়ের রঙ টকটকে। মোটা নাক তাঁর, ভারী চিবুক, চিবুকের তলায় তিন থাক চর্বি, চওড়া কপালের ওপর থেকে কাঁচাপাকা পাতলা চুল ব্যাকব্রাশ করা, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। পরনে দামী স্যুট আর কম্বিনেশন শ্যু। দেখেই বোঝা যায় শাঁসালো মালদার লোক। ভদ্রলোক একটা ঢাউস অ্যাটাচি ব্যাগ দু' হাত দিয়ে বুকের ভেতর চেপে ধরে আছেন। ধস্তাধস্তি এবং টানা হ্যাঁচড়ার জন্য তাঁর কোটের পকেট, জামা, টাই ছিঁড়ে গেছে। নখের আঁচড় লেগে মুখের এবং গলার চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

গ্যাং-এর একজন শোফারের গলার কাছে ছোরার ডগা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, 'একদম আওয়াজ করবে না।'

আওয়াজ করবে কি, তার হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনি বোধহয় থেমে গেছে। মুখটা রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে। চোখের তারা একেবারে ফিক্সড হয়ে গেছে। মাকড়া বেঁচে আছে কিনা কে জানে।

গ্যাং-এর বাকী ছোকরাগুলো ছোরা উঁচিয়ে বয়স্ক মালদার লোকটিকে ঘিরে রয়েছে। একটা ছোকরা ডান হাতের তর্জনী নাচিয়ে তীব্র চাপা গলায় বলল, 'ঝামেলা না করে ব্যাগটা দিয়ে দিন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'না, কক্ষনো না।'

'আপনার ডেড-বডি রাস্তায় পড়ে থাকার চাইতে ব্যাগটা দিয়ে দেওয়া কি ভালো না?'

চাপা কিন্তু দৃঢ় গলায় ভদ্রলোক বললেন, 'কিছুতেই ব্যাগ দেব না। তোমরা যা পার করো।'

খানিকটা দূরে পায়ে পায়ে ক্রশ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে পরমেশ্বর। মনে মনে বেশ তারিফ করল, বাহ্ বাহ্, মালের নার্ভের টেরিফিক জোর! এতগুলো ড্যাগার চারদিকে কিন্তু ব্যাগটা কিছুতেই সে ছাড়ছে না!

সেই ছোকরাটা এবার বলল, 'এক মিনিট সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে না দিলে ড্যাগার পেটে ঢুকে যাবে।' বলে ঘড়ির দিকে তাকাল।

পরমেশ্বরও কবজি উলটে নিজের ঘড়িটার দিকে চোখ রাখল। যখন এক মিনিট পুরো হতে মোটে দশ সেকেণ্ড বাকী সেই সময় ছোকরা আরেক বার ওয়ার্নিং দিল, 'এখনও ভেবে দেখুন—'

ভদ্রলোক কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই পরমেশ্বর আস্তে করে বলে উঠল, 'এই যে মালেরা—'

চমকে পুরো গ্যাংটা এবং সেই সঙ্গে বয়স্ক ভদ্রলোক আর তাঁর শোফার ঘাড় ফেরাল। সাইকেল-রিকশা থেকে নেমে পরমেশ্বর যে কখন এখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তারা কেউ খেয়াল করে নি।

পরমেশ্বর আবার বলল, 'এসব কী হচ্ছে? তোমাদের মতো হারামীদের জন্যে কোন ভদ্দরলোক এ রাস্তায় আসতে পারবে না! ছেড়ে দাও ওঁকে।' ভদ্রলোকের দিকে ফিরে বলল, 'আপনি চলে যান স্যার—'

ভদ্রলোক বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না ঐ লোকটা অর্থাৎ পরমেশ্বর গ্যাংস্টারদের কেউ কিনা। আর যদি এই দলের না হয়ে থাকে তা হলে তার দুঃসাহসের কথা ভাবলে বুকের ভেতরকার রক্ত জমে বরফ হয়ে যায়।

ছোকরাগুলোর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল। হিংস্র ভঙ্গিতে তারা তাকিয়ে আছে। তাদের চোখের তারা দপ্ দপ্ করছিল। যে কোন মুহূর্তে তারা পরমেশ্বরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। একটা ছোকরা, খুব সম্ভব সে-ই দলটার লীডার—চেঁচিয়ে উঠল, 'কে তুই?'

'আমি পরমেশ্বর—অলমাইটি গড। যা, ভদ্দরলোককে ছেড়ে ফুটে যা—'

'শুয়াবকা বাচ্চা, দাঁড়াও, তোমার লাশ শুইয়ে দিচ্ছি—'

বয়স্ক লোকটিকে ছেড়ে গ্যাংস্টারগুলো পরমেশ্বরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মনে হয়েছিল পাঁচটা উদ্যত ছুরির ফলায় রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে তার ডেড-বডি রাস্তায় লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু কিছুই ঘটল না; চতুর পিছল মাছের মতো সে এঁকেবেঁকে শুয়ে-দাঁড়িয়ে নিজের শরীরটাকে ছুরির ঘা থেকে বাঁচাতে লাগল। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে ক্যারাটে বা কুংফুর স্টাইলে ছোকরাগুলোর ঘাড়ে, পেটে, মুখে বা বুকে এক একটা দারুণ জোরালো আপার কাট, আণ্ডার কাট বা লাথি হাঁকিয়ে গেল।

দেখতে দেখতে সেই বয়স্ক ভদ্রলোক, তাঁর শোফার এবং দুশো গজ দূরে সাইকেল-রিকশাওলাটার চোখের সামনে যেন তারাবাজি ঘটে যেতে লাগল। তাদের চোখের পাতা আর পড়ছে না। বার বার তাদের মনে হচ্ছিল হাইওয়ের পাশের এই সরু রাস্তায় হলিউডের কোন অ্যাকশন ছবির সব চাইতে দুর্দান্ত দৃশ্যটি দেখানো হচ্ছে।

এক দিকে মাত্র একজন, অন্য দিকে পাঁচ জন সশস্ত্র গ্যাংস্টার—পনের মিনিট ধরে এদের মধ্যে একটানা দুর্ধর্ষ একটা ফাইট চলল। তারপর হঠাৎ দেখা গেল, তিনটি ছোকরা ঘাড়ে গলায় বা পেটে প্রচণ্ড মার খেয়ে মুখ গুঁজে রাস্তায় পড়ে গেছে। তাদের নাকমুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসছিল। সঙ্গীদের এই হাল দেখে বাকী দু-জন লড়াই চালিয়ে যাওয়াটা

দরকার মনে করল না। আচমকা অন্ধকার মাঠে নেমে দৌড়ুতে শুরু করল এবং চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল।

নিজেকে সারাক্ষণ বাঁচিয়ে গেলেও দু-চারটে ছুরির খোঁচা পরমেশ্বরের গায়ে লেগেছিল। সেই জায়গাগুলো থেকে এখন রক্ত বেরিয়ে আসছে। তা ছাড়া জামা আর ট্রাউজার্স ছিঁড়ে-টিড়ে গেছে। পরমেশ্বর কিন্তু সে সব গ্রাহ্য করল না। যে ছোকরা তিনটে ঘাড় গুঁজে রাস্তায় পড়ে ছিল, পরমেশ্বর তাদের কাছে গিয়ে এক এক জন করে টেনে তুলল। তারপর চোখ কুঁচকে জিভের ডগায় চুক চুক শব্দ করে বলল, 'মাকড়ারা, এই তাগদ নিয়ে হাইওয়ে রবারি করতে বেরিয়েছিস। আগে ভালো করে ফাইটের ট্রেনিং নে; তারপর এ সব কাজে নাবিব। নইলে জানে লোপাট হয়ে যাবি যে। যা, ফোট—' বলেই সবাইকে একটা করে লাথি হাঁকাল।

ছোকরা তিনটে টলতে টলতে এলোমেলো পা ফেলে খানিকটা এগুলো। তারপর হুড়মুড় করে পড়ে গেল। পরক্ষণেই উঠে হামাগুড়ি দিয়ে কিংবা বুকে হাঁটতে হাঁটতে মাঠের ভেতর অদৃশ্য হল।

এতক্ষণ সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো সেই বয়স্ক ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার তিনি ঊধর্বশ্বাসে দৌড়ে এলেন। বললেন, 'তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ ভাই। তুমি না এলে ওই গ্যাংস্টাররা আমাকে মেরে ফেলত, আর ব্যাগটা নিয়ে যেত।'

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'কী আছে এই ব্যাগে?'

'দশ লাখ টাকা।'

'এত ক্যাশ নিয়ে কেউ রাত্তিরবেলা এই রাস্তায় আসে! জানেন না, এটা টেরিফিক খচড়া জায়গা!'

'জানি। কিন্তু টাকাগুলো এক জায়গায় পেঁছে দেবার কথা আছে। তাই বাধ্য হয়ে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এ কি, তোমার গলা, হাত-টাত কেটে গেছে। এক্ষুণি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। এসো—এসো—'

'কোথায়?'

'ঐ যে আমার গাড়ি রয়েছে। নার্সিং-হোমে নিয়ে যাব।'

'আমার জন্যে ভাববেন না। স্লাইট কেটেছে; একটু ডেটল-ফেটল লাগিয়ে দিলে ঠিক হয়ে যাবে। আপনি চলে যান।'

'তাই কখনো হয়! নিজের লাইফ রিস্ক করে আমাকে বাঁচালে—এসো।'

ভদ্রলোক নিজের গাড়িতে তুলে নার্সিং-হোমে নিয়ে যাবার অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু পরমেশ্বর কিছুতেই গেল না। জগদীশ সাহার সেই শুঁড়িখানাটা তাকে চুম্বকের মতো টানছিল।

বয়স্ক ভদ্রলোকটি আবার বললেন, 'তুমি আমার লাইফ সেভ করেছ। তোমার জন্যে আমাকে কিছু করতেই হবে।'

'আপনার কিস্সু করতে হবে না। দয়া করে এখন ফুটে যান। আমার টেরিফিক জরুরী কাজ আছে।' বলেই পরমেশ্বর ঘুরে সেই সাইকেল-রিকশাটার দিকে এগিয়ে চলল।

বয়স্ক ভদ্রলোকটি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এলেন, 'তুমি কোথায় যাবে, বল, পেঁৗছে দিচ্ছি—'

'আমি যেখানে যাব তার পাঁচ শো মাইলের মধ্যে আপনার মতো জেণ্টালম্যানরা যায় না। ঝামেলা না করে এবার কেটে পড়ুন।'

প্রাণ বাঁচাবার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পরমেশ্বরের জন্য কিছু একটা না করতে পারলে ভদ্রলোকের একেবারেই ভালো লাগছিল না। তিনি এবার বললেন, 'তোমার যখন জরুরী কাজ আছে তখন আর বিরক্ত করব না! এই নাও আমার কার্ড। এতে ঠিকানা, ফোন নাম্বার দেওয়া আছে। কাল হোক পরশু হোক যেদিন ইচ্ছে এসো। আসবেই কিন্তু। প্লীজ—' পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে পরমেশ্বরের হাতে দিলেন ভদ্রলোক।

কার্ডটা ভাল করে দেখলও না পরমেশ্বর। খুবই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে পকেটে রেখে দিল। তারপর লোকটাকে গা থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্য বলল, 'আচ্ছা যাব।'

গভীর আবেগে পরমেশ্বরের দুটো হাত জড়িয়ে ধরে ভদ্রলোক বললেন, 'তুমি আমাকে রক্ষা করেছ; তোমার জন্যে আমাকে কিছু করতেই হবে।'

পরমেশ্বর উত্তর দিল না। ভদ্রলোক তার হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা চলি।'

ভদ্রলোক তাঁর গাড়ির দিকে ফিরে গেলেন। ক' পা হেঁটে পরমেশ্বর সাইকেল-রিকশায় গিয়ে উঠল।



জগদীশ সাহার কাণ্ট্রি লিকার শপের সামনে গিয়ে পরমেশ্বর যখন রিকশা থেকে নামল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। ঘন হয়ে আকাশ থেকে হিমের গুঁড়ো ঝরতে শুরু করেছে।

হাইওয়ে থেকে প্রথমে একটা গলি, সেই গলি থেকে আরেকটা খোয়া-ওঠা ব্লাইণ্ড লেনের শেষ মাথায় জগদীশের শুঁড়িখানা। এদিকের রাস্তা-ঘাটে মিউনিসিপ্যালিটি স্রেফ নিয়মরক্ষার জন্য সিকি মাইল দূরে দূরে একটা করে ল্যাম্প পোস্ট পুঁতে দিয়ে গেছে। এবং কী আশ্চর্য, কখনও কখনও সেগুলোর গায়ে টিমটিম করে আলোও জ্বলে। আজও জ্বলছিল। তবে কুয়াশার জন্য সেই আলোর দশ ফুট দূরের কিছুই চোখে পড়ে না।

জায়গাটার চারদিকে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অগুনতি বস্তি। সে সবের ফাঁকে ফাঁকে নর্দমা, ঝোপঝাড়, কিছু কিছু ফাঁকা জমি আর রিফিউজি' কলোনি।

জগদীশ সাহার শুঁড়িখানাটা একটা টালির চালের বস্তির রাস্তার দিকের ঘরে।

পরমেশ্বর তার কিট ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখল, আসর একেবারে জমজমাট। টালির চাল থেকে একটা এক শো পাওয়ারের আলো ঝুলছে। সেই আলোয় চোখে পড়ে এক ধারে গদিবসানো চেয়ারে বসে আছে মালিক জগদীশ সাহা। লোকটা মধ্যবয়সী। ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা, কালো কুচকুচে চেহারা তার। পরনে জালিকাটা গোলাপী গেঞ্জির ওপর মলমলের পাঞ্জাবি আর মিলের ধুতি। ধুতি বা পাঞ্জাবি এত ফিনফিনে যে গায়ের লোম পর্যন্ত দেখা যায়। চুল চামড়া ঘেঁষে খাড়া খাড়া করে ছাঁটা। গলায় তার সোনার চেন, তিনটে দাঁত সোনা বাঁধানো, হাতে ঢাউস সোনার তাবিজ। লোকটার সামনে উঁচু টেবলের ওপর ক্যাশ-বাক্স। ঐখানে বসেই বাজপাখির মতো চোখ দিয়ে খদ্দেরদের ওপর সে নজর রাখে।

জগদীশের পেছন দিকের দেয়ালে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের এক্সাইজ ডিপার্টমেণ্ট থেকে দেওয়া একখানা বাঁধানো লাইসেন্স ঝুলছে। সেটার পাশে

একটা কাঠের র‍্যাকে রয়েছেন মাটির তৈরী সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং মা কালীর বাঁধানো ছবি। পুজারী বামুন রোজ এসে এখানে কালী এবং গণেশ পুজো করে যায়। ঘরটার বাকী তিন দেয়ালে সিনেমার হিরোইনদের নানা রকম পোজের আলুথালু ছবি নিষ্ঠাভরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। প্রতিটি দেয়াল ঘেঁষে নীচু বেঞ্চ পাতা এবং সেগুলোর সামনে টেবলের ধরনে হাই বেঞ্চ।

এই মুহূর্তে প্রচুর লোকজন বেঞ্চগুলোতে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে। তাদের সবার সামনে মাটির খোরায় দিশি মদ আর শালপাতায় ঘুগনির চাট। চেহারা দেখেই টের পাওয়া যায়, জগদীশের খদ্দেরদের শতকরা এক-শো ভাগই হলো কারখানার ওয়ার্কার এবং বস্তির বাসিন্দা।

শুঁড়িখানার তিন-চারটে ছোকরা অনবরত ছোটাছুটি করে খদ্দেরদের মা-কালী মার্কা বাংলা মাল দিয়ে যাচ্ছে।

জগদীশ নড়েচড়ে বসে বলল, 'কি গুরু, তোমার আজ এত দেরি ?'

পরমেশ্বর বলল, 'ইলেকশানের ব্যাপারে একটা কনট্রাক্ট নিয়ে গিয়েছিলাম। কাজটা ফিনিশ করতে দেরি হয়ে গেল।'

'সান-সেট হয়ে গেছে কখন, অথচ তুমি আসছ না। তোমাকে ছাড়া শুঁড়িখানাটা মাইরি ম্যাড়ম্যাড় করছিল।'

চারদিক থেকে মাতালেরা হল্লা করে উঠল, 'যা বলেছ মালিক! গুরুকে ছাড়া রাত্তিরবেলাটা জমে না।'

জগদীশ বলল, 'যাও, বসো গে।' বলতে বলতেই হঠাৎ পরমেশ্বরের ঘাড়ে গলায় রক্ত দেখতে পেল এবং প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কী হয়েছে গুরু ? এত ব্লাড কেন ?'

পরমেশ্বর অল্প একটু হাসল, 'ও কিছু না। রাস্তায় ক'টা হারামি আমার লাশ ফেলে দিতে চেয়েছিল। এত তাড়াতাড়ি লাশ হয়ে যাবার ইচ্ছে আমার নেই। মাকড়াদের হাতে ছুরি ছিল ; একটু খোঁচা-ফোঁচা লেগে গেছে।'

ব্যাপারটা যেন কিছুই না, এমন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলে শুঁড়িখানার এক কোণে চলে গেল পরমেশ্বর। সেখানে একটা ফাঁকা চেয়ার আর টেবল রয়েছে। অবশ্য টেবলের ওধারে মুখোমুখি আরো একটা চেয়ার আছে। এগুলো তার জন্যই নির্দিষ্ট। সে ছাড়া এখানে অন্য কোন খদ্দের বসে না।

পরমেশ্বর কিট ব্যাগটা একধারে রেখে বসে পড়ল এবং টেবলের ড্রয়ার থেকে একটা তিনকোণা কাঠের বোর্ড বার করে টেবলটার ওপর রাখল। বোর্ডটার গায়ে ইংরেজীতে লেখা রয়েছেঃ 'ইণ্টারন্যাশনাল সারভিস সেণ্টার',

তার তলায় 'আন্তর্জাতিক সেবাকেন্দ্র'। এই ইন্টারন্যাশনাল সারভিস সেন্টার সম্পর্কে আগেই কিছুটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যাপারে ফী নিয়ে জনগণের সেবা করে থাকে পরমেশ্বর। জগদীশের শুঁড়িখানায় এই চেয়ার-টেবলটা তার অফিস। দরকার মতো নানা ধরনের লোক এখানে এসে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে।

এদিকে জগদীশ সাহা খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। হইচই বাধিয়ে একটা ছোকরাকে দিয়ে হাইওয়ের এক ডিসপেন্সারি থেকে আইডিন তুলো-টুলো আনিয়ে পরমেশ্বরের কাটা জায়গাগুলোতে লাগিয়ে দিল।

পরমেশ্বরের ব্যাপারে জগদীশের এত উদ্বিগ্ন বা ব্যস্ত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। পরমেশ্বর হচ্ছে এই শুঁড়িখানার লক্ষ্মী। বছর তিনেক আগে একশো বাহাত্তর ঘাটের জল খেয়ে শহরতলির এই জায়গাটায় এসে ভিড়েছিল সে। এখানে এসে প্রথম দিন সূর্যাস্তের পর জগদীশের বাংলা মালের দোকানে ঢুকে একখানা তাসের যাদু দেখিয়ে খদ্দেরদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে রোজ সন্ধ্যেবেলা সে আধ ঘণ্টার মতো নানা রকম ম্যাজিক দেখায় কিংবা নানা রকম খচড়ামোর গান গায়। পরমেশ্বর আসার তিন দিনের ভেতর এই ভেলকিবাজির আর গানের খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল। তাতে নগদ যার লাভ হয়েছিল সে হল জগদীশ সাহা। অন্য সব শুঁড়িখানা থেকে মাতালেরা মাছির মতো ঝাঁক বেঁধে গান আর ম্যাজিকের লোভে এখানে চলে এসেছে। ফলে জগদীশের বিজনেস দু-তিন গুণ বেড়ে গেছে।

জগদীশ অকৃতজ্ঞ নয়। মনুষ্যত্ব-টনুষ্যত্ব বলে খানিকটা জিনিস এখনও তার মধ্যে রয়েছে। বিজনেস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বরের মাল খাওয়া পুরোপুরি ফ্রি করে দিয়েছে সে। তারপর পরমেশ্বর যখন এখানে 'ইন্টারন্যাশনাল সারভিস সেন্টার' খুলতে চাইল, তখন ঘাড়টা দেড় ফুট হেলিয়ে এক কথায় রাজী হয়ে গিয়েছিল। তবে কানের ভেতর মুখটা গুঁজে শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, 'পুলিসের কোন ঝামেলা হবে না তো?'

পরমেশ্বর বলেছিল, 'আমার হাতের কাজ ভেরি ক্লিন। আমাকে ফাঁদে ফেলা খুব সোজা না।'

জগদীশ পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল, 'তবে আর কি, জনগণের সেবা স্টার্ট করে দাও।'

'ইন্টারন্যাশনাল সারভিস'-এর কারবারটা প্রথম দিকে তেমন চালু হয় নি। তারপর ব্যাপারটার দারুণ পাবলিসিটি হয়ে গেছে। এখন পরমেশ্বরের প্রফেশনও জমজমাট।

আইডিন-টাইডিন লাগাবার পর একটা ছোকরা নতুন বোতল খুলে মাটির খোরা বোঝাই করে বাংলা মাল আর চাট দিয়ে গেল।

পরমেশ্বরের হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। চারদিকে তাকিয়ে বলল, 'লোলেকে তো দেখছি না! মাকড়া আসে নি?' লোলে তার সব কাজের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। বড় বড় সব অপারেশনেই লোলে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ছোটখাটো কাজে পরমেশ্বর তাকে নেয় না। এই সন্ধ্যেবেলাটা সে এই শুঁড়িখানায় *'ইণ্টারন্যাশনাল সারভিস সেণ্টার'-এ বসে তাদের সাহায্যপ্রার্থী জন*-গণের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নানা অপারেশনের অর্ডার নেয়। যখন পরমেশ্বর অন্য কাজে কোথাও চলে যায় এবং এখানে বসতে পারে না, সেই সময়টা লোলে 'ইণ্টারন্যাশনাল সারভিস সেণ্টার'-এর পাবলিক রিলেশানস অফিসার-কাম-সেক্রেটারি।

জগদীশ বলল, 'মাকড়া এসেছিল। এক ঘণ্টায় দু' বোতল স্টমাকে চালান করে লেটে পড়ল। তখন ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম।'

এই এক দোষ লোলের। সোনার বাংলা দেখলে তার আর মাথার ঠিক থাকে না। আর মালটি পেটে পড়লেই আউট। পরমেশ্বর বলল, 'শলা থার্ড কেলাস ড্রাংকার্ড কাঁহাকা।'

এদিকে অন্য খদ্দেররা গলা মিলিয়ে কোরাসে বলতে শুরু করল, 'কি গুরু, আজ ভেলকিবাজি দেখাবে না?' পরমেশ্বরের জন্যই তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছে। সারাদিন পর শুঁড়িখানায় ঢুকে পরমেশ্বরের ম্যাজিক না দেখলে বা গান না শুনলে ওদের নার্ভগুলো চনমনে হয়ে ওঠে না।

পরমেশ্বর কিছু বলবার আগেই জগদীশ বলে উঠল, 'গুরুর অনেক কেটে-ফেটে গেছে, ব্লাড বেরিয়েছে। আজ আর ম্যাজিক হবে না।'

পরমেশ্বরও বলল, 'কাল দেখো। আজ ভাল লাগছে না।'

'ঠিক আছে গুরু; কালই দেখিও। ডাবল শো চাই।'

দু' মিনিট পর পর দু' খোরা বাংলা মাল পাকস্থলীতে চালান করে পরমেশ্বর যখন টের পেল মাথার ভেতর টুং-টাং করে অর্কেস্ট্রা বাজছে সেই সময় জগদীশের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'আমার কাছে আজ কেউ এসেছিল?'

হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল জগদীশের। ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, দুটো লোক এসেছিল। তিনবার ঘুরে গেছে।'

'মালেরা গেল কোথায়?'

'বলতে পারছি না। সোনার বাংলা আর ঘুগনি দিয়ে বসিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম। বসল না। দেখে মনে হল মালদার আসামী; কালীমার্কা খায় না। ভ্যাট সিক্সটি-নাইন ফাইন ওড়ায়।'

'কী করে বুঝলে?'

'মালেরা গাড়ি করে এসেছিল। ও রকম বড় গাড়ি আমাদের এ গলিতে আগে ঢোকে নি।' জগদীশ বলতে লাগল, 'তেমন মওকা বুঝলে ভাল ক্যাশ খিঁচে নিও গুরু।'

পরমেশ্বর বলল, 'আবার ওরা আসবে তো?'

'বলে তো গেছে।'

পরমেশ্বর আবার কী জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। তার আগেই বাইরে একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। জগদীশ তার গলাটা রাস্তার ধারের দরজার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'গুরু, তোমার একজন ক্লায়েণ্ট এসে গেছে।'

একটু পরে মধ্যবয়সী মেদহীন পাতলা চেহারার এক ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। পরনে দামী স্যুট, পায়ে চকচকে আয়নার মতো পালিশ করা জুতো, হাতে ইমপোর্ট করা বিদেশী সিগারেটের টিন। এ ধরনের লোক এই রকম থার্ড ক্লাস বাংলা মালের দোকানে ঢোকে না।

জগদীশ উঠে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে কচলাতে আপ্যায়নের ভঙ্গিতে বলল, 'আসুন স্যার।'

ভদ্রলোক বললেন, 'পরমেশ্বরবাবু এসে গেছেন?'

'হ্যাঁ স্যার, ঐ যে।' আঙুল বাড়িয়ে পরমেশ্বরকে দেখিয়ে দিল জগদীশ।

ভদ্রলোক সোজা পরমেশ্বরের কাছে চলে এলেন। তার মুখোমুখি চেয়ারটায় বসতে বসতে বললেন, 'এই নিয়ে আপনার কাছে চার বার এলাম।'

'ক্যাঁচাকলে পড়লে চার বার কেন, লোকে আমার কাছে আটাশ বারও আসে।' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে একটু হাসল পরমেশ্বর।

ভদ্রলোকও হাসলেন, 'তা যা বলেছেন।'

'আমার খবর কার কাছে পেলেন?'

'ঝুনঝুনওয়ালার কাছে।'

'কোন্ ঝুনঝুনওয়ালা?'

'বৈজনাথ।'

এবার মনে পড়ে গেল পরমেশ্বরের। বছর খানেক আগে তার একটা কাজ করে দিয়েছিল সে। সেজন্য মোটা ফী-ও পেয়েছিল। পরমেশ্বর বলল, 'ও, আচ্ছা।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ঝুনঝুনওয়ালা আপনার খুব প্রেইজ করে। বলে আপনার মতো জিনিয়াস সে এই ইণ্ডিয়ায় দেখে নি।'

সামনে বসে কেউ প্রশংসা-ট্রশংসা করলে কার না ভাল লাগে। পরমেশ্বরেরও লাগছিল। কিন্তু মুখ-চোখ দেখে বুঝবার উপায় নেই। চীনা কি জাপানীদের মতো ভাবলেশহীন মুখ করে সে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের মালিকের কাছে

শুনেছি, আপনি সোনার বাংলা খান না। কিন্তু এখানে কালীমার্কা ছাড়া আর কিছুই যে পাওয়া যায় না। কী দিয়ে যে আপনার সেবা করি—'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমার কিছু দরকার নেই। এই নিন।' দামী বিদেশী সিগারেটের টিনটা পরমেশ্বরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

একটা সিগারেট ধরিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'এবার বলুন আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

চারদিক ভাল করে একবার দেখে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'খুব সিক্রেট ব্যাপার। কথাটা এত লোকের সামনে বলতে চাইছি না। মানে—'

'এরা সবাই আমার নিজের লোক। ঠিক আছে, ভেতরে আসুন।'

শুঁড়িখানার পেছন দিকে আরেকটা ঘর আছে। সেটা জগদীশের স্টোর। সেখানে কালীমার্কা বাংলা মদের কয়েক শো বোতল মজুত করা আছে। স্টোরের একধারে চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে পরমেশ্বরের জন্য বসবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে জগদীশ। যদি ক্লায়েণ্টদের কেউ গোপনে কথা বলতে চায় তাকে এখানে নিয়ে আসে পরমেশ্বর।

বাংলা মালের গো-ডাউনে ভদ্রলোককে সঙ্গে করে এনে মুখোমুখি বসল পরমেশ্বর। বলল, 'স্টার্ট করে দিন!'

কোন রকম ভণিতা না করে ভদ্রলোক যা বললেন তা এই রকম। তিনি বাপের ত্যাজ্যপুত্র। মদ-মেয়েমানুষ, জাল-জোচ্চুরি ইত্যাদির জন্য বাবা তাঁকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছেন। বাবা সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেও তিনি চুকোতে রাজী নন। কেন না বাবা হলেন একজন বিরাট বিজনেসম্যান। তিনি চার কোটি টাকার মালিক। ক'দিন আগে খবর পাওয়া গেছে বাবা তাঁকে বাদ দিয়ে বাকী চার ভাইকে তাঁর বিষয়সম্পত্তি এবং নগদ তিন-চার কোটি টাকা সমান ভাগে ভাগ করে উইল করে ফেলেছেন। কিন্তু এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'আপনিই বলুন পরমেশ্বরবাবু, এই ইনজাস্টিস কেউ সহ্য করতে পারে? বড়লোকদের ছেলেরাই ড্রিংক আর মেয়েমানুষের পেছনে পয়সা ওড়ায়, নইলে ওয়ার্ল্ডে ও দুটো জিনিসের সৃষ্টি হল কেন? হিস্ট্রি কি বলে, আপনিই বলুন?'

এই সব ভ্যাজর ভ্যাজর শুনতে ভাল লাগছিল না পরমেশ্বরের। কিন্তু হাজার হোক ক্লায়েণ্ট তো। সে বলল, 'সবই বুঝলাম। এখন আমাকে কী করতে হবে সেটাই বলুন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডটা না জানা থাকলে কাজ করতে অসুবিধা

হয়। এখন হিস্ট্রিটা জেনে ফেললেন। আমার ওপর নিশ্চয়ই আপনার সিমপ্যাথি হচ্ছে। সিমপ্যাথি হলেই দেখবেন কাজটা ভাল করে করতে ইচ্ছে হবে। যাক গে, এবার আসল কথায় আসি। ঝুনঝুনওয়ালার কাছে শুনেছি, আপনি নাকি তালা খোলায় ওস্তাদ?'

পরমেশ্বর বলল, 'ওয়ার্ল্ডে এমন কোন তালা পয়দা হয় নি, যা আমি দশ মিনিটের ভেতর খুলতে পারি না।'

ভদ্রলোক সামনের দিকে ঝুঁকে পরমেশ্বরের দুই কাঁধে দুই হাত রেখে আবেগের গলায় বললেন, 'মনে হচ্ছে ভগবান আমাকে ঠিক জায়গায় পেঁৗছে দিয়েছেন। গত জন্মে আপনি আমার মায়ের পেটের ভাই ছিলেন ব্রাদার।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এ জন্মে কী করতে হবে সেটাই এখন বলে যান।'

পকেট থেকে একটা উইল বার করে ভদ্রলোক এবার বললেন, 'এটা নকল। একটা আলমারির তালা খুলে বাবার আসল উইলটা বার করে এই জাল উইলটা সেখানে রেখে আসতে হবে।'

'আপনার বাবার আলমারিটা কোথায় আছে?'

'তাঁর অফিসের চেম্বারে।'

'চেম্বারটা কোথায়? কিভাবে সেখানে যেতে হয়—ডিটেলে বলুন। সেই অনুযায়ী ব্লু-প্রিণ্ট তৈরি করতে হবে।'

ভদ্রলোক জানালেন, তাঁর বাবার অফিস 'চৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স' ডালহৌসি স্কোয়ারের এক গলির ভেতর পুরনো সাত তলা বাড়ির একেবারে টপ ফ্লোরে। বাবার চেম্বারে ঢুকতে হলে অন্ততঃ কয়েকটা বড় বড় হল ঘর পেরুতে হয়। অফিস আওয়ার্সে অর্থাৎ দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ওখানে ক্লার্ক, টাইপিস্ট এবং অন্যান্য এমপ্লয়ীরা বসে কাজ করে। বাকী সময়টা তালা বন্ধ থাকে। তা হলে দেখা যাচ্ছে বাবার চেম্বারে ঢুকতে হলে কম করে তিনটে হল ঘরের তিনটে এবং তাঁর চেম্বারের একটা, মোট চারটে তালা খুলতে হবে। আরেকটা মুশকিল হল এই, অফিসের সময় বাদ দিয়ে একটা নেপালী দারোয়ান সর্বক্ষণ হলঘরগুলোর সামনের প্যাসেজে পাহারা দেয়। তার চোখে ধুলো ছিটিয়ে কিছু করার উপায় নেই। তবে রাত আটটা থেকে ন'টা, এই এক ঘণ্টা হাওয়া খাওয়ার জন্য সে একবার বেরোয়। যা করবার এই এক ঘণ্টার ভেতরে করে ফেলতে হবে। ভদ্রলোক কাগজে নকশা এঁকে অফিসে ঢোকার রাস্তা, সিঁড়ি, লিফট ইত্যাদি দেখিয়ে দিলেন।

পরমেশ্বর কয়েক সেকেণ্ড কী ভাবল। তারপর হাতটা বাড়িয়ে বলল, 'আমার ফী পাঁচ হাজার টাকা দিন।'

ভদ্রলোক বিমূঢ়ের মতো বললেন, 'মানে ?'

'মানে পরশুদিন এ রকম সময় এসে আপনার বাবার অরিজিন্যাল ডকুমেণ্টটা নিয়ে যাবেন।'

'পাব তো ভাই, পাব তো ?'

'না পেলে পাঁচ হাজারের ডাবল দশ হাজার ফেরত নিয়ে যাবেন।'

ভদ্রলোক পকেট থেকে এক তাড়া এক শো টাকার নোট বার করে গুনে গুনে পঞ্চাশটা পরমেশ্বরকে দিলেন।

পরমেশ্বর কিন্তু গুনল না। নোটগুলো পকেটে পুরে উঠে পড়ল। বলল, 'আচ্ছা, গুড নাইট।'

একটু পর ফের শুঁড়িখানায় ফিরে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল পরমেশ্বর। আর সেই ভদ্রলোক সোজা রাস্তার দিকে গিয়ে তাঁর গাড়িতে উঠলেন। তিনি চলে যাবার পর দু-মিনিটও কাটল না, আবার একটা দামী লিমুজিন শুঁড়িখানার সামনে এসে দাঁড়াল। কয়েক সেকেণ্ড বাদে দরজা খুলে যে এসে ভেতরে ঢুকল তার বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন। পাকানো চেহারা, নাকমুখ ধারালো, মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি চলে গেছে। সিঁথির দু' ধারে কাঁচা-পাকা ঘন চুল। পরনে দামী ট্রাউজার এবং বুশ শার্ট। তীক্ষ্ম চোখে চারদিক দেখতে দেখতে তাঁর নজর পরমেশ্বরের টেবলে 'ইণ্টারন্যাশনাল সারভিস সেণ্টার'-এর সেই তিনকোণা বোর্ডটার ওপর আটকে গেল। এমন একটা বাজে টাইপের শুঁড়িখানার 'ইণ্টারন্যাশনাল সারভিস'-এর মতো ব্যাপারের হেড কোয়ার্টার থাকতে পারে, এটাই যেন সে ভাবতে পারছে না। অন্ততঃ তার মুখ-চোখ দেখে তাই মনে হচ্ছে।

জগদীশ বলল, 'ওঁর কাছে যান। উনিই পরমেশ্বরবাবু।' পরমেশ্বরকে বলল, 'গুরু, ইনিও তিন বার তোমার খোঁজ করে গেছেন।'

লোকটি সোজা পরমেশ্বরের কাছে এসে মুখোমুখি বসল। বলল, 'আমার নাম নটবর নন্দী। একটা বিশেষ দরকারে আপনার কাছে এসেছি।'

পরমেশ্বর বলল, 'বিশেষ দরকার ছাড়া আমার কাছে কোন হারামী আসে না। বলুন, আপনার জন্যে কী সারভিস দিতে পারি ?'

এই লোকটাই আসল পরমেশ্বর কি না এবং এটাই 'ইণ্টারন্যাশনাল সারভিস সেণ্টার'-এর সঠিক হেড অফিস কি না সেটা বাজিয়ে নেবার জন্য নটবর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি চ্যাটার্জী সাহেবকে চেনেন, অবনী চ্যাটার্জী ?'

'মানে স্টিভেডর অবনী চ্যাটার্জী তো ?'

'হ্যাঁ।'

'চিনব না কেন ? তার একটা কাজ আমি করে দিয়েছিলাম। লোকটার দিল আছে। যা ফী ঠিক হয়েছিল তার ডাবল দিয়েছে।'

নটবর নিশ্চিত হয়ে গেল, আসল জায়গাতেই সে এসে গেছে। বলল, 'চ্যাটার্জী সাহেব আপনার নাম দারুণভাবে রেকমেণ্ড করেছেন। বলেছেন, ওয়ার্ল্ডে এমন কোন কাজ নেই যা আপনি পারেন না।'

চোখ কুঁচকে একটু হাসল পরমেশ্বর। তারপর বলল, 'বলুন, আপনার জন্যে কী করতে হবে?'

'আমার জন্যে না, এই ভদ্রলোকের জন্যে।' পকেট থেকে আইভরি ফিনিশ কাগজে ঝকঝকে করে ছাপা একটা কার্ড টেবিলের ওপর রাখল নটবর।

পরমেশ্বর কার্ডটা তুলে নিয়ে দেখল, তাতে লেখা আছেঃ

'মিঃ সোমেশ্বর মল্লিক

ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট'

তার তলায় কলকাতার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার একটা ঠিকানা এবং ফোন নম্বর।

দেখতে দেখতে চমকে উঠল পরমেশ্বর। সোমেশ্বর মল্লিক কলকাতার একজন টপমোস্ট শিল্পপতি। খুবই ফেমাস লোক। সোসাইটির ওপর দিকের এমন একজন লোকের তার কাছে কী দরকার থাকতে পারে, ভেবে পেল না পরমেশ্বর। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সঙ্গে এঁর রিলেশন কী?'

দ্রুত চারদিক একবার দেখে নিয়ে খুব চাপা গলায় নটবর বলল, 'আমি মল্লিক সাহেবের এজেণ্ট। জানেনই তো, বড়লোকদের অনেক রকম সিক্রেট কাজকর্ম করতে হয়। নিজের হাতে সে সব তো করা যায় না।'

'তাই আপনাদের মতো একটা করে হাত দরকার হয়। তাই না?'

'একজাক্টলি—' হারমোনিয়ামের রিডের মতো বড় বড় বত্রিশটা দাঁত বার করে হাসল নটবর।

পরমেশ্বর বলল, 'এবার কাজের কথাটা সেরে ফেলুন—'

'সেটা মল্লিকসাহেবই বলবেন। কাল আটটা থেকে ন'টার ভেতর আপনি এই কার্ডের ঠিকানায় দয়া করে একবার আসবেন। যদি বলেন আমি নিজে এসে আপনাকে নিয়ে যাব।'

সেই দলিল সরাবার কথাটা মনে পড়ে গেল পরমেশ্বরের। ক'মিনিট আগেই কথা দেওয়া হয়েছে নকলটা বাপের সিন্দুকে রেখে পরশুদিন আসলটা তার ত্যাজ্য পুত্তুরকে দেবে। মনে মনে ভেবেই রেখেছিল, অপারেশনটা কালই করে ফেলবে। এবং সেটা করতে হবে রাত আটটা থেকে ন'টার মধ্যে। পরমেশ্বর বলল, 'আটটা থেকে ন'টায় খুব সম্ভব হবে না। সাড়ে ন'টা নাগাদ যেতে পারি। আমার অন্য একটা কাজ আছে। ঐ সময়টায় গেলে আপনাদের অসুবিধা হবে না তো?

'একটুও নয়। আমরা আপনার জন্যে ওয়েট করব। আচ্ছা, আজ চলি। কাল দেখা হবে।' নটবর চলে গেল।

সোসাইটির বড় বড় ছদ্মবেশী চোর, জোচ্চোর, ফেরেববাজ, বিজনেসম্যান ইত্যাদির জন্য অনেক বাজে কুকাজ করে দিয়েছে পরমেশ্বর। করতে হয়েছে, কেননা এটাই তার একমাত্র প্রফেশন। কিন্তু এত বড় একজন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের তার সারভিস দরকার, এটা কোন দিন ভাবতেও পারে নি পরমেশ্বর। সোমেশ্বর মল্লিক সম্পর্কে তার দারুণ কৌতূহল হতে লাগল।

শুঁড়িখানার ছোকরারা মাঝে মাঝে খোরায় ভরে বাংলা মাল দিয়ে যাচ্ছে। অন্যমনস্কের মতো খেতে খেতে সোমেশ্বর মল্লিকের নাম ছাপানো কার্ডটা হাতের ভেতরে নাড়াচাড়া করছিল পরমেশ্বর। আচমকা তার মনে পড়ে গেল, খানিকক্ষণ আগে এখানে আসার সময় রাস্তায় গ্যাংস্টারদের সঙ্গে লড়বার পর সেই মধ্যবয়সী ভদ্রলোকটি তাকে একটা কার্ড দিয়েছিলেন।

আগে পরমেশ্বরকে কেউ কখনও কার্ড-টার্ড দেয় নি। আজ একই দিনে সে পর পর দু-খানা কার্ড পেয়েছে। দিনটা নিঃসন্দেহে মনে করে রাখবার মতো।

একজন হলেন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট সোমেশ্বর মল্লিক। অন্য কার্ডটা যিনি দিয়েছেন তিনি তা হলে কে? নিশ্চয়ই কোন ভি-আই-পি-টি-আই-পি হবেন। ভেরি ইমপর্টাণ্ট পার্সন না হলে কে আর নিজের পরিচয় দেবার জন্য কার্ড ছাপাবে?

তখন কার্ডটা না দেখেই পকেটে পুরে ফেলেছিল পরমেশ্বর। এখন সেটা দেখার জন্য দারুণ কৌতূহল হতে লাগল তার। পকেট হাঁটকে অন্য সব কাগজপত্র এবং মানি-ব্যাগের ভেতর থেকে সেই কার্ডটা তুলে আনল সে। আলোর দিকে সেটা ধরতেই চমকে উঠল। এটা অবিকল আগের কার্ডটার মতোই। এখানেও সোমেশ্বর মল্লিকের নাম, ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার লেখা রয়েছে।

আশ্চর্য, যে ভদ্রলোককে ঘণ্টা দেড় দুই আগে গ্যাংস্টারদের হাত থেকে সে বাঁচিয়েছে তিনিই তাঁর সারভিসের জন্য একজন এজেণ্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন। যারা তার সাহায্য চায় তারা কেউ সাচ্চা লোক নয়, সবার কাপড়ের তলায় দগদগে ঘা রয়েছে। খবর নিলেই জানা যাবে, তারা প্রত্যেকে এক একটি বিপজ্জনক ক্রিমিন্যাল। চোর-জোচ্চোর-বজ্জাত, যাই হোক না, পরমেশ্বরের অবশ্য কোন রকম মাথাব্যথা নেই। সাধু-মহাত্মা থেকে ফোরটোয়েণ্টি পর্যন্ত যে-ই তার কাছে আসুক না, টাকা পেলে চোখ বুজে তার কাজ করে দেবে সে। তবু সোমেশ্বর মল্লিক সম্পর্কে তার কৌতূহলটা টান টান হয়ে রইল।



রাত বারোটার পর জগদীশের শুঁড়িখানা থেকে বেরুল পরমেশ্বর। এর মধ্যে পাক্কা এক বোতল কালী মার্কা তার পাকস্থলীতে ঢুকে গেছে। এতটা ধেনো বা ধান্যেশ্বরী স্টমাকে ঢুকলে পা দুটো কনট্রোলে থাকার কথা নয়। কিন্তু মাথার ভেতর রিমঝিম করে ব্যাঞ্জো বেজে যাওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছুই হল না পরমেশ্বরের। সোজা পা ফেলে ফেলে সে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

এখান থেকে দুই ফার্লং দূরে একটা বস্তিতে বছর তিনেক ধরে আছে পরমেশ্বর। লাইফে কম করে শ' দু-তিনেক ঠিকানা বদল করেছে সে। ছেলেবেলায় বছর এগারো বারো একটানা একটা অরফ্যানেজে ছিল সে। তারপর থেকে দু' মাস, চার মাস, বড় জোর এক বছরের বেশী কোথাও থাকে নি। কিন্তু এখানে এসে পুরো তিন বছরেরও বেশী কাটিয়ে দিল।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় একটা মাঝারি ধরনের বস্তির ভেতর এসে পড়ল পরমেশ্বর। মাঝখান দিয়ে ট্যারাবাঁকা রাস্তা চলে গেছে; সেটার দু-ধারে টানা টালির চালের তলায় সারি সারি ঘর। এক একটা ফ্যামিলি থাকে। সবগুলো ঘরের সামনের দিকেই ঘেরা বারান্দা। ওখানেই ভাড়াটেরা রান্না-টান্না করে। অর্থাৎ কিনা বারান্দাগুলো একই সঙ্গে কিচেন-কাম-ডাইনিং রুম। এগুলোর পাশ দিয়ে একটা করে ফোকর। ফোকরগুলো আসলে ঘরে ঢোকার দরজা। প্রতিটি ঘরেই তিন ফুট বাই দু' ফুট মোট ছয় স্কোয়ার ফুটের একটা করে জানলা রয়েছে. কিন্তু তা দিয়ে বছরের কোন ঋতুতেই আলো বা হাওয়া ঢোকে না!

মাঝখানের রাস্তাটা একই সঙ্গে পায়ে চলার পথ এবং নর্দমা। দু-ধারের ঘরগুলো থেকে যাবতীয় আনাজের খোসা, মাছের কাঁটা, বাসি উনুনের ছাই ইত্যাদি আবর্জনা এখানে ফেলা হয়। তা ছাড়া রয়েছে থিকথিকে কফ, থুতু,

পানের পিক। বস্তির গাদা গাদা কাচ্চা-বাচ্চার প্রাকৃত কর্মের চিহ্নও এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এ বস্তির বাতাসে একটা পার্মানেণ্ট দুর্গন্ধ সর্বক্ষণ অনড় হয়ে থাকে। নতুন কেউ এখানে ঢুকলে হড় হড় করে বমি করে ফেলবে। তিন বছর এখানে থাকার জন্য এখন আর দুর্গন্ধটা নাকে লাগে না পরমেশ্বরের; অ্যাটমসফিয়ারটা মোটামুটি সয়ে গেছে। একসঙ্গে অনেক দিন থাকার অভ্যাস আর কি!

এই মুহূর্তে বস্তির একটা লোকও জেগে নেই। সবাই ঘুমের সমুদ্রে ডুবে আছে।

এখন বোধ হয় পূর্ণিমা। মাথার ওপর রুপোর থালার মতো গোল একখানা চাঁদ উঠে এসেছে। ঘন দুধের মতো জ্যোৎস্নায় চারদিক যেন ভেসে যাচ্ছিল।

মাঝখানের রাস্তাটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বস্তির শেষ মাথায় এসে পড়ল পরমেশ্বর। এখানেই শেষ ঘরটায় সে থাকে।

নিজের ঘরের কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ল বারান্দার দেয়ালে ঠেসান দিয়ে উঠোনে পা ঝুলিয়ে বসে আছে এলিজাবেথ। তার বয়স ষাট পঁয়ষট্টি। মাথার বারো আনা সাদা হয়ে গেছে। চামড়া কোঁচকানো। মুখে অসংখ্য আঁকিবুকি; মনে হয় কেউ যেন ছুরি দিয়ে এলোপাথাড়ি দাগ টেনে গেছে। চোখ দুটো ঘোলাটে। গায়ের রং পোড়া ঝামার মতো।

এলিজাবেথের পরনে এই মুহূর্তে মোটা জীনের বাদামী গাউন, গলায় কালো 'কারে' স্টেনলেস স্টীলের একটা ক্রস। ক্রসটা সর্বক্ষণ তার গলায় থাকে।

রাত্তিরে বারোটা একটার আগে কোনদিনই ফেরে না পরমেশ্বর। যতক্ষণ না সে ফিরছে, বারান্দায় ঠেসান দিয়ে রাস্তায় পা ঝুলিয়ে একা বসে থাকে। পরমেশ্বর অনেকবার বলেছে, তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। কিন্তু কে কার কথা শোনে। যত রাতই হোক বুড়ী বসে থাকবেই।

পরমেশ্বরকে দেখে উঠে পড়ল এলিজাবেথ। বলল, 'আয়—' বলেই বারান্দার এক কোণে নিবু-নিবু হেরিকেনটার চাবি ঘুরিয়ে আলোর তেজ বাড়িয়ে দিল।

রাস্তা থেকে বারান্দায় উঠতে উঠতে সেই পুরনো কথাটাই আবার বলল, 'মাদার, তোমাকে বলেছি না, আমার জন্যে ওয়েট করবে না। এল্ড এজে এত রাত জাগা তোমার ঠিক না।'

এলিজাবেথ ততক্ষণে ঘরে ঢুকে আরেকটা হেরিকেনের আলোর তেজ বাড়াতে বাড়াতে বলল, 'তুমি বাইরে থাকবে আর আমি খেয়ে-দেয়ে মজা করে নাক ডাকাব —সেটা আমাকে দিয়ে হবে না।'

এলিজাবেথের সঙ্গে পরমেশ্বরের এমনিতে কোন সম্পর্ক নেই। শুধু তার সঙ্গেই না, ওয়াল্ডের্ কারো সঙ্গেই তার কোন সম্পর্ক আছে বলে সে মনে করে না। উলটোপালটা হাওয়ায় তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর ধরে কুটোর মতো এলোমেলো উড়ে বেড়াচ্ছে। দু' বছর আগেও এলিজাবেথকে চিনত না পরমেশ্বর। এক শীতের রাত্তিরে এলিয়ট রোড দিয়ে আসতে আসতে আচমকা তার চোখে পড়েছিল, একদল গুণ্ডা টাইপের লোক একটা ঘর থেকে হাঁড়িকুড়ি, পুরনো ছেঁড়া তোশক, বালিশ, তোবড়ানো টিনের ট্রাঙ্ক, ভাঙ্গা পিয়ানো, জলের কুঁজো ছুঁড়ে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলছে। একটু দূরে চর্বির পাহাড় একটা লোক—পরনে ফিনফিনে ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবির ওপর দামী কাশ্মীরী শাল; হাতে গোটা-সাতেক আংটি, পায়ে দামী পাম্প-শু—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশ তরিবত করে দৃশ্যটি দেখছে। গালের দেড় ইঞ্চি পুরু চর্বির ওপর দিয়ে ঢেউয়ের মতো তৃপ্তির একটা হাসি খেলে যাচ্ছিল।

আর এই এলিজাবেথ বুড়ী হাতজোড় করে কাঁদতে কাঁদতে একবার করে সেই গ্যাংস্টারগুলোর কাছে দৌড়ে যাচ্ছে; সেখান থেকে ধাক্কা খেয়ে আসছে চর্বির পাহাড়টার কাছে; ওখান থেকে ধাক্কা খেয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে গ্যাংস্টার-গুলোর কাছে। ক্যারমের ঘুঁটির মতো অনবরত রিবাউণ্ড খাচ্ছিল সে, আর অসহায় করুণ গলায় বলছিল, 'আমাকে তোমরা বার করে দিও না। এই কোল্ড নাইটে কোথায় যাব আমি! আমার যে কেউ নেই। দয়া করো, প্রভু তোমাদের মঙ্গল করবেন।'

চর্বির পাহাড় বলছিল, 'কেউ কারো মঙ্গল করে না। নিজের মঙ্গল নিজেরই করতে হয়। তোমাকে তুলে দিয়ে আমি তাই করছি। এখন মোটা সেলামি নিয়ে ঘরটা ভাড়া দিতে পারব।'

বুড়ীটাকে যে উৎখাত করা হচ্ছে, সেটা টের পাওয়া গিয়েছিল। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখতে দেখতে এক ধরনের মজাও লাগছিল, আবার রাগে ব্লাড-প্রেসারটা একটা বিপজ্জনক জায়গায় পেঁাছে যাচ্ছিল পরমেশ্বরের। মজার কারণটা হল, একটা বুড়ীকে তুলবার জন্য এতগুলো লোক লাগাতে হয়েছে। রাগটাও প্রায় সেই কারণেই। অসহায় বলেই তার ওপর হামলা চালানো সম্ভব হচ্ছে। পরমেশ্বরের একবার ইচ্ছা হল, কুংফু বা ক্যারাটের প্যাঁচ ঝেড়ে এমন কিছু করে দেয় যাতে মাকড়াগুলো অন্ততঃ মাস তিনেক হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে। কিন্তু কিছুই করল না সে। দশ মিনিটের ভেতর ওয়েলেসলির ওদিক থেকে একটা টেম্পো ভাড়া করে নিয়ে এসেছিল।

এদিকে মালপত্র বার করে সেই গ্যাংস্টারগুলো তখন ঘরে তালা লাগিয়েছে।

চর্বির পাহাড় একটা বড় স্টেশন ওয়াগন নিয়ে এসেছিল। সেটায় করে ওরা ফিরে যাবে, সেই সময় পরমেশ্বর বলল, 'এই যে মাকড়ারা, একটা বুড়ীকে ঘর থেকে বার করে অনেক রংবাজি তো দেখালে। এবার বাকী কাজটা ফিনিশ করে যাও—'

গ্যাংস্টারগুলোর এবং চর্বির পাহাড়টার মুখ চোখ স্টীলের মাতো শক্ত হয়ে উঠেছিল। দাঁতে দাঁত চেপে তারা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী কাজ ?'

'বুড়ীর যে মালগুলো ঘর থেকে রাস্তায় ছুঁড়ে দিয়েছ, সেগুলো ঝটপট এই টেম্পোটায় তুলে দাও—'

গ্যাংস্টারগুলো একেবারে থ হয়ে গেল। তাদের মতো মাস্তানদের কেউ যে এভাবে হুকুম করতে পারে, এটা তারা ভাবতে পারছিল না। ওদিকে বুড়ী এলিজাবেথ শব্দ করে কাঁদছিল আর তার মালপত্র টানাটানি করে এক জায়গায় জড়ো করে রাখছিল। সে-ও হকচকিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পরমেশ্বরের দিকে তাকিয়েছিল।

কয়েক সেকেণ্ড মাত্র; তারপরই গ্যাংস্টারেরা চিৎকার করে উঠেছিল, 'শালা হারামী, আমরা তোমার বাপের চাকর! দাঁড়াও, তোমার বডি ফেলে দিচ্ছি—'

ছোকরাগুলো পরমেশ্বরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই পকেট থেকে একটা ফল্‌স্‌ রিভলবার বার করে তাক করল সে, 'অনেক মাকড়াই আমার বডি ফেলতে চায় কিন্তু পারে না—বুঝলি! নে, মালগুলো তুলে ফেল।' হাতের ভেতর রিভলবারটা নাচাতে লাগল সে। সর্বক্ষণই ওটা তার সঙ্গে থাকে।

গ্যাংস্টারেরা থমকে গিয়েছিল। এক সেকেণ্ডও আর দেরি করল না তারা। হাতে হাতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বুড়ীর মালগুলো টেম্পোতে তুলে দিল।

পরমেশ্বর বলল, 'এবার ফুটে যা মাকড়ারা—'

ছোকরাগুলো এবং সেই চর্বির পাহাড়টা আর দাঁড়াল না। স্টেশন ওয়াগনে উঠে চোখের পলক পড়তে না পড়তেই হাওয়া হয়ে গেল।

পরমেশ্বর এলিজাবেথের দিকে এগিয়ে গেল। ইংরেজীতে বলল, 'গাড়িতে উঠে পড়—'

এলিজাবেথ হকচকিয়ে গিয়েছিল। সে ভেবে পাচ্ছিল না মাস্তানদের হাত থেকে সে আরো ভয়ানক টাইপের কোন খুনির হাতে গিয়ে পড়ল কিনা! ভয়ে তার হাত-পা কাঁপছিল। হাত জোড় করে সে বলেছিল, 'মাই সন, আমাকে মেরে ফেলো না।'

'ভ্যাজর ভ্যাজর না করে এখন ওঠো—'

'কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে ?'

'গেলেই দেখতে পাবে। আমার সঙ্গে না গেলে শীতের রাত্তিরে রাস্তায় জমে স্রেফ আইসক্রিম হয়ে যাবে।'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গাড়িতে উঠেছিল এলিজাবেথ। আর সোজা তাকে বস্তির এই ঘরে এনে তুলেছিল পরমেশ্বর। তারপর থেকে এখানেই আছে।

টেম্পোয় করে নিয়ে আসার সময় এলিজাবেথের কথা টুকরো টুকরো ভাবে শুনেছে পরমেশ্বর। বুড়ীর লাইফটা ভীষণ দুঃখের। সৎ মেয়েসুদ্ধু রেলের এক অ্যাংলোইণ্ডিয়ান গার্ডকে বিয়ে করেছিল সে। এটা তার তিন নম্বর বিয়ে। প্রথম বিয়েটা বছর চারেক স্থায়ী হয়েছিল। তারপর কাটাকুটি হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিয়েটা ভেঙে গিয়েছিল মাত্র ছ' মাসের মাথায়। তৃতীয় স্বামী ডিকির আগের পক্ষের সতের বছরের মেয়ে লিসিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত এলিজাবেথ। কিন্তু সতীনের মেয়েটা তাকে দু' চোখে দেখতে পারত না।

তিন নম্বর স্বামী ডিকি ছিল রেলের গার্ড। লোকটা এমনিতে দারুণ ভালো—বেজায় ফুর্তিবাজ আর দিলদরিয়া। সর্বক্ষণ কিছু একটা হইচই নিয়ে থাকতে ভালবাসত। মেজাজ হলে গলার স্বর শেষ পর্দায় তুলে গাঁক গাঁক করে বিং ক্রসবির রোমান্টিক গান গেয়ে উঠত কিংবা পিয়ানোতে ঝড় তুলে বাজিয়ে যেত। ছুটির দিনে বৌ আর মেয়েকে নিয়ে ময়দানে বেড়াতে বেরুত কিংবা হগ সাহেবের বাজারে মার্কেটিং-এ যেত। দোষের মধ্যে ছিল একটা ; মারাত্মক ড্রিঙ্ক করত। দিশি মদ গিলে গিলেই লিভারের বারোটা বাজাল। তারপর ঐ ধেনোর বোতলে চড়েই একদিন হেভেনলি অ্যাবোডে চলে গেল অর্থাৎ কিনা স্বর্গারোহণ করল। ডিকির মৃত্যুর দু' মাসের মাথায় লিসি এলিজাবেথকে না জানিয়ে একটা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছোকরাকে বিয়ে করে অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেল। তারপর থেকে সে একাই আছে।

ডিকির মৃত্যুর পর রেলের অফিস থেকে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড-টাণ্ডের কিছু টাকা পেয়েছিল এলিজাবেথ। তাই দিয়ে বছর পাঁচেক চালিয়েছে। এখন হাতে একটা পয়সাও নেই। একদিন খাওয়া জোটে তো তিন দিন না খেয়ে থাকে। তার ওপর আট ন' মাসের বাড়ি ভাড়া বাকী পড়ে গেছে। সেদিন তো বাড়িওলা ব্যাসমল জেঠমালানি গুণ্ডা দিয়ে তাকে উৎখাতই করে দিল।

যাই হোক, দু' বছর এই বস্তিতে থেকে বাংলা ভাষাটা মোটামুটি শিখে ফেলেছে এলিজাবেথ। বুঝতে সবই পারে। বলতেও পারে। তবে উচ্চারণে কেমন যেন একটা টান আছে। পরমেশ্বর তাকে ডাকে 'মাদার' বলে। এলিজাবেথ তার নাম ধরেই ডাকে, তবে কখনো কখনো বলে—'মাই সন'। বেঁচে থাকার সুখ বা আনন্দ কাকে বলে এই প্রথম জানতে পেরেছে এলিজাবেথ।

হেরিকেনের জোরালো আলোয় এখন দেখা যাচ্ছে ঘরের একধারে পাশাপাশি.

দুটো ক্যাম্প খাট পাতা। একটা পরমেশ্বর, বাকীটা এলিজাবেথের। খাট দুটো ছাড়া ঘরের চারদিক নানারকম মালপত্রে ঠাসা। এ সবই এলিজাবেথের জিনিস। নিজের বলতে খানকতক জামা প্যান্ট, ম্যাজিকের সাজ-সরঞ্জাম আর সবরকম তালা খোলার জন্য মাস্টার কী, মেক-আপের সাজ-সরঞ্জাম এবং নিজের প্রফেসানের জন্য আরো হাজাররকম টুকিটাকি জিনিস ছাড়া ওয়াল্ডের্ আর কিছুই নেই পরমেশ্বরের।

এলিজাবেথ বলল, 'জামা-কাপড় পালটে হাত মুখ ধুয়ে নে। আমি ততক্ষণ খাবারগুলো গরম করে ফেলি।'

এলিজাবেথ বেরিয়ে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'আরে মাদার, একটু দাঁড়াও। এই নাও—' পকেট থেকে তাড়া তাড়া নোট বার করে এলিজাবেথকে দিয়ে ফের বলল, 'ছ' হাজার টাকা আছে।'

মহীধর তরফদারের ইলেকশন মিটিং জমাবার জন্য এক হাজার টাকা পেয়েছিল সে। আসছে কাল 'চৌধুরী এ্যাণ্ড কোম্পানি'তে গিয়ে আসল দলিল সরিয়ে জাল দলিল রেখে আসার জন্য পেয়েছে আরো পাঁচ হাজার। এলিজাবেথকে নিয়ে আসার পর থেকে সব টাকা পয়সাই তার হাতে তুলে দেয় পরমেশ্বর।

ছ' হাজার টাকার গোছা গোছা নোট হাতে নিয়ে উদ্বিগ্নভাবে এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করল, 'এত টাকা কোথায় পেলি ?'

কথা বলতে বলতে ট্রাউজার্স-ফ্রাউজার্স ছেড়ে লুঙ্গি আর হাতওলা নাইলনের গেঞ্জি পরে নিয়েছিল পরমেশ্বর। কোণের একটা দড়িতে তোয়ালে ঝুলছিল। হাত বাড়িয়ে সেটা টেনে নিতে নিতে সে বলল, 'ওয়াল্ডের্ অনেক মাকড়া টাকা দেবাব জন্যে পাগলা হয়ে ঘুরছে।' আঙুল দিয়ে নিজের মাথাটা দেখিয়ে বলতে লাগল, 'এর ভেতর ব্রেন বলে যে মাল আছে স্রেফ সেটা খাটিয়ে সেই টাকাটা পীপলের পকেট থেকে আমার পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছি।'

দুশ্চিন্তা কাটল না এলিজাবেথের। বলল, 'এই টাকা পয়সা নিয়ে গোলমাল হবে না তো ? তোর কোন ক্ষতি হবে না ?'

'কোন গড়বড় হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মাদার। এ সব সাচ্চা অনেস্ট মানি—আমার প্রফেসনাল ফী। গায়ে খেটে ব্রেন খাটিয়ে এ সব আমি ইনকাম করেছি। ও-কে ?' বলেই ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

রাস্তাটার একেবারে শেষ মাথায় মিউনিসিপ্যালিটির বারোয়ারি টিউবওয়েল। সেখান থেকে হাত-পা ধুয়ে এসে পরমেশ্বর দেখল, বারান্দায় আসন পেতে কেরোসিনের স্টোভ জেবলে খাবার-দাবার গরম করছে এলিজাবেথ। পরমেশ্বর খেতে বসে গেল।

একটু পর থালায় রুটি তরকারি, আর প্লেটে প্লেটে ডিমের ঝোল, ডাল

ইত্যাদি সাজিয়ে দিল এলিজাবেথ। খেতে খেতে পরমেশ্বর বলল, 'তোমার ফান্ড তো ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। ছ' হাজার টাকায় মিনিমাম একটা মাস চলে যাবে, না কি বল ?'

এই ফান্ডের ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলা দরকার। এখানকার, মানে এই বস্তির যারা বাসিন্দা তাদের কেউ কারখানার ফিটার কি ওয়েল্ডার, কেউ মাদারী খেলোয়াড়, কেউ ফড়ে, কেউ দালাল, কেউ সার্কাসের জোকার, জুয়াড়ী, ফেরেববাজ, মাতাল, সাট্টাবাজ, চোর, ছ্যাঁছোড়, রেসুড়ে—ইত্যাদি হাজার টাইপের মানুষ। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে যত রকম জাত আছে, যেমন বাঙালী, বিহারী, গুজরাটী, কেরলী—সব এখানে পাওয়া যাবে। এই বস্তিটা যেন একটা মিনি ইন্ডিয়া।

এখানকার বেশির ভাগ লোকেরই নির্দিষ্ট কোন রোজগার অর্থাৎ 'অসটেনসিবল মীনস অফ ইনকাম' নেই। হাতে পয়সা এল তো হুড় হুড় করে এসে গেল। আবার কখনও হাত একেবারে ফাঁকা। যারা ফ্যাক্টরি-ট্যাক্টরিতে কাজ করে তাদেরও বছরে অন্ততঃ তিনটে মাস একটা না একটা ঝামেলা লেগে রয়েছে—হয় লক-আউট নইলে স্ট্রাইক। স্ট্রাইক বা লক-আউটের সময়টা তারা পুরোপুরি বেকার।

দেখেশুনে এই সব মানুষের জন্য একটা 'রিলিফ ফান্ড' খুলেছে পরমেশ্বর। যখন কারো ইনকাম থাকবে না তখন ফান্ড থেকে তারা 'ক্যাশ ডোল' নিয়ে যাবে। এত দিন ঘরের এক কোণে একটা টিনের বাক্সে টাকা পয়সা রেখে দিত। যার যখন দরকার হত ওখান থেকে নিয়ে যেত। অবশ্য ইচ্ছামতো নেওয়া চলত না। 'কোটা' ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। যার ফ্যামিলিতে দুজন লোক সে নেবে মাসে পঁচাত্তর টাকা, তিন জন হলে এক শো, এই রকম ফ্যামিলি যত বড় হবে বরাদ্দ তত বাড়বে। তা ছাড়া সাট্টা, রেস, জুয়া ইত্যাদির জন্যও 'রিলিফ'-এর ব্যবস্থা আছে। কারণ ওগুলোও তো কারো না কারো প্রফেসান।

আগে যে যার মতো বাক্স থেকে টাকা নিয়ে যেত। এলিজাবেথ আসার পর এখন সে-ই ওটা দেখাশোনা করে। যখন ফান্ডে টাকা থাকে না তখন পরমেশ্বরকে সে শুধু জানিয়ে দেয়। পরমেশ্বর নানা রকম ধান্দা করে টাকা পয়সা জুটিয়ে টিনের বাক্স বোঝাই করে ফেলে। এই বস্তির বাসিন্দারা তাকে প্রায় ভগবানের মতো মনে করে। এদের নিয়েই তার বিশাল সংসার। তবে এলিজাবেথ এবং আরো পাঁচ-সাত জনকে নিয়ে তার নিজস্ব একটা মিনি সংসারও রয়েছে !

খেতে খেতে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'লক্ষ্মী, টগর, মজিদ আর জোড়া

মানকেরা খেয়েছে ?' এরা সব তার মিনি সংসারের মেম্বার। ডান পাশের দুটো ঘরে থাকে।

এলিজাবেথ বলল, 'কখন। তোর জন্যে বসে থেকে থেকে শুয়ে পড়েছে।'

এলিজাবেথের মতোই রাস্তার নানা জায়গা থেকে কুড়িয়ে-টুড়িয়ে এই বস্তিতে নিজের কাছে তাদের এনে তুলেছে পরমেশ্বর। সে জানে, রোজই তার জন্য লক্ষ্মী-টক্ষ্মীরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ; কিন্তু কতক্ষণ আর জেগে থাকবে ! বারোটা বাজলে চোখ যখন ঘুমে ঢুলে আসে তখন গিয়ে শুয়ে পড়ে।

এক সময় খাওয়া হয়ে গেল পরমেশ্বরের। আঁচিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে ক্যাম্পখাটে টান টান শুয়ে পড়ল। আর শুয়ে শুয়েই একটা সিগারেট ধরাল। মুখটা ছুঁচলো করে হাওয়ায় এক একটা ধোঁয়ার রিং ছুঁড়তে ছুঁড়তে কালকের প্রোগ্রাম ভাবতে লাগল। অফিস টাইমে কোন সময় ডালহৌসিতে গিয়ে চৌধুরী এ্যাণ্ড কোম্পানির অফিসটা দেখে আসতে হবে। আগে থেকে দেখা না থাকলে পরে অসুবিধা হবে। কেননা এ সব কাজে হাজারটা রিস্ক থাকে। একটু এদিক-সেদিক হয়ে গেলে ধরা পড়ার খুবই সম্ভাবনা। কত দিক দিয়ে চৌধুরী অ্যাণ্ড কোম্পানিতে ঢোকা যায় এবং কত দিক দিয়ে সেখান থেকে পালানো যায়, এ সব জানা থাকলে নিখুঁতভাবে অপারেশনের প্ল্যানটা করা যায়।

দলিল বদলাবার কথা ভাবতে ভাবতে আচমকা সেই কার্ড দুটোর কথা মনে পড়ে গেল। আশ্চর্য, যে লোকটাকে আজ হাইওয়ের পাশের গলিতে সে বাঁচিয়েছে তার এজেণ্ট শুঁড়িখানায় এসে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে গেছে। কাল ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। লোকটা কেমন ? তাকে দিয়ে সে কী করাতে চায় ? এ সব ভাবতে ভাবতে কিছুক্ষণের মধ্যে চোখ জুড়ে এল। কখন যে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে এলিজাবেথ তার পাশের খাটটায় এসে শুল, সে টেরও পেল না।



পরের দিন সকালে কার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল পরমেশ্বরের, 'দাদা, তোমার চা—'

চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিছানায় উঠে বসে পরমেশ্বর দেখল, লক্ষ্মী চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মেয়েটার বয়েস কুড়ি-বাইশ। গায়ের রং না কালো না ফর্সা। নাক মুখ মোটামুটি, তবে সারা গায়ে তার প্রচুর স্বাস্থ্য। বাবা-মা ভাই-বোন কেউ নেই। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এক গাঁ থেকে কলকাতায় ভিক্ষে করতে এসেছিল। থাকত ফুটপাথে।

একদিন মাঝরাতে তালা খোলার একটা অপারেশন সেরে পবিত্র খালসা হোটেল থেকে আস্ত এক বোতল বাংলা মাল আর রোটি-তড়কা খেয়ে শিয়ালদা স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল পরমেশ্বর। ইচ্ছা ছিল রাতটা স্টেশনেই রিফিউজিদের সঙ্গে কাটিয়ে দেবে (তখন শিয়ালদায় রিফিউজিরা থাকত)। কেননা অত রাতে শহরতলীর লাস্ট ট্রেন চলে গেছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মেয়ে গলার প্রাণ ফাটানো চিৎকার কানে এসেছিল।

আস্ত একটি বোতল স্টমাকে রয়েছে। নার্ভের ভেতর ঝড়ের গতিতে কনসার্ট বেজে যাচ্ছিল। চিৎকার শুনে চমকে সামনের দিকে তাকাতেই পরমেশ্বরের চোখে পড়েছিল চারটে লোক একটি যুবতী মেয়েকে ঘিরে ধরেছে। হারামীগুলোর উদ্দেশ্যটা এক সেকেণ্ডে বুঝে নিয়েছিল পরমেশ্বর। মাত্র পাঁচটা মিনিট; তার মধ্যেই ক্যারাটে আর কুংফুর গোটা কয়েক প্যাঁচে চারটে বদমাশ রাস্তায় ঘাড় গুঁজে পড়ে গিয়েছিল। তারপর সেই রাতেই লক্ষ্মীকে মাইল দশেক হাঁটিয়ে শহরতলীর এই বস্তিতে চলে এসেছে। সেই থেকে মেয়েটা এখানেই আছে।

লক্ষ্মীর হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে লম্বা চুমুক দিল পরমেশ্বর। বলল, 'ফাইন!'

লক্ষ্মীর চোখ মুখ চকচকিয়ে উঠল। পরমেশ্বর নামে এই অদ্ভুত টাইপের লোকটা জন্তুদের হাত থেকে তার ইজ্জত বাঁচিয়েছে। শুধু তাই না, লোকের

কাছে ভিক্ষে করে করে তার দিন কাটাতে হত। রাস্তা থেকে তুলে এনে তাকে মোটামুটি একটু ভদ্রগোছের নিশ্চিন্ত জীবনের মধ্যে এনেছে। এর জন্য লক্ষ্মীর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। পরমেশ্বরকে খুশি করার জন্য সে যে কী করবে, ভেবে পায় না। পরমেশ্বরের মুখে একটু হাসি দেখলে তার মনে হয়, হাতে স্বর্গ পেয়ে গেল।

চা খেতে খেতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল পরমেশ্বরের। চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্মীকে দেখতে দেখতে রগড়ের গলায় বলল, 'বীরেনের সঙ্গে কারবার কেমন চলছে? মাকড়াকে গেঁথে তুলতে পারবি তো?'

মুখ লাল হয়ে উঠল লক্ষ্মীর। চোখ নামিয়ে আধফোটা গলায় সে বলল, 'যাও, জানি না।'

বীরেন মাল্টিমিলিওনেয়ারের ছেলে। ইচ্ছা করলে রাজার হালে দারুণ আরামে থাকতে পারত। কিন্তু জনগণের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হবার জন্য সব স্যাক্রিফাইস করে এই বস্তিতে এসে আছে। মাঝারি ধরনের একজন ট্রেড ইউনিয়ন লীডার। তার ধারণা, গরিব দুঃখী মানুষদের জন্য কাজ করতে হলে তাদের মধ্যে থাকতে হয়। দূরে থেকে ফাঁকা সহানুভূতির বুলি আউড়ে কিংবা লম্বা লম্বা বাণী ঝেড়ে কাজের কাজ কিছুই করা যায় না। এই বীরেনের সঙ্গে প্রেম-ফ্রেম চালাচ্ছে লক্ষ্মী। ব্যাপারটা দু-এক দিন পরমেশ্বরের চোখেও পড়ে গেছে।

পরমেশ্বর বলল, 'গেঁথে যদি তুলতে পারিস, এক মাস আগে নোটিশ দিবি। ক্যাশ যোগাড় করতে হবে তো। সানাই-ফানাই বসিয়ে আর ডাবল ব্যান্ড পার্টি বাজিয়ে শ্লা এমন একখানা বিয়ে দেব না, লোকের চোখ ব্রহ্মতালুতে উঠে যাবে।'

জিভ ভেংচে আরক্ত মুখে কিছু বলতে যাচ্ছিল লক্ষ্মী, তখনই লাট্টু আর ছর্‌রা এসে ঢুকল। ঢুকেই দুজনে গ্যাঁট হয়ে বসে পরমেশ্বরের দুটো পা কোলে তুলে টিপতে শুরু করল। রোজ এই সময় এসে গা ম্যাসাজ করতে শুরু করে দেয়। পা থেকে ম্যাসাজ শুরু মাথায় গিয়ে শেষ।

লাট্টু এবং ছর্‌রা, দুজনেরই বয়স এগারো কি বারো। ওদেরও কেউ নেই। কারা ওদের মা-বাবা তাও জানে না। শুধু এটুকু জানে, কলকাতার রাস্তায় জন্মেছে। সেখানেই বড় হয়েছে। ওদের প্রফেসান ছিল পুরনো ময়লা কাগজ কুড়িয়ে বিক্রি করা। থাকত লোকের বাড়ির রকে কিংবা ফুটপাথে। কিন্তু রোজ আর কত কাগজ রাস্তায় পাবে! তা ছাড়া এই প্রফেসানেও দারুণ কম্পিটিশন। ফলে একদিন খাওয়া জুটত তো তিন দিন না খেয়ে থাকত।

একদিন কাগজ কুড়োতে গিয়ে দামড়া মোষের মতো অন্য তিন-চারটে কম্পিটিটরের সঙ্গে ওদের মারামারি লেগে যায়। তারা ওদের মেরে নাকমুখ ফাটিয়ে দিয়ে চলে যায়। রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ঘাড় গুঁজে যখন ওরা কাঁদছিল সেই সময় পরমেশ্বরের সঙ্গে ওদের দেখা। পরমেশ্বর ওদের রাস্তা থেকে তুলে নিজের কাছে এই বস্তিতে নিয়ে এসেছে। সেই থেকে এখানেই আছে। এক জনের ওপর আরেক জনের দারুণ টান। পরমেশ্বর আদর করে ওদের বলে, 'মাকড়ারা যেন "মেড ফর ইচ আদার"। একেবারে জোড়া মানকে।'

এলিজাবেথ বা লক্ষ্মীর মতো পরমেশ্বরের কাছে ওরাও দারুণ কৃতজ্ঞ। তার মুখে একটু হাসি দেখার জন্য সকালে উঠেই লাটু আর ছর্‌রা ম্যাসাজ করতে বসে যায়।

লক্ষ্মী আর দাঁড়াল না। বলল, 'আমি যাই, মাসী উনুন ধরিয়ে দিয়েছে। বাটনা বাটতে হবে।' বলেই চলে গেল। এলিজাবেথকে সে মাসী বলে।

জোড়া মানিক সমানে ম্যাসাজ করে যাচ্ছে। আরামে চোখ বুজে আসছিল পরমেশ্বরের। সে বলতে লাগল, 'ফাস কেলাস মাকড়ারা। হাত কি, যেন শলা বাটার। যা ম্যাসাজ শিখেছিস, এলিজাবেথ টেলারের গা টেপাবার ব্যবস্থা করে দেব।'

ছর্‌রা আর লাটু একসঙ্গে বলে উঠল, 'এলিজাবেথ টেলার কে গুরু?'

বাঁ চোখ টিপে পরমেশ্বর বলল, 'সে আছে, দেখলে তেদের হার্টে থ্রম্বসিস হয়ে যাবে।'

এই সময় কাছাকাছি কোন একটা থানা থেকে ন'টার সাইরেন বেজে উঠল। পরমেশ্বর হাত তুলে বলল, 'স্টপ—'

লাটু আর ছর্‌রা ম্যাসাজ থামিয়ে দিল। অবাক্ হয়ে বলল, 'কেন গুরু, গা দাবানো থামাতে বলছ কেন?'

ক্যাম্প খাট থেকে নামতে নামতে পরমেশ্বর বলল, 'আমাকে এখন বেরুতে হবে। রাত্রে অপারেশন করার জন্য 'চৌধুরী এ্যাণ্ড কোম্পানি'র অফিসটা একবার দেখে আসা দরকার।'

তোয়ালে-ফোয়ালে কাঁধে চাপিয়ে ঘর থেকে বাইরে এসে পরমেশ্বর দেখল, লোলে বাজার নিয়ে এসেছে। এলিজাবেথ তার কাছ থেকে প্রতিটি নয়া পয়সার হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছে। একধারে বসে লক্ষ্মী বাটনা বাটছে আর টগর আনাজ কুটছে।

লোলে এককালে ছিল দুর্দান্ত পকেটমার। বাসে-ট্রামে লোকের পকেট হালকা করে বেড়াত। একবার পরমেশ্বরের পকেটে হাত ঢোকাতে গিয়ে ধরা



ঘড়ির কাঁটায় যখন এগারটা তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে গায়ে দারুণ একটা ড্রেস চড়াল পরমেশ্বর। তারপর পকেটে একটা মাস্টার-কী আর সেই নকল দলিলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

আরো ঘণ্টাদেড়েক পর দেখা গেল ডালহৌসিতে 'চৌধুরী এ্যাণ্ড কোম্পানি'র অফিস বিল্ডিংটায় ঢুকে পড়েছে পরমেশ্বর।

প্রথমে চারিদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সে। কোন্ দিকে সিঁড়ি, ক'টা গেট, কোথায় লিফট, দারোয়ানদের মুভমেণ্ট—সব দেখার পর একজনকে খোঁজার ভান করে 'চৌধুরী এ্যাণ্ড কোম্পানি'র অফিসে এসে ঢুকল। উদ্দেশ্য, অপারেশনের আগে এই অফিসটা ভাল করে দেখে রাখা।

বলার দরকার নেই, পরমেশ্বর যাকে খুঁজতে এসেছে সেই নামের কেউ এ অফিসে নেই। তবে এখানে এসে নিজের প্ল্যানটা ঠিক করে নিল সে। সেই লোকটা যা বলেছিল, ঠিক তাই। অর্থাৎ কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সীনিয়র চৌধুরীর চেম্বারে ঢুকে দলিল বদল করতে হলে মোট চারটে তালা খুলতে হবে।

সব দেখার পর অফিসটা থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় এলো-মেলো ঘুরে বেড়াল পরমেশ্বর। একটা পাবলিক শুঁড়িখানায় গিয়ে বোতলখানেক বীয়ার খেল। একটা চেনাজানা পেট্রোল পাম্পে ঘণ্টাদুয়েক আড্ডা মারল। এখন রাত আটটা পর্যন্ত সময়টা এইভাবে কাটাতে হবে।

আটটা বাজার কয়েক মিনিট আগে আবার 'চৌধুরী এ্যাণ্ড কোম্পানি'র অফিস বিল্ডিংটার সামনে এল পরমেশ্বর এবং রাস্তায় একটা ফায়ার বক্সের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল, একটা নেপালী পাহারাদার অফিসটা থেকে বেরিয়ে আসছে। আগেই সে খবর পেয়েছে, এই নেপালীটাই রাত্তিরে 'চৌধুরী

এ্যাণ্ড কোম্পানি'র অফিস পাহারা দেয় এবং আটটা থেকে ন'টা পর্যন্ত এক ঘণ্টার জন্য বেড়াতে বেরোয়।

নেপালীটা রাস্তার মোড়ে উধাও হলে ফায়ার বক্সের পেছন থেকে বেরিয়ে এল পরমেশ্বর। তবে অফিস বিল্ডিংটার মেইন গেট দিয়ে সে ঢুকল না। কেননা সেখানে তিন-চারটে দারোয়ান বসে আছে। এত রাতে ফাঁকা অফিস বাড়িতে ঢুকতে গেলে নিশ্চয়ই তারা চ্যালেঞ্জ করবে।

মেইন গেট থেকে খানিকটা দূরে আরেকটা ছোট গেট রয়েছে। সেখানে কেউ নেই। এদিক সেদিক দেখে সট্ করে সেখান দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল পরমেশ্বর। তারপর মাত্র মিনিট দশেকের ব্যাপার। সীনিয়র চৌধুরীর চেম্বারে ঢাউস দেয়াল আলমারি খুলে আসল দলিলের জায়গায় নকল দলিলটা রেখে যখন সে বেরিয়ে এল তখন ঘড়িতে আটটা বেজে বারো।

বিনা ঝামেলায় অপারেশনটা হয়ে যাবার জন্য মেজাজটা শরীফ হয়ে রয়েছে। টুই টুই করে শিস দিতে দিতে মেইন গেটে এসে দারোয়ানদের কাছে এসে খৈনি চেয়ে খেল। তারপর সবাইকে দু' টাকা করে 'টিপস' দিয়ে গালে একটা করে চুমা খেয়ে বলল, 'মাকড়ারা, ঠিক এই রকম করে অফিস পাহারা দিও। আচ্ছা বাই—'

দারোয়ানরা বখশিস পেয়ে দারুণ খুশী। তবে চুমুর জন্য গালে যে থুতু লেগেছিল সেটা ঘষে ঘষে তুলতে তুলতে এই অদ্ভুত টাইপের লোকটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

'চৌধুরী এ্যাণ্ড কোম্পানি'র অফিস যে রাস্তায় সেখান থেকে বেরিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংস পেরিয়ে সোজা এসপ্ল্যানেডের দিকে হাঁটতে লাগল পরমেশ্বর। দূরে একটা বড় বাড়ির টাওয়ার ক্লকে আটটা বেজে এখন বত্রিশ। ন'টা থেকে দশটার ভেতর সোমেশ্বর মল্লিকের সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রয়েছে। এখনও হাতে যথেষ্ট সময় আছে। হুটপাট না করে বেশ ধীরে-সুস্থে এসপ্ল্যানেডে এসে মিনি বাসে উঠল পরমেশ্বর।

ঘণ্টাখানেক বাদে কলকাতার আউটস্কার্টে একটা বিরাট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল-কাম-রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ায় এসে বাস থেকে নেমে পড়ল পরমেশ্বর।

কার্ডে যে ঠিকানা ছিল সেটা মিলিয়ে একটা বিরাট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের প্রকাণ্ড গেটটার সামনে এসে পরমেশ্বর দেখল, সোমেশ্বর মল্লিকের এজেণ্ট পাকানো চেহারা নটবর নন্দী দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই লোকটা ক্যাঙারুর মতো লাফাতে লাফাতে কাছে এগিয়ে এল। রাজকীয় রিসেপসান দেবার ভঙ্গিতে

মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'আসুন আসুন পরমেশ্বরবাবু, আপনার জন্যেই সেই ন'টা থেকে এখানে ওয়েট করছি।'

পরমেশ্বর উত্তর দিল না। অল্প একটু হাসল।

নটবর আবার বলল, 'আসুন, আসুন'—গেটের পর সবুজ কার্পেটের মতো চমৎকার 'লন', শাড়ির পাড়ের মতো 'লন'-টার বর্ডারে সমান মাপের কোনিক্যাল শেপের ছোট ছোট ঝাউগাছ।

'লন'-টাকে সমান দু'ভাগে ভাগ করে মাছখান দিয়ে বাদামী নুড়ির রাস্তা চলে গেছে। 'লন'-এর দু' অংশেই চমৎকার দুটো ফোয়ারা ঘিরে সুন্দর করে সাজানো সারি সারি অঁকিড।

নুড়ির রাস্তাটা যেখানে গিয়ে থেমেছে সেটা এই কমপ্লেক্সের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং। বাড়িটার গায়ে মর্ডান আর্কিটেকচারের ছাপ রয়েছে।

যেতে যেতে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'জামাই আদর করে তো নিয়ে যাচ্ছেন; মামলাটা কী বলুন তো?'

নটবর বলল, 'আপনাকে কালকেই বলেছি, যা বলবার মল্লিক সাহেবই বলবেন।'

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এ ঢুকে লিফটে করে ফিফ্‌থ ফ্লোরে উঠে এল। করিডরে চার ইঞ্চি পুরু জয়পুরী কার্পেট মাড়িয়ে নটবর যে চেম্বারটার সামনে এসে দাঁড়াল তার গায়ে পেতলের প্লেটে লেখা আছে 'ম্যানেজিং ডিরেক্টর'। চেম্বারটার বাঁ পাশে টুলের ওপর ধবধবে উর্দিপরা তিনটে বেয়ারা শিরদাঁড়া টান টান করে বসে আছে। নটবরদের দেখে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে উঠল।

নটবর জিজ্ঞেস করল, 'সাহেবের ঘরে আর কেউ আছে?'

একটা বেয়ারা জানাল, 'কেউ নেই। মল্লিক সাহেব নটবরদের জন্য অপেক্ষা করছেন'। জানিয়েই কারুকাজ-করা বিরাট দরজা খুলে দিল।

নটবর পরমেশ্বরকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

প্রকাণ্ড চেম্বার; আগাগোড়া দামী মার্বেল-উডের প্যানেল বসানো রয়েছে। মেঝেতে দামী নীল কার্পেট, দেয়ালে তিনটে এয়ার-কুলার বসানো।

একধারের গোটা দেয়ালে শুধু কাচ বসানো; তার ওপর পর্দা ঝুলছে।

চেম্বারের মাঝখানে প্রকাণ্ড অর্ধবৃত্তাকার টেবিল। তার ওধারে আরামদায়ক রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন সোমেশ্বর মল্লিক। টেবলের এধারে অনেকগুলো গদিমোড়া ফ্যাশানেবল চেয়ার।

দেখামাত্রই সোমেশ্বরকে চিনতে পারল পরমেশ্বর। সোমেশ্বরও তাকে চিনে ফেলেছেন। কয়েক সেকেণ্ড স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে প্রায় লাফিয়েই

উঠলেন তিনি। গলার স্বরে সবরকম বিস্ময় ঢেলে বললেন, 'আরে তুমি, এসো এসো—'

এজেণ্ট নটবর নন্দী অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। উটের মতো গলা বাড়িয়ে বলল, 'স্যার, আপনি এঁকে চেনেন নাকি?'

'চিনি মানে! কাল এ না থাকলে দশ লাখ টাকার সঙ্গে আমার প্রাণটা ডেফিনিটলি চলে যেত। হী ইজ মাই সেভিয়ার—আমার ত্রাণকর্তা। আমাকে ও প্রাণে বাঁচিয়েছে। তোমাকে কাল রাত্তিরে বলছিলাম না!'

নটবর দেড়ফুট ঘাড় হেলিয়ে দিল অর্থাৎ সোমেশ্বর বলেছেন। তার চোখের তারা ক্রমশঃ ফিক্সড হয়ে যেতে লাগল।

সোমেশ্বর আবার বললেন, 'ওহ্, কাল কুংফু আর ক্যারাটের কি খেলাই না দেখিয়েছে! চোখের ওপর দশ মিনিট ধরে যেন একখানা অ্যাকশান-প্যাক্ড আমেরিকান ছবি দেখছিলাম।'

ব্যস্তভাবে টেবলের ওধার থেকে বেরিয়ে এসে পরমেশ্বরের দু' হাত ধরে গভীর আবেগের গলায় সোমেশ্বর বলতে লাগলেন, 'তুমি এসেছ, কি খুশী যে হয়েছি! মা-বাবা একবার প্রাণ দিয়েছিলেন, তারপর তুমি দিলে। ইউ আর অ্যাজ গুড অ্যাজ মাই সেকেণ্ড পেরেণ্টস। তোমার ঋণ কোন দিন শোধ করতে পারব না। হোল লাইফ তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। বসো ভাই, বসো—'

একটা চেয়ারে পরমেশ্বরকে বসিয়ে নিজে ফের টেবলের ওধারে চলে গেলেন। মুখোমুখি বসে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আমাকে কেন আসতে বলেছেন?'

সোমেশ্বর বললেন, 'তুমি আমার লাইফ বাঁচিয়েছ; তোমার জন্যে আমার কিছু করা দরকার। কী যে করব, ঠিক করতে পারছি না।' একটু ভেবে বলল, 'কী নাম তোমার?'

'পরমেশ্বর মানে অলমাইটি গড আর কি—' বলে একটু হাসল পরমেশ্বর।

'পরমেশ্বর কী? আই মীন, তোমার সারনেমটা জানতে চাইছি।'

'সেটা স্যার আমার মা-বাবা বলতে পারবে।'

'কারা তোমার মা-বাবা?'

'পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু মাকড়াদের ট্রেস পাচ্ছি না। খচ্চরদুটো আমার জন্ম দিয়ে রাস্তায় ফেলে রেখে কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে। কাওয়ার্ডস—'

'স্যরি; তোমার জন্যে কষ্ট হচ্ছে।' মুখটা দারুণ ব্যথিত আর করুণ করে ডিজেল ইঞ্জিনের মতো হুশ করে একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন

সোমেশ্বর। তারপর বললেন, 'বাবা-মা'র পরিচয়-টরিচয় না থাক, তুমি একটা গ্রেট সোল—মহাপুরুষ।'

'আমি স্যার মহাপুরুষ-ফুরুষ না, একটা থার্ড ক্লাস মাল। যাক গে, রাত হয়ে যাচ্ছে, কাজের কথাটা পাকা করে ফেলুন—'

রাতের কথায় কী যেন মনে পড়ে গেল সোমেশ্বরের। দ্রুত কবজি উলটে ঘড়ি দেখে নিয়ে চোখ কুঁচকে নটবরের দিকে তাকালেন, 'কী হল, তোমার সেই লোক কোথায়? ন'টা থেকে দশটার ভেতর আসবে বলেছিল। এখন তো দশটা বেজে গেছে।'

নটবর মাড়িসুদ্ধু বত্রিশখানা দাঁত বার করে বলল, 'আমার লোক তো এসেই গেছে স্যার, আপনার সামনেই বসে আছে।'

বিস্ময়ে চোখদুটো পুরোপুরি গোল হয়ে গেল সোমেশ্বরের। অনেকক্ষণ পর বললেন, 'পরমেশ্বরই তোমার লোক! এ যে ডাবল সারপ্রাইজ।'

নটবর নন্দী বলল, 'কেমন কোইনসিডেন্স দেখুন। যে আপনার প্রাণ বাঁচাল তাকেই আমি ধরে আনলাম।'

সোমেশ্বর বললেন, 'তুমি তো আবার অদৃষ্ট-টদৃষ্ট মানো না। সবই প্রি-ডেস্টিনড।'

পরমেশ্বর অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। সেই দুপুরবেলা বস্তি থেকে বেরিয়ে এসেছে। সূর্যাস্তের পর জগদীশের শুঁড়িখানায় গিয়ে যার পাকি দু' বোতল সোনার বাংলা স্টমাকে চালান করার কথা, এখনও যে একটা ড্রপও খায় নি। অবশ্য মাঝখানে বোতলখানেক বীয়ার খেয়েছিল। কিন্তু কোথায় সোনার বাংলা আর কোথায় বীয়ার! এইট পারসেণ্ট অ্যালকোহলে ঘাড়ের একটা রগেও কিক লাগে না। বার-দুই পেচ্ছাপ করতেই পুরো বীয়ারটাই বেরিয়ে গেছে। এখন আগমার্কা খাঁটি বাংলা মাল না পেলে সে মরে যাবে।

পরমেশ্বর বলল, 'স্যার, অনেক রাত হয়ে গেছে। ঝটপট কাজটা সেরে ফেলুন। আমাকে আবার ফিরতে হবে।'

'দশটা আবার রাত নাকি! ফেরার জন্যে চিন্তা কী! আমি নিজে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।' সোমেশ্বর মল্লিক বলতে লাগলেন, 'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। আবার নটবর তোমাকে আমার অন্য কাজের জন্যে ধরে এনেছে। আমার বন্ধু স্টিভেডর অবনী চ্যাটার্জীর মুখে দু' হাজার বার তোমার প্রেইজ শুনেছি। সে তোমার দারুণ ফ্যান। অবনী বলে তোমার মতো জিনিয়াস সে লাইফে দেখে নি। সেই তুমি এসেছ; আর এসেই কিনা যাবার জন্য উড়ু-উড়ু করছ। কোনো মানে হয়!'

পরমেশ্বর ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'স্যার, সন্ধ্যের পর থেকে গলায় এক ড্রপও সোনার বাংলা পড়ে নি। জিভের ডগা থেকে আলটাগরা পর্যন্ত একেবারে ডেজার্ট হয়ে আছে। হ্যাবিট স্যার, পনের বছর বয়স থেকে সোনার বাংলা খেয়ে আসছি। এ সময়টা ঐ জিনিস স্টমাকে না পড়লে মনে হয় থ্রম্বসিস হয়ে যাবে।'

বিমূঢ়ের মতো সোমেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, 'সোনার বাংলা কী?'

'বাংলা মাল সার—'

'ও, ড্রিংক করতে চাইছ? হুইস্কি, রাম, জিন, কইনাক, ভদকা, পোর্ট, শেরি —এনি ড্যাম গুড ড্রিংক অফ দা ওয়ার্ল্ড তোমার জন্যে রেডি আছে। কাজের কথাটা সেরেই তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব। সেখানে ড্রিংক এ্যান্ড ডিনারের পর যেখানে বলবে তোমায় পোঁছে দিয়ে আসব।'

পরমেশ্বর বলল, 'হুইস্কি, ভদকা, রাম-ফাম—এ সব বিলিতি জিনিসে আমার চলবে না স্যার। আমি স্যার আগ মার্কা দেশপ্রেমিক; দিশি বাংলা মাল ছাড়া আমি কিছু খাই না।'

সোমেশ্বর নটবরের দিকে তাকালেন। নটবর বলল, 'আমি স্যার ব্যাপারটা দেখছি।'

নটবর বেরিয়ে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে একটু ভেবে সোমেশ্বর বললেন, 'এক কাজ কর, এখানেই ডিনার আর ড্রিংক-ট্রিংকের অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দাও। এত রাত্তিরে পরমেশ্বরকে আর টানাটানি করে সার্কুলার রোডে নিয়ে যাবো না।'

'ঠিক আছে স্যার। এখানেই সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করছি।' বলে নটবর চলে গেল।

সোমেশ্বর সোজাসুজি পরমেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার কাজের কথাটা সেরে ফেলি। অবনী চ্যাটার্জী সেদিন বলেছিল, ওয়ার্ল্ডে এমন কোন কাজ নেই যা তুমি পার না—'

পরমেশ্বর বলল, 'উনি স্যার একটু বাড়িয়ে বলেছেন। আমি যা যা পারি তার একটা লিস্ট দিচ্ছি। দেখুন এতে আপনার কাজ চলবে কিনা—' পকেট থেকে সাইক্লোস্টাইল করা একটা কাগজ বার করে টেবিলের ওপর রাখল পরমেশ্বর।

কাগজটা তুলে নিয়ে সোমেশ্বর পড়তে লাগলেন। (১) ম্যাজিক (২) ক্যারাটে (৩) কুংফু (৪) নোট জাল (৫) দলিল জাল (৬) জেল পালানোয় সাহায্য (৭) যে কোন তালা খোলায় সাহায্য (৮) প্রতারণায় সাহায্য (৯) ইলেকশানে জেতার জন্য প্লান করে দেওয়া (১০) যে কোন ছদ্মবেশ ধারণ (১১) ক্লায়েন্টের সুবিধার জন্য অন্যের ফ্যাক্টরি বা বাড়ি উড়িয়ে দিতে সহায়তা (১২) চোরাই মাল সরিয়ে দিতে সাহায্য (১৩) স্মাগলিং-এ সাহায্য, ইত্যাদি ইত্যাদি। চল্লিশটা আইটেম রয়েছে।

এক একটা আইটেম পড়ছিলেন সোমেশ্বর আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠছিলেন, 'ফাইন, ফাইন'—সবগুলো পড়া হলে বললেন, 'অবনী বাজে কথা বলে নি। সত্যি, তুমি জিনিয়াস। দেখা যাচ্ছে, তুমি পার না এমন কোন কাজ নেই।'

'একটা কাজ ছাড়া—'

'কী সেটা?'

'মার্ডার! মানুষ খুন করতে পারব না স্যার। ওটা আমার প্রফেসানের ভেতরে পড়ে না। আমি স্যার পুরোপুরি নন-ভায়োলেণ্ট।'

সোমেশ্বর ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'দরকার নেই, দরকার নেই। ওটা আমিও পছন্দ করি না। রক্তপাত ব্যাপারটা বড়ই খারাপ, ভেরি ব্যাড থিং।'

পরমেশ্বর বলল, এবার বলুন, এইগুলোর মধ্যে কোন্‌টা আমাকে করতে হবে?'

সোমেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন না। চেয়ার থেকে উঠে সোজা ডানদিকের পুরো দেয়াল-জোড়া কাচের জানলাটার দিকে চলে গেলেন। তারপর নিজের হাতে পর্দা টেনে দিয়ে পরমেশ্বরকে ডাকলেন, 'এদিকে এসো—'

পরমেশ্বর উঠে এল। সোমেশ্বর বললেন, 'তোমাকে যে এখানে আসতে বললাম তার কারণ আছে। কারণটা হল, তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই। এখানে না এলে সেটা দেখানো যেত না। ঐ যে ফ্যাক্টরির চিমনিটা দেখছ—দেখতে পাচ্ছ?'

কাচের জানলা দিয়ে পরমেশ্বর দেখল, এখানকার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টে চারদিকে হাজার হাজার আলো জ্বলছে। ছোট বড় অগুনতি কারখানা চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সে জানে এখানকার বেশির ভাগ কারখানাই ইলেকট্রনিক্স, ড্রাগস, কেমিক্যালস ইত্যাদি ইত্যাদির। তার মধ্যে সোমেশ্বরের দেখানো চিমনিটা পারপেণ্ডিকুলারের মতো আকাশের গায়ে গিয়ে বিঁধে আছে। সে বলল, 'দেখতে পাচ্ছি স্যার।'

'ওখানে 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজ-এর ফ্যাক্টরি কমপ্লেক্স। দেখা হয়েছে?'

'হয়েছে স্যার।'

'চল এবার ওদিকে যাওয়া যাক!'

সোমেশ্বর মল্লিক পরমেশ্বরকে নিয়ে আরেক দিকের দেয়ালের কাছে চলে এলেন। আগে লক্ষ্য করে নি পরমেশ্বর, এবার দেখল, দেয়ালটাও কাচ দিয়ে মোড়া এবং সেটার ওপর পর্দা ঝুলছে। সোমেশ্বর পর্দা সরিয়ে দিতেই বিরাট একটা ফ্যাক্টরি কমপ্লেক্স চোখে পড়ল। পরমেশ্বররা এখন যে প্রকাণ্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংটায় রয়েছে, কমপ্লেক্সটা ঠিক তার পেছনেই এবং একই কমপাউণ্ডের ভেতর। বোঝা যাচ্ছে এটা সোমেশ্বর মল্লিকের।

সোমেশ্বর বলল, 'এই যে কমপ্লেক্সটা দেখলে এটা—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই পরমেশ্বর বলল, 'আপনার।'

'ঠিক ধরেছো। এবার চল, বসে কথা বলা যাক।'

টেবলের কাছে ফিরে এসে ওরা আবার মুখোমুখি বসল। সোমেশ্বর বলতে লাগলেন, 'আমাদের কারখানায় ওষুধ, ইলেকট্রনিক গুডস, এমনি নানা জিনিস তৈরি হয়। আমরা যা যা প্রডিউস করি, ঐ যে দেখলে 'ইটার্নাল ইন্ডাস্ট্রিজ'—ওরাও তাই প্রডিউস করে। বুঝতেই পারছ, আমাদের মধ্যে দারুণ কম্পিটিশন।'

সোমেশ্বরকে থামিয়ে দিয়ে পরমেশ্বর আচমকা বলে উঠল, 'ওদের কারখানায় ঝামেলা পাকিয়ে যাতে আপনার মাল বাজারে বেশী করে চালু করা যায় সেই জন্যে আমাকে লাগাতে চান তো?'

শুনেও সোমেশ্বর যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর চোখ দুটো সার্কেলের মতো পুরোপুরি গোল হয়ে গিয়েছিল। বিস্ময়ের গলায় বললেন, 'এক-জাক্টলি, একজাক্টলি। তোমার মতো এমন জিনিয়াস আগে আর কখনও দেখি নি।'

চোখেমুখে স্বর্গীয় একটি হাসি ফুটিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'যে মাকড়ার সঙ্গে দেখা হয় সে-ই আমাকে ঐ কথা বলে। যাক, 'ইটার্নাল ইন্ডাস্ট্রিজ'-এর জিওগ্রাফিটা তো দেখালেন, এবার হিস্ট্রিটা বলুন। ওটার মালিক কে?'

সোমেশ্বরের মুখটা বেশী পাওয়ারের বাল্বের মতো আলো হয়ে উঠল। দারুণ খুশির গলায় বললেন, 'তুমি তাহলে কেসটা টেক-আপ করলে! আই অ্যাম ভেরি ভেরি হ্যাপি। 'ইটার্নাল ইন্ডাস্ট্রিজ'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নাম অমিতাভ সেন। বয়েস খুব বেশি না, তোমার চাইতে ছোটই হবে। তবে দারুণ হারামজাদা। একটা ফার্স্ট গ্রেডের খচ্চড়। ছোকরার পঞ্চাশটা চোখ। মাথার ভেতরকার গ্রে ম্যাটারটা সাঙ্ঘাতিক। কাউকে দেখামাত্র তার মতলব ধরে ফেলে।'

'আপনি কিন্তু খিস্তিখাস্তা করেও আপনার কমপীটিটরের প্রেইজ করে ফেলছেন।'

সোমেশ্বর থতমত খেয়ে গেলেন, 'না, মানে তোমাকে আগে থেকে একটু কসাস করে দিচ্ছি।'

পরমেশ্বর বলল, 'আমার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। ব্রেনে ভালো মাল আছে, এমন বহুত মাকড়া আমি দেখেছি। যাক গে, বুঝতেই পারছি আপনার সঙ্গে ওর রিলেশনটা টেরিফিক। নিশ্চয়ই কেউ কারো হানড্রেড কিলো-মিটারের মধ্যে ঢোকেন না।'

সোমেশ্বর হাসলেন, 'কারেক্ট। আমাদের ভেতর মুখ দেখাদেখি কি কথাবার্তা নেই।'

পরমেশ্বর একটু কী ভেবে বলল, 'যার ফ্যাক্টরিতে আপনার জন্যে কিচাইন করতে যাব তার চেহারাটা তো জানা দরকার। আপনি তো আর ইনট্রোডিউস করে দেবেন না। ওর ওখানে 'ইন' করার আগে মালের সঙ্গে একটু জমিয়ে নেওয়া তো দরকার।'

সোমেশ্বর হঠাৎ বলে উঠলেন, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, ওর একটা ফোটো বোধহয় আমার কাছে আছে।' বলতে বলতেই উঠে গিয়ে পেছনের দেয়াল আলমারি খুলে কাগজপত্র হাঁটকে একটা ফোটো নিয়ে ফিরে এলেন। পরমেশ্বরকে ফোটোটা দিয়ে বললেন, 'কাজে লাগতে পারে বলে একজন ফোটোগ্রাফার লাগিয়ে সিক্রেটলি এই ফোটোটা তুলিয়ে রেখেছিলাম।'

ছবিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেখতে পরমেশ্বর বলল, 'মালটি ফাইন দেখতে। একেবারে ফিল্ম স্টারদের মতো।' ফোটোটা পকেটে পুরে সোমেশ্বর কি তাকিয়ে বলল, 'আপনি মশাই একখানা শাহানশা জিনিস। আপনারও ব্রেনে ভালো ম্যাটার আছে। কাজে লাগবে বলে আগে থেকেই ফোটো-টোটো খিঁচে রেখেছেন।'

প্রশংসায় দারুণ খুশি হয়ে গেলেন সোমেশ্বর। ভারী চোয়াল নাড়তে নাড়তে বললেন, 'বলছ, আমার ব্রেনেও ভালো জিনিস কিছু আছে।'

'একশো বার বলছি স্যার।'

একটু চুপ করে থেকে সোমেশ্বর এবার বললেন, 'আমি চাইছি 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজ'এ ঢুকে এমন ট্রাবল ক্রিয়েট করবে যাতে ঐ কোম্পানি লাটে উঠে যায়।'

'ঠিক আছে স্যার, ভাববেন না।' পরমেশ্বর তুড়ি দিয়ে দিয়ে হাই তুলল। তারপর ফের বলল, 'কিন্তু আপনার এজেন্ট সেই যে সোনার বাংলা আনার জন্যে গেল, সে ফিরবে তো?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ফিরবে। নটবর খুব এফিসিয়েন্ট লোক। এখুনি এসে যাবে।'

কথা শেষ হল কি হল না, নটবর নন্দী সোমেশ্বরের চেম্বারে এসে ঢুকল। বাংলা মদ এবং হুইস্কির বোতল ছাড়াও দামী রেস্তোরাঁ থেকে ডিনারের প্যাকেট নিয়ে এসেছে। দুর্দান্ত ম্যাজিসিয়ানের মতো কোত্থেকে দামী দামী প্লেট, নকশা-করা বাহারী গেলাস, কাপ, ফর্ক, চামচ ইত্যাদি ইত্যাদি বার করে ফেলল সে। তারপর সোমেশ্বরের জন্য হুইস্কি আর পরমেশ্বরের জন্য সোনার বাংলা গেলাসে ঢেলে সার্ভ করল। চাট হিসেবে প্লেটে সাজিয়ে দিল ফিশ ফিঙ্গার, প্রন কাটলেট, কাজু বাদাম আর কিছু পেঁয়াজ কুচি। তারপর নিজেও একটা হুইস্কির গেলাস নিয়ে বসল। এক ঢোঁক খেয়ে বলল, 'বেয়ারাদের নিয়ে সার্ভ করলাম না স্যার; এখানে কনফিডেনশিয়াল টক হচ্ছে।'

সোমেশ্বর বললেন, 'ঠিকই করেছ।' পরমেশ্বরকে বললেন, 'কি, তোমার সোনার বাংলা পেয়ে গেছ তো? নটবরের কাজে কোন রকম লুপহোল পাবে না।'

পরমেশ্বর বলল, 'পেয়েছি স্যার, কিন্তু এ রকম এয়ার কণ্ডিশানড ঘরে দামী গেলাসে বাংলা মাল ঠিক জমে না। তার জন্যে শুঁড়িখানা আর মাটির খেরো দরকার। যাক গে, যা পাওয়া গেছে আজ তা-ই দিয়েই কাজ চালাই।' পর পর দু' গেলাস স্টম্যাকে চালান করে সে আবার বলল, 'স্যার যে কাজ দিয়েছেন তাতে কিন্তু অনেক ক্যাশ ঢালতে হবে।'

'টাকার জন্যে ফিকর মাত করো। এনি অ্যামাউণ্ট তুমি পেয়ে যাবে।' খানিকটা হুইস্কি শরীরে ঢোকার জন্য রক্তচাপে কিছু গোলমাল হয়ে গিয়েছিল সোমেশ্বরের। ক্রমশঃ তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলেন, 'ওয়ান লাখ, টু লাখস্, ফাইভ লাখস্, টেন লাখস—যা লাগে পেয়ে যাবে। আই ওয়াণ্ট 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজ' ইজ টোটালি ফিনিশড।'

পরমেশ্বর বলল, 'ভাববেন না, ফিনিশ করে দেব।'

টেবলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন সোমেশ্বর, 'হাত মিলাও ফ্রেণ্ড।

পরমেশ্বর তাঁর হাতটা ধরল। বলল, 'মেলালাম।'

সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো একজনের হাতের ভেতর আরেক জনের হাত খানিকক্ষণ আটকে রইল। একসময় হাতটা ছেড়ে দিয়ে সোমেশ্বর বললেন, 'আমার একটা প্রোপোজাল আছে পরমেশ্বর।'

'বলুন স্যার।'

'তার আগে ক'টা কথা জানা দরকার।'

'কী?'

'তোমার কে কে আছে?'

'কেউ না।'

'ফাইন। থাকো কোথায়?'

'সেটা স্যার একটা 'হেল'। আপনার এজেন্ট নন্দী সাহেব জানেন।'

'ফার্স্ট ক্লাস। এতেই হবে, আর কিছু জানার নেই। এবার প্রোপোজালটা শোন। তোমার মতো একজন জিনিয়াসকে আমার পার্মানেন্টলি দরকার।'

পরমেশ্বর বলল, 'আপনি মশাই খুব সোজা মাল না। আমাকে যখন পার্মানেন্টলি চাইছেন তখন মনে হচ্ছে, 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজ'কে বারোটা বাজানো ছাড়া আপনার আরো অনেক লাফরা আছে।'

হুইস্কি সোমেশ্বরের শরীরের ভেতরকার আবহাওয়ায় ঝামেলা পাকিয়ে দিয়েছিল। তিনি টেবলে একটা ঘুষি মেরে জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন,

'আলবত আছে। আমি একটা বিজনেসম্যান, ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট—আগ মার্কা সাধু-মহাত্মা নই। আমার গায়ে অনেক ছেঁদা আছে। আস্তে আস্তে সব জানতে পারবে। কিন্তু তোমাকে চিরস্থায়ী করে আমার কাছে রাখতে চাই।'

'যে ক্যাশ ছাড়ে তার গায়ে আমি সট করে সেঁটে যাই। আগে আপনাকে দেখি কিছুদিন। তারপর পার্মানেণ্টলি আপনার খোঁয়াড়ে ঢোকার কথা ভাবব। তবে আমি মশাই স্বাধীন আদমী—ফ্রী ম্যান। এক্সক্লুসিভলি কারো কাছে দাসখত দিতে ইচ্ছে করে না।'

'ও-কে, কিছুদিন আমাকে দেখেই নাও। তুমি যে অমিতাভ সেনের বারোটা বাজাবার কেসটা হাতে নিতে রাজী, সেজন্য আমি ড্যাম গ্ল্যাড। হাত মেলাও—'

হাত মেলাবার পর সোমেশ্বর বললেন, 'কবে থেকে 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজ'-এর কেসটা স্টার্ট করবে?'

পরমেশ্বর বলল, 'কাল থেকেই। ফাস্ট দু-এক দিন ওয়াচ করব। তারপর একটা ব্লু-প্রিণ্ট তৈরি করে আপনার সঙ্গে দেখা করব। এখন স্টার্টিং পয়েণ্টে খরচার জন্যে হাজারখানেক টাকা চাই।'

টেবলের ড্রয়ার থেকে একশো টাকার দশখানা নোট বার করে পরমেশ্বরকে দিতে দিতে বললেন, 'কাজের কথা তো হল, কিন্তু তুমি লাইফ সেভ করেছ। সে জন্যে কিছু করতে হবে আমাকে। একটা দারুণ কিছু করা দরকার।'

'কিচ্ছু করতে হবে না স্যার। আমি ছাড়া যে কেউ থাকলে আপনাকে বাঁচাত। ওটা আমার ডিউটি।'

'কোনো শালা বাঁচাত না। গ্যাংস্টারগুলোর হাতে ছোরা দেখলে আশি মাইল স্পীডে দৌড়ে পালাত। তোমার ডিউটি যেমন করেছ, আমার ডিউটি আমাকে করতে দিও। স্টমাকে আট পেগ হুইস্কি ঢুকে গেছে। এখন ঠিক বুঝতে পারছি না কী করা দরকার। পরে ব্যাপারটা ঠিক করব।'

আরো ঘণ্টাখানেক বাদে ডিনার শেষ হল। তখন কমপ্লীট 'আউট' হয়ে গেছেন সোমেশ্বর। তাই পরমেশ্বরকে তার বস্তিতে পেঁছে দিতে পারলেন না। তবে দড়িপাকানো পোকায়-কাটা চেহারার নটবর নন্দীর নার্ভের জোর আছে। মাকড়া চুক চুক করে পুরো দশটি পেগ দামী হুইস্কি পাকস্থলীতে চালান করার পরও পুরোপুরি স্টেডি রয়েছে। চোখ দুটো একটু লাল হয়েছে শুধু, মাথা বা পা এতটুকু কাঁপছে না।

ধরাধরি করে প্রথমে সোমেশ্বরকে একটা লিমুজিনে তুলে তাঁর আলিপুরের বাংলোয় পাঠিয়ে দিল নটবর। তারপর অন্য একটা লিমুজিনে করে পরমেশ্বরকে নিয়ে তার বস্তির দিকে চলল।



পরের দিন সকালবেলা রোজকার রুটিন মাফিক লক্ষ্মী চা দিয়ে গেছে। ক্যাম্প খাটে বসে এই মুহূর্তে কাপে আস্তে আস্তে চুমুক দিচ্ছে পরমেশ্বর। জোড়া মানিক কোলে তার দু' পা তুলে ম্যাসাজ করে যাচ্ছে। বাইরে এলিজাবেথ, টগর আর লক্ষ্মী রান্নাবান্নায় ব্যস্ত। এই সময় লোলে বাজার থেকে ফিরল। এলিজাবেথ ডিভিসন অফ লেবারে বিশ্বাসী। সবাইকে সংসারের কাজ ভাগ করে দিয়েছে সে। তার রোল হল চিফ অফ আর্মি স্টাফের মতো। সবার মাথার ওপর বসে চারদিক থেকে কুড়িয়ে আনা নানা টাইপের মানুষের এই সংসারটাকে সে চালায়। লোলেকে সে দিয়েছে রোজকার বাজার করার ভার।

লোলের গলা পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এল পরমেশ্বর। তাকে দেখেই দাঁত বার করে লোলে বলল, 'গুড মর্নিং গুরু। কাল রাত্তিরে কোথায় গিয়েছিলে? তোমার জন্যে হেড আপিসে সন্ধ্যে পর্যন্ত দেখে তারপর সোনার বাংলা খেয়ে লাট খেতে খেতে বাড়ি চলে এলাম। মাগনা তোমার যাদুকি খেল দেখার জন্যে খচড়াগুলো বসে থেকে থেকে মাল খেতে লাগল।'

'কাল এক জায়গায় গিয়েছিলাম। বিগ অপারেশন চাইছিলি না? সেটা এসে গেছে। তোমার মাথায় স্ক্র্যাপ আয়রন পোরা আছে না সত্যিকারের ভালো মাল আছে, এবার দেখা যাবে।'

হাই-জাম্পের ভঙ্গিতে নিচের রাস্তাটা থেকে বারান্দায় কিচেন-কাম-ডাইনিং স্পেসে উঠে এল লোলে। দারুণ উৎসাহের গলায় বলল, 'কী অপারেশন গুরু?'

'চল আমার সঙ্গে। কোথাও বসে প্ল্যানটা করে ফেলি।'

কাল সোমেশ্বরের অফিস থেকে বেরুবার পর থেকে 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজ' সম্পর্কে কিভাবে কাজ শুরু করবে, তাই নিয়ে ভেবে যাচ্ছে পরমেশ্বর। মোটামুটি একটা ব্যাপার ঠিকও করে ফেলেছে সে।

লোলেকে নিয়ে বস্তি থেকে বেরিয়ে সোজা হাইওয়ের দিকে চলে গেল পরমেশ্বর। হাইওয়ের পাশে একটা ঝাঁকড়া-মাথা রেন-ট্রীর তলায় মুখোমুখি বসে বলল, 'তোকে একটা কাজ করতে হবে। কাজটা বহোৎ ঝামেলার।'

লোলে বলল, 'গুরু, ঝামেলা আর গড়বড়ের কাজই তো আমি চাই। তুমি বললে শ্লা আমি জান লড়িয়ে দিতে পারি।'

'ফাস কেলাস। এই নে—' পকেট থেকে অমিতাভ সেনের ফোটোটা বার করে লোলের হাতে দিতে দিতে পরমেশ্বর বলল, 'মালটাকে ভালো করে দ্যাখ।'

ফোটোটার ওপর চোখ ফিক্সড করে লোলে বলল, 'দেখলাম।'

'লোকটা 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজে'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর।'

'বলে যাও গুরু।'

'এর একটা পাত্তা লাগাতে হবে।'

'কি রকম?'

'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজে'র ঠিকানাটা দিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'ওদের গেটের বাইরে একটা ট্যাক্সি নিয়ে পর পর ক'দিন সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বসে থাকবি। অমিতাভ সেন ওখান থেকে বেরিয়ে কোথায় কোথায় যায় তার ঠিকানা টুকে রাখবি।'

'ঠিক আছে, আগে বাড়ো।'

'তারপর রোজ সন্ধ্যেবেলা হেড অফিসে এসে আমাকে খবর দিবি।'

'জরুর। লেকিন—'

'কী?'

'ট্যাক্সি নিয়ে ফলো করতে হলে তো অনেক ক্যাশ দরকার।'

পকেট থেকে তিনটে একশো টাকার নোট বার করে পরমেশ্বর বলল, 'তিন দিনের ট্র্যাভেলিং অ্যালাউয়েন্স।'

লোলের চোখ দুটো হেড লাইটের মতো জ্বলে উঠল। ঝাঁ করে নোট তিনটে পরমেশ্বরের হাত থেকে নিয়ে পকেটে পুরতে পুরতে সে বলল, 'গরু তিন দিনের টি-এ তিন শো! মনে হচ্ছে কোন মালদার আসামীকে গেঁথে ফেলেছ।'

'এখনও পুরোটা পারি নি। অমিতাভ সেনের পাত্তাটা ঠিকমতো যদি লাগাতে পারিস তাহলে শ্লা'র আলটাগরায় বঁড়শি ঠিক আটকে দেব।'

'কার আলটাগরায় গুরু? ফোটোর এই মালের?'

'না, আছে আরেকজন। মাকড়ার লাখ লাখ টাকা। পরে সব জানতে পারবি।'

লোলে জিজ্ঞেস করল, 'কবে থেকে ফোটোর এই জিনিসটির পেছনে লাগতে হবে।'

পরমেশ্বর বলল, 'আজ থেকেই। খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়বি। একটা কথা মনে রেখো—'

'কী গুরু?'

'শুনেছি অমিতাভ সেন দারুণ হুঁশিয়ার লোক, মাকড়ার নাকি পঞ্চাশটা চোখ। ধরা পড়লে বডির হাড়গুলো ওর কাছে ডিপোজিট করে আসতে হবে।'

'গুরু, ফিকর মাত কর। দু' বছর তোমার কাছে অ্যাপ্রেণ্টিস হয়ে আছি। আমার বডি থেকে হাড় খুলে নেবে, এমন মাল ওয়ার্ল্ডে এখনও জন্মায় নি। বাটারের ভেতর দিয়ে ছুরি চলে যাবার মতো ঠিক কেটে বেরিয়ে আসব। একটু আশীর্বাদ করে দাও। সেই সঙ্গে দশ গ্রাম পায়ের ধুলো দিও।' বলেই ঝট করে শরীরটাকে প্যারাবোলার মতো বাঁকিয়ে পরমেশ্বরের পায়ে মাথা ঠেকাল লোলে।



তিন দিন পর সন্ধ্যেবেলায় জগদীশের শুঁড়িখানায় মাতালদের ম্যাজিক ট্যাজিক দেখিয়ে এক কোণে 'ইণ্টারন্যাশনাল সার্ভিস সেণ্টারে'র টেবলে গিয়ে সবে পরমেশ্বর বসেছে, সেই সময় লোলে এসে হাজির। মুখোমুখি বসতেই পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'কী খবর ?'

লোলে বলল, 'আগে একটু সোনার বাংলা খেয়ে নিই। গলা শুকিয়ে ঝামা হয়ে গেছে মাইরি।'

পরমেশ্বর বলল, 'আগে খবর, তারপর সোনার বাংলা।'

মুখটা করুণ আর ছুঁচলো করে কাঁধ ঝাঁকাল লোলে। তারপর বলল, 'সেই এক খবর, এক ইঞ্চি এদিক সেদিক নেই। বেলা দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজে'র গেটের কাছে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে ল্যাম্প পোস্ট হয়ে বসে রইলাম। তারপর অমিতাভ সেন গাড়ি করে বেরুল। আমি তার সঙ্গে জোঁকের মতো সেঁটে রইলাম। মাল ফার্স্ট গেল 'ওরিয়েণ্টাল ক্লাবে', সেখান থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট দশ সেকেণ্ড পরে গেল 'ক্লাব ডে অ্যাণ্ড নাইটে'। সেখানে এক ঘণ্টা বারো মিনিট সাঁইত্রিশ সেকেণ্ড ছিল। তারপর ওল্ড বালিগঞ্জে ওদের বাড়ি পেঁছে দিয়ে এই চলে আসছি।'

পর পর তিন দিন এই একই রিপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে লোলে। অর্থাৎ ফ্যাক্টরি আর ঐ দুটো ক্লাব ছাড়া আর কোথাও যায় নি অমিতাভ সেন। রাত্রে বাইরে বেশিক্ষণ থাকে না সে। দুই ক্লাবে ঘণ্টা দুয়েকের মতো কাটিয়ে রাত আটটার ভেতর বাড়ি চলে যায়। শালা একেবারে আগমার্কা গুড বয়।

লোলে ভয়ে ভয়ে ফিসফিসিয়ে এবার বলল, 'গুরু, রিপোর্ট দিলাম। এবার তা হলে—'

তার কথা শেষ হবার আগেই শুঁড়িখানার একটা ছোকরাকে ডেকে পরমেশ্বর বলল, 'বল্টে, লোলেকে ফুল তিন বোতল সোনার বাংলা দে।'

'গুরু, তোমার জবাব নেই।' বলেই চেঁচিয়ে উঠল লোলে, 'অলমাইটি পরমেশ্বর—'

শুঁড়িখানার মাতালেরা জড়ানো গলায় একসঙ্গে স্লোগান দিল, 'জিন্দাবাদ—'

মাঝরাতে নেশায় চুরচুর বেহেড লোলেকে কাঁধে করে বস্তিতে ফেরার আগেই 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজ' সম্পর্কে একটা ব্লু-প্রিণ্ট মনে মনে ঠিক করে ফেলল পরমেশ্বর। ভাবল, কালই একবার সোমেশ্বর মল্লিকের সঙ্গে দেখা করবে।

পরের দিন দুপুরে লোকাল পোস্ট অফিস থেকে ফোন করে সোমেশ্বরকে ধরল পরমেশ্বর। বলল, স্যার, আমার ব্লু-প্রিণ্ট রেডি। আপনার সঙ্গে একটু ডিসকাস করে নিতে হবে।'

সোমেশ্বর দারুণ খুশি হয়ে বললেন, 'ভেরি গুড। কখন আসতে চাও বল।'

'যখন বলবেন।'

'এখনই চলে এসো।' বলেই তক্ষুনি শুধরে নিলেন সোমেশ্বর, 'না না, এখন থাক। অফিসে বসে এসব ডিসকাসান করতে চাই না। তুমি বরং পার্ক স্ট্রীটে চলে আসবে। ধরো বিটুইন সেভেন এ্যাণ্ড এইট—' একটা নামকরা বার-কাম-রেস্তোরাঁর নাম করে বললেন, 'একটা টেবল 'বুক' করে রাখছি। ওখানে গিয়ে স্টুয়ার্ড ম্যানেজারকে আমার নাম বললেই দেখিয়ে দেবে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় পরমেশ্বর পার্ক স্ট্রীটের সেই বার-কাম-রেস্তোরাঁয় পেঁছে গেল। সোমেশ্বর দোতলার এক কোণে রিজার্ভ-করা একটা নিরিবিলি টেবলে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বললেন, 'এসো এসো।'

পরমেশ্বর মুখোমুখি একটা আরামদায়ক চেয়ারে বসল।

নরম নীলাভ আলোয় গোটা রেস্তোরাঁটা এই মুহূর্তে অলীক স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। নিচে এবং ওপরে একেকটা টেবল ঘিরে দামী দামী পোশাক-পরা পুরুষ এবং মহিলারা থোকায় থোকায় বসে আছে। নানা টেবলের ফাঁক দিয়ে ট্রে-তে হুইস্কি কি রামের গেলাস আর সুখাদ্যের প্লেট সাজিয়ে বয়রা মাছের মতো ছোটাছুটি করছে। নিচে এক ধারে একটা ডায়াসের ওপর বার-সিঙ্গার গোয়াণিজ যুবতীটি শরীরের মাত্র টেন পারসেণ্ট ঢেকে বাকী নাইনটি পারসেণ্ট খুলে রেখে দারুণ সেক্সি গলায় উত্তেজক 'পপ' সং গেয়ে যাচ্ছে।

স্টুয়ার্ড অর্ডার নেবার জন্য এগিয়ে এসেছিল। সোমেশ্বর বলল, 'ফাস্ট টু হুইস্কি উইথ আইস অ্যাণ্ড ফ্রায়েড প্রন।'

অর্ডার নিয়ে স্টুয়ার্ড চলে যাবে, পরমেশ্বর বলল, 'উঁহু উঁহু—ওয়ান হুইস্কি ওনলি।'

সোমেশ্বর অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি হুইস্কি খাবে না?' বলেই কী খেয়াল হল, 'ও, তোমার তো আবার বাংলা মাল না হলে চলে না! কিন্তু

এই পার্ক স্ট্রীটের 'বার'-এ দিশী মদ কোথায় পাই বল তো। কথাটা আমার মনেও ছিল না। ভারী বিপদ—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই পরমেশ্বর ট্রাউজার্সের পকেট থেকে একটা চ্যাপ্টা বোতল আর মাটির খোরা বার করে টেবলের ওপর রাখতে রাখতে বলল, 'ভাববেন না, আমার মাল আমি নিয়ে এসেছি।' বলে বোতল খুলে খোরায় ঢালতে লাগল।

সোমেশ্বর খানিকক্ষণ বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তুমি একটি পারফেক্ট হারামজাদা—' স্টুয়ার্ডকে বললেন, 'ওয়ান হুইস্কি।'

হুইস্কি এসে গেল। চুকচুক করে ছোট ছোট 'সিপে' খেতে খেতে সোমেশ্বর বললেন, 'এবার তোমার ব্লু-প্রিণ্টটা বল।'

পরমেশ্বর বলল, 'বলার আগে দুটো কণ্ডিশান করতে হবে।'

'বল!'

'ফার্স্ট, আমি কী করব না করব সে ব্যাপারে কিছু জানতে চাইবেন না। সেকেণ্ড, আমার কোন কাজে নাক ঢোকাতে পারবেন না। যে কাজে আমাকে লাগিয়েছেন, এক মাসের ভেতর যদি রেজাল্ট না পান, "বাই বাই" করে আমি কেটে যাব। এর ভেতর আমার জন্যে যা খরচ করবেন সাকসেসফুল না হলে "ডাবল" ফেরত পাবেন।'

সোমেশ্বর বললেন, 'তোমার কণ্ডিশানে আমি রাজী। টাকা ফেরত দিতে হবে না। আমি জানি সাকসেসফুল তুমি হবেই।'

পরমেশ্বর বলল, 'এবার "ইমপর্টাণ্ট" কথা। দুটো বড় ক্লাবে আমাদের মেম্বার করে দিতে হবে।'

'কী কী ক্লাব?'

'ক্লাব ডে অ্যাণ্ড নাইট আর ওরিয়েণ্ট ক্লাব।'

'ঠিক আছে। দুই ক্লাবেই আমার অনেক বন্ধুবান্ধব মেম্বার আছে। তারা তোমাকে মেম্বার করে নেবার জন্য রেকমেণ্ড করবে। কোন অসুবিধা হবে না।'

'আমি যে আপনার লোক, এটা যেন সিক্রেট রাখা হয়। অমিতাভ সেন জানতে পারলে কিচাইন হয়ে যাবে।'

সোমেশ্বর বললেন, 'রাইট রাইট। আমার এমন বিশ্বাসী বন্ধুকে দিয়ে রেকমেণ্ড করাব যে আমার নাম ফাঁস করবে না। তুমি যেন তারই লোক—এইভাবে রেকমেণ্ড করবে।'

পরমেশ্বর বলল, 'ফাইন।'

সোমেশ্বর একটু ভেবে বললেন, 'ঠিক আছে, দশ দিনের ভেতর মেম্বার হয়ে যাচ্ছ। আর কী করতে হবে আমাকে?'

পরমেশ্বর বলল, 'আমার থাকার জন্যে পশ লোকালিটিতে একটা ওয়েল

ফার্নিশড ফ্ল্যাট দিতে হবে। সেখানে 'ইন' করলে যেন মনে হয় একজন বিগ বিজনেসম্যান কি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের ফ্ল্যাটে এসে ঢুকলাম।'

'নো প্রবলেম। পার্ক স্ট্রীট, থিয়েটার রোড, সার্কুলার রোড, ক্যামাক স্ট্রীট—এ সব জায়গায় আমার আট দশটা ফ্ল্যাট রয়েছে! তোমার যেখানে পছন্দ সেখানে থাকতে পারো। আর কিছু ?'

'আমাকে একটা বেশ বড় অফিস সাজিয়ে দিতে হবে।'

'কিসের অফিস ?'

ভুরু দুটো তিন সেন্টিমিটার ওপরে তুলে কিছুক্ষণ কী চিন্তা করে নিল পরমেশ্বর। তারপর বলল, 'ধরুন ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের। ভেতরে টেরিফিক চেহারার দু'-চারটে ছুকরি থাকবে, টাইপিস্ট থাকবে, বেয়ারা-ফেয়ারা থাকবে। দারুণ একখানা সাইনবোর্ড লটকে দেবেন।'

'অসুবিধা হবে না। তুমি যা চাইছ সব অ্যারেঞ্জমেণ্ট এক উইকের ভেতর হয়ে যাবে। কিন্তু—' বলতে বলতে চুপ করে গেলেন সোমেশ্বর।

'কিন্তু কী ?'

'তোমার সঙ্গে কণ্ডিশান করে ফেলেছি, কিচ্ছু জিজ্ঞেস করব না। কিন্তু তোমার লাইন অফ অপারেশন সম্বন্ধে ভীষণ কিউরিওসিটি হচ্ছে। মানে—'

'আরে মশাই, অমিতাভ সেনকে ক্যাঁচাকলে ফেলতে হবে তো। তার ফ্যাক্টরিতে ঢুকতে হলে মালের সঙ্গে জমাতে হবে না ? তাই যে ক্লাবে সে মেম্বার, আমিও সেখানে মেম্বার হতে চাইছি। ভাবটাব জমলে সে যদি বলে আমি কী করি ? সেই জন্যে ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের অফিস খুলতে চাইছি। যদি সে আমার কাছে আসতে চায়, তাই ভালো ফ্ল্যাটে থাকতে চাইছি।'

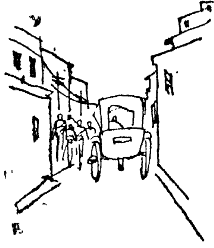
সোমেশ্বর দু' হাত নেড়ে দারুণ উচ্ছ্বাসের গলায় বললেন, 'বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। দুর্দান্ত প্ল্যান করেছ ; কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই।'

এর মধ্যে পরমেশ্বর তিন খোরা বাংলা মাল স্টমাকে চালান করে দিয়েছে। সে বলল, 'স্যার, আপনার কিউরিওসিটি মিটিয়ে দিলাম ; আর কোন কিউরিওসিটি দেখাবেন না।'

'পাগল হয়েছ। আর কিচ্ছু জিজ্ঞেস করছি না। কালই তোমার জন্যে ক্লাবের মেম্বারশিপ, ফ্ল্যাট আর অফিসের অ্যারেঞ্জমেণ্ট করে ফেলছি। ও-কে ?'

পরমেশ্বর উত্তর দিল না।

অনেক রাতে ড্রিঙ্ক এবং ডিনারের পর বেয়ারাদের কাঁধে চড়ে তাঁর লিমুজিনে গিয়ে উঠলেন সোমেশ্বর। এত রাতে পরমেশ্বর বাস বা ট্যাক্সি ফ্যাক্সি পেল না। একটা টেম্পো ভাড়া করে তার ওপর শুয়ে নার্ভের ভেতর বাংলা মালের টুং টাং কনসার্ট শুনতে শুনতে বস্তিতে ফিরে গেল।



দিন তিনেক পর নটবর নন্দী জগদীশের শুঁড়িখানা থেকে আবার পরমেশ্বরকে তুলে সোমেশ্বরের অফিসে নিয়ে গেল।

সোমেশ্বরের চেম্বারে তাঁর মুখোমুখি দুজন স্মার্ট চেহারার দামী স্যুট-টাই পরা মধ্যবয়সী ভদ্রলোক বসে ছিলেন।

পরমেশ্বরকে দেখে দারুণ হৈ-চৈ বাধিয়ে সোমেশ্বর বললেন, 'এসো-এসো, বোসো—'

পরমেশ্বর সেই ভদ্রলোক দুটির পাশে বসতেই সোমেশ্বর বললেন, 'আগে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। এঁরা—'

পরমেশ্বর জানতে পারল ভদ্রলোক দুটি ওয়েস্ট বেঙ্গলের দু'জন নাম করা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। একজন মিস্টার নগিনদাস কেজিরওয়াল, আরেকজন মিস্টার মণিশঙ্কর চৌধুরী। কেজিরওয়াল এবং চৌধুরী, দু'জনেই সোমেশ্বরের বন্ধু এবং 'ক্লাব ডে এ্যাণ্ড নাইট' আর 'ওরিয়েণ্টাল ক্লাবের' মেম্বার।

পরমেশ্বরকে দেখিয়ে সোমেশ্বর তাঁর বন্ধুদের বললেন, 'ইনি রণজয় হালদার, মাই ফ্রেণ্ড, ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের বিজনেসে আছেন। এঁর কথা আগেই আপনাদের বলেছি। 'ক্লাব ডে অ্যাণ্ড নাইট' আর 'ওরিয়েণ্টাল ক্লাবে' এঁকে মেম্বার করে নিতে হবে।'

নিজের নামটা আচমকা রণজয় হালদার হয়ে যেতে ভেতরে ভেতরে চমকে উঠেছিল পরমেশ্বর। মজাও লাগছিল তার। কিন্তু কথা বলতে বলতে চোখ টিপে তাকে মুখে তালা লাগিয়ে রাখতে ইশারা করলেন সোমেশ্বর।

পরিচয়ের পর চৌধুরী এবং কেজিরওয়াল খুব আন্তরিকভাবেই পরমেশ্বরের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বললেন, সোমেশ্বরের বন্ধু মানে তাঁদেরও বন্ধু, সাত দিনের ভেতর তাঁরা তাকে দুটো ক্লাবেরই মেম্বার হবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

কাজের কথা হয়ে যাবার পর আরো কিছুক্ষণ এলোমেলো গল্প করে কেজিরওয়ালরা চলে গেলেন।

ফার্নিশড ফ্ল্যাট দিতে হবে। সেখানে 'ইন' করলে যেন মনে হয় একজন বিগ বিজনেসম্যান কি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের ফ্ল্যাটে এসে ঢুকলাম।'

'নো প্রবলেম। পার্ক স্ট্রীট, থিয়েটার রোড, সার্কুলার রোড, ক্যামাক স্ট্রীট—এ সব জায়গায় আমার আট দশটা ফ্ল্যাট রয়েছে! তোমার যেখানে পছন্দ সেখানে থাকতে পারো। আর কিছু?'

'আমাকে একটা বেশ বড় অফিস সাজিয়ে দিতে হবে।'

'কিসের অফিস?'

ভুরু দুটো তিন সেন্টিমিটার ওপরে তুলে কিছুক্ষণ কী চিন্তা করে নিল পরমেশ্বর। তারপর বলল, 'ধরুন ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের। ভেতরে টেরিফিক চেহারার দু'-চারটে ছুকরি থাকবে, টাইপিস্ট থাকবে, বেয়ারা-ফেয়ারা থাকবে। দারুণ একখানা সাইনবোর্ড লটকে দেবেন।'

'অসুবিধা হবে না। তুমি যা চাইছ সব অ্যারেঞ্জমেণ্ট এক উইকের ভেতর হয়ে যাবে। কিন্তু—' বলতে বলতে চুপ করে গেলেন সোমেশ্বর।

'কিন্তু কী?'

'তোমার সঙ্গে কণ্ডিশান করে ফেলেছি, কিচ্ছু জিজ্ঞেস করব না। কিন্তু তোমার লাইন অফ অপারেশন সম্বন্ধে ভীষণ কিউরিওসিটি হচ্ছে। মানে—'

'আরে মশাই, অমিতাভ সেনকে ক্যাঁচাকলে ফেলতে হবে তো। তার ফ্যাক্টরিতে ঢুকতে হলে মালের সঙ্গে জমাতে হবে না? তাই যে ক্লাবে সে মেম্বার, আমিও সেখানে মেম্বার হতে চাইছি। ভাবটাব জমলে সে যদি বলে আমি কী করি? সেই জন্যে ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের অফিস খুলতে চাইছি। যদি সে আমার কাছে আসতে চায়, তাই ভালো ফ্ল্যাটে থাকতে চাইছি।'

সোমেশ্বর দু' হাত নেড়ে দারুণ উচ্ছ্বাসের গলায় বললেন, 'বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। দুর্দান্ত প্ল্যান করেছ; কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই।'

এর মধ্যে পরমেশ্বর তিন খোরা বাংলা মাল স্টমাকে চালান করে দিয়েছে। সে বলল, 'স্যার, আপনার কিউরিওসিটি মিটিয়ে দিলাম; আর কোন কিউরিওসিটি দেখাবেন না।'

'পাগল হয়েছ। আর কিচ্ছু জিজ্ঞেস করছি না। কালই তোমার জন্যে ক্লাবের মেম্বারশিপ, ফ্ল্যাট আর অফিসের অ্যারেঞ্জমেণ্ট করে ফেলছি। ও-কে?'

পরমেশ্বর উত্তর দিল না।

অনেক রাতে ড্রিঙ্ক এবং ডিনারের পর বেয়ারাদের কাঁধে চড়ে তাঁর লিমুজিনে গিয়ে উঠলেন সোমেশ্বর। এত রাতে পরমেশ্বর বাস বা ট্যাক্সি ফ্যাক্সি পেল না। একটা টেম্পো ভাড়া করে তার ওপর শুয়ে নার্ভের ভেতর বাংলা মালের টুং টাং কনসার্ট শুনতে শুনতে বস্তিতে ফিরে গেল।

পরমেশ্বর বলল, 'ফাইন। আমার ফোরটীন জেনারেসন এ রকম অফিস দ্যাখে নি।'

সোমেশ্বর বললেন, 'ভাল করে দেখে বল, ডেকরেসন-টেকরেসন চেঞ্জ করতে হবে কিনা! তা হলে দু' দিনের ভেতরেই করে দেব। লজ্জা কোরো না।'

স্যার, আমার মতো মাকড়ার লজ্জা-ফজ্জা থাকে না। আমার দুটো কানই কাটা। ডেকরেসন চেঞ্জটেঞ্জ করতে হবে না।'

"বসো।"

টেবলের এধারে অনেকগুলো চেয়ার সাজানো রয়েছে। তার একটাতে বসতে যাচ্ছিল পরমেশ্বর। সোমেশ্বর ব্যস্ত ভাবে বলে উঠলেন, 'নো-নো, এখানে না। তুমি নিজের চেয়ারে গিয়ে বোসো।' টেবলের ওধারে গদি-মোড়া একটা বিরাট রিভলভিং চেয়ার রয়েছে সেটা দেখিয়ে দিল সোমেশ্বর।

পরমেশ্বর বলল, 'আজই আমার করোনেসন কমপ্লীট করে ফেলতে চাইছেন স্যার?'

'শুভ কাজ ফেলে রাখতে নেই।'

'কারেক্ট বলেছেন স্যার। ঝুলিয়ে রাখলেই একটা না একটা বাগড়া পড়ে যায়।'

সোমেশ্বর বললেন, 'যাও, বোসো গিয়ে।'

পরমেশ্বর ওধারে গিয়ে চেয়ারটায় বসে পড়ল। সোমেশ্বর টেবলের এধারে একটা চেয়ারে বসে বেল বাজিয়ে ক্লার্ক টাইপিস্ট, পার্সোনাল অ্যাসিসটাণ্ট ইত্যাদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। ওরা মোট ছ'জন।

দুটি ক্লার্কের নাম মৃন্ময় রায় আর সমীর মিত্র। টাইপিস্ট আর স্টেনো দুটি হলো অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবতী—স্টেলা এবং জুলি। সবাই দারুণ দেখতে। তবে এদের মধ্যে পার্সোনাল অ্যাসিসট্যাণ্ট পার্শী ছুকরিটা সব চাইতে বিপজ্জনক। পরনে হট প্যাণ্ট আর ব্রা-টাইপের ব্লাউজের ওপর কাচের মতো স্বচ্ছ এবং সী-থ্রু শার্ট। গায়ের থেকে আগুনের ঝাঁঝ উঠে আসছে। বুকের ওপর জোড়া এবং খাড়া পাহাড়। উরু দুটো মাখনের স্তূপ, পেছন দিকটা যেন ওলটানো তানপুরা। হাত-পা বুক-চোখ-ঘাড়—মেয়েটার সারা গায়ে শুধু সেক্স আর সেক্স। তার নাম রোজি।

আলাপ-টালাপ হবার পর সবাই চলে গেল। সোমেশ্বর এবার পরমেশ্বরের দিকে তাকালেন। একটা চোখ কুঁচকে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে মজাদার ভঙ্গিতে বললেন, 'তোমার জন্যে বেছে বেছে কেমন সব এমপ্লয়ী জুটিয়েছি বল?'

পরমেশ্বর বলল, 'ফাস কেলাস। চাকরি দেবার আগে বিউটি কনটেস্ট করিয়েছিলেন নাকি স্যার!'

'ফাইন বলেছ।' সোমেশ্বর হাসতে লাগলেন। তারপর ঝট করে হাসিটা থামিয়ে গলার স্বর খাদে নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'রোজিকে কেমন দেখলে।'

পরমেশ্বর বলল, 'একেবারে ফোর ফোরটি ভোল্ট। হোল বডি থেকে স্পার্ক মারছে।'

সোমেশ্বর বললেন, 'আমার দিক থেকে এটি হলো তোমাকে স্পেশাল গিফট।'

'কাজে হাত দিতে না দিতেই গিফট দিচ্ছেন স্যার!'

'আগে থেকে দিয়ে রাখলে ইমপেটাস পেয়ে যাবে!' সোমেশ্বর দাঁতে দাঁত চেপে খচড়ামোর ভঙ্গিতে হাসতে লাগলেন।

পরমেশ্বর কিছু বলল না।

সোমেশ্বর হাসতে হাসতেই আবার বললেন, 'ঐ সেক্স-বম্বখানাকে নিয়ে এই ঘরে দরজা বন্ধ করে তুমি বসবে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ?'

পরমেশ্বর বলল, 'পারছি স্যার। ইলেকট্রিক "শক" খাইয়ে খাইয়ে আমার বারোটা বাজাবার ধান্দা করেছেন।'

সোমেশ্বরের হাসির তোড় এবার দশ গুণ বেড়ে গেল।

আরো খানিকক্ষণ পর সোমেশ্বর বললেন, 'এবার উঠতে হবে। আমরা আরেক জায়গায় যাব।'

পরমেশ্বর উঠতে উঠতে বলল, 'কোথায়?'

'চলই না!'

পরমেশ্বরকে সঙ্গে করে আধ ঘণ্টার মধ্যে সার্কুলার রোডের এক মাল্টি-স্টোরিড অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে চলে এলেন সোমেশ্বর। শোফার নিচের তলার পার্কিং জোনে লিমুজিনটা দাঁড় করাতেই দু'জনে দরজা খুলে সোজা লিফট্-বক্সে এসে ঢুকলেন।

বোতাম টেপার পর দু' মিনিটও লাগল না, লিফট্টা ঝিঁঝির ডাকের মতো একটানা শব্দ করে সোজা ফোরটীনথ ফ্লোরে উঠে এল।

লিফট থেকে নেমে ডান দিকের করিডর ধরে সোমেশ্বর যে স্যুইটটার সামনে এসে দাঁড়ালেন, সেটার দরজায় পেতলের ঝকঝকে নেমপ্লেটে লেখা রয়েছে 'রণজয় হালদার।' দরজার মাথায় রয়েছে কলিং-বেল।

সোমেশ্বর ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'এই ফ্ল্যাটটা তোমার।' বলেই কলিং-বেলটা টিপলেন।

মিউজিক্যাল বেল। বাইরে থেকেও টের পাওয়া গেল ভেতরে টুং-টাং করে সেতারের বাজনার মতো শব্দ হল। একটু পরেই দরজা খুলে ধবধবে সাদা ইউনিফর্ম পরা কুড়ি-বাইশ বছরের শিখ ছোকরা সামনে এসে দাঁড়াল

এবং সোমেশ্বরদের দেখে লম্বা স্যালুট হাঁকিয়ে দারুণ ব্যস্তভাবে একধারে সরে দাঁড়াল।

সোমেশ্বর পরমেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। শিখ বেয়ারাটা দরজা বন্ধ করে তাঁদের গায়ে ছায়ার মতো সেঁটে গিয়ে পেছন পেছনে চলতে লাগল।

যেতে যেতেই সোমেশ্বর পরমেশ্বরকে দেখিয়ে বেয়ারাটাকে বললেন, 'এ হল তোমার সাহেব; এখন থেকে এখানেই থাকবেন। ঠিক মতো এঁর দেখ্‌ভাল আর খিদমত করবে।'

মিলিটারী কায়দার গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে নতুন মালিকের উদ্দেশে আরেকবার লম্বা স্যালুট হাঁকাল বেয়ারাটা। তারপর বলল, 'জী, বড়ে সরকার।'

সোমেশ্বর এবার পরমেশ্বরকে জানালেন বেয়ারাটার নাম ছোটি সিং। খুবই কাজের লোক সে এবং দারুণ বিশ্বাসী। তা ছাড়া আরো অনেক কোয়ালি-ফিকেশন আছে তার। ছোটি সিং একাধারে কেয়ারটেকার, বেয়ারা তো বটেই, সেইসঙ্গে দুর্দান্ত বাবুর্চি। ফরাসী, চীনা, স্প্যানিশ, আইরিশ—সব রকম খানা সে বানাতে পারে। তা ছাড়া পারে ফাইন কক্‌টেল তৈরি করতে। ছোটি সিং যখন আছে, এখানে পরমেশ্বরের কোন রকম অসুবিধা হবে না।

একটু পর ওঁরা ড্রইং-রুমের কাছে চলে এলেন। ভেতরে ঢুকতে গিয়ে সোমেশ্বর দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, 'চল, এক কাজ করা যাক। আগে তোমাকে পুরো স্যুইটটা দেখিয়ে নিই। তারপর কমফোর্টেবলি বসা যাবে।'

পরমেশ্বর বলল, 'ঠিক আছে।'

ফ্ল্যাটটা বিশাল; প্রায় দু' হাজার স্কোয়ার ফুটের মতো এরিয়া। চারটে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বেড-রুম ছাড়া রয়েছে ড্রইং-রুম, কিচেন, ডাইনিং-রুম, স্টোর ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রতিটি ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচড বাথ। পুরো দু' হাজার স্কোয়ার ফুট ফ্লোরের কোথাও এক ইঞ্চি চোখে পড়ে না; সবটাই দামী জয়পুরী কার্পেটে মোড়া। এ ছাড়া আরামের এবং প্রয়োজনের যাবতীয় উপকরণ এখানে ছড়ানো। যেমন ফ্রীজ, রঙ-বেরঙের চার-পাঁচটা টেলিফোন, ডিভান, সোফা, আর্ম-চেয়ার, ঘরে ঘরে এয়ারকুলার, অ্যাকুয়েরিয়াম, জানালা-দরজায় দামী দামী পর্দা। এ ছাড়া রয়েছে ছোটখাটো প্রাইভেট 'বার'। সেখানে ওয়ার্ল্ডের সেরা হুইস্কি-রাম-জিন-ভদকা-কনিয়াকের পাশাপাশি ডজন ডজন কালী-মার্কা বোতল সাজানো রয়েছে। আর আছে কাট গ্লাসের লম্বা, পেটমোটা, সরু, ছুঁচলো, গোল, বেঁটে ইত্যাদি নানা ধরনের ডিকাণ্টার এবং গেলাস। সে-সবের পাশে সারি সারি মাটির খোরা।

'বার'টা দেখে পরমেশ্বর বলল, 'সোনার বাংলার পাশে ঐ সব ফরেন মাল রেখেছেন কেন স্যার? জানেনই তো, আমার কাছে ওসব বিলকুল বেকার।'

সোমেশ্বর বললেন, 'জানি। তবু ভাবলাম এখানে থাকতে থাকতে যদি তোমার হ্যাবিটটা চেঞ্জ হয়ে যায়, যদি হুইস্কি-ফুইস্কি টেস্ট করতে ইচ্ছে হয়, তাই স্টোর করে রেখেছি।'

'বারো বছর বয়েস থেকে সোনার বাংলা ধরেছি স্যার। নাকের ডগায় যতই ফোরেন চীজ ঝুলিয়ে রাখুন, হ্যাবিট এতটুকু গড়বড় হবে না।'

'তবু রাখলাম। মাঝে মধ্যে আমি আসব। তা ছাড়া এখন তোমার সার্কেল বড় হবে; নানা টাইপের ফ্রেণ্ড জুটবে। তারাও এখানে আসবে। তবে যার জন্যে এত অ্যারেঞ্জমেণ্ট সেই অমিতাভ সেনকে ভাল করে ফাঁদে ফেলতে হলে এখানে আনা দরকার। এই সব গেস্টকে তো আর কালী-মার্কা দিয়ে এণ্টারটেন করা যায় না।'

কথাটা ঠিকই বলেছেন সোমেশ্বর। পরমেশ্বর বলল, 'আপনার চোখের টেরিফিক জোর স্যার; দুশো কিলোমিটার দূরের জিনিস দেখতে পান।'

জলে কলসী ডোবানোর মতো বগবগিয়ে হেসে উঠলেন সোমেশ্বর। তবে কিছু বললেন না।

গোটা ফ্লাটটা দেখা হয়ে গেলে ও'রা ড্রইং-রুমে এসে বসলেন। পরমেশ্বর বলল, 'সেই সন্ধ্যে থেকে ঘুরতে ঘুরতে গলাটা শুকিয়ে ঝামা হয়ে গেছে। সোনার বাংলা দিয়ে ভিজিয়ে না নিলে স্রেফ মরে যাব।'

'কী আশ্চর্য, এটা তোমার ফ্লাট। যা চাই, ছোটি সিংকে বললেই তো হয়। মুখ থেকে অর্ডার খসতে না খসতেই দেখবে ও সব এনে হাজির করেছে।'

সারা ফ্ল্যাটটায় এতক্ষণ ছোটি সিং ও'দের সঙ্গে ঘুরে এখনই ড্রইং-রুমের একধারে দাঁড়িয়ে আছে! সোমেশ্বর তার দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন।

ছোটি সিং ইশারাটা তক্ষুণি বুঝে ফেলল। তারপর 'জী সাব' বলেই দারুণ ব্যস্তভাবে দৌড়ে বেরিয়ে গেল এবং দু' মিনিটের মধ্যে ট্রে-তে করে সোমেশ্বরের জন্য সুদৃশ্য লম্বা গেলাসে হুইস্কি, পরমেশ্বরের জন্য মাটির খোরায় কালী-মার্কা আর ড্রিঙ্কের চাট হিসেবে নক্‌শা-করা জাপানী প্লেটে ফিশ-ফিঙ্গার, পাঁপড়, ফ্রায়েড চিকেন নিয়ে এল।

পরমেশ্বর অবাক হয়ে গিয়েছিল। ট্রে থেকে খোরা ভরতি গ্যাঁজানো কালী-মার্কা তুলে নিয়ে একটা চুমুক দিয়ে সে বলল, 'আমি যে সোনার বাংলা খাই, ছোটি সিং জানলো কেমন করে?'

সোমেশ্বর হুইস্কির গেলাসে আলতো করে 'সিপ' দিয়ে অল্প অল্প হাসতে হাসতে বললেন, 'কাল ওকে এখানে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিয়েছি। দেবার আগে

তোমার সম্বন্ধে আধ ঘণ্টা ট্রেনিং দিয়েছিলাম। ছোকরা দারুণ ওস্তাদ, কিচ্ছু ভোলে না।'

এর পর সোমেশ্বরের গেলাস আর পরমেশ্বরের মাটির খোরা কত বার যে ফাঁকা হল আর কত বার ছোটি সিং সে দুটো বোঝাই করে দিল তার হিসেব নেই।

রাত যখন দশটা বেজে গেছে সেই সময় সোমেশ্বর কব্জী উল্‌টে ঢুলু-ঢুলু আরক্ত চোখে ঘড়ি দেখতে দেখতে বললেন, 'ওরে বাবা, অনেক রাত হয়ে গেছে, এবার বাড়ি ফিরতে হবে। আমি উঠলাম। তুমি আজ থেকে এখানেই থাকছ তো?' বলতে বলতে সোফার হাতলে হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

পুরো এক বোতল কালী-মার্কা খাবার পরও মাথাটা এতটুকু টলছে না পরমেশ্বরের। চোখ দুটো সামান্য লাল হয়েছে মাত্র। সে-ও উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আজ না, কাল থেকে এসে থাকব।'

'ঠিক আছে। কোথায় যাবে বল, তোমাকে লিফট্‌ দিয়ে যাচ্ছি।'

'দরকার নেই। আমি চলে যেতে পারব।'

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে লিফট্‌-বক্সে ঢুকে পরমেশ্বর বলল, 'সেই কথাটা মনে আছে তো স্যার?'

দশ-বারো পেগ হুইস্কি সোমেশ্বরের নার্ভে এখন সাইক্লোন ছুটিয়ে যাচ্ছে। ঘাড়ের ওপর মাথাটা তিনি আর খাড়া রাখতে পারছিলেন না। কোন রকমে চৌকো থুঁতনিটা ওপর দিকে তুলে জড়ানো গলায় বললেন, 'কোন্‌ কথাটা?'

'সব অ্যারেঞ্জমেণ্ট হয়ে গেল। কাল থেকে আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। দরকার হলে আমিই আপনার কাছে যাব, নইলে ফোন-টোন করব।'

'মনে আছে, নিশ্চয়ই মনে আছে। আমার মেমারি অতো উইক না।'

'ক্লাব দুটোর মেম্বারশিপ পেতে ক'দিন লাগবে?'

'চৌধুরী আর কেজিরওয়ালকে কালই বলে দেব; ব্যাপারটা যেন এমার্জেন্সী হিসেবে ওরা ট্রিট করে। আশা করছি দু'-তিনদিনের ভেতর তুমি মেম্বারশিপ পেয়ে যাবে।'

'ফার্স্ট ক্লাস। মেম্বার হবার পর আমার অ্যাকটিভিটি আপনি দেখতে পাবেন। ও-কে।'

'ও-কে।'

গ্যালপিং লিফটটা কোথাও না থেমে এক সময় গ্রাউণ্ড ফ্লোরে এসে থামল।



পরের দিন ম্যাসাজ, চান, খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা একটা টাউস কিট ব্যাগে শার্ট ট্রাউজার্স শেভিং বক্স ইত্যাদি পুরে নিল পরমেশ্বর। তারপর এলিজাবেথ, লোলে, লাট্টু, ছররা, লক্ষ্মী এবং টগরকে ডেকে বলল, 'একটা বিরাট অপারেশনে যাচ্ছি। ক'দিন আমাকে কলকাতায় গিয়ে থাকতে হবে।'

এলিজাবেথ বলল, 'বাড়ি ফিরবি না?'

'না।'

দু' বছরে পরমেশ্বরের প্রফেশন সম্পর্কে সব কিছুই জেনে ফেলেছে এলিজাবেথ। উদ্বিগ্ন মুখে সে এবার বলল, 'বিপদ-টিপদ হবে না তো?'

পরমেশ্বর হাসল, 'মাদার, তুমি তো আমাকে জানো। আমাকে কবজা করার মতো বিপদ এখনও জন্মায় নি।' লাট্টু আর ছররাকে বলল, 'মোটে খচড়ামো বদমাইশি করবি না। গুড বয় হয়ে থাকবি।' লক্ষ্মীকে বলল, 'যে ক'দিন থাকছি না তার ভেতর বীরেনকে গেঁথে তুলে ফেলবি। আমি এসেই যেন চিৎপুরে সানাইয়ের অর্ডার দিতে পারি।' টগরকে বলল, 'আর কতদিন আমার ঘাড়ে হেভিওয়েট হয়ে চেপে থাকবি? কী মেয়ে তুই! লক্ষ্মীর মতো কারো নাকে বঁড়শি আটকাতে পারছিস না? দশ-বারো দিন সময় দিলাম, এর ভেতর একটা ছোকরাকে যদি ফাঁসাতে না পারিস, বুঝব তুই ইয়াং গার্লই না!'

লক্ষ্মী আর টগর একসঙ্গে আরক্ত লাজুক মুখে বলে উঠল, 'আহা—হা—হা—'

লোলে এক কোণ থেকে বলে উঠল, 'গুরু, তুমি তো ক'দিনের জন্যে কাটছ; আমাকে কী ডিউটি দিয়ে গেলে?'

'তোর ডিউটি—' চোখ কুঁচকে কয়েক সেকেণ্ড কী ভাবল পরমেশ্বর। তারপর অন্যমনস্কর মতো বলল, 'এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে আমার এই অপারেশনটায় তোকেও লাগাতে হবে।'

লোলে বলল, 'ঠিক আছে গুরু, তুমি যখন বলবে, তখনই লড়ে যাব।'

কোথাও নড়বি না। দরকার হলেই যেন তোকে হাতের কাছে পাই।'

'ফিকর মাত করো গুরু। বস্তিতে আর জগার মালের দোকানে ল্যাম্পপোস্ট হয়ে আমি বসে থাকব। সিগন্যাল পেলেই দেখবে তোমার কাছে গিয়ে হাজির হয়েছি। লেকেন গুরু—'

'আবার কী?'

'তোমার ইণ্টারন্যাশান্যাল সারভিস সেণ্টারের কী হবে? হোল কাণ্ট্রির খচড়ারা রোজ ডজন ডজন ঝামেলার কেস নিয়ে আসে।'

'মার্ডার ছাড়া সব কেসের অর্ডার নিবি; অর্ডারের সঙ্গে টোয়েণ্টি-ফাইভ পারসেণ্ট অ্যাডভান্স। বড় অপারেশনটা ফিনিশ করে ঐ কেসগুলোতে হাত দেব।'

'ও-কে! তুমি এখন কোথায় গিয়ে থাকছ, তার অ্যাড্রেসটা দিয়ে যাও। তোমাকে যদি হুট করে দরকার হয়—'

'অ্যাড্রেসটা এখন দেব না।'

'তোমার মতলবটা কি গুরু? যাত্রায় প্যাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস দেখেছিলাম, সেই রকম তুমি কোথাও বডি লুকিয়ে রাখতে চাইছ?'

পরমেশ্বর হাসতে লাগল। হাসতে হাসতেই বলল, 'আচ্ছা, এখন চলি।'

বস্তি থেকে বেরিয়ে হাইওয়েতে এসে বাস ধরল পরমেশ্বর। বাসটা তাকে নর্থ ক্যালকাটায় পেঁছে দিল। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সার্কুলার রোডের সেই মালটিস্টোরিড অ্যাপার্টমেণ্ট্ হাউসে যখন সে পেঁছুল তখন তিনটে বেজে গেছে।

কলিং-বেল টিপতেই কালকের মতো দরজা খুলে দিয়ে ছোটি সিং লম্বা স্যালুট হাঁকিয়ে পরমেশ্বরের হাত থেকে ব্যস্তভাবে কিট ব্যাগটা নিয়ে বলল, 'সাব, মল্লিকসাব আপকো তিন দফে ফোন কিয়া থা।'

মল্লিকসাব অর্থাৎ সোমেশ্বর। ছোটি সিংয়ের সঙ্গে স্যুইটের ভেতরে যেতে যেতে ভুরু কুঁচকে গেল পরমেশ্বরের। অনেকবার সোমেশ্বরকে সে বলেছে, নিজের থেকে তিনি যেন আর কনট্যাক্ট না করেন, কিন্তু কাল দেখা হওয়ার পর আঠার ঘণ্টা যেতে না যেতেই ফোন করে বসেছেন। মাকড়া কারো ওপর কাজের দায়িত্ব দিয়ে ভরসা করতে পারে না, দেখা যাচ্ছে! বিরক্তমুখে অনেকগুলো ভাঁজ ফেলে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'ফোন করেছিল কেন? কিছু বলেছে?'

'নহী। আপনার খবর পুছছিল, এসেছেন কিনা, সিরিফ এই।'

পরমেশ্বর আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। ড্রইং-রুমে এসে একটা সোফায় গা ছড়িয়ে দিয়ে সেণ্টার টেবলের ওপর দু পা তুলে দিল। তারপর পাশের কারুকাজ-করা কাশ্মীরী ছোট্ট টী-পয় থেকে মেরুন রঙের টেলিফোন তুলে

ডায়াল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সোমেশ্বরকে ধরে ফেলল। সোমেশ্বর কিছু বলার আগেই সে হুড়হুড় করে বলতে লাগল, 'আপনাকে তো আগেই বলেছি ক'টা দিন ওয়েট করুন। অপারেশনের সময় আমাকে ফোন-টোন করবেন না। আমার ওপর বিশ্বাস না থাকলে বলে দিন; আমি এ কেস নেব না।'

অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সোমেশ্বর বললেন, 'আরে বাবা, তোমার ওপর হানড্রেড পারসেণ্টের জায়গায় টু হানড্রেড পারসেণ্ট কনফিডেন্স আছে! না হলে তোমার ব্লু-প্রিণ্ট মেনে নিয়ে এত বড় অফিস আর স্যুইটের অ্যারেঞ্জমেণ্ট করে দিই! আমি জানি, যে কেস হাতে নিয়েছ সেটা সাকসেসফুল হবেই।'

'তা হলে ফোন করেছিলেন কেন?'

'ক্লাবে তোমার মেম্বারশিপের ব্যাপারে!'

'কিছু গড়বড় হয়েছে?'

'না—না। সব ব্যবস্থা পাক্কা হয়ে গেছে। আজ সন্ধ্যেবেলায় অ্যাট শার্প সেভেন তুমি "ক্লাব ডে অ্যাণ্ড নাইট"-এ চলে যাবে। চৌধুরী আর কেজিরওয়াল ওখানে ওয়েট করবে। ঐ ক্লাবের সেক্রেটারি ফর্মালি তোমার সঙ্গে অন্য মেম্বারদের আলাপ-টালাপ করিয়ে দেবে। সব মেম্বারকে আজ ওখানে আসতে বলা হয়েছে। এভরিথিং টু-নাইট উইল বী ইন ইওর অনার। ওখানকার কাজ হয়ে যাবার পরে কেজিরওয়ালরা তোমাকে নিয়ে যাবে "ওরিয়েণ্টাল ক্লাবে"। ওখানে তোমাকে অন্য মেম্বারদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হবে। ও কে?'

'ও-কে, স্যার।'

সোমেশ্বর বললেন, 'ক্লাবে ডে অ্যাণ্ড নাইটের অ্যাড্রেস হল—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই পরমেশ্বর বলল, 'অ্যাড্রেসের দরকার নেই। আমি জানি।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই তো! স্পাই লাগিয়ে তুমিই তো জেনে নিয়েছ, অমিতাভ সেন ঐ ক্লাব দুটোর মেম্বার। আরেকটা কথা—'

'বলুন।'

'এখন থেকে তুমি আর—'

সোমেশ্বরকে মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'আর পরমেশ্বর নই, রণজয় হালদার। তাই তো?'

'একজ্যাক্টলি! তা হলে সাতটায় ক্লাব ডে অ্যাণ্ড নাইটে—'

'রাইট।'

ওধার থেকে সোমেশ্বর লাইন কেটে দিলেন।



সেন্ট্রাল ক্যালকাটার একটা দুর্দান্ত 'পশ' জায়গায় ক্লাব ডে অ্যাণ্ড নাইট। উঁচু কমপাউণ্ড ওয়াল দিয়ে ঘেরা এই ক্লাবটার কিছুই বাইরে থেকে দেখা যায় না। সামনের দিকে গেট ; গেটে সাড়ে ছ' ফুট লম্বা ঝকঝকে চেহারার টান টান দুই শিখ দারোয়ান। সাদা ইউনিফর্ম আর পাগড়ি-পরা জোড়া শিখকে দেখে মনে হয় যেন দেবদূত।

গেট থেকে দশ ফুট দূরে স্টিলের উঁচু স্ট্যাণ্ড। স্ট্যাণ্ডটার গায়ে আইভিলতার ঝাড়। এই স্ট্যাণ্ডটার জন্যই বাইরে থেকে ভেতরের কিছু দেখা যায় না।

ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় সাতটা, সেই সময় গেটের সামনে পরমেশ্বরের লিমুজিন এসে থামল। অমিতাভ সেনকে ঘিরে যে অপারেশন শুরু হয়েছে, তাতে এ রকম একটা দামী ইমপোর্টেড গাড়ি পরমেশ্বরের দরকার। আপাতত এটা তাকে দিয়েছেন সোমেশ্বর।

লিমুজিনটা থামতেই জোড়া শিখ দৌড়ে এল। একটা শিখ সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি হালদারসাব ?'

পরমেশ্বর বলল, 'হ্যাঁ।'

'আইয়ে আইয়ে। চৌধুরীসাব, কেজিরওয়ালসাব আপকো লিয়ে ইন্তেজার কর রহে হ্যায়।'

পরমেশ্বরের আসার ব্যাপারটা তাহলে গেট-কীপারদের জানিয়ে রাখা হয়েছে। স্যুইট থেকে বেরুবার সময় সে ভাবছিল, ক্লাব থেকে চৌধুরী আর কেজিরওয়ালকে খুঁজে বার করতে হয়ত অসুবিধা হবে। যাক, 'পয়লা' ঝামেলাটা অন্ততঃ কেটেছে।

যাই হোক, শোফারকে পথ দেখিয়ে ভেতরের পার্কিং জোনে নিয়ে এল একটা শিখ।

ভেতরে একদিকে সবুজ কার্পেটের মতো বিশাল লন। লনে লাল-

নীল-সবুজ-হলুদ নানা ধরনের গার্ডেন আম্ব্রেলার তলায় গদিমোড়া গোলাকার বেতের সোফা পাতা। লনটার বাঁ দিকে পার্কিং বে। লনের ডান দিকে নুড়ির রাস্তা। রাস্তার গায়ে একই মাপের এক উচ্চতায় ছাতার মতো ঝাউয়ের সারি। তারপর ফিলিগ্রির কাজের মতো কারুকাজ-করা উঁচু দেয়াল। দেয়ালের ওধারে সুইমিং পুল। এপাশ থেকে দেয়ালের ছোট ছোট ফাঁক দিয়ে পুলটা অবশ্য পরিষ্কার চোখে পড়ে না। লন এবং সুইমিং পুলের পেছন দিকে আমেরিকান আর্কিটেকচারের সুদৃশ্য ক্লাব বিল্ডিং।

এই মুহূর্তে নানা বয়সের সুসজ্জিত পুরুষ এবং মহিলাদের লনে, সুইমিং পুলে, নুড়ির রাস্তায় বা ক্লাব বিল্ডিংয়ে দেখা যাচ্ছে। পুরুষদের পরনে প্যারালাল, বেলবটম, কনভেনশনাল ব্রিটিশ স্যুট বা খাঁটি দেশজ চুস্ত আর কলিদার পাঞ্জাবী। মহিলাদের পোশাক-টোশাকের দিকে তাকালে মাথার ভেতর বাঁই বাঁই করে যেন চাকা ঘুরতে থাকে। বেশির ভাগ মহিলারাই শাড়ি পরে এসেছে। নাভি থেকে পাক্কা দশ সেন্টিমিটার তলায় কোমরের বাঁধন আর ওপরের দিকে ব্রা-টাইপের ব্লাউজ। শাড়ি এবং ব্লাউজের মাঝখানের বিশাল জমি একেবারে ওপেন-এয়ার স্টেজের মতো মুক্ত। কারো কারো পরনে ম্যাক্সি, কারো জাপানী কিমোনো, কারো শালোয়ার-কামিজ, কারো মেমসাহেবদের স্টাইলে স্কার্ট-ব্লাউজ। তবে ইয়াং ছুকরিগুলোর দিকে তাকানো যায় না। তারা পরে এসেছে হট প্যান্ট আর পাতলা সী-থ্রু খাটো স্লীভলেশ জামা; তাদের পায়ে আট ইঞ্চি সোলের রণ-পা টাইপের লেডিজ শ্যু। সব মিলিয়ে মাথায় চক্কর লাগাবার মতো একটা ফ্যাশন প্যারেড চলছে যেন এখানে।

লনের তলায় আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে লাল-নীল-সবুজ-হলুদ ইত্যাদি নানা রঙের আলো চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। সব মিলিয়ে ক্লাবটা যেন ড্রিমল্যান্ড।

লিমুজিন থেকে নেমে পড়েছিল পরমেশ্বর। সেই শিখ গেট-কীপারটা বলল, 'আইয়ে সাব, আইয়ে—' রাস্তা দেখিয়ে দেখিয়ে সাড়ে-ছ' ফুট শিখ পরমেশ্বরকে 'লনে'র দিকে নিয়ে গেল।

একধারে চৌধুরী আর কেজিরওয়াল দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা পরমেশ্বরকে দেখে দৌড়ে এলেন। ব্যস্তভাবে বললেন, 'আপনার জন্যেই আমরা ওয়েট করছি। এধারে আসুন, ফর্মাল ব্যাপারটা আগে সেরে নিই।'

চৌধুরী এবং কেজিরওয়াল পরমেশ্বরকে 'লনে'র একধারে ক্লাব বিল্ডিংটার কাছাকাছি নিয়ে গেল। আগে পরমেশ্বর লক্ষ্য করে নি, এবার চোখে পড়ল, এখানে একটা উঁচু মঞ্চ রয়েছে। মঞ্চের ওপর খানকয়েক সুদৃশ্য চেয়ার, একটা বড় টেবল আর লাউডস্পীকার রয়েছে।

মণ্ডটার দিকে যেতে যেতে কেজিরওয়াল বললেন, 'ক্লাবের সব মেম্বারকে আসতে বলা হয়েছে। সবাই এসেছেন। আমাদের প্রেসিডেণ্ট স্যার নটবরলাল গোয়েঙ্কা আর সেক্রেটারি অনিলধন চ্যাটার্জি'ও এসেছেন। এ'দের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন?'

না শুনলেও ঘাড় কাত করল পরমেশ্বর।

কেজিরওয়াল বললেন, 'দুজনেই ইণ্ডিয়ার টপমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। ও'রা আপনাকে ক্লাবের অন্য মেম্বারদের কাছে ইনট্রোডিউস করে দেবেন।'

'এটা নিয়ম নাকি?'

'হ্যাঁ। আমাদের সেক্রেটারি আর প্রেসিডেণ্ট নতুন মেম্বারকে প্রথম দিন সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দ্যান।'

কথায় কথায় ওরা ডায়াসের কাছে এসে পড়েছিল। আচমকা 'লনে'র এক কোণে একটা চেনা মুখ চোখে পড়ল পরমেশ্বরের।

তাকে যুবকই বলা যায়। বয়স সাতাশ-আটাশের বেশি হবে না। পাঁচ ফুট দশ-এগারোর মতো হাইট। দারুণ ঝকঝকে স্মার্ট চেহারা। খুব ফর্সা'ও না, আবার কালোও না—দুইয়ের মাঝামাঝি গায়ের রং। মাঝারি ধরণের উজ্জ্বল চোখ, নাকমুখ বেশ ধারালো; চওড়া কপাল, চুল নিখুঁত ভাবে ব্যাক-ব্রাশ-করা। পরনে চমৎকার ডিনার স্যুট।

কোথায় একে দেখেছে, কয়েক সেকেণ্ড মনে করতে পারল না পরমেশ্বর। মল্লিকের দেওয়া সেই ফোটোটা চোখের সামনে সিনেমার স্লাইডের মতো ভেসে উঠল। ফোটোটা তার সঙ্গেই আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা পকেট থেকে বার করা ঠিক হবে না। বার না করলেও সে ঠিকই চিনে ফেলেছে। ঐ যুবকটি অমিতাভ সেন। ওর জন্যই সোমেশ্বর মল্লিক তাকে ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের অফিস করে দিয়েছেন, দু হাজার ফুটের এয়ার-কুলার বসানো ফ্যাশনেবল ফ্ল্যাট দিয়েছেন। ওকে একেবারে শেষ করে দেবার জন্যই এই ক্লাবে মেম্বার হতে চলেছে পরমেশ্বর।

পরমেশ্বর ঠিক করে ফেলল, ফর্মাল ইনট্রোডাকশনটা হয়ে গেলেই অমিতাভ সেনের সঙ্গে আলাপ-টালাপ করে জমিয়ে নেবে। বেশি দেরি করার মানে হয় না। আজ থেকেই সে অপারেশন শুরু করে দেবে।

পরমেশ্বর ডায়াসে ওঠার পর এক মিনিটও কাটল না, অন্য দিকের সিঁড়ি দিয়ে প্রায় দু কুইণ্টাল ওজনের ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা চর্বির একটা বেঁটে পাহাড় উঠে এল। তার পেছন পেছন কনট্রাস্টের মতো ঢ্যাঙা, রোগা, প্রায় ছ' ফুট হাইটের আরেক ভদ্রলোকও এলেন। লেংথ উইদআউট ব্রেড্‌থ্‌ এই লোকটার গায়ে মাংসের চাইতে হাড় বেশী। ছ' ফুট হাড়ের একটা ফ্রেম খাড়া করে

তার গায়ে দামী স্যুট টাই-ফাই পরিয়ে দিলে যা দাঁড়ায়, এই ভদ্রলোক হলেন তাই।

কম বয়েসে পরমেশ্বর এন্তার ফরেন ফিল্ম দেখত। বেঁটে মোটা আর ঢ্যাঙা রোগা—এই লোক দুটোকে দেখে ঝট করে তার লরেল-হার্ডির কথা মনে পড়ে গেল।

চৌধুরী আর কেজিরওয়াল পরমেশ্বরের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। তাঁরা লরেল-হার্ডির সঙ্গে আলাপ-টালাপ করিয়ে দিলেন। মাংসের পাহাড়টার নাম নটবরলাল গোয়েঙ্কা—বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট টাইকুন এবং এই 'ক্লাব ডে এ্যাণ্ড নাইটে'র প্রেসিডেণ্ট। রোগা ঢ্যাঙা লোকটি হলেন অনিলধন চ্যাটার্জি। চ্যাটার্জি বিরাট হার্ডওয়ার মার্চেণ্ট এবং ইমপোর্টার এক্সপোর্টার। তিনি এই ক্লাবের সেক্রেটারি। দুজনেই পরমেশ্বরের হাত ধরে আস্তে আস্তে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললেন, তাকে এখানকার নতুন মেম্বার হিসেবে পেয়ে খুব খুশী হয়েছেন।

পরমেশ্বর মনে মনে বলল, 'আমি যে কী মাল তা তো জানো না শালারা!' তবে মুখে গ্যাদগেদে বিগলিত একখানা হাসি ফুটিয়ে বলল, কোনদিন স্বপ্নেও সে ভাবেনি এ রকম একটা ক্লাবের মেম্বার হতে পারবে। গোয়েঙ্কা এবং চ্যাটার্জিরা অনুগ্রহ করেছেন বলে এটা সম্ভব হয়েছে! সে তাঁদের কাছে হোল লাইফের জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে রইল।

মাখন লাগালে ভগবান পর্যন্ত নাকি গলে যায়। গোয়েঙ্কা আর চ্যাটার্জিরা খুবই খুশী হলেন। তাঁরা পরমেশ্বরকে নিয়ে ডায়াসের সামনের দিকে যেখানে টেবল চেয়ারগুলো সাজানো রয়েছে সেখানে নিয়ে বসালেন। পরমেশ্বর বুঝতে পারল, এবার তার সঙ্গে ক্লাবের অন্য মেম্বারদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে।

লাউড স্পীকারে প্রথমে অনিলধন চ্যাটার্জি পরমেশ্বর সম্পর্কে কিছু বললেন। তাঁর পর সভাপতি গোয়েঙ্কা বলতে লাগলেন—ওভারসীজ ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্টের প্রোপাইটার বিখ্যাত বিজনেসম্যান রণজয় হালদারকে আমাদের ক্লাবের একজন সভ্য হিসাবে পেয়ে আমরা আনন্দিত। তাঁকে আমাদের মধ্যে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের অন্যান্য মেম্বারদের কাছে অনুরোধ, এই আনুষ্ঠানিক পরিচয়ের পর তাঁরা যেন মিস্টার হালদারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার ধারণা মিস্টার হালদারের মতো নতুন মেম্বারকে পেয়ে আমাদের ক্লাব লাভবান হবে। নতুন তাজা রক্ত স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী।

ক্লাবের অন্য মেম্বাররা কিছুক্ষণ আগেও লনে, সুইমিং পুলে, নুড়ি-বিছানো রাস্তায় কিংবা মেইন বিল্ডিং-এর লাউঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। চ্যাটার্জি আর গোয়েঙ্কা বক্তৃতা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সবাই ডায়াসের সামনের

'লনে'-র কাছে চলে এসেছেন। বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে চটর পটর হাততালির শব্দ হতে লাগল।

পরমেশ্বর ভাবল, দিয়ে যাও মালেরা, যত পার হাততালি দাও। তালিয়া বাজাতে বাজাতে হাতের জোড় আলগা করে ফেল। জানো তো না, তাজা নতুন রক্ত বলে কাকে এনে এখানে ঢোকালে! সেই রক্তটি কতটা ক্যান্সারের বীজাণু বয়ে নিয়ে এল, তাও মালুম পাও নি।

হাততালির আওয়াজ থিতিয়ে এলে ক্লাবের তরফ থেকে উপহার স্বরূপ বিরাট ফুলের 'বুকে' পরমেশ্বরের হাতে তুলে দিলেন সভাপতি। এবার চ্যাটার্জি বললেন, 'মিস্টার হালদার, মেম্বাররা আপনার কাছ থেকে দু-একটা কথা শুনতে চায়।'

এসব জায়গায় কী বলতে হয়, পরমেশ্বর জানে না। প্রথমে খানিকটা নার্ভাস হয়ে পড়ল সে। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড মাত্র। তারপরেই মাইকের কাছে গিয়ে গোয়েঙ্কাদের যা বলেছিল সেই কথাটাই আরেকবার রিপিট করল। অর্থাৎ 'এই ক্লাবের মেম্বার হতে পেরে তার ফোরটীন জেনারেসন উদ্ধার হয়ে গেছে'—এ-রকম ব্যাপার আর কি।

সঙ্গে সঙ্গে আরেক দফা হাততালির শব্দ উঠল।

এবারকার হাততালির মধ্যে ডায়াস থেকে গোয়েঙ্কারা পরমেশ্বরকে নিচে নিয়ে এলেন। নামতে নামতে বললেন, প্রথম দিন বলে আজ ক্লাবের পক্ষ থেকে তাকে এণ্টারটেন করা হবে। ড্রিঙ্ক বা খাবারের জন্য তাকে কোন বিল সই করতে হবে না।

এদিকে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে অন্য মেম্বাররা এসে তাকে প্রায় মাছির মতো ছেঁকে ধরল। সবাই তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সুতরাং তাকেও হাত বাড়িয়ে একেকটা হাত ধরতে হচ্ছে। যার হাতই পরমেশ্বর ধরছে সে নিজের পরিচয় দিচ্ছে। এদের কেউ আগরওয়াল, কেউ সোনি, কেউ মিটার, কেউ বাসু, কেউ কাপাডিয়া, কেউ ভার্গিজ, কেউ মিট্টাল, কেউ নিগম। ইত্যাদি ইত্যাদি। সারনেম তাদের যা-ই হোক, তারা সবাই হয় বিজনেসম্যান বা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বা কোন বড় মার্কেণ্টাইল ফার্ম বা মালটি-ন্যাশনাল কোম্পানির টপ একজিকিউটিভ কিংবা গভর্নমেণ্টের ক্লাস ওয়ান অফিসার।

ডায়াসে ওঠার পর গোয়েঙ্কারা যখন মাইকে পরিচয়-টরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল তখন হাততালি-টাততালির জন্য অমিতাভ সেনের কথাটা কিছুক্ষণের জন্য মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল পরমেশ্বরের। আচমকা তার কথা আবার মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল, চারদিক থেকে ছেঁকে ধরে যারা তার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে সেই ভিড়ে অমিতাভ নেই!

আলাপ-টালাপের পর সবাই একে একে চলে যাচ্ছিল। ভিড়টা পাতলা হয়ে আসছে দ্রুত। এর মধ্যে একটা বেয়ারা পরমেশ্বরের কাছে ট্রে-তে হুইস্কির গেলাস সাজিয়ে নিয়ে এল। পরমেশ্বর হাতের ইশারায় তাকে চলে যেতে বলল। কালীমার্কা ছাড়া সে আর কিছু স্টমাকে চালান করে না।

যদিও সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, দেড় দু ঘণ্টা আগে সূর্যটা আকাশের বিরাট ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উধাও হয়েছে, তবু গলায় সোনার বাংলা ঢালার কথা মনে পড়ল না পরমেশ্বরের। আশেপাশে যে দুচারজন এখনও রয়েছে তাদের মাথার ওপর দিয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল সে। কিন্তু না, অমিতাভ সেনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। লোকটা কেটে গেল নাকি ?

ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠল পরমেশ্বর। কোন কেস হাতে নিলে ঝটপট চুকিয়ে ফেলতে না পারলে সে ঘুমোতে পারে না। সব সময় মনে হয় আলটাকরায় কাঁটা আটকে আছে। তা ছাড়া সোমেশ্বর মল্লিককে কথা দেওয়া আছে, পনের দিনের ভেতর রেজাল্ট দেখিয়ে দেবে। আরো একটা ব্যাপার, এই কেস ঘাড় থেকে না নামালে নতুন কোন কেস নেওয়া যাবে না। কাজেই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় অমিতাভ সেনের সঙ্গে জমিয়ে নিতে হবে। একবার জমাতে পারলে তার ফ্যাকটরিতে ঢুকতে আর কতক্ষণ ! ঢুকে পড়ার পর সাত দিনের ভেতর ফ্যাক্টরির ফাউণ্ডেশন যদি উড়িয়ে দিতে না পারল তবে এই প্রফেশন ছেড়ে পরমেশ্বর অন্য লাইনে ভিড়ে যাবে।

ভিড়টা আরো হাল্কা হয়ে গেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিকে দেখতে লাগল পরমেশ্বর। সুইমিং পুল, লন, লনের ভেতর গার্ডেন আমব্রেলার তলায় থোকা থোকা ভিড়, ওধারে ক্লাব বিল্ডিং—কোথাও দেখা যাচ্ছে না অমিতাভ সেনকে। পরমেশ্বর যখন আশা ছেড়ে দিয়ে ভাবছে আজ আর এই কেসটা স্টার্ট করা গেল না সেই সময় আচমকা কাঁধের কাছ থেকে আস্তে করে কেউ ডেকে উঠল, 'মিস্টার হালদার—'

প্রথমটা খেয়াল করে নি পরমেশ্বর, পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল, তার নামটা আজ থেকে বদলে গেছে। তার গায়ে এখন রণজয় হালদারের স্ট্যাম্প। ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সে ; তারপর কয়েক সেকেন্ড অবাক হয়ে রইল। পেছনে অমিতাভ সেন দাঁড়িয়ে। অমিতাভর হাতে বীয়ারের গেলাস।

কিছুক্ষণ আগে ডায়াসের ওপর থেকে অমিতাভকে খুব ভাল করে দেখতে পায় নি পরমেশ্বর। কাছাকাছি আসতে দেখা গেল, দারুণ ঝকঝকে আর স্মার্ট চেহারা অমিতাভর। নাক মুখ কাটা কাটা, চওড়া কপালের ওপর থেকে ব্যাক ব্র্যাশ-করা চুল, মেরুদণ্ড টান টান। মাঝারি মাপের চোখ দুটোর দিকে তাকালে

টের পাওয়া যায় সাতাশ আটাশ বছরের এই ছোকরা দুর্দান্ত শার্প, বুদ্ধিমান। তার পরনে দামী ডিনার স্যুট আর উঁচু হিলের জুতো।

চোখোচোখি হতেই একটু হাসল অমিতাভ। তারপর হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমি অমিতাভ—অমিতাভ সেন।'

অবাক হবার ভাবটা ঝট করে চোখমুখ থেকে মুছে নিয়ে পরমেশ্বর অমিতাভর হাতটা ধরে আস্তে করে ঝাঁকাল। যাকে সে এতক্ষণ খুঁজছিল সে নিজেই কাছে চলে এসেছে। ছোকরা নিজের পরিচয় দিয়েছে। ও তো জানে না, এক সপ্তাহ ধরে তার ফোটো পকেটে পুরে পরমেশ্বর ঘুরে বেড়াচ্ছে! আর জানে না, কোন্ ফাঁদে এসে সে পা ঢুকিয়েছে।

পরমেশ্বর দু পাটির বত্রিশটা দাঁত মেলে দিয়ে হাসল। বলল, 'হ্যালো—'

নানা রকম কেস নিতে হয় পরমেশ্বরকে। ফলে বস্তি-ফস্তির খিস্তিখাস্তা যেমন সে জানে তেমনি হায়ার সোসাইটির কিছু কিছু কায়দাকানুনও শিখে নিয়েছে।

অমিতাভ বলল, 'আমি আগে এসেই আলাপ করতাম কিন্তু সবাই আপনাকে ঘিরে ছিল। ভিড়ের ভেতর আসি নি।' একটু থেমে বলল, 'ভাবলাম, ভিড় কমলে আসব।'

পরমেশ্বর হাসল। পালিশ-করা ল্যাংগুয়েজে বলল, 'আপনি যে নিজের থেকে আলাপ করতে এসেছেন সে-জন্য ধন্যবাদ।'

'আরে না-না, ধন্যবাদ আবার কী। ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, চলুন কোথাও বসে একটু কথা বলা যাক। আপত্তি নেই তো?'

আপত্তি! এই রকম চান্সই তো চায় পরমেশ্বর। অমিতাভকে গাঁথবার জন্য কত কায়দা-ফাযদা করে সে এই ক্লাবের মেম্বার হয়েছে। তার ধারণা ছিল, এই মালটিকে কব্জা করতে অনেক ঝামেলা করতে হবে। কিন্তু বঁড়শি ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ যে টেনে নিয়ে সেটা নিজের আলটাকরায় গেঁথে ফেলবে, কে ভাবতে পেরেছিল! পরমেশ্বর বলল, 'কোন আপত্তি নেই—'

'থ্যাঙ্ক ইউ। কোথায় বসবেন বলুন—'

'যেখানে বলবেন।'

এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা গার্ডেন আমব্রেলার তলায় ফাঁকা ক'টা বেতের চেয়ার দেখা গেল। অমিতাভ বলল, 'চলুন যাই।'

ওরা গিয়ে আমব্রেলাটার তলায় বসল। পরমেশ্বরের হাত ফাঁকা দেখে অমিতাভ বলল, 'আপনি তো কিছুই নেন নি। কী আনতে বলব—হুইস্কি, রাম না জীন?'

'ধন্যবাদ। কিছু দরকার নেই।'

'ড্রিঙ্কের হ্যাবিট নেই?'

পেটের ভেতর থেকে বগবগিয়ে হাসি উঠে আসছিল পরমেশ্বরের। ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছরের লাইফে কত হাজার কুইন্টাল বাংলা মাল তার স্টমাকে ঢুকেছে, সে নিজেই তার হিসেব জানে না। আর অমিতাভ জিজ্ঞেস করছে তার ড্রিঙ্কের হ্যাবিট আছে কিনা! এমন মজার কথা এই প্রথম শুনল সে। যাই হোক, পেটের ভেতরকার সেই উথলানো হাসিটা বেরিয়ে আসতে দিল না পরমেশ্বর। কী উত্তর দেবে, সেটা ভাবতে কয়েক সেকেন্ডে সময় লাগল। কেননা, প্রথম দিনেই এমন একটা 'পশ' ক্লাবে বসে বাংলা মালের কথাটা বলা ঠিক হবে না। সে বলল, 'আমি হুইস্কি-টুইস্কি খাই না।'

এবার অমিতাভ দামী সিগারেটের প্যাকেট বার করে পরমেশ্বরের দিকে এগিয়ে দিল।

পরমেশ্বর সিগারেট খায় না। গাঁজার মশলা দেওয়া বিড়িই তার পছন্দ। কিন্তু এই রকম একটা ক্লাবে যেখানে সুইমিং পুলের পাশে কিংবা সবুজ 'লনে' ফিলম স্টারদের মতো যুবতীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে বিড়ির কথা মুখে আনা যায় না। পরমেশ্বর শুধু বলল, 'ধন্যবাদ।'

অমিতাভ বলল, 'ড্রিঙ্ক করেন না, স্মোক করেন না—আপনি কি টীটোটেলার?'

বলে কি ছোকরা। যত সোনার বাংলা সে আজ পর্যন্ত খেয়েছে সে সব জড়ো করলে আরেকটা বে অফ বেঙ্গল হয়ে যেত। আর গাঁজার পুর দেওয়া যত বিড়ি সে ফুঁকেছে তার ধোঁয়ায় হোল ক্যালকাটা দশ মাসের জন্য ঢেকে রাখা যেত। পরমেশ্বর বলল, 'না। স্মোক, ড্রিঙ্ক—কিছুতেই আমার অরুচি নেই। তবে এখন ভাল লাগছে না।' একটু থেমে বলল, 'আপনার নাম জেনেছি। অন্য পরিচয়-টরিচয় জানি না। তবে আমার ধারণা, নিশ্চয়ই একজন বিগ শট-টটের সঙ্গে কথা বলছি।

অমিতাভর সম্পর্কে ডিটেল সব খবর যোগাড় করে তবে এখানে মেম্বার হতে এসেছে পরমেশ্বর। কিন্তু তার নিষ্পাপ ডিভাইন মুখটা দেখে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যেন কিছুই জানে না।

অমিতাভ অল্প হাসল। বলল, 'বিগ শট আর কি, আমার ছোট-খাটো দু-একটা ইন্ডাস্ট্রি আছে।'

আগ্রহে ঝুঁকে পড়ল পরমেশ্বর, 'ও তাই নাকি! তা হলে আপনি একজন বিগ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট।'

'বিগ টিগ না, কিছু কিছু জিনিস আমার ফ্যাক্টরিগুলোতে তৈরি হয়। ইচ্ছা আছে বড় স্কেলে কিছু করার কিন্তু পেরে উঠছি না।'

'কী কী প্রোডাক্ট হয় আপনার ফ্যাক্টরিগুলোতে?'

'ইলেকট্রনিক কমপোনেণ্টস, ফ্যান, টেক্সটাইল মেসিনারি, মেডিসিন, মোটর এঞ্জিনস—এমনি নানা জিনিস।'

'এত সব জিনিস! আর বলছেন আপনি বিগ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট নন!'

অমিতাভ হাসল।

পরমেশ্বর বলল, 'আপনার বয়স কত?'

অমিতাভ কিছুটা বিমূঢ়ের মতো বলল, 'কেন বলুন তো?'

বলুন না—'

'থার্টি চলছে।'

দেখে মনেই হয় না অমিতাভর বয়স তিরিশ-চেহারাটা তার দারুণ ডিসেপটিভ। বয়সের তুলনায় তাকে অনেক বেশী যুবক দেখায়। পরমেশ্বর তো ভেবেই নিয়েছিল, ছাব্বিশ-সাতাশের বেশি হবে না। যাই হোক, সে বলল, 'এই বয়সে এতগুলো ইন্ডাস্ট্রি বিল্ড করেছেন। হ্যাটস অফ!'

প্রশংসার কথা কার না ভাল লাগে। তেমন তেমন করে বলতে পারলে অলমাইটি গড পর্যন্ত কাত হয়ে যায়। অমিতাভ লাজুক মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'কী যে বলেন!'

পরমেশ্বর মনে মনে বলল, 'শালা বাটার লাগিয়ে লাগিয়ে আমি তোমাকে ফ্ল্যাট করে ছেড়ে দেব। তারপর একবার তোমার অফিস ফ্যাক্টরিতে ঢুকি, তখন বুঝিয়ে ছাড়ব আমি কী চীজ!' মুখে বলল, 'শুনেছি ফোর্ড, রকফেলার, টাটা বিড়লারাও এই বয়েসে এ রকম ইণ্ডাস্ট্রি করতে পারে নি। আপনি বাঙালীদের গৌরব।'

'প্লীজ, এসব বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, আপনি যখন লজ্জা পাচ্ছেন তখন আর কিছু বলছি না। তবে যা সত্যি তা বুক ফুলিয়ে বলা উচিত।'

একটু চুপ। তারপর অমিতাভ বলল, 'আমার সম্বন্ধেই শুধু কথা হচ্ছে। আপনার সম্পর্কে কিছু জানতে ইচ্ছে করছে। আমাদের প্রেসিডেণ্ট মিস্টার গোয়েঙ্কা অবশ্য ইনট্রোডিউস করিয়ে দেবার সময় বলেছিলেন আপনার ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের বিজনেস আছে।'

'হ্যাঁ।'

'কী কী জিনিস ইমপোর্ট করেন?'

পরমেশ্বর হকচকিয়ে গেল। ঠিক এ জাতীয় প্রশ্নের জন্য সে তৈরি ছিল

না। রণজয় হালদারের নামে কী কী কমোডিটি ইমপোর্ট করার লাইসেন্স আছে, পরমেশ্বর জানে না। নার্ভাস ভাবটা কাটিয়ে কোন রকমে সে বলল, 'এই নানা রকম মেটাল-টেটাল।'

'আপনার অফিস কোথায়?'

পরমেশ্বর তার অফিসের ঠিকানা বলল।

অমিতাভ আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় হুড়মুড় করে চৌধুরী আর কেজিরওয়াল এসে পড়লেন। কেজিরওয়াল বললেন, 'আরে আপনি বসে মিস্টার সেনের সঙ্গে গল্প করছেন! আর আমরা সারা ক্লাবে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। চলুন, শিগ্‌গির চলুন—'

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল করল, 'কোথায়?'

'বা-রে, আজ ওরিয়েণ্টাল ক্লাবেও আপনার মেম্বার হবার কথা আছে না?'

পরমেশ্বরের মনে পড়ে গেল। একই দিনে 'ক্লাব ডে অ্যাণ্ড নাইট' আর 'ওরিয়েণ্টাল ক্লাবে' তার মেম্বার হবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু যার জন্য দু ক্লাবের মেম্বার হওয়া সেই অমিতাভই একেবারে পয়লা দিনেই বঁড়শির কাছে মুখ নিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে জমিয়ে নেবার এই চান্সটা ছাড়া ঠিক হবে না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, অমিতাভ সম্পর্কে বেশি আগ্রহ দেখাতে গেলে কেজিরওয়ালরা, এমন কি অমিতাভ নিজেই কিছু ভাবতে-টাবতে পারে। ভাবনা-টাবনা বা সন্দেহের কোন রকম চান্স সে কাউকে দেবে না। কাউকে কিছু টের পেতে না দিয়ে মসৃণভাবে নিজের কাজটি সে করে যাবে। ঝটপট কিছু একটা ভেবে নিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'এক্সকিউজ মী, বেশ জমিয়ে আড্ডা শুরু হয়েছিল কিন্তু আমাকে ওরিয়েণ্টাল ক্লাবে যেতে হচ্ছে! আজ আমি ওখানে মেম্বার হব। সব অ্যারেঞ্জমেণ্ট করা আছে। কিছু মনে করবেন না প্লীজ।'

অমিতাভ বলল, 'না-না, মনে করব কেন?' বলতে বলতেই হঠাৎ তার কী মনে পড়ে গেল, 'আরে আমিও তো ওরিয়েণ্টাল ক্লাবের মেম্বার। আমাকে ওখান থেকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে আপনাকে নতুন মেম্বার করা হচ্ছে, আর এই অকেসানে আমি যেন হাজির থাকি। চলুন চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি।'

পরমেশ্বর বলল, 'ভেরি গুড। চলুন।'



ওরিয়েণ্টাল ক্লাবটা সেণ্ট্রাল ক্যালকাটার আরেকটা 'পশ' লোকালিটিতে। এখানেও সুইমিং পুল আছে, সবুজ কার্পেটের মতো লনে গার্ডেন আমব্রেলার তলায় আরাম-দায়ক চেয়ার-টেয়ার সাজানো আছে। আর আছে মডার্ন আর্কিটেকচারের চোখধাঁধানো বিরাট ক্লাব বিল্ডিং।

'ক্লাব ডে অ্যাণ্ড নাইটে' লনের একধারে মঞ্চ সাজিয়ে পরমেশ্বরকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওরিয়েণ্টাল ক্লাবের লনে নয়, ক্লাব বিল্ডিং-এর ভেতরকার প্রকাণ্ড হলে ডায়াস সাজানো হয়েছে।

ওরিয়েণ্টাল ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট জগপৎ সারোগি ফুলের 'বুকে', মালা আর মাইক ইত্যাদি নিয়ে বসে আছেন। ডায়াসে তিনি শুধু একাই নন, তাঁর ডান পাশে আরো একজনকে বসে থাকতে দেখা গেল।

উঁচু মঞ্চের সামনের দিকে গোটা হলটা জুড়ে অগুনতি চেয়ার। নানা বয়েসের পুরুষ এবং মহিলারা সেখানে বসে আছেন। চেহারা এবং পোশাক-টোশাক দেখেই টের পাওয়া যায় এঁরা অ্যাফ্লুয়েণ্ট সোসাইটির মানুষ এবং এই দামী ক্লাবের মেম্বার। সবাই পরমেশ্বরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

এক সময় চৌধুরী আর কেজিরওয়াল খুব ব্যস্তভাবে, এক রকম টানতে টানতেই পরমেশ্বরকে মঞ্চে নিয়ে এলেন। ব্যস্ততার কারণও রয়েছে। সাড়ে-সাতটায় তাঁদের এখানে আসার কথা। এখন আটটা বেজে পাঁচ। পঁয়ত্রিশ মিনিট দেরি হওয়ার জন্য কেজিরওয়ালরা প্রেসিডেণ্ট সারোগির কাছে ক্ষমা চেয়ে পরমেশ্বরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সারোগি বেশ সমাদর করেই দু-একটা কথা বললেন, তারপর পরমেশ্বরকে তাঁর পাশে বসতে বললেন।

পরমেশ্বর সারোগির বাঁ পাশের ফাঁকা চেয়ারটায় বসে দ্রুত এক পলক মঞ্চের সামনের দিকের পুরুষ আর মহিলাদের দেখে নিল। তারপর

সারোগির ঘাড়ের ফাঁক দিয়ে তাঁর ডান পাশে যে বসে আছে তার দিকে তাকাল। এ-ধার থেকে ভালো করে চোখে পড়ছে না, তবে যে প্রোফাইলটা দেখা গেল তাতে মনে হচ্ছে, সারোগির ওপাশের লোকটি একজন যুবক। যাই হোক, আগ্রহশূন্যের মতো চোখ ফিরিয়ে পরমেশ্বর আবার সামনে তাকাল।

ওদিকে সারোগি মাইকে বলতে শুরু করেছেন: 'আজ আমরা আমাদের এই গৌরবময় ক্লাবে দু'জন নতুন মেম্বার পেতে চলেছি। তাঁদের একজন হলেন রণজয় হালদার, আরেকজন হেমা সারিন। হালদার এবং সারিন দুজনেই রয়েছেন ইমপোর্ট এক্সপোর্টের বিজনেসে। এই দুজনকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত। ক্লাবের তরফ থেকে তাঁদের আমরা সাদরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।'

সারোগির শেষ দিকের কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিল না পরমেশ্বর। তাঁর মুখে 'হেমা সারিন' নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল সে। দ্রুত সারোগির ঘাড়ের পাশ দিয়ে আবার ওধারে তাকাল সে। হেমা নিশ্চয়ই কোন পুরুষের নাম হতে পারে না। নন-বেঙ্গলীদের হতে পারে কিনা, সে জানে না। কিন্তু ওধার থেকে সারোগির ওপাশের শার্ট এবং বেলবটম-পরা লোকটিকে একজন যুবক ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না।

যাই হোক, আনুষ্ঠানিকভাবে দুজনকে অন্য মেম্বারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর তাদের ফুলের 'বুকে' উপহার দেওয়া হল। তারপর 'ক্লাব ডে অ্যাণ্ড নাইটে'র মতো এখানেও সারোগি জানিয়ে দিলেন, আজ প্রথম দিন ক্লাবের তরফ থেকে দুই নতুন মেম্বারকে ড্রিঙ্ক এবং ডিনারে আপ্যায়িত করা হবে। যথারীতি হাততালি দিয়ে নতুন মেম্বারদের অভিনন্দন জানানো হলো।

ফর্মালিটির ব্যাপারগুলো হয়ে যাবার পর সারোগির সঙ্গে পরমেশ্বর আর হেমা ডায়াস থেকে নেমে আসছিল। হঠাৎ কী মনে পড়তে সারোগি দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর দু'জনকে লক্ষ্য করেই বললেন, 'ঐ দেখুন, আপনাদের আলাপটাই করিয়ে দেওয়া হয় নি। একেবারে ভুলে গেছি। আপনারা একজন আরেকজনের নাম জানেন। মিস্টার হালদার, মিস সারিন—নাউ ইউ মীট অ্যান্ড বী গুড ফ্রেন্ডস।'

মিস সারিন অর্থাৎ হেমা। এবার পরমেশ্বরের আর কোন সন্দেহই নেই—যে আজ তার সঙ্গে এই ক্লাবের নতুন মেম্বার হল সে যুবক নয়, একজন 'মড' ইয়ং গার্ল।

বুকের জোড়া পাহাড় আর কোমরের ঢালের দিকে চোখ পড়লে অনেক-

আগেই টের পাওয়া যেত হেমা যুবক না যুবতী! পরমেশ্বর নিজের উদ্দেশে মনে মনে একটা খিস্তি দিল, 'শালা খচড়া, তুমি একেবারে ব্লাইন্ড। তোমার দেড় হাজার চোখ, আর আসল কেসটাই দেখতে পাও না।'

এদিকে সারোগির কথা শেষ হতে না হতেই হেমা হাত বাড়িয়ে দিল। অগত্যা পরমেশ্বরকেও একটা হাত সেই হাতের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে হল।

হেমা বলল, 'গ্ল্যাড টু মীট ইউ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। আই অ্যাম অলসো হ্যাপি টু মীট ইউ।' কথা বলতে বলতে চোখের কোণ দিয়ে পরমেশ্বর হেমাকে দেখতে লাগল।

সাধারণ মেয়েদের তুলনায় হেমা অনেক বেশী লম্বা, পাঁচ ফুট ছ'-সাত ইঞ্চির মতো হবে। গায়ের রং রোদের ঝলকানির মতো। ছোট কপালের ওপর থেকে ফাইন সিল্কের মতো ঘন চুলের ঘের। তবে সাধারণ মেয়েদের মতো সে-চুল লম্বা নয়, ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। মুখ ডিমের মতো। প্লাক-করা ভুরুর তলায় ঝকঝকে চোখ, চোখে প্রকাণ্ড চাকার মতো পাওয়ারলেস গোল চশমা। পাতলা ঠোঁট, সরু থুতনিতে সুন্দর একটা খাঁজ। নিটোল মসৃণ গলায় সামান্য একটা ভাঁজ পর্যন্ত নেই।

ডেনিমের বেলবটস আর শার্ট আগেই পরমেশ্বরের চোখে পড়েছিল। এবার দেখা গেল হেমার পায়ে উঁচু সোলের বুট। বাঁ হাতে স্টীল ব্যান্ডে ঢাউস একটা ঘড়ি ছাড়া সারা শরীরে গয়না-টয়না বলতে কিছু নেই। সব মিলিয়ে মেয়েলী লাবণ্যের চাইতে তেজী পুরুষালী ভাবটা অনেক বেশী।

হেমা এবার বলল, 'আজকের দিনটা আমাদের পক্ষে খুবই মেমোরেবল, তাই না?'

হেমার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল পরমেশ্বর। বলল, 'হ্যাঁ। একদিনে দু'জনে এই ক্লাবের মেম্বার হলাম।'

'রাইট।'

কথা বলতে বলতে হঠাৎ আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল পরমেশ্বরের। হেমাদের সারনেম সারিন, তার মানে ওরা পঞ্জাবের মানুষ। কিন্তু মেয়েটা যে কোন বাঙালীর চাইতে ভালো বাংলা বলে। হয়ত অনেকদিন কলকাতায় আছে।

পরমেশ্বর আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় মঞ্চের তলা থেকে অন্য সব মেম্বাররা চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন। মজা করে বললেন, 'নিজেদের মধ্যে গল্প করলে চলবে না। নিচে নেমে আসুন; আমরাও আলাপ করতে চাই।'

একজন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'আমাদের দাবি—'

অন্যরা কোরাসে গলা মেলালেন, 'মানতে হবে।'

হেমা আর পরমেশ্বর হেসে হেসে অন্য মেম্বারদের উদ্দেশে হাত নেড়ে

বুঝিয়ে দিল, তারা এখনই আসছে। তারপর নিজেদের দিকে ফিরে দু'জনে প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল, 'চলুন, নিচে যাওয়া যাক। মেম্বার যখন হলাম তখন নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে।'

'অবশ্যই।'

ওরা মঞ্চের নিচে আসতেই অন্য মেম্বাররা ঘিরে ধরলেন। সবার সঙ্গে এভারেজে আধ মিনিট করে কথা বলতে বলতে ঘণ্টা খানেক কেটে গেল। সবার কাছ থেকে ছাড়া পাবার পর পরমেশ্বর বিরাট হলের কোথাও হেমাকে দেখতে পেল না। সে যখন এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে সেই সময় অমিতাভ এগিয়ে এল।

হেমার সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে অমিতাভর কথা ভুলে গিয়েছিল পরমেশ্বর। প্রফেশানের পক্ষে খুবই খারাপ ব্যাপার। অমিতাভর জন্যই এই সব 'পশ' ক্লাবে তার মেম্বার হওয়া। অথচ হেমা যে একজন ইয়ং গার্ল, এটা জানবার পর থেকেই তার ব্রেনে চাকা ঘুরে গেছে। এমন 'মড' যুবতী আগে আর সে কখনও দেখে নি। তা ছাড়া এদেশে মেয়েরা ইণ্ডাস্ট্রি বা বিজনেস করে এটা তার জানা ছিল না। মেয়ে বিজনেস ম্যাগনেট এই প্রথম দেখল সে। এসব নানা কারণে অমিতাভর ব্যাপারটা তার মাথায় ছিল না।

কিন্তু অমিতাভ নিজের থেকেই প্রথমে আলাপ করেছে, তারপর এখন আবার এগিয়ে এসেছে। কেউ যদি নিজেদের ইচ্ছায় গিলোটিনের তলায় মাথা ঢুকিয়ে দেয় পরমেশ্বর আর কী করতে পারে!

অমিতাভ বলল, 'যাক, এতক্ষণে ফ্রী হতে পেরেছেন। চলুন, কোথাও গিয়ে বসা যাক।'

পরমেশ্বর বলল, 'চলুন—'

'হল' থেকে বেরিয়ে ওরা 'লনে' এল। সেখানে প্রত্যেকটা গার্ডেন আমব্রেলার তলায় গিজগিজে ভিড়। অগত্যা পরমেশ্বরকে নিয়ে সুইমিং পুলের দিকে চলে এল অমিতাভ।

এখানেও বেশ ভিড়-টিড় রয়েছে। তবে সবই সুইমিং পুলের উঁচু পাড়ে। একধারে কংক্রীটের রঙিন যে গ্যালারি রয়েছে সেটা প্রায় ফাঁকাই। অমিতাভ পরমেশ্বরকে নিয়ে গ্যালারিতে গিয়ে বসল। তারপর একটা বেয়ারাকে ডেকে নিজের জন্য বীয়ার আর যেহেতু পরমেশ্বর হুইস্কি-টুইস্কি খায় না তাই তার জন্য সফ্‌ট্‌ ড্রিঙ্ক আনতে বলল।

বীয়ার-টীয়ার এলে চুকচুক করে খেতে খেতে নানা রকম গল্প হতে লাগল।

নিচে সুইমিং পুলে লাল-নীল-সবুজ-হলুদ জলপরীর মতো যুবতীরা

নানা রঙের কস্টিউম পরে সাঁতার কাটছে। স্টেজে অভিনয়ের সময় যেমন লাইটম্যানেরা রঙিন আলো ছুঁড়ে দেয় তেমনি এখানেও অটোমেটিক কোন প্রক্রিয়ায় পুলের জলে নানা রকম রং ছড়িয়ে যাচ্ছে।

পুলের একেবারে ধার ঘেঁষে প্রায় নেকেড জলপরীদের সাঁতার দেখার জন্য ভিড় জমেছে। বিভিন্ন বয়েসের পুরুষের ভিড়। তাদের সবার হাতেই হুইস্কি বা জিনের গেলাস বা বীয়ারের মগ। স্টমাকের ভেতর অ্যালকোহল যত ঢুকছে ততই জলপরীদের উদ্দেশে তারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠছে, 'হাই সোনিয়া, বা হাই পিমপি, বা হাই লিলি—' ইত্যাদি।

এধারে গ্যালারির একেবারে ওপরের সিঁড়িতে বসে অমিতাভ বলছিল, 'তখন বললেন, নানা রকম মেটাল ফরেন থেকে ইমপোর্ট করেন। কী কী মেটাল ?'

পরমেশ্বর ভেতরে ভেতরে হকচকিয়ে গেল। ঠিক কী কী জিনিস সে আমদানি করে সেটা স্পেসিফিক্যালি জানতে চায় অমিতাভ। ভাসা ভাসা যা হোক একটা উত্তর দিলে চলবে না। কয়েক সেকেণ্ড ভেবে ঝট করে যা মুখে এল পরমেশ্বর বলে ফেলল, 'এই নানা টাইপের স্পেশাল স্টীল, জিঙ্ক, ব্রোঞ্জ, নিকেল এটসেটরা—'

আগ্রহে অনেকখানি কাছে এগিয়ে এল অমিতাভ। বলল, 'যদি নিকেল বা ব্রোঞ্জ-ট্রোঞ্জ আপনার সারপ্লাস থাকে, আমাকে বলবেন।'

ঐ জিঙ্ক-টিঙ্ক দিয়ে অমিতাভর কী দরকার, সে-সব আর জিজ্ঞেস করল না পরমেশ্বর। খুব সংক্ষেপে বলল 'বলব।'

অমিতাভও ইমপোর্টেড মেটাল নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করল না। শুধু জিজ্ঞেস করল, 'আপনার অফিসটা কোথায় ?'

পরমেশ্বর অফিসের ঠিকানা দিল। অমিতাভ এর পর ফোন নাম্বার জানতে চাইল। পরমেশ্বর তাও দিল। অমিতাভ পকেট থেকে একটা ছোট ডায়েরি বার করে পরমেশ্বরের অফিসের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার টুকে নিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ। আমার মনে হয় আপনাকে আমার খুব দরকার হবে। যদি হয় আমাকে হেল্প করতে হবে কিন্তু। আমাকে দিয়েও যদি আপনার কিছু কাজ হয় বলবেন। কোনরকম হেজিটেসন করবেন না।'

কী কাজে তাকে অমিতাভর প্রয়োজন, পরমেশ্বর জানে না। তবে কারো যদি ক্যাঁচাকলে পা ঢোকাবার জন্য ঠ্যাঙ সুড় সুড় করে পরমেশ্বর আর কী করবে। সে তো চায়ই অমিতাভ তার দিকে আরো এগিয়ে আসুক। অমিতাভ যত এগোবে ততই তার সুবিধা। গলায় কয়েক কেজি মাখন ঢেলে সে বলল, 'অফ কোর্স। আপনার সঙ্গে আলাপ হল, বন্ধুত্ব হল। আমাকে

দিয়ে আমার একজন বন্ধুর যদি কিছু হেল্প হয়, এর চাইতে আনন্দের আর কী আছে। যা দরকার হয় বলবেন। আমার ক্ষমতায় থাকলে করব।'

'ভেরি মেনি থ্যাঙ্কস।'

পরমেশ্বর কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় নিচে সুইমিং পুলের স্প্রিং বোর্ড থেকে উড়ন্ত রঙিন ঘূর্ণির মতো কে যেন শূন্যে খানিকটা উড়ে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝপাং করে একটা শব্দ হল। তারপরেই পুলের পাড় থেকে কোরাসে মাতালদের গলায় একটা বিস্ময় যেন ফেটে পড়ল, 'হাই—'

চমকে অমিতাভ আর পরমেশ্বর দেখল গনগনে আগুনের মতো একটা কস্টিউম পরে হেমা সারিন অলৌকিক কোন মাছের মতো জলের ভেতর খেলা করে যাচ্ছে। এতক্ষণ যে যুবতীরা সাঁতার কাটছিল মুহূর্তে তারা যেন মিইয়ে গেল। তাদের মাঝখানে হেমাকে সম্রাজ্ঞীর মতো মনে হচ্ছে। কখনও চিত হয়ে হাত দুটো দাঁড়ের মতো ফেলে যাচ্ছে সে, কখনও জলের সঙ্গে শরীরটাকে প্যারালাল করে নিস্তব্ধ হয়ে ভেসে থাকছে, কখনও বা ডুব সাঁতার দিয়ে পুলের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় গিয়ে ভুস করে ভেসে উঠছে।

বেলবটম আর শার্ট পরা ছিল বলে তখন বোঝা যায় নি। এখন সরু সংক্ষিপ্ত কস্টিউমে হেমাকে দেখতে দেখতে পরমেশ্বরের মনে হল, তার চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের লাইফে এরকম মেয়ের শরীর আগে আর কখনও দ্যাখে নি।

পাতলা সরু কোমর হেমার, তার তলার দিকটা যেন ওল্টানো তানপুরা। আর দুই বুক যেন জোড়া সোনার পাহাড়। পুলের দিকে তাকালে মনে হয় একটা আগুনের হল্কা যেন জলের তলায় অনবরত একদিক থেকে আরেক দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে।

পরমেশ্বর তার সেক্স-ফেক্স পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী হয়ে বসে নি। হেমার দিকে তাকিয়ে তার নাক মুখ দিয়ে সোডার ঝাঁজ বেরিয়ে আসতে লাগল যেন। কম্পাসের কাঁটা যেমন উত্তর দিকে ফিক্সড হয়ে থাকে তার চোখদুটোও হেমার শরীরে আটকে আছে।

অমিতাভর কিন্তু সেদিকে নজর-টজর নেই। হঠাৎ ঘড়ি দেখে সে যেন চমকে উঠল। বলল, 'মিস্টার হালদার—'

হেমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলুন—'

'সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। আমি ন'টার পর বাইরে থাকি না। আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতে ভীষণ ভাল লাগছিল। তাই থেকে গেছি। প্লীজ পারমিসান দিন, বাড়ি ফিরব!'

'পারমিসানের কী আছে, আপনি বাড়ি যান।'

'আবার কবে দেখা হচ্ছে?'

পরমেশ্বর খুব একটা আগ্রহ দেখাল না। সে জানে কোথায় স্পীড তুলতে হয়, আর কোথায় ব্রেক কষতে হয়। পরমেশ্বর বলল, 'আমরা যখন একই ক্লাবের মেম্বার তখন মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই দেখা হবে।'

অমিতাভ বলল, 'আমি রোজ অফিসের পর ক্লাবে আসি।'

পরমেশ্বর মনে মনে বলল, মাকড়া, তোমাকে ক্যাঁচাকলে ফেলার জন্যে আমিও রোজ সন্ধ্যে থেকে দুই ক্লাবে প্রেজেন্ট থাকব। মুখে বলল, 'রোজ কি আর আসতে পারব। উইকে দু-একদিন আসতে চেষ্টা করব।'

'ইটস ভেরি নাইস মীটিং ইউ। আচ্ছা গুড নাইট—'

অমিতাভ পরমেশ্বরের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে একটু পরে চলে গেল। তারপর আরো কিছুক্ষণ সফট্ ড্রিংক খেতে খেতে হেমার অত্যন্ত উত্তেজক হট চেহারা দেখতে লাগল পরমেশ্বর। মেয়েটার মধ্যে কী আছে সে জানে না, তবে কী যেন এক প্রবল আকর্ষণে সে ক্রমাগত পরমেশ্বরকে নিজের দিকে টানছিল।

চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের লাইফে কম করে তিন-চার লাখ যুবতী দেখেছে পরমেশ্বর। তার ভেতর তিন-চার হাজার সেক্সি ছুকরি কি আর ছিল না? কিন্তু হেমার মতো কেউ তাকে টানতে পারে নি।

অমিতাভ চলে যাবার পর কতক্ষণ পুলের দিকে চোখের তারা ফিক্সড করে তাকিয়ে ছিল খেয়াল নেই পরমেশ্বরের। এক সময় চৌধুরী আর কেজিরওয়াল কোত্থেকে এসে হাজির হলেন। বললেন, 'আরে আপনি এখানে! আর আমরা হোল ক্লাব খুঁজে বেড়াচ্ছি! সাড়ে-দশটা বেজে গেছে। ফিরবেন না? আমাদের ডিউটি ছিল আপনাকে আপনার ফ্ল্যাটে পেঁছে দেওয়া।'

সোমেশ্বর মল্লিক পরমেশ্বরের জন্য অফিস, অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে ফ্ল্যাট— সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে একটা গাড়িও দরকার। আজ সেটার অ্যারেঞ্জমেণ্ট করা সম্ভব হয় নি। ঠিক হয়েছে সোমেশ্বর একটা ইমপোর্টেড কার পরমেশ্বরের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। সোমেশ্বর কেজিরওয়ালদের ওপর আজ পরমেশ্বরকে ক্লাবে নিয়ে আসা এবং ফ্ল্যাটে পেঁছে দেবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

হেমার দিক থেকে আস্তে আস্তে চোখ ফিরিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'হ্যাঁ চলুন'। বলতে বলতেই গ্যালারি থেকে উঠে দাঁড়াল। মনে মনে ভাবল, হেমা যখন এই ক্লাবের মেম্বার হয়েছে তখন সুইমিং পুলে তার সাঁতার আরো অনেক বার দেখা যাবে।

একটু পর গ্যালারি থেকে নেমে সুইমিং পুলের পাড়ে চলে এল পরমেশ্বররা। তার চোখ জলের দিকেই ফেরানো রয়েছে। হঠাৎ সাঁতার কাটতে কাটতে পাড়ের কাছে এসে হাত তুলে হেমা পরমেশ্বরের উদ্দেশে নাড়তে লাগল। বলল, 'গুড নাইট মিস্টার হালদার। আশা করি আমার সাঁতার আপনার ভালো লেগেছে।'

পরমেশ্বর ভেতরে ভেতরে খানিকটা চমকে উঠল। তবে কি সুইমিং পুলে নামার সময় থেকেই হেমা তাকে লক্ষ্য করে আসছে! যাই হোক, হকচকানো ভাবটা চোখে-মুখে ফুটে উঠতে দিল না পরমেশ্বর। দারুণ স্মার্ট একটা ভঙ্গি করে বলল, 'একসেলেণ্ট, আপনাকে মারমেডের মতো লাগছে!'

'ট্রু?'

'হানড্রেড পারসেণ্ট।'

'থ্যাঙ্কস। সী-ইউ—'

'ও কে—' পরমেশ্বর হাত নাড়তে নাড়তে পুলের পাড় ধরে কেজিরওয়ালদের সঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগল। একটু পর দেখা গেল, স্যুইমিং পুল আর লন পেরিয়ে তারা পার্কিং জোনে এসে পড়েছে।



কেজিরওয়ালরা পরমেশ্বরকে তার অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসের সামনে নামিয়ে দিয়ে এইমাত্র চলে গেলেন। ও'রা তাকে একেবারে ফ্ল্যাট পর্যন্ত পে'ছে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। পরমেশ্বর জোরজার করে তাঁদের পাঠিয়ে দিয়েছে। তারপর লিফট্ বক্সে ঢুকে বোতাম টিপে সোজা ফোরটীনথ ফ্লোরে উঠে এল। লম্বা করিডর পেরিয়ে নিজের স্যুইটের সামনে এসে কলিং বেল টিপতেই ছোটি সিং দরজা খুলে তাকে দেখেই লম্বা একখানা স্যালুট হাঁকাল। তার পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে পরমেশ্বর দারুণ ব্যস্তভাবে বলল, 'আগে সাত খুরি বাংলা মাল নিয়ে আয়। আলটাকরা থেকে স্টমাক পর্যন্ত হোল জিওগ্রাফিটা শুকিয়ে ডেজার্ট হয়ে গেছে।'

'জী সাব—' দরজা বন্ধ করে ছোটি সিং দৌড়ে প্রাইভেট 'বার'টার দিকে চলে গেল। আর পরমেশ্বর সোজা ড্রইং রুমে গিয়ে নিজেকে একটা সোফায় ছুঁড়ে দিয়ে পা দুটো সেণ্টার টেবলের ওপর তুলে দিল।

দু মিনিটও লাগল না, ছোটি সিং একটা দারুণ কারুকাজ-করা কাশ্মীরী ট্রেতে সাতটা মাটির খোরায় ফেনানো কালী মার্কা সাজিয়ে নিয়ে এল। সেই সঙ্গে কাজু বাদাম আর মেটে ভাজার চাট।

দশ মিনিটের ভেতর সাত খোরা স্টমাকে চালান করার পর শুকনো ঝামার মতো খরখরে গলাটা যখন একটু ভিজেছে আর মাথার ভেতর টুং-টাং করে অর্কেস্ট্রা বাজতে শুরু করেছে সেই সময় ছোটি সিং বলল, 'সাব খানা লাগাউঁ ?'

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'কী খানা পাকিয়েছ মাণিক ?'

'রাইস, চিকেন, পরোটা, ফিস ফ্রাই, আফগানি সালাড, দহিবড়া—'

ছোটি সিংকে মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে পরমেশ্বর দু হাত নেড়ে বলল, 'ব্যস ব্যস, এত বানিয়েছিস! আমার ফোরটীন জেনারেসন এত সব খানার নাম শোনে নি। যা, নিয়ে আয়।'

'এখানেই দেব, না ডাইনিং টেবিলে খানা লাগাব ?'

'বডি তুলতে আর ইচ্ছে করছে না চাঁদ। এখানেই নিয়ে এসো।'

ছোটি সিং খাবার-দাবার আনতে চলে গেল। আর সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। ক্রেডেল থেকে ফোনটা তুলে কানে ঠেকাতেই ওধার থেকে একটা চেনা গলা ভেসে এল, 'আমি সোমেশ্বর মল্লিক বলছি—'

সোজা হয়ে বসতে বসতে পরমেশ্বর বলল, 'বলুন—'

'একসঙ্গে তিনটে কনগ্র্যাচুলেসন নাও।'

'কী কী ব্যাপারে ?'

'প্রথমটা হল, তুমি ক্যালকাটার বেস্ট দুটো ক্লাবের মেম্বার হয়েছ, সে জন্য !'

'ঠিক আছে। সেকেন্ডটার কারণ ?'

'পয়লা দিনেই অমিতাভর সঙ্গে জমিয়ে নিয়েছ—সেই জন্যে।'

পরমেশ্বরের নার্ভগুলো টান টান হয়ে গেল। বলল, 'এই খবরটাও পেয়ে গেছেন !'

সোমেশ্বর জড়ানো গলায় খুক খুক শব্দ করে একটু হাসলেন। টেলিফোনের রিসিভারের মধ্য দিয়ে পরমেশ্বর টের পেল, লোকটা এই রাত এগারটার সময় হুইস্কি খেয়ে চুর হয়ে আছে।

হাসি থামিয়ে সোমেশ্বর এবার বললেন, 'আমি আরো খবর রাখি। 'ক্লাব ডে অ্যাণ্ড নাইটে' মেম্বার হবার পর অমিতাভ তোমার সঙ্গে নিজে এসে আলাপ করেছে। শুধু তাই না, 'ওরিয়েণ্টাল ক্লাবে' গিয়ে সুইমিং পুলের গ্যালারিতে বসে হাফ নেকেড ছুঁড়িদের সাঁতার দেখতে দেখতে তুমি চুটিয়ে তার সঙ্গে গল্প করেছ। কণ্ডিসান অনুযায়ী আমি জানতে চাইব না, তুমি তার সঙ্গে কী কী টপিক নিয়ে গল্প করেছ। আমার ধারণা খুব তাড়াতাড়িই তুমি তোমার ট্যালেণ্ট প্রুভ করতে পারবে। আই অ্যাম রিয়্যালি ভেরি ভেরি হ্যাপি।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে পরমেশ্বর বলল, 'একটা ব্যাপার আমার জানার আছে।'

'কী ?'

'আমাকে তো ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের বিজনেসে নামিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমি কী ইমপোর্ট করি আর কী এক্সপোর্ট করি, তাই জানি না। অমিতাভ আমাকে জিজ্ঞেস করছিল। আমি তাকে একটা ভক্কি দিয়েছি।'

'তাকে কী বলেছ ?' সোমেশ্বরের গলাটা এবার সীরিয়াস শোনাল।

'আপনি তো স্যার আগে থেকে কিছু শিখিয়ে-ফিকিয়ে দ্যান নি। যা শলা

মুখে এল তা' বলে ফেললাম। বললাম নিকেল জিঙ্ক-ফিঙ্ক ইমপোর্ট করি।'

'আন্দাজে ফাইন বলেছ। এবার দেখা হলে বলবে স্পঞ্জ আয়রন ইমপোর্ট করার কোটাও আছে তোমার।' বলে একটু থামলেন সোমেশ্বর। তারপর দম নিয়ে আবার শুরু করলেন, 'আসলে ব্যাপারটা কী জানো ?'

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'কী ?'

'ইমপোর্ট এক্সপোর্টের লাইসেন্স আছে বলেই ও তোমার কাছে ভিড়েছে।'

'আমার লাইসেন্স থাকলে অমিতাভ মাকড়ার কী প্রফিট ?'

সোমেশ্বর এবার বুঝিয়ে দিলেন। অমিতাভর ফ্যাক্টরিতে যেসব প্রোডাক্ট হয় তার জন্য র মেটিরিয়াল হিসেবে নিকেল, জিঙ্ক, স্টীল—এমনি অনেক জিনিস দরকার। সব ইণ্ডাস্ট্রির জন্যই গভর্নমেণ্টের মেটিরিয়ালের কোটা ঠিক করে দিয়েছে। কিন্তু সে সব সাপ্লাই পেতে অনেক সময় দেরী হয়ে যায়। তা ছাড়া অনেকেই লুকিয়ে-চুরিয়ে বেশি প্রোডাক্ট বানায়। বেশি প্রোডাক্টের জন্য বেশি র মেটিরিয়াল দরকার। কোটা অনুযায়ী সময়-মতো না পাওয়া গেলে অন্য সোর্স থেকে তা যোগাড় করে নিতে হয়। প্রোডাকসান তো আর বন্ধ রাখা যায় না।

ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে সোমেশ্বর বললেন, 'অমিতাভ তোমার দিকে ঝুঁকেছে, এটা খুব ভালো সাইন। দরকার হলে তাকে র মেটিরিয়াল দিয়ে হেল্পের কথা বলবে।'

পরমেশ্বর বলল, 'বলেছি। এই করে ওর ফ্যাক্টরীতে "ইন" করার হাইওয়ে বানিয়ে ফেলব, না কি বলেন ?'

'কারেক্ট !'

'ঠিক আছে স্যার। কিন্তু সত্যি সত্যি যদি ও র মেটিরিয়াল চায় তখন দেবেন কি ?'

'সিওর দেব। তোমাকে যেভাবে হোক ওর ফ্যাক্টরিতে ঢুকতে হবে !'

পরমেশ্বর এ ব্যাপারে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।

সোমেশ্বর নাকের ভেতর থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ বার করতে করতে গুজ গুজ করে এবার বললেন, 'তুমি তো শুনলাম অমিতাভর সঙ্গে ভেড়া ছাড়া ক্লাবে আরেকটি দারুণ কম্ম করেছ !'

পরমেশ্বর খানিকটা অবাক হয়ে বলল, 'কী করেছি ?'

'ওরিয়েণ্টাল ক্লাবের গ্যালারিতে বসে সুইমিং পুলে ন্যুড ছুঁড়িদের সাঁতার দেখছিলে। পার্টিকুলারলি ওই ছুঁড়িটা দারুণ—না ?'

পরমেশ্বর চমকে উঠল। হারামীটা তার পেছনে স্পাই লাগিয়ে রেখেছে

নাকি? সে চোখের তারা ফিক্সড করে পুলের দিকে যে তাকিয়ে ছিল, এ কথাটা জানলেন কী করে সোমেশ্বর? দারুণ ইনোসেন্টের মতো গলা করে পরমেশ্বর বলল, 'আপনি কার কথা বলছেন স্যার?'

সোমেশ্বর বললেন, 'তুমি একটি সুপিরিয়র কোয়ালিটির খচ্চর। যার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তিন ঘণ্টা চোখের এক্সারসাইজ করে গেলে আমি তার কথা বলছি।' বলতে বলতে গলার স্বরটা ঝপ করে খাদে নামিয়ে দিলেন, 'আই মীন হেমা সারিন—যে ছুকরি আজ তোমার সঙ্গে মেম্বার হল!'

পরমেশ্বর একটু আগে যা ভাবছিল তা বলে ফেলল, 'আমার পেছনে হোল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আর লালবাজারটাকে লাগিয়ে দিয়েছেন নাকি স্যার?'

সোমেশ্বর বললেন, 'তার মানে?'

'মানে আমি কী করছি, কোন্ ছুকরির ন্যুড বডি দেখছি—এ সব খবর স্পাই না লাগালে পাচ্ছেন কী করে? আপনার সঙ্গে কিন্তু কন্ডিশান আছে, আমার কাজের রেজাল্ট দেখে যাবেন, আর কোন ব্যাপারে কিউরিওসিটি দেখাবেন না।'

সোমেশ্বর হকচকিয়ে গেলেন, 'আই স্যোয়ার, তোমার পেছনে কোন স্পাই লাগাই নি। তোমার ওপর হানড্রেড পারসেন্টের জায়গায় আমার টু হানড্রেড পারসেন্ট কনফিডেন্স আছে। চৌধুরী আর কেজিরওয়াল ক্লাবে তোমার অ্যাকটিভিটির কথা বলছিল। সব শুনে মজা করতে ইচ্ছা হচ্ছিল, তাই বললাম।'

পরমেশ্বরের মনে হল, সোমেশ্বর মিথ্যে বলছেন না। সে বলল, 'মজা যখন করছেন—ঠিক আছে।'

সোমেশ্বর রগড়ের গলায় এবার বললেন, 'ছুকরি নাকি একখানা ভলক্যানো?'

'কারেক্ট স্যার।'

'ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস কী?'

'হাতের কাছে ফিতে ছিল না। মাপতে পারি নি।'

'বেস্ট অফ লাক। গেঁথে যদি তুলতে পার, হনিমুন করার জন্যে হনলুলুতে দু'জনকে পাঠিয়ে দেব।'

'হনিমুনের আগে অমিতাভর বারোটা বাজাতে হবে না? নাকি ওটা গুটিয়ে রেখে আগে হনিমুনের ইন্তেজামটা করে ফেলব?'

সোমেশ্বর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'আগে অমিতাভ, তারপর হনিমুন। তবে—'

'কী?'

'অপারেশন অমিতাভর' ফাঁকে ফাঁকে হনিমুনের হাইওয়েটাও তৈরি করো। নইলে হেমা সারিনের যা ডেসক্রপশন শুনলাম তাতে মনে হয় অনেক শালাই ছিপ ফেলে বসে আছে। কখন কার বঁড়শিতে যে গেঁথে যাবে। বুঝলে হারামজাদা—' বলেই গলার ভেতর আক্ষেপ এবং অপরাধসূচক একটি শব্দ করে ফের বললেন, 'এক্সকিউজ মাই ল্যাঙ্গুয়েজ। তোমাকে ক'দিনের মধ্যে ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছি। তার ওপর আজ বারো পেগের মতো স্টমাকে ঢুকে গেছে। তাই "হারামজাদা"টা বেরিয়ে এল। কিছু মনে কোরো না।'

'মনে করি নি। আপনি স্যার গ্রেট। আপনার হোল বডি দয়ামায়ার একখানা গোডাউন। আমার হনিমুনের কথা এমন করে এর আগে কোন মাকড়া কোনদিন ভাবে নি। আপনাকে গুনে দেড়শো স্যালুট।'

'ও-কে, ও-কে। এখন ফোন রাখছি, অনেক রাত হল, তুমি রেস্ট নাও। গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

লাইন কেটে গেল।



রোজ সূর্য ডুববার ঠিক পর পরই পুরো এক পাঁট কালীমার্কা স্টমাকে চালান করে থাকে পরমেশ্বর। এটা তার লাস্ট পনেরো-ষোল বছরের হ্যাবিট। কিন্তু কাল রাত্তিরে দু-দুটো ক্লাবে মেম্বার হবার পর সোমেশ্বরের দেওয়া ফ্ল্যাটে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। ক্লাবে সে ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্ক করে নি। মাঝ রাতে ফেরার পর পনের মিনিটে পাক্কা পনের খোরা ধান্যেশ্বরী খাবার পর বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ফলে আজ তার ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। কাছের কোন একটা থানায় তখন ন'টার সাইরেন বাজছে।

ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ছোটি সিং চা দিয়ে গেল। চা-টা খেয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝাড়া আধঘণ্টা হোল বডি ম্যাসাজ করাল পরমেশ্বর। তারপর চান-ফান সেরে খেয়েদেয়ে রণজয় হালদার হয়ে ক্যামাক স্ট্রীটের ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের অফিসে চলে গেল।

ম্যাজিক, ক্যারাটে, দলিল জাল, সই জাল, তালা খোলায় সাহায্য, চীটিং-এ সাহায্য, নোট জাল, ইলেকশান জেতায় সহায়তা ইত্যাদি নানা টাইপের কাজে প্ল্যানিং করে এসেছে পরমেশ্বর। কিন্তু লাইফে এই প্রথম সে নিজের প্রফেসানের জন্য অফিসে ডিউটি দিতে চলেছে। তার কাছে এটা একটা দারুণ এক্সপীরিয়েন্স।

লিফটে করে ফোরটীন্থ ফ্লোরে তার অফিসে ঢুকে পরমেশ্বর দেখল, টাইপিস্ট, ক্লার্ক, বেয়ারা, সব স্টাফই এসে গেছে। তাকে দেখে ওরা উঠে দাঁড়াল এবং একের-পর-এক বলে যেতে লাগল, 'গুড মর্নিং স্যার—'

অনবরত 'গুড মর্নিং' আওড়াতে আওড়াতে পরমেশ্বর তার চেম্বারে গিয়ে বসল। তার প্রাইভেট সেক্রেটারি রোজি শরীরের এইট্টি পারসেন্ট খোলা রেখে বাকী টোয়েন্টি পারসেন্ট কোন রকমে ঢেকে বসে ছিল। তার সঙ্গে একবার 'গুড মর্নিং'-এর আদান-প্রদান হয়ে গেল।

পরমেশ্বর এই অফিসে ঢোকার পর ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। এখন সে তার ফোম-বসানো রিভলভিং চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আধশোয়ার মতো করে পড়ে আছে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে আরামে তার চোখ বুজে এসেছিল। খানিকটা দূরে পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রোজি তার সেক্সি চেহারা থেকে প্রচুর পরিমাণে হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিসিটি ছড়িয়ে বসে ছিল। সে অবশ্য ঘুমোচ্ছিল না, পরমেশ্বর যদি কোন কাজের কথা বলে সে জন্য মেরুদণ্ড টান-টান করে রেখেছিল।

'সাব—'

হঠাৎ কার ডাকে ঘুমের চটকা ভেঙে গেল পরমেশ্বরের। চোখ মেলে দেখল, অফিসে তার পার্সোন্যাল বেয়ারা বুধিলাল টেবলের ওধারে দাঁড়িয়ে আছে।

চোখাচোখি হতেই বুধিলাল তার সামনে একটা কার্ড রাখল। সেটা তুলে নিয়ে পরমেশ্বর দেখল, সমীরের নাম লেখা রয়েছে। সমীর এ অফিসের ক্লার্ক; সে তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

পরমেশ্বর খানিকক্ষণ অবাক হয়ে বসে রইল। কার্ড পাঠিয়ে কেউ কোনদিন তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, কে তা ভাবতে পেরেছিল! নিজেকে হঠাৎ একটা দারুণ স্ট্যাটাসওলা লোক বলে মনে হতে লাগল। গম্ভীর চালে সে বলল, 'যাও, সাহেবকে ডেকে আনো।'

একটু পর সমীর সামনের টেবলটার ওধারে এসে দাঁড়াল।

পরমেশ্বর তাকে বসতে বলে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার বলুন।'

সমীর বলল, 'স্যার, আমরা সবাই বসে আছি। কী করতে হবে যদি বলে দ্যান—'

ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের অফিসে কী জাতীয় কাজকর্ম হয়ে থাকে, সে সম্বন্ধে পরমেশ্বরের কোন রকম ধারণাই নেই। কয়েক সেকেণ্ড ভেবে সে বলল, 'আজ আমরা প্রথম অফিস ওপেন করলাম। আজ কোন কাজ নয়। সবাই এখানে ফ্রেশ এসেছেন। নিজেদের মধ্যে জমিয়ে আলাপ-পরিচয় গল্প-টল্প করুন। কাল থেকে আপনাদের কাজ দেব। ও-কে?'

'ইয়েস স্যার।'

সমীর চলে গেল। পরমেশ্বর দ্রুত রোজির দিকে ফিরে বলল, 'আপনিও ওদের সঙ্গে গিয়ে আলাপ-টালাপ করে আসুন। আজকের দিনটা পুরোপুরি লিজার আর প্লেজারের জন্য।'

প্রথমে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে রইল রোজি। বডির টোয়েণ্টি পারসেণ্ট ঢেকে বাকী এইট্টি পারসেণ্টের একজিবিশন লাগিয়ে একই ঘরে সে মাত্র দশ

ফ্ট দ্রে বসে আছে। এই রকম অবস্থায় কেউ তাকে বাইরে আড্ডা মারতে যাবার কথা বলতে পারে, এটা সে ভাবতে পারে নি! চোখের কোণ দিয়ে পরমেশ্বরকে দেখতে দেখতে সে বলল, 'থ্যাঙ্কু স্যার।' বলেই শরীরে নদীর ঢেউ তুলে তুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

আসলে এই ম্হ্তে পরমেশ্বর ঘরটা ফাঁকা করতে চাইছে। উদ্দেশ্য, এ অফিস চালাবার ব্যাপারে সোমেশ্বরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে একটা গাইড-লাইন যোগাড় করা।

ডায়াল ঘ্রিয়ে ঘ্রিয়ে সোমেশ্বরকে ধরে ফেলল পরমেশ্বর। বলল, 'স্যার, ভীষণ গাড্ডায় পড়ে গেলাম যে—'

সোমেশ্বর বললেন, 'তুমি গাড্ডায় পড়েছ! এমন গাড্ডা ওয়াল্ডে তৈরি হয়েছে নাকি?'

'হ্যাঁ স্যার, হয়েছে। আর সেটা আপনিই ম্যান্ফ্যাকচার করেছেন।'

'কি রকম?'

'আমাকে অফিস করে দিয়েছেন কিন্তু ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের অফিসে কী টাইপের কাজ হয় আমার জানা নেই। এদিকে এমপ্লয়ীরা কাজের জন্য আমাকে ছেঁকে ধরেছে। কী কাজ দেব, বলে দিন।'

'এই ব্যাপার! আমি ভাবলাম, না জানি কী? ঠিক আছে, সন্ধ্যেবেলায় তোমার ফ্ল্যাটে এক বস্তা কাগজ পাঠিয়ে দেব। টাইপিস্টদের ওগ্লো টাইপ করতে দিও। এক মাসেও শেষ হবে না।'

'আর স্টেনো দ্টোকে কী কাজে লাগাব?'

'ইংরেজী পড়তে পার?'

'পারি স্যার। তবে বড় বড় দাঁতভাঙা ওয়ার্ড থাকলে পারব না।'

'না-না, সোজা সোজা শব্দই আছে।'

'তা হলে অস্মবিধা হবে না।'

'ফাইন। তোমার মেমোরি কেমন? মানে ম্খস্থ করতে কী রকম পার?'

'কোন জিনিস দ্বার পড়লে লাইফে ভ্লি না। কিন্তু আপনার ধান্দাটা কী? অরিজিন্যাল লাইন থেকে ভাগিয়ে আমাকে লেখাপড়ার লাইনে ঠেলে দিতে চাইছেন নাকি? পড়াশোনার নামে আমার স্যার থ্রম্বসিস হয়ে যায়।'

সোমেশ্বর বোতলে জল পোরার মতো বগবগিয়ে হেসে উঠলেন, 'দার্ণ বলেছ। যাক গে, রোজ কয়েকটা করে চিঠির ড্রাফট করে পাঠাব। ওগ্লো ম্খস্থ করে স্টেনোদের ডিকটেশন দেবে।'

পরমেশ্বর বলল, 'রোজ চিঠি ম্খস্থ করতে হবে? আপনি আমার বারোটা বাজাবেন দেখছি।'

হাসতে হাসতে সোমেশ্বর বললেন, 'এত রকম প্ল্যান করতে পার, আর ক'টা চিঠি মুখস্থ করতে পারবে না! যাক গে, ব্যাপারটা কঠিন কিছু না। সব বাঁধা গত। দু-চারটে দেখলেই বুঝতে পারবে। তারপর এগুলোই একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ডিকটেশন দিয়ে যাবে।'

'অলরাইট স্যার।'

একটু চুপচাপ। তারপর সোমেশ্বর বললেন, 'আজ সন্ধ্যের পর ক্লাবে যাচ্ছ নাকি?'

পরমেশ্বর বলল, 'যেতে তো হবেই। আপনার বেস্ট ফ্রেণ্ড অমিতাভ সেনকে গাঁথতে হবে না?'

'রাইট, রাইট। কিন্তু এ ব্যাপারে তোমাকে কিচ্ছু জিজ্ঞেস করব না। কনট্রাক্টের বাইরে গেলে তুমি আবার চটে যাবে।'

পরমেশ্বর শব্দ করে হাসল। বলল, 'লাইন ছেড়ে দিলাম স্যার।'

আরো দু-তিন ঘণ্টা কেটে গেল। এয়ারকণ্ডিশনড চেম্বারে বিশাল চেয়ারের দেড় ফুট পুরু গদির ভেতর ডুবে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছিল পরমেশ্বর। আচমকা খটর খটর আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু চোখ মেলে কিছুই দেখতে পেল না। সে ছাড়া এ ঘরে আর কেউ নেই। সেই যে রোজি আড্ডা মারতে বেরিয়ে গিয়েছিল, আর সে ফেরে নি। কিন্তু শব্দটা অনবরত হয়েই যাচ্ছে। একটু কান খাড়া করলে টের পাওয়া যাবে শব্দটা এক রকমের না। কখনো পেরেক ঠোকার আওয়াজ হচ্ছে, কখনো মেঝেতে ভারী কিছু টানার, কখনো বা দুমদাম করে লোহার র‍্যাক-ট্যাক ফেলার।

রিভলভিং চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছিল পরমেশ্বর। কিন্তু না, আওয়াজটা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

ঘণ্টা দেড় দুই চোখ বুজে থাকার পর বিরক্ত হয়ে উঠতে যাবে, আচমকা ফোন বেজে উঠল।

এখন কে ফোন করতে পারে? চোখ মেলে তাকিয়ে কয়েক সেকেণ্ড ভুরু দুটো কুঁচকে রইল পরমেশ্বর। সোমেশ্বর ফোন করছেন কি? তাই বা কী করে হবে? খানিকক্ষণ আগেই তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। সোমেশ্বর ছাড়া আর কারো পক্ষে তো এই অফিসের ফোন নাম্বার জানা সম্ভব না। তাহলে কে?

হাত বাড়িয়ে ধীরে-সুস্থে টেলিফোনটা তুলে নিল পরমেশ্বর। 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে ভেসে এল, 'কে, হালদার সাহেব?'

গলাটা চেনা মনে হল পরমেশ্বরের কিন্তু ঠিক ধরতে পারল না। সে বলতে যাচ্ছিল, 'হালদার সাহেব আবার কোন্ মাকড়া?' বলতে গিয়েই খেয়াল হোল, রণজয় হালদারের নাম-টাম নিজের ঘাড়ে চড়িয়ে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে ঠিক—'

'চিনতে পারছেন না, তাই তো?'

এবার চিনে ফেলল পরমেশ্বর। গলায় কয়েক কেজি খুশী আর বিস্ময় ঢেলে দিয়ে বলল, 'আরে মিস্টার সেন না?'

ওধার থেকে অমিতাভ সেন বলল, 'যাক, ধরতে পেরেছেন তা হলে!'

পরমেশ্বরের মনে পড়ে গেল, কাল ক্লাবে এ-অফিসের ঠিকানা আর ফোন নম্বর একমাত্র অমিতাভকেই দিয়েছিল। কিন্তু সে যে পুরো চব্বিশটা ঘণ্টা পার হতে-না-হতেই তাকে 'রিং' করবে, এটা ভাবতে পারে নি। কেউ যদি নিজের থেকেই ক্যাঁচাকলে ঠ্যাং ঢুকিয়ে দ্যায়, অন্যে আর কী করতে পারে! পরমেশ্বর ভাবল, বেশী দিন সময় লাগবে না, দু' সপ্তাহের ভেতরেই অমিতাভকে ফিনিশ করে দিতে পারবে। বলল, 'কী যে বলেন—আপনাকে চিনতে পারব না! তবে এখন আপনার ফোন ঠিক এক্সপেক্ট করি নি। তাই—'

'কী করছিলেন?'

'এই কিছু মেটাল দু-চার দিনের ভেতর পোর্টে আসবে। যে শিপিং কোম্পানির জাহাজ মাল নিয়ে আসছে তাদের চিঠি লিখছিলাম—' বলে নিজের মনে দারুণ একচোট হেসে নিল পরমেশ্বর। এই মুহূর্তে সে কী করছে, তার চাইতে আর কে ভাল জানে!

অমিতাভ বলল, 'তা হলে তো কাজের সময় আপনাকে ডিস্টার্ব করা হল।'

'কিছু না, কিছু না। আপনি আমাকে মনে রেখে ফোন করেছেন, ইটস এ প্লেজার।'

'থ্যাঙ্কস। যাকগে, আজ সন্ধ্যেবেলা ক্লাবে আসছেন তো?'

'আপনি যাবেন?'

'আমি রোজই যাই। সারাদিন স্ট্রেনুয়াস কাজের পর কিছুক্ষণের জন্যে ক্লাবে না গেলে ভাল লাগে না। আমার কাছে ওটাই একমাত্র পাসটাইম। আপনি যদি আজ আসেন খুশী হব।'

'নিশ্চয়ই যাব।'

'ফাইন, তা হলে সন্ধ্যেবেলা দেখা হচ্ছে?'

'সিওর।'

'তখন গল্প করা যাবে। এখন আর বিরক্ত করব না।'

অমিতাভ লাইন কেটে দিল।

তারপর আরো খানিকক্ষণ রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করল পরমেশ্বর, কিন্তু সেই শব্দটা ক্রমশঃ বেড়েই যাচ্ছে।

এক সময় পরমেশ্বর উঠে পড়ল। চেম্বারের বাইরে আসতেই তার খাস বেয়ারা টুল থেকে উঠে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে টান-টান হয়ে দাঁড়াল। ওধারে ক্লার্করা, টাইপিস্টরা এবং তার পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টান্ট রোজি চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে।

পরমেশ্বরকে দেখতে পেয়ে ব্যস্তভাবে রোজিরা এগিয়ে এল।

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, এত আওয়াজ হচ্ছে কোথায়?'

রোজিরা বলল, 'বাইরে স্যার।'

'কী হচ্ছে ওখানে?'

আওয়াজটা নিয়ে কারো তেমন মাথাব্যথা ছিল না। ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে সবাই প্রায় কোরাসে জানালো, 'ঠিক বলতে পারব না স্যার।'

পরমেশ্বর আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। লম্বা লম্বা পা ফেলে তার ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের অফিস থেকে বাইরের করিডরে বেরিয়ে এল। পেছন পেছন ক্লার্ক-টুার্করাও আসছিল। হাত নেড়ে সে তাদের ফিরে যেতে বলল। তারপর এদিক-সেদিক তাকাতেই দেখতে পেল, তার অফিস থেকে ডান দিকে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট তফাতে আরেকটা ফ্ল্যাটের সামনে কুলী-মজুর ক্লাসের সাত-আটটা লোক কী সব করছে। আরো চোখে পড়ল, স্টীলের আলমারি, র‍্যাক, চেয়ার, টেবিল, ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট, টাইপরাইটার ইত্যাদি ইত্যাদি ওখানে করিডরের ওপর ডাঁই হয়ে রয়েছে।

দেখা মাত্রই টের পাওয়া গেল, ওখানে একটা অফিস-টফিস বসানোর তোড়জোড় চলছে। যদিও কাল সোমেশ্বরের সঙ্গে একবার নিজের অফিসে এসেছিল পরমেশ্বর, তবু ঠিক ঠিক বলতে গেলে আনুষ্ঠানিকভাবে আজ থেকেই তার অফিসটা খোলা হয়েছে। আর আজই মোটে কয়েক ফুট দূরে একই ফ্লোরে কারা আবার অফিস বসাচ্ছে জানার জন্য ভীষণ কৌতূহল হতে লাগল পরমেশ্বরের। নিজের অজান্তেই পায়ে পায়ে সে এগিয়ে গেল।

কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল, সেই কুলী-মজুর টাইপের লোকগুলোর কেউ মেঝেতে জুট কার্পেট পাতছে, কেউ চেয়ার-টেবল বানাচ্ছে, কেউ পেরেক ঠুকে ঠুকে ফ্ল্যাটটার দরজার মাথায় সাইনবোর্ড লাগাচ্ছে। এতক্ষণে খটর খটর, ঘ্যাস-ঘ্যাস বা ঠুকঠাক আওয়াজের কারণটা বোঝা গেল।

ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে মাঝে মাঝে একটা গলা শোনা যাচ্ছে, 'রাখ্খো, ইয়ে সামান ইধর রাখ্খো। উয়ো সামান উধার।' অর্থাৎ কেউ নির্দেশ দিয়ে দিয়ে মালপত্র সাজিয়ে রাখছে।

শুনতে শুনতে আবছাভাবে পরমেশ্বরের মনে হল, গলাটা পুরুষের নয়। এধারে-ওধারে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ তার চোখ দরজার মাথায় সাইনবোর্ডটায় আটকে গেল। সেখানে লেখা আছে, 'ইণ্টারন্যাশনাল ড্রেসার্স'। তলায় 'এক্সপোর্টার্স অফ গারমেণ্টস'।

যাক, এরাও তা হলে এক্সপোর্টার! সাইনবোর্ড থেকে চোখ নামিয়ে পরমেশ্বর ফের তার অফিসে ফিরে আসতে যাবে, সেই সময় হঠাৎ কে যেন খুব কাছ থেকে বলে উঠল, 'মিস্টার হালদার না?'

চমকে সামনের দিকে তাকাতেই পরমেশ্বর দেখতে পেল, দরজার ফ্রেমের মাঝখানে হেমা সারিন দাঁড়িয়ে রয়েছে। কখন যে সে ওখানে এসেছে, টের পাওয়া যায় নি।

হেমার পরনে আজ দারুণ 'মড' পোশাক। ডেনিমের বেলবটস আর টী-শার্ট, পায়ে উঁচু হীলের স্পোর্টস শ্যু, বাঁ হাতে ইলেকট্রনিক্সের ঢাউস ঘড়ি।

সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাকের মতো কাল রাত্তিরে ক্লাবের সুইমিং পুলে হেমার সাঁতারের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল পরমেশ্বরের। পুলের কাচের মতো টলটলে জলে কস্টিউম পরা হেমার টেরিফিক সেক্সি শরীর মাছের মতো খেলা করছিল। 'সীন'টার কথা ভাবতে ভাবতে তার নাকের ভেতর দিয়ে হুস করে গরম লু-বাতাস বেরিয়ে আসতে লাগল।

হেমা আবার বলল, 'হোয়াট এ প্লেজেণ্ট সারপ্রাইজ! আপনাকে এখানে দেখব, ভাবতে পারি নি।'

পরমেশ্বর হকচকিয়ে গিয়ে বলল, 'সেম টু মী। কিন্তু আপনি এখানে!'

হেমা বলল, 'এই ফ্ল্যাটটা কিনেছি। এখানে আমার অফিস হবে।'

'কী আশ্চর্য, আমারও তো অফিস এখানে।'

'তাই নাকি! কোথায়?'

আঙুল বাড়িয়ে নিজের অফিসটা দেখিয়ে দিল পরমেশ্বর।

হেমাকে দারুণ খুশী দেখাল। সে বলল, 'একসেলেণ্ট! আমরা তা হলে 'নেবার' হলাম। আরে ঐ দেখুন, আপনাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন।'

পরমেশ্বর বলল, 'আপনারা ব্যস্ত আছেন। আজ থাক। অফিস-টফিস সাজিয়ে বসুন, তখন আসব তো নিশ্চয়ই।'

'তখনকার কথা তখন হবে। এখন আসুন। দরজা পর্যন্ত এসে ভেতরে ঢুকবেন না, তা কখনো হয়। প্লীজ—'

অগত্যা ভেতরে ঢুকতেই হল। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোটা ফ্ল্যাটটা দেখাল

হেমা। ফ্লোর এরিয়া আঠারশো স্কোয়ার ফুটের মতো। মোট চারটে ঘর, দুটো ইউরিনাল, তিনটে বাথরুম। কোন্ ঘরে কী কাজ হবে, কোথায় ক্লার্করা বসবে, কোথায় হেমা নিজে বসবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কয়েক মিনিটের মধ্যে জানা হয়ে গেল পরমেশ্বরের। তারপর সে বলল, 'মিস সারিন, আজ তা হলে চলি। এদিককার ঝামেলা চুকলে আপনাকেও আমার অফিসে আসতে হবে কিন্তু। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।'

হেমা বলল, 'অবশ্যই যাব।'

পরমেশ্বর তার অফিসের দিকে যাবার জন্য পা বাড়াতে যাবে, হেমা আবার বলল, 'আজ ক্লাবে যাচ্ছেন?'

ঝট করে আরেক বার হেমার সাঁতারের দৃশ্যের পাশাপাশি অমিতাভর মুখটা মনে পড়ে গেল। অমিতাভও তাকে ক্লাবে যাবার কথা বলেছে। যাই হোক, বাইরের দিকে খুব একটা আগ্রহ দেখাল না। দেখালে হেমা ভাবতে পারে, সে ফেঁসে গেছে। খানিকটা নিস্পৃহভাবে সে বলল, 'সন্ধ্যেবেলা কোথাও আটকে-টাটকে না গেলে একবার যাব।'

চোখের কোণ দিয়ে পরমেশ্বরকে দেখতে দেখতে হেমা বলল, 'আরে চলে আসবেন, দেখবেন ভাল লাগবে।'

ভাল যে লাগবে, সে সম্পর্কে পরমেশ্বর হানড্রেড পারসেন্টের জায়গায় টু হানড্রেড পারসেন্ট সিওর। কিন্তু এই মেয়েটার কাছে প্রথম দিকেই ভো-কাট্টা হয়ে ভেসে গেলে তার দাম বিলকুল কানাকড়ি হয়ে যাবে। পরমেশ্বর বলল, 'আপনি যখন বলছেন, যেতে চেষ্টা করব। ও-কে?'

'ও-কে।'

একটু পর পরমেশ্বর তার অফিসে ফিরে এল।



কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় অফিস ছুটি। ছুটির পর সোজা নিজের ফ্ল্যাটে চলে এল পরমেশ্বর। আর আসতেই ছোটি সিং দুটো ঢাউস স্টীলের বাক্স তার সামনে এনে রাখল।

পরমেশ্বর অবাক। জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো কে দিল?'

ছোটি সিং জানালো, একটা বেয়ারা গোছের লোক এসে বিকেলবেলা বাক্স দুটো দিয়ে গেছে।

পরমেশ্বর আবার বলল, 'কী আছে এতে?'

ছোটি সিং বলল, 'মালুম নেহি। উসকা অন্দর পত্তা হ্যায়।' অর্থাৎ চিঠি আছে।

প্রথম বাক্সটা খুলতেই সোমেশ্বরের চিটি পাওয়া গেল। তাতে যা লেখা আছে তা এই রকম। দুপুরে ফোনে যে কথা হয়েছে সেই মতো হাতে-লেখা কাগজপত্র আর ডিকটেশনের বয়ান পাঠানো হল। কাল থেকে টাইপিস্টরা হাতে লেখা কাগজ থেকে টাইপ করবে। আর বয়ানগুলো মুখস্থ করে পরমেশ্বরকে ডিকটেশন দিতে হবে।

বাক্স দুটো একধারে সরিয়ে রেখে বাথরুমে ঢুকে পড়ল পরমেশ্বর। ভাল করে স্নান-টান করে বাইরে আসতেই দেখা গেল সূর্যটা পশ্চিম আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে গড়াতে গড়াতে ডুবে যাচ্ছে। তার মাথাটা তিন-চার সেন্টিমিটারের মতো চোখে পড়ছে। আর দশ-পনের মিনিটের ভেতর ওটুকুও দেখা যাবে না। ক্যালকাটা মেট্রোপলিসের ওপর সন্ধ্যা নেমে আসবে।

ছোটি সিং টী-পয়ে চায়ের সরঞ্জাম আর ট্রে-তে খাবার-দাবার সাজিয়ে সামনে রেখে গেল। চা দেখে ব্লাডপ্রেসারটা এক ঝটকায় একটা বিপজ্জনক জায়গায় গিয়ে পেঁছিল। সূর্যাস্তের সময় বাংলা মাল না দেখলে সে ক্ষেপে ওঠে।

এ বাড়িতে অন্তত ডজন তিনেক সোনার বাংলার বোতল মজুদ করা আছে। সোমেশ্বরই সব বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। ছোটি সিংকে ডেকে বিশুদ্ধ ধান্যেশ্বরী দিয়ে যাবার কথা বলতে গিয়েও থমকে গেল পরমেশ্বর। সন্ধ্যের পর তাকে ক্লাবে যেতে হবে। বাংলা খেয়ে ক্লাবে যাওয়াটা ঠিক হবে না। হাজার হোক, সেখানে সোসাইটির টপ লোকেরা আসবে। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বিজনেসমেন, হাই একজিকিউটিভস, টপ অফিসারস। মুখে বাংলা গন্ধ নিয়ে এদের ভেতর যাওয়াটা ঠিক হবে না। আফটার অল, ক্লাবে সে তো আর একজন চিটিংবাজ বা ফোর-টোয়েন্টি নয়। সে একজন ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের বিজনেসম্যান। তার পরিচয়—রণজয় হালদার। রণজয় হালদারের মেক-আপ ছুঁড়ে ফেলে যখন সে আবার বস্তিতে ফিরে গিয়ে পরমেশ্বর হবে, তখন সান-ডাউন মানে সূর্যাস্তের পর থেকেই খোরার-পর-খোরা বোঝাই করে সোনার বাংলা স্টমাকে চালান করবে। আপাতত এখানে অপারেশনটা যে ক'দিন চলবে, সে ক'টা দিন ড্রিঙ্কের হ্যাবিট পাল্টে ফেলতে হবে। সূর্যাস্তের বদলে রাত্তিরে শুতে যাবার আগে পেট ভরে বাংলা খাবে। অভ্যাসটা ঝট করে বদলাতে হলে খুবই কষ্ট-টষ্ট হবে, কিন্তু কী আর করা! অমিতাভ সেনের বারোটা বাজাবার কনট্রাক্ট নিয়ে যখন সে এখানে এসেছে তখন কাজটা তো করতেই হবে।

চিরতার জল খাবার মতো করে পর পর দু'কাপ চা খেল পরমেশ্বর। সেই সঙ্গে কেক, প্যাটিজ আর কিছু বিস্কুট-টিস্কুট। খেতে খেতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। আর অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় ক্যালকাটা কর্পোরেশনের আলোগুলো ফটাফট জ্বলে উঠতে লাগল।

ছোটি সিংও ফ্ল্যাটের ঘরে ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। পরমেশ্বর কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল। সাড়ে-ছ'টা বেজে গেছে। তার মানে এখন ক্লাবে যাওয়া যেতে পারে। গাড়ির চাবিটা হাতের ভেতর ঘোরাতে ঘোরাতে, একটু পর সে বেরিয়ে পড়ল।

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে লিফ্‌টে করে নিচে নেমে তার জন্য বরাদ্দ ইমপোর্টেড লিমুজিনটায় উঠতে যাবে, হঠাৎ পরমেশ্বরের চোখে পড়ল, একটা বিরাট ট্রাক কমপাউণ্ডের ভেতর ঢুকেছে। ট্রাকটায় আলমারি, সোফা, টি-ভি, ফ্রিজ, ওয়ার্ডরোব, গ্যাস-ওভেন, কার্পেট, এয়ারকুলার ইত্যাদি ইত্যাদি নানা জিনিস রয়েছে। বোঝা যায়, নতুন কেউ এই অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে এল।

এই হাই রাইজ বিল্ডিংটায় কম করে ষাট-সত্তরটা ফ্ল্যাট রয়েছে। জাতীয় সঙ্গীতে যতগুলো প্রভিন্সের নাম আছে, সে-সব জায়গার লোকই এখানে ফ্ল্যাট কিনেছে। সিন্ধী, বাঙালী, পার্শী, গুজরাটী, মারাঠী ইত্যাদি মিলিয়ে

যে কসমোপলিটান অ্যাটমসফিয়ার, যেখানে নতুন কারা এল তা নিয়ে একেবারেই মাথাব্যথা নেই পরমেশ্বরের। তা ছাড়া এখানে সে আর থাকছেই বা ক'দিন? অমিতাভ সেনের ওপর অপারেশনটা হয়ে গেলেই এখান থেকে তাঁবু গুটিয়ে সে সরে পড়বে।

পরমেশ্বর আর দাঁড়াল না। লিমুজিনে উঠে স্টার্ট দিয়ে বাইরের রাস্তায় চলে এল।

আধ ঘণ্টা পরে দেখা গেল, 'ডে অ্যাণ্ড নাইট' ক্লাবের পার্কিং জোনে লিমুজিনটা রেখে পরমেশ্বর কখনও সবুজ কার্পেটের মতো 'লনে', কখনও সুইমিং পুলের পাশে, কখনও বিশাল হল ঘরে, কখনও বা বিলিয়ার্ড টেবিলের চারধারে অমিতাভকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এর ভেতর অনেক মেম্বার এসে গেছে। ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট আনুষ্ঠানিকভাবে কাল এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু একদিনে এত লোকের নাম বা মুখ মনে করে রাখা সম্ভব না। তবে অনেকের পক্ষে বিশেষ একজনকে মনে রাখা অনেক বেশী সহজ। পরমেশ্বর যখন অমিতাভকে খোঁজাখুঁজি করছে তখন এধার-ওধার থেকে কেউ কেউ বলে উঠেছিল, 'গুড ইভনিং হালদার সাহেব,' কিংবা 'হ্যাল্লো স্যার,' অথবা 'হাই—'। পরমেশ্বরও হাত তুলে তুলে বলে যাচ্ছিল. 'হ্যাল্লো—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করেও যখন অমিতাভকে পাওয়া গেল না, পরমেশ্বর স্ট্রেট পার্কিং জোনে এসে আবার লিমুজিনে উঠে স্টার্ট দিল এবং কয়েক মিনিটের ভেতর ওরিয়েণ্টাল ক্লাবে এসে পড়ল।

এবার আর বেশী খুঁজতে হল না। গাড়িটা পার্ক করে লনের দিকে যেতে গিয়ে অমিতাভের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বাঁশের চোঙ টাইপের একটা বীয়ার-ভর্তি মগ হাতে নিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল। পরমেশ্বরকে দেখে লম্বা লম্বা পায়ে কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'কতক্ষণ?'

পরমেশ্বর বলল, 'অনেকক্ষণ?'

একটু থতিয়ে গিয়ে অমিতাভ বলল, 'কই আপনাকে আগে দেখতে পাই নি। এইমাত্র তো এসে পার্ক করলেন।'

'ডে অ্যাণ্ড নাইট ক্লাবে প্রথমে গিয়েছিলাম। সেখানে পাক্কা একটি ঘণ্টা আপনাকে খুঁজেছি। তারপর এখানে এলাম।'

'বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, আমি প্রথমে ওরিয়েণ্টাল ক্লাবে আসি। বলে দিলে এই ট্রাবলটা আর আপনার হতো না। এবার থেকে কাইণ্ডলি প্রথমে এখানে চলে আসবেন। আর যদি আগে ডে অ্যাণ্ড নাইট ক্লাবে যেতে চান,

আমাকে একটু কষ্ট করে টেলিফোন করে দেবেন। আমি গিয়ে ওখানে আপনার সঙ্গে দেখা করব।'

'ও. কে.।'

'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে। চলুন, আইস স্কেটিং রিঙ্কে গিয়ে বসা যাক।'

রাশিয়ান না আমেরিকান, কারা যেন কলকাতায় এসে বরফের ওপর স্কেটিং দেখিয়ে গিয়েছিল। এই রকম একটা শো'তে কিভাবে যেন ভিড়ে পড়েছিল পরমেশ্বর। বরফের ওপর এমন একটা কারবার করা যায়, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতো না। এই ক্লাবে ওই রকম অ্যারেঞ্জমেণ্ট আছে, শুনে অবাক হয়ে গেল পরমেশ্বর। বলল, 'এখানে আইস স্কেটিং রিঙ্ক আছে নাকি?'

অমিতাভ অল্প একটু হাসল বলল, 'আছে। আপনি সবে মেম্বার হয়েছেন, তাই সব জানেন না। আসুন।'

ক্লাব বিল্ডিংয়ের দোতলার অর্ধেকটা ফ্লোর জুড়ে বরফ জমিয়ে আইস স্কেটিং রিঙ্ক। পুরোপুরি এয়ারকণ্ডিশানড এই জায়গাটা ঘিরে মোজেক করা গ্যালারি। জোড়ায় জোড়ায় টেরিফিক টেরেফিক ইয়াং ছুকরি আর ইয়াং ছোকরারা বরফের ওপর স্কেটিং করে যাচ্ছিল।

অমিতাভ আর পরমেশ্বর গ্যালারিতে গিয়ে বসল। অমিতাভ বলল, 'আমি বীয়ার খাচ্ছি। আপনার তো আবার এসব চলে না। কফি বলে দিই?'

বাংলা মালের বদলে কফি! পরমেশ্বর ভাবল, দু'দিন ধরে সন্ধ্যেবেলা যা চলছে তাতে দিন কয়েক এভাবে চালালে সে বিলকুল সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসী হয়ে যাবে। দারুণ নিস্পৃহগলায় পরমেশ্বর বলল, 'বলুন।'

অমিতাভ একটা বেয়ারাকে দিয়ে কালকের মতো কফি আনিয়ে দিল। একজন বীয়ার, আরেক জন কফি খেতে খেতে প্রথম দিকে এলোমেলো কথা বলে যেতে লাগল।

কথার ফাঁকে পরমেশ্বর লক্ষ্য করে যাচ্ছে, আজ আর অমিতাভ তার ইমপোর্টেড মেটাল-টেটাল সম্পর্কে কিছু জানতে চাইছে না। কথাবার্তার সবটাই দেশের পলিটিক্স, গভর্নমেন্টের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি, ইনকাম-ট্যাক্স লেবার আনরেস্ট ইত্যাদি নিয়ে।

এসব ব্যাপারে একেবারেই ইণ্টারেস্ট নেই পরমেশ্বরের। তা ছাড়া ট্যাক্স-ফ্যাক্স সম্পর্কে তার ধারণাও ভাসা-ভাসা। মাঝে-মধ্যে সে হুঁ-হাঁ করে যেতে লাগল। আর ভেতরে ভেতরে একই সঙ্গে বিরক্ত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। আসল কাজের কথা থেকে সরে এসে অমিতাভ অনবরত যদি আজেবাজে টপিক নিয়ে সময় কাটিয়ে দেয় তা হলে অপারেশনটা শেষ করতে কতদিন

লেগে যাবে তার ঠিকঠিকানা নেই। পরমেশ্বরের হাতে অনেক কনট্রাক্ট, অজস্র অ্যাসাইনমেণ্ট। এখানকার কাজ কমপ্লিট না হলে অন্য অ্যাসাইনমেণ্টে হাতই দেওয়া যাবে না। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অমিতাভর ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলতেই হবে। তার নিজের দিক থেকে একটু এগুনো দরকার। অমিতাভ কিভাবে সাড়া দেয়, সেটা জানার জন্য একটু টোকা মেরে দেখাই যাক।

কফি খেতে খেতে চোখের কোণ দিয়ে একবার অমিতাভকে দেখে নিল পরমেশ্বর। তারপব আগ্রহের গলায় বলল, 'শুনলাম, আপনি ফার্স্ট ক্লাস মডার্ন সব ফ্যাক্টরি করেছেন। এত ভাল ফ্যাক্টরি ইণ্ডিয়াতে নাকি খুব বেশী নেই।'

অমিতাভ বলল. 'কার কাছে শুনলেন ?'

'এই ক্লাবে আসার আগে 'ডে অ্যাণ্ড নাইট' ক্লাবে গিয়েছিলাম। ওখানেই একজন বলছিল। খুব সম্ভব কোন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট কি বিজনেসম্যান-ট্যান হবে। নামটা মনে পড়ছে না।' ডোজটায় কতটা কাজ হয়েছে বুঝবার জন্য তাকিয়েই রইল পরমেশ্বর।

দেখে মনে হচ্ছে. ফ্যাক্টরি সম্বন্ধে ভাল ভাল কথা বলায় খুশীই হয়েছে অমিতাভ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল. 'সাংঘাতিক কিছু না, তবে লেটেস্ট মেশিন-টেশিন দিয়ে ফ্যাক্টরিগুলোকে ইকুইপ করতে চেষ্টা করেছি। নানা রকম সফিস্টিকেটেড প্রোডাক্ট আমার কারখানাগুলো থেকে বেরোয় তো।'

অমিতাভর কথার বিশেষ কিছু মাথায় ঢুকল না পরমেশ্বরের। তবু অনেকখানি সামনের দিকে ঝুঁকে আগ্রহটা দশগুণ বাড়িয়ে এবার বলল, 'শুনলাম, সবগুলো ফ্যাক্টরি আপনি নিজের হাতে করেছেন।'

অমিতাভ খুবই বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'ও কিছু না।'

'কিছু না মানে! আপনার বয়সে এত সব একা একা করে তোলা সোজা ব্যাপার নাকি ? কত লোক কাজ করে আপনার ফ্যাক্টরিগুলোতে ?'

'চার হাজারের মতো।'

'চার হাজার !'

অমিতাভ এবার আর কিছু বলল না ; সামান্য হাসল মাত্র।

পরমেশ্বর বুঝতে পারছিল, অমিতাভ নামে এই মাকড়াটি রীতিমত ভিজে গেছে। এখন আরেকটু এগুনো যেতে পারে। সে বলল, 'ডে অ্যাণ্ড নাইট ক্লাবে ঐ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টটার কাছে শুনবার পর থেকে আমার দারুণ একটি ইচ্ছা হচ্ছে—'

অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, 'কী ?'

'আপনার ফ্যাক্টরিগুলো দেখব।'

অমিতাভ ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'কী আশ্চর্য, নিশ্চয়ই দেখবেন। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। আগেই ভেবেছিলাম, আপনাকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সে ইনভাইট করব। কিন্তু হেজিটেশান হচ্ছিল—'

'কেন ?'

'একদিনের আলাপে আপনাকে যেতে বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিলাম না।'

'এখন নিশ্চয়ই আর হেজিটেশানটা নেই।'

'একেবারেই না। কবে আপনার সময় হবে বলুন ; আমি নিজে গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসব।'

'আপনাকে কষ্ট করে আনতে যেতে হবে না। আমি নিজেই চলে যাব।'

'কবে আপনাকে এক্সপেক্ট করব বলুন।'

পরমেশ্বর মনে মনে ভাবল, আজ এখনই যাবার জন্য সে মুখিয়ে আছে। কিন্তু গোড়াতেই এত তাড়াহুড়ো আর আগ্রহ দেখালে অমিতাভ সন্দেহ করতে পারে। খুব সাবধানে চারদিক দেখেশুনে পা ফেলা দরকার। একটা চাল ভুল হলে সব কিচাইন হয়ে যাবে। এমন কি শেষ পর্যন্ত স্ট্রেট জেলে গিয়ে যে পিওর লাপসি খেতে হবে না, তারও কোন গ্যারাণ্টি নেই। পরমেশ্বর যেন খুবই চিন্তা-টিন্তা করছে, এমন একটা পোজ মেরে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'কাল হবে না ; কাল আমার অনেকগুলো প্রোগ্রাম রয়েছে। পরশুও হবে না। কোম্পানি অ্যাফেয়ার্সের ডেপুটি সেক্রেটারি কলকাতায় আসছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তরশু যেতে হবে রাইটার্সে। এক কাজ করব, রাইটার্সের কাজ সেরে বিকেলের দিকে আপনার ওখানে চলে যাব।'

'একসেলেণ্ট। আমি আপনার জন্যে ইগারলি ওয়েট করব।'

পরমেশ্বর কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই একটা মেয়ের গলা শোনা গেল, 'হাই মিস্টার হালদার—'

দ্রুত ঘাড় ফেরাতেই পরমেশ্বর দেখতে পেল, নিচের আইস রিঙ্কে হেমা সারিন টাইফুন তুলে স্কেটিং করে যাচ্ছে। তার পরনে আজ হট প্যাণ্ট আর টী-শার্ট। ক্যামাক স্ট্রীটে অফিস সাজিয়ে কখন সে এখানে চলে এসেছিল, টের পাওয়া যায় নি।

চোখাচোখি হতেই স্কেটিং করতে করতেই হাত তুলে নাড়তে লাগল হেমা। পরমেশ্বরও হাত নাড়ল। মড যুবক-যুবতীদের গলা নকল করে বলল, 'হাই—'

কাল হেমাকে সুইমিং পুলে রঙিন মাছের মতো সাঁতার কাটতে দেখেছে পরমেশ্বর। আজ দেখল স্কেটিং রিঙ্কে। মেয়েটা আরো কত কি জানে কে বলবে।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে আইস রিঙ্কে উত্তেজক স্কেটিং দেখার মানে হয় না। এখন যদি হাতের কাছে খোরা-ভর্তি গাঁজানো সোনার বাংলা থাকত! কিন্তু কী আর করা যাবে! এসপ্রেসো কফি কি আর বাংলা মালের সাবস্টিটিউট হয়!

যাই হোক, স্কেটিং রিঙ্কে হেমাকে দেখতে দেখতে অমিতাভর সঙ্গে তার ফ্যাক্টরিতে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে অন্যমনস্কর মতো কথা বলে যেতে লাগল পরমেশ্বর।

তারপর রাত আরো খানিকটা বাড়লে হাত নাড়তে নাড়তে হেমা স্কেটিং থামিয়ে মেয়েদের ড্রেসিং রুমের দিকে চলে গেল। আর পাশ থেকে অমিতাভ বলল, 'ন'টা বাজে। এবার আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে মিস্টার হালদার। একটা জরুরী কাজ আছে।'

পরমেশ্বর বলল, 'ঠিক আছে। আমি আর একা একা থেকে কী করব? রাত হয়েছে, ফিরেই যাই।'

'কাল আবার আসছেন তো?'

'ইচ্ছা আছে।'

'প্লীজ, আসবেন। এলে খানিকক্ষণ আপনার কোম্পানি পাওয়া যেত।'

পরমেশ্বর হাসল।

কিছুক্ষণ পর ওরা স্কেটিং রিঙ্ক থেকে বেরিয়ে পার্কিং জোনে চলে এল। অমিতাভর গাড়িটা সামনের দিকে ছিল। সে স্টার্ট দিয়ে আগে বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে গেল। তার পেছন পেছন পরমেশ্বর যখন নিজের লিমুজিন নিয়ে গেটের কাছে চলে এসেছে সেই সময় দৌড়ুতে দৌড়ুতে হেমা এসে পড়ল, 'মিস্টার হালদার, মিস্টার হালদার—'

গাড়িতে ব্রেক কষে পরমেশ্বর জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল। অবাক হয়ে বলল, 'কী হয়েছে মিস সারিন?'

'উড ইউ কাইন্ডলি ডু মী এ ফেভার?'

'অলওয়েজ অ্যাট ইওর সারভিস। বলুন, আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

আমার গাড়িটা স্টার্ট নিচ্ছে না। ইঞ্জিন ট্রাবল হয়েছে। হঠাৎ দেখলাম আপনার গাড়ি ক্লাব থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। দৌড়ে চলে এলাম। দয়া করে যদি একটা লিফ্‌ট দ্যান—'

'উইথ প্লেজার।' হেমার দিকের দরজা খুলে দিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'উঠুন।' হেমা উঠবার পর জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন ?'

হেমা বলল, 'সার্কুলার রোডে। আপনার খুবই অসুবিধা হবে। কিন্তু—'

তাকে থামিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে পরমেশ্বর বলল, 'একটুও অসুবিধে নেই। আমিও ওদিকেই যাচ্ছি।'

'তা হলে তো ভালোই হল।'

'সার্কুলার রোডে কোথায় যাবেন ?'

'একটা হাই-রাইজ বিল্ডিং-এ।'

'সার্কুলার রোড এলে বাড়িটা ঠিক কোন্ জায়গায় বলে দেবেন।'

'ঠিক আছে।'

একটু চুপচাপ। ঝকঝকে অ্যাসফাল্টের রাস্তা লিমুজিনের চাকার তলায় কালো ফিতের মতো গুটিয়ে যাচ্ছিল। দু'পাশ দিয়ে হুস হুস করে বাস-মিনিবাস-প্রাইভেট কার আর ভ্যান-ট্যান ছুটে যাচ্ছে।

এক সময় পরমেশ্বর বলল, 'কাল আপনার সাঁতার দেখলাম। আপনি তো দারুণ এক্সপার্ট সুইমার।'

চোখের তারা দুটো কোণের দিকে এনে হেমা বলল, 'থ্যাঙ্কস।'

পরমেশ্বর এবার বলল, 'আজ আবার আপনার আইস স্কেটিং দেখলাম। একবার রাশিয়ান না আমেরিকান ছুঁড়িদের আইস স্কেটিং দেখেছিলাম। এ ব্যাপারে আপনি তাদের নাক কেটে নিতে পারেন। ইওর পারফর্মেন্স ইজ ফার ফার বেটার।'

'বহোত বহোত সুক্রিয়া।'

পরমেশ্বর একটু ভেবে এবার জিজ্ঞেস করল, 'আর কী কী পারেন আপনি ?'

হেমা বলল, 'তাড়াহুড়োর কী আছে। সবে তো আলাপ-টালাপ হল। আমি আর কী কী জানি, স্লোলি স্লোলি সব জানতে পারবেন। হ্যাভ পেশেন্স।'

কথায় কথায় ওরা সার্কুলার রোডে এসে পড়েছিল। পরমেশ্বর ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এবার বলুন—'

'আরেকটু সামনের দিকে যান।'

মিনিটখানেক যাবার পর ডান দিকে একটা হাই-রাইজ বিল্ডিং দেখিয়ে হেমা বলল, 'প্লীজ, গাড়িটা একটু থামান। ভেতরে আর কষ্ট করে আপনাকে যেতে হবে না।'

পরমেশ্বর চমকে উঠল। এই বাড়িটার ফোরটীনথ ফ্লোরে তার নিজের স্যুইট। হেমা এখানে কার কাছে এসেছে? এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন না করে লিমুজিনটা সোজা কমপাউণ্ডের ভেতর নিয়ে গেল পরমেশ্বর।

হেমা খানিকটা বিব্রত হবার ভঙ্গি করে বলল, 'ভেতরে যাবার কোন দরকার ছিল না মিস্টার হালদার।'

পরমেশ্বর বলল, 'দরকার আছে মিস সারিন।' হেমাকে নামতে বলে নিজেও নেমে পড়ল সে। তারপর গাড়িটা লক করে বলল, 'আপনি কোন্ ফ্লোরে যাবেন?'

'সেভেনটীনথ ফ্লোরে।'

'আসুন।'

'কোথায়?'

'লিফট্ বক্সে।'

হেমা অবাক হয়ে গেল, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

পরমেশ্বর বলল, ফোরটীনথ ফ্লোরে।'

'এখানে কিছু দরকার আছে?' হেমা সারিনকে রীতিমতো কৌতূহলী দেখাল।

দু'জনে লিফট্ বক্সে ঢুকে পড়েছিল। চোদ্দ আর সতেরো নম্বর বোতাম দুটো টিপতে টিপতে পরমেশ্বর আস্তে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'আছে। কারণ আমি এখানেই থাকি।'

'আরে তাই নাকি!'

ঝিঁঝির ডাকের মতো শব্দ করে লিফট্টা ফোরটীনথ ফ্লোরে চলে এসেছিল। দরজা খুলে বাইরের করিডরে গিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'বাই; আবার দেখা হবে।' বলতে বলতে লিফটের দরজা বন্ধ করে দিল।

হেমা লিফটের ভেতর থেকে বলল, 'নিশ্চয়ই দেখা হবে। বাই—'

পরমেশ্বর নিজের স্যুইটের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ব্যস্তভাবে বলল, 'এখানকার কাজ শেষ হলে ফিরবেন কী করে? আপনার সঙ্গে তো গাড়ি নেই।'

অদ্ভুত হাসল হেমা। বলল, 'ভাববেন না, একটা কিছু অ্যারেঞ্জমেণ্ট হয়ে যাবেই।'

'যদি দরকার হয় আমার ফ্ল্যাটে একটা ফোন করে দেবেন। নাম্বারটা হল টু ফোর জিরো নাইন সেভেন···

'খুব সম্ভব দরকার হবে না। হলে নিশ্চয়ই ফোন করব। হেমা বোতাম টিপে দিল। চোখের পলকে লিফট্টা হাউই হয়ে ওপরে উঠে গেল।

আরো ঘণ্টা দুয়েক বাদে পরমেশ্বর পাক্কা এক বোতল বাংলা মাল আর পরোটা-মাংস স্টমাকে পুরে যখন সবে শুয়ে পড়েছে সেই সময় ফোন বেজে উঠল। রিসিভারটা তুলে কানে লাগাতেই ওধার থেকে হেমার গলা ভেসে এল, 'মিস্টার হালদার—'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে বসতে পরমেশ্বর বলল, 'বলুন মিস সারিন। আপনি কি এখনও সেভেনটীনথ ফ্লোরে রয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

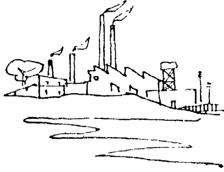
'আপনাকে পেঁৗছে দিয়ে আসতে হবে?'

'নো, থ্যাঙ্কস। তখন আপনাকে বলি নি, আজ থেকে আমি এখানেই থাকছি।'

পরমেশ্বর হকচকিয়ে গেল, 'তার মানে!'

'মানে হল, এ-বাড়ির সেভেনটীনথ ফ্লোরে আমি একটা স্যুইট কিনেছি। আর আপনি আছেন ফোরটীনথ ফ্লোরে। আমাদের অফিসও এক বাড়িতে, থাকবও এক বাড়িতে। আচ্ছা, গুড নাইট। উইশ ইউ এ ফাইন স্লিপ উইথ সুইট ড্রিম।'

লাইন কেটে গেল। টেলিফোনটা ক্রেডেলে রাখতে রাখতে মাথার ভেতর বাংলা মালের টুংটাং অর্কেস্ট্রা শুনতে পেল পরমেশ্বর। তারপর হেমার কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় আবার শুয়ে পড়ল।



পরের দিনটা মোটামুটি কেটে গেল। সকালে কাছাকাছি একটা থানা থেকে যখন ন'টার সাইরেন বাজল সেই সময় ঘুম ভাঙল পরমেশ্বরের। সঙ্গে সঙ্গে ছোটি সিং চায়ের পট-টট নিয়ে দৌড়ে এসে ম্যাসাজ শুরু করে দিল। বডি দলাই-মলাই করানোর হ্যাবিটটা সঙ্গে করে সে এই অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে ঢুকেছে।

ম্যাসাজের সঙ্গে পর পর কয়েক কাপ চা। তারপর স্নান-ফান করে খেয়েদেয়ে সোজা ক্যামাক স্ট্রীটের অফিস। নিজের মনে হেসে পরমেশ্বর বলে, 'শালা, আমি একেবারে জেণ্টলম্যান হয়ে গেলাম।'

অফিসে আসার আগে একবার তার ইচ্ছা হয়েছিল হেমাকে ফোন করে কিংবা মাত্র তিনটে ফ্লোর অর্থাৎ তিরিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট ওপরে উঠে তার ফ্ল্যাটে একবার যায়। চিন্তাটা অবশ্য এক সেকেণ্ডে বাতিল করে দিয়েছে পরমেশ্বর। হুট করে বিনা ইনভিটেশনে গেলে ছুকরি তাকে একটা সেক্সি খচ্চর ভাবতে পারে। নাঃ, তাড়াহুড়োর দরকার নেই। এক বাড়িতে যখন তারা আছে, এক জায়গায় যখন তাদের অফিস তখন অনেক বার দেখা হবেই। চোখ কান এবং নার্ভগুলো সজাগ রেখে আস্তে আস্তে এগুনোই ভাল।

অফিসে এসে টাইপিস্টদের ডেকে সোমেশ্বর যে সব কাগজপত্র পাঠিয়েছেন— তার থেকে খানকতক টাইপ করতে দিল পরমেশ্বর। করেসপণ্ডেন্সের বাঁধাগত গোটাকয়েক মুখস্থ করে স্টেনোদের ডিকটেশন দিয়ে গেল।

তারপর অফিস আওয়ার্সের পর প্রথমে ওরিয়েণ্টাল ক্লাবে চলে এল পরমেশ্বর। কিন্তু সেখানে অমিতাভ আসে নি। সুইমিং পুলে, ক্লাব বিল্ডিং-এ অমিতাভকে খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে 'ডে অ্যাণ্ড নাইট ক্লাবে গেল পরমেশ্বর। ওখানেও অমিতাভকে পাওয়া গেল না। কফির কাপ হাতে রাত ন'টা পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করেও যখন অমিতাভর দেখা মিলল না, তখন বোঝা গেল আজ আর সে আসবে না।

আচমকা হেমার কথা মনে পড়ে গেল পরমেশ্বরের। দুটো ক্লাবে তিন সাড়ে-তিন ঘণ্টা সময় কাটিয়ে দিয়েছে সে। ক্লাব বিল্ডিং, বিশাল লন, সুইমিং পুল, আইস স্কেটিং রিঙ্ক—সব জায়গায় চরকির মতো ঘুরেছে কিন্তু হেমাকে দেখতে পায় নি। তবে কি হেমাও আজ আসে নি?

অমিতাভর ফোন নাম্বার জানে পরমেশ্বর। একবার ভাবল, ক্লাব অফিসে গিয়ে একটা ফোন করে। পরক্ষণে ঠিক করল, করবে না। কাল তো অমিতাভর ফ্যাক্টরিতে যাবার কথাই আছে। দেখা হলে আজ না আসার কারণটা জেনে নেওয়া যাবে।

আরো কিছুক্ষণ পর নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এল পরমেশ্বর।

পরের দিন বিকেল পর্যন্ত কার্বন কপি করার মতো ম্যাসাজ, স্নান, খাওয়া, অফিস যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি কাজগুলো করে গেল পরমেশ্বর। তারপর কাঁটায় কাঁটায় চারটে বাজলে লিমুজিন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

অমিতাভ সেন তার 'ইটারনাল ইণ্ডাস্ট্রিজে'র ঠিকানাটা পরমেশ্বরকে দিয়ে রেখেছিল। অবশ্য তার আগেই সোমেশ্বর তাকে ওটা দিয়েছেন। নিজের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের অফিস বিল্ডিং থেকে কাচের জানলা দিয়ে 'ইটারনাল ইণ্ডাস্ট্রিজে'র ফ্যাক্টরি-ট্যাক্টরিগুলোও দেখিয়েছিলেন সোমেশ্বর।

আধ ঘণ্টা বাদে ইটারনাল ইণ্ডাস্ট্রিজের বিশাল গেটের ভেতর লিমুজিনটা ঢোকাতেই ঝকঝকে চেহারার দুই যুবক দু দিক থেকে দৌড়ে এল। একজন গাড়ির দরজা খুলে দিল। আরেকজন অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে শিরদাঁড়া টান-টান করে দাঁড়িয়ে রইল। দেখেই বোঝা যায়, তারা এখানকার একজিকিউটীভ-টেকজিকিউটিভ হবে!

পরমেশ্বর বেরিয়ে আসতেই যে যুবকটি দাঁড়িয়ে আছে, সে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, আপনি নিশ্চয়ই মিস্টার হালদার।'

পরমেশ্বর ঘাড় কাত করল, 'হ্যাঁ।'

'আসুন আসুন। সেন সাহেব আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

অর্থাৎ পরমেশ্বর আসবে বলে আগে থেকেই অমিতাভ এই যুবক দুটিকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। রিসেপশনটা খুব খারাপ হল না। কিন্তু অমিতাভ তো জানে না, বন্ধু এবং ওয়েল উইশারের মেক-আপ গায়ে চড়িয়ে কে এসে এখানে ঢুকল! পরমেশ্বর যুবকটিকে বলল, 'চলুন।' যেতে যেতে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা নিশ্চয়ই এখানে কাজ করেন?'

দু'জনে একসঙ্গে বলে উঠল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।'

দু' মিনিটের ভেতরই জানা হয়ে গেল, ওদের একজনের নাম শেখর

সান্যাল, আরেক জন কল্যাণ সাহা। শেখর ইলেকট্রনিকস ডিভিসনের ডেপুটি ওয়ার্কস ম্যানেজার, কল্যাণ জুনিয়ার অ্যাকাউণ্টস অফিসার।

কিছুক্ষণ পর গেটের পাশের পার্কিং বে থেকে বেরিয়ে এসে একটা সিমেণ্ট বাঁধানো মসৃণ রাস্তায় এসে পড়ল ওরা। রাস্তাটার দু ধারে লন। লনের ধার দিয়ে দিয়ে কনিক্যাল শেপের ঝাউয়ের বর্ডার। দুই লনেরই মাঝখানে ফোয়ারা; রাস্তাটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেটা আমেরিকান আর্কিটেকচারের বিরাট বিল্ডিং। দেখামাত্র টের পাওয়া যায়, এটা ইটারনাল ইণ্ডাস্ট্রিজে'র হেড কোয়ার্টার। বিল্ডিংটার ডান এবং বাঁ দিকে নানা ধরনের প্ল্যাণ্ট। বিরাট বিরাট সব চিমনি সোজা আকাশ ফুঁড়ে ওপরে উঠে গেছে।

পরমেশ্বর বলল, 'আপনাদের অনেক ফ্যাক্টরি, তাই না?'

কল্যাণ বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, টোটাল সাতটা'।

'সব ফ্যাক্টরি এই কমপাউণ্ডের ভেতরই রয়েছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

পরমেশ্বর আর-কিছু জিজ্ঞেস করল না।

একটু পর ওরা অফিস বিল্ডিং-এ এসে লিফট্-বক্সে ঢুকে পড়ল। তারও মিনিট দুই-তিন পর চারতলায় ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেম্বারের সামনে চলে এল।

কাঠের প্যানেল-করা দেওয়ালের গায়ে পেতলের ঝকঝকে প্লেটে অমিতাভর নাম এনগ্রেভ করা রয়েছে। তার তলায় লেখা 'ম্যানেজিং ডিরেক্টর'।

দুটো স্মার্ট বেয়ারা সাদা উর্দি পরে দরজার কাছে বসে আছে। পরমেশ্বরদের দেখে তারা স্প্রিং-লাগানো অটোমেটিক পুতুলের মতো উঠে দাঁড়াল।

কল্যাণ বলল, 'বড়া সাবকো বোলো, হালদারসাহেব আ গিয়া।'

বেয়ারাটা তক্ষুণি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেম্বারে ঢুকে গেল। আর এক মিনিটের ভেতর অমিতাভ দারুণ ব্যস্তভাবে বাইরে বেরিয়ে এল। পরমেশ্বরকে দেখে দারুণ খুশী হয়েছে সে। দু' হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে অমিতাভ বলল, 'আসুন আসুন। মোস্ট ওয়েলকাম টু আওয়ার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স—' বলে তার একটা হাত ধরে চেম্বারের ভেতর নিয়ে গেল।

আগাপাশতলা প্যানেল-করা বিশাল চেম্বারটা দামী কার্পেট, চেয়ার, সেক্রেটারিয়েট টেবিল, নানা রঙের গোটা কয়েক টেলিফোন ইত্যাদি দিয়ে চমৎকার সাজানো।

পরমেশ্বরকে বসিয়ে অমিতাভ নিজের চেয়ারে গিয়ে মুখোমুখি বসল।

কল্যাণ আর শেখর দাঁড়িয়ে ছিল; তাদের বলল, 'তোমরা এখন যাও। নিজেদের ডিপার্টমেণ্টেই থেকো। দরকার হলে ডাকব।'

আচ্ছা স্যার।' কল্যাণ এবং শেখর চলে গেল।

অমিতাভ এবার পরমেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আগে বলুন, কী খাবেন? কফি না ঠাণ্ডা কিছু?'

'কিছু দরকার নেই।'

'তাই কখনো হয়?'

অমিতাভ একটা বেয়ারাকে ডেকে কফি আনতে বলল।

কফি-টফি খাওয়ার পর পরমেশ্বর বলল, 'আপনার ফ্যাক্টরি কমপ্লেক্সে ঢুকে যেটুকু দেখেছি তাতে আমার ব্রেনে চক্কর লেগে গেছে।' বলেই মনে হয়, তার এই ল্যাঙ্গুয়েজটা এখানে ঠিক খাপ খাচ্ছে না। পরক্ষণেই শুধরে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে বলে গেল, 'মানে মাথা ঘুরে গেছে।'

অমিতাভ ঠিক বুঝতে পারে নি। বিমূঢ়ের মতো সে বলল, 'কী ব্যাপার বলুন তো? আমি ঠিক—'

'ইটারনাল ইণ্ডাস্ট্রিজ যে এত বিগ ব্যাপার আমার আইডিয়া ছিল না। তবু তো পুরোটা এখনও দেখি নি। দেখলে আমার কণ্ডিশান আরো খারাপ হয়ে যেত।'

অমিতাভ লাজুক মুখে হাসতে লাগল।

পরমেশ্বর আবার বলল, 'আপনার ফ্যাক্টরিগুলো না দেখা পর্যন্ত খুব খারাপ লাগছে।'

অমিতাভ বলল, 'নিশ্চয়ই আপনাকে দেখাব। কবে দেখবেন বলুন?'

একটু ভেবে পরমেশ্বর বলল, 'এসেই যখন পড়েছি তখন আজই দেখি না। এই ঘরে বসে থেকে কী হবে? অবশ্য যদি আপনার অসুবিধা না থাকে!'

'না-না, আমার অসুবিধা কিসের। চলুন।' পরমেশ্বরকে সঙ্গে করে অমিতাভ বেরিয়ে পড়ল।

প্রথমে ঘুরে ঘুরে গোটা অফিস বিল্ডিংটা দেখাল অমিতাভ। অ্যাকাউণ্টস ডিপার্টমেণ্ট, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লক, পার্সোনেল ডিপার্টমেণ্ট, ইঞ্জিনীয়ারিং ইউনিটের জন্য ডিজাইন সেকশন, কনফারেন্স হল—কিছুই বাদ দিল না। যে ডিপার্টমেণ্টেই ওরা যাচ্ছে, ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে দেখে সবাই রীতিমতো সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াচ্ছে। প্রতিটি এমপ্লয়ির সঙ্গে দু-একটা করে কথা বলছে অমিতাভ এবং পরমেশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছে। পরমেশ্বর তার

ঘনিষ্ঠ শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং সে কষ্ট করে এই ফ্যাক্টরি-ট্যাক্টরি দেখতে এসেছে —সবাইকে এই কথাগুলো বলে যাচ্ছে।

পরমেশ্বর লক্ষ্য করছিল, অফিসের প্রতিটি এমপ্লয়ির নাম জানে অমিতাভ। তাদের সবার সঙ্গে তার ব্যবহার বন্ধুর মতো। কথাবার্তা শুনলে মনে হয়, এমপ্লয়িরা তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভালও বাসে।

অফিস থেকে বেরিয়ে ফ্যাক্টরিগুলোতে চলে এল দু-জনে। মোট সাতটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট রয়েছে এখানে। ড্রাগ ইউনিট, ইলেকট্রনিকস ইউনিট, ইঞ্জিনীয়ারিং ইউনিট, প্রিসিসান টুলস ইউনিট, অটোমোবাইল পার্টস ইউনিট, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যান ইউনিট, আর সিউয়িং মেশিনের পার্টস ইউনিট।

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটার পর একটা ইউনিট দেখাতে লাগল অমিতাভ। যেখানে ওরা যাচ্ছে সেখানেই পরমেশ্বর দেখতে পেল, অফিস এমপ্লয়িদের মতোই ফ্যাক্টরি-ওয়ার্কারদের সঙ্গেও অমিতাভর সম্পর্কটা বন্ধুত্বপূর্ণ।

এক সময়ে ওরা ইঞ্জিনীয়ারিং ইউনিটে চলে এল। এখানে কড়া পাহারার ব্যবস্থা রয়েছে।

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'এত গার্ড কেন এখানে?'

অমিতাভ যা বলল তা এই রকম। ইঞ্জিনীয়ারিং ইউনিটে ডিফেন্সের কিছু কিছু জিনিস তৈরি হয়। সেই কারণে এত পাহারার বন্দোবস্ত। সারা দিনরাত পালা করে এখানে সেণ্ট্রিরা প্ল্যাণ্ট গার্ড দিয়ে যায়।

ইলেকট্রনিক এবং ড্রাগ ইউনিটেও পঞ্চাশ ফুট দূরে দূরে রাইফেল কাঁধে একজন করে সেণ্ট্রি।

পরমেশ্বরের প্রশ্নের জবাবে এবার অমিতাভ জানাল, ইলেকট্রনিক ইউনিটেও ডিফেন্সের কিছু জিনিস তৈরি হয়। তাছাড়া ড্রাগ ইউনিটে বানানো হয় লাইফ সেভিং মেডিসিন। কাজেই সর্বক্ষণ কড়া পাহারা রাখতেই হয়।

পরমেশ্বর ভাবল, অমিতাভর বারোটা বাজাতে হলে এই ফ্যাক্টরিগুলোতে ঢুকতে হবে। কিন্তু ঢোকাটা খুব সোজা ব্যাপার না। যত ঝামেলাই হোক, সোমেশ্বরের সঙ্গে যখন কনট্রাক্ট হয়ে গেছে তখন ওখানে তাকে ঢুকতেই হবে।

অফিস বিল্ডিংটার দু'ধারে পর পর ফ্যাক্টরি। আর পেছন দিকে অনেকটা জায়গা ফাঁকা। তারপর কম্পাউণ্ড ওয়াল। ওয়ালের তিন ধারে অন্য কোম্পানির কলকারখানা।

সন্ধ্যে নেমে আসছিল। অমিতাভর ফ্যাক্টরিগুলো দেখে ফিরে আসতে আসতে পরমেশ্বর বলল, 'আপনার জবাব নেই ব্রাদার। এই বয়েসে এসব কী করেছেন!' ঠিক এই কথাগুলোই ক্লাবে বসে আরো একবার বলেছিল

সে। ফ্যাক্টরির কথা দু-চারবার বললে কোন অসুবিধা নেই। বরং তাতে তার কাজটা অনেক বেশী সোজা হয়ে যাবে।

অমিতাভ বলল, 'কী এমন করেছি। আমার ক'টা আর ফ্যাক্টরি।' কয়েকটা বড় বড় মনোপলি হাউসের নাম করে বলল, 'ওদের তুলনায় আমার এই কারখানাগুলো হিসেবের ভেতরেই আসে না।'

'অমন বিনয়-ফিনয় রাখুন তো। আপনি মশাই আমাদের বাঙালীদের গৌরব।'

'কী যে বলেন!'

একটু চুপচাপ। তারপর পরমেশ্বর বলল, 'আচ্ছা, পেছন দিকের ঐ ওপেন স্পেসটা কতটা হবে?'

অমিতাভ বলল, 'অ্যাবাউট থার্টি একার্স।'

'অতটা জায়গায় ফেলে রেখেছেন কেন?'

'ভেবেছিলাম কোন একটা নতুন ইউনিট ওখানে বসাব। কিন্তু কী যে বসাব সেটাই ভেবে উঠতে পারছি না।'

'একটু ভাবুন। ভাবলেই ব্রেনে আইডিয়া স্পার্ক মারবে।'

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর পরমেশ্বর আবার বলল, 'আচ্ছা' আপনার ডান দিকে ওগুলো কাদের ফ্যাক্টরি?'

'এক গুজরাটি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের।'

'বাঁ দিকে?'

'রাজগরিয়াদের।'

'আর পেছন দিকে?'

অমিতাভ বলল, 'ওটা প্রিমিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিজের কমপ্লেক্স।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সোমেশ্বর মল্লিক বলে একজন বাঙালী ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আছেন, ওগুলো তাঁর ফ্যাক্টরি।'

অমিতাভর 'ইটারনাল ইণ্ডাস্ট্রিজে'র ঠিক গা থেকেই যে সোমেশ্বরের 'প্রিমিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিজে'র সীমানা শুরু তা কে ভাবতে পেরেছিল। সেদিন সোমেশ্বরের চেম্বারে বসে এটা ভাবতে পারা যায় নি। অবশ্য কম্পাউণ্ডের গা ঘেঁষেই তো কারো ফ্যাক্টরি বা অফিস-বিল্ডিং নয়। কম করে দু'ধারে ষাট-সত্তর একর করে সোয়াশো কি দেড়শো একর দূরে ফ্যাক্টরি বা অফিস।

একটা কথা ভেবে দারুণ মজা লাগল পরমেশ্বরের। অমিতাভ আর সোমেশ্বর দু-জনেরই ফ্যাক্টরি-ট্যাক্টরি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে! অথচ দু'জনের কী রিলেশান। সোমেশ্বর চাইছেন অমিতাভর প্ল্যাণ্ট-ট্যাণ্ট উড়িয়ে দিতে। সোমেশ্বর সম্পর্কে অমিতাভর মনের কথা এখনও ঠিক জানা

হয় নি। তবে এ মাকড়া কি আর সোমেশ্বরকে ফুল দুব্বো-ফুব্বো দিয়ে পুজো করার কথা ভাবে! সোমেশ্বর সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থমকে গেল পরমেশ্বর। না, এ ব্যাপারে দুমদাম করে না এগুনোই ভাল।

এক সময় ঝপ করে সন্ধ্যে নেমে গেল। চারদিক দ্রুত অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। তারই মধ্যে এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের ফ্যাক্টরি, অফিস বিল্ডিং আর রাস্তাগুলোতে আলো জ্বলে উঠেছে।

পরমেশ্বর আর অমিতাভ হেড অফিস বিল্ডিংটার সামনে এসে পড়ল। একটু দূরে পোর্টিকোর তলায় পরমেশ্বরের লিমুজিনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পরমেশ্বর বলল, 'আপনাকে অনেক ট্রাবল দিয়ে গেলাম। আমার জন্যে হাঁটতে হাঁটতে নিশ্চয়ই হাঁটুর ডায়নামো ঢিলে হয়ে গেছে!' বলতে বলতে ভাবল, হ্যাবিট! যতই সাবধানে কথা বলতে চায় সে, তবু হড়হড় করে তার পুরনো ডায়লগ বেরিয়ে আসে। কিছুতেই মনে থাকে না, সে এখন একজন ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের বিজনেসম্যান, দু-দুটো নামকরা পশ ক্লাবের মেম্বার। এখন তার জিভ থেকে স্লিপ করে আজেবাজে লুজ শব্দ বেরুনো উচিত নয়। কিন্তু কী আর করা যাবে!

অমিতাভ একটু হেসে বলল, 'কেউ আমার কারখানা দেখতে চাইলে আমার ভীষণ ভাল লাগে। এই ফ্যাক্টরিগুলো যে কী প্যাসান দিয়ে গড়ে তুলেছি! আমার কথা থাক। আপনি নিশ্চয়ই টায়ার্ড। চলুন আমার ঘরে একটু রেস্ট নিয়ে আরেক কাপ কফি খাবেন।'

পরমেশ্বর বলল, আজ আর খাব না। আরেক দিন এসে কফি খেয়ে যাব।'

'আরেক দিন আসার কথা দিলেন তো?'

পরমেশ্বর ভাবল, আরেক দিন কি, মাকড়া তোমার এখানে রোজ আসবার একটা প্ল্যান আমাকে দু-একদিনের ভেতর বার করে ফেলতেই হবে। মুখে বলল, 'নিশ্চয়ই দিলাম।' একটু থেমে ফের বলল, 'সন্ধ্যে হয়ে গেল। এখন আপনার প্রোগ্রাম কী? ক্লাবে যাবেন না?'

অমিতাভ বলল, 'না, আজ আর যাচ্ছি না।'

আচমকা কিছু মনে পড়ে যেতে পরমেশ্বর এবার বলল, 'আ রে, কালও তো আপনি ক্লাবে যান নি।'

'আপনি গিয়েছিলেন?'

ঘাড়টা পাক্কা এক মিটার হেলিয়ে পরমেশ্বর বলল, নিশ্চয়ই গিয়েছিলাম। ঝাড়া তিনটে ঘণ্টা আপনার জন্যে ওয়েট করে যখন ভাবলাম মাল আসবে

না তখন ফিরে গেলাম।' বলতে বলতে আচমকা ব্রেক কষার মতো করে থেমে গেল এবং পর মুহূর্তে নিজের কানে মোচড় দিতে শুরু করল, 'এক্সকিউজ মাই ল্যাঙ্গুয়েজ। জিভ থেকে স্লিপ করে 'মাল' কথাটা বেরিয়ে গেছে।'

অমিতাভ হাসতে হাসতে বলল, 'ঠিক আছে, আমি কিছু মনে করছি না।' একটু থেমে ভেবে নিয়ে বলল, 'মা'র শরীরটা কাল থেকে খারাপ যাচ্ছে। হাই সুগার, চোখের ট্রাবল। ডাক্তার কাল এসেছিল, আজও আসবে। মা একটু ভাল থাকলে কাল ক্লাবে যাব।'

'মা ঝটপট সুস্থ হয়ে উঠুন। আচ্ছা, তাহলে যাওয়া যাক। বাই—'

'বাই—'

পরমেশ্বর তার লিমুজিনে গিয়ে উঠল।



অমিতাভ সেনের 'ইটারনাল ইণ্ডাস্ট্রিজ' থেকে বেরিয়ে সোজা নিজের ফ্ল্যাটে চলে এল পরমেশ্বর। আজ আর ক্লাবে গেল না সে। যার জন্য ক্লাবে যাওয়া সে-ই যখন যাবে না, বেফায়দা গিয়ে কী হবে? তা ছাড়া ওখানে যাওয়া মানেই তো কফি খেয়ে খেয়ে স্টমাক বোঝাই করা। বাংলা মালের বদলে কফি খেয়ে খেয়ে পাকস্থলীতে জং ধরে গেল।

ফ্ল্যাটে এসে প্রথমে দশ খোরা বাংলা মাল খেয়ে নিল পরমেশ্বর। নেশার কিকে ব্রেনের নার্ভগুলো কয়েক মিনিটের ভেতর চাঙ্গা হয়ে উঠল। তারপর ডিভানে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল, কেমন করে 'ইটারনাল ইণ্ডাস্ট্রিজ'-এ সে পার্মানেণ্টলি ঢুকবে। ভাবতে ভাবতে ফ্ল্যাশ বাল্বের মতো মাথায় একটা প্ল্যান খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডায়াল করে সোমেশ্বরকে ধরে ফেলল সে, 'হ্যালো স্যার—'

লাইনের ওধার থেকে সোমেশ্বরের গলা ভেসে এল, 'কে, পরমেশ্বর?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন চলছে?' বলেই দারুণ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সোমেশ্বর, 'আমি কিন্তু কোন কিছু জানতে চাইছি না। তুমি আবার ক্ষেপে উঠো না। প্লীজ।'

পরমেশ্বর বসল, 'না, ক্ষেপছি না। একটা খবর আপনাকে দিচ্ছি; শুনে খুশিতে আপনার ব্লাড প্রেসার চড়ে যাবে।'

'কী খবর?'

'আমি অমিতাভ সেনের ফ্যাক্টরির ভেতর আজ 'ইন' করেছি। সে এখন আমার জিগরি দোস্ত।'

'এর ভেতর ওখানে ঢুকে পড়েছ! ফাইন। তুমি দেখছি একখানা পিওর জেম হে। তারপর বল—'

'দেখুন স্যার, অ্যাদ্দিন ব্যাঙ্ক ডাকাতি, হাইওয়ে রবারি, নোট জাল, দলিল

জাল, এটসেট্রার প্ল্যান-ট্যান করেছি। কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রির লাইনে আপনারটাই আমার ফার্স্ট কেস। তাই কয়েকটা ব্যাপারে আপনার হেল্প চাই।

'ডেফিনিটলি। আই অ্যাম রেডি টু এক্সটেণ্ড এনি কো-অপারেশন ইউ রিকোয়ার। বল কী দরকার—'

পরমেশ্বর বলল, 'ধরুন, আমার তিরিশ একর ল্যাণ্ড আছে। আমি একটা ইণ্ডাস্ট্রি করতে চাই। কী ইণ্ডাস্ট্রি করা যায়, ভেবেচিন্তে তার একটা প্ল্যান করিয়ে আমাকে দিতে পারবেন ?'

'সোমেশ্বর বললেন, 'নিশ্চয়ই পারব। কবে তোমার দরকার ?'

'ইন এ উইক।'

'পাবে। একেবারে বাজেট পর্যন্ত করে দেব। ফ্যাক্টরি বসাবার জন্যে কিভাবে টাকা পাওয়া যাবে, মানে এল-আই-সি, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট ব্যাঙ্ক, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, এইসব ইনস্টিটিউশানকে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হবে, তার ডিটেলস দিয়ে দেব।'

'বহোত আচ্ছা।'

কিন্তু ব্যাপারটা কী বল তো ? ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডের হাওয়া গায়ে লাগল নাকি ? কোথায় ফ্যাক্টরি বসাচ্ছ ?'

'আপনি বিশ্বাস করেন আমার মতো মাকড়া একটা ফ্যাক্টরি বসাতে পারে ? আমি কোন্ লাইনের মাল তা তো আপনি ভাল করেই জানেন। আমি মশাই এ জন্মে তো নয়ই, কোন জন্মেই আপনার কমপিটিটর হব না।'

সোমেশ্বর বলল, তুমি যে ফ্যাক্টরি করবে না, সেটা হয় বুঝলাম, তবে ফ্যাক্টরির প্ল্যান করতে চাইছ কেন ?'

পরমেশ্বর বলল, 'স্রেফ আপনার জন্যে। ক'টা দিন ওয়েট করুন। সব মালুম পাবেন। মেয়েমানুষদের মতো কিউরিওসিটি ছাড়ুন মাইরি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করছি না। এবার বল, আমার কাছে এসে কাজ করতে তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো ?'

'হচ্ছে।'

'কী ?' উদ্বেগে টেলিফোনের ভেতর প্রায় মুখটা ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সোমেশ্বর।

পরমেশ্বর বলল, 'ক্লাবে ধান্যেশ্বরী পাওয়া যায় না। সন্ধ্যেগুলোর বারোটা বেজে যাচ্ছে !'

'এটা একটা প্রোবলেম বটে।' গলার স্বর শুনে টের পাওয়া যায়, সোমেশ্বর খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। একটু চুপ করে থেকে ফের বললেন, 'দ্যাখ, প্রবলেমটার কিভাবে সলিউশন করতে পার।'

'দেখি।'

'আর কী অসুবিধা ?'

'আমার ল্যাঙ্গুয়েজ। জন্মের পর থেকে হোল লাইফ খিস্তিখাস্তা করে আসছি। মুখটা শালা টেরিফিক খচ্চর হয়ে গেছে। হাঁ করলেই ড্রেনের গন্ধ বেরুতে থাকে। আপনাদের মতো জেণ্টলমেনদের সামনে ড্রপসিন তুলতে কী তখলিফ যে হচ্ছে। সব সময় ভালো ভালো কথা বলতে চেষ্টা করছি, কিন্তু দুমদাম অরিজিনাল বোল বেরিয়ে আসছে। শালা, একেবারে কিচাইন হয়ে যাচ্ছে।'

জোরে জোরে টেলিফোন ফাটিয়ে খুব একচোট হেসে নিলেন সোমেশ্বর। তারপর বললেন, 'তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। তুমি একেবারে ফ্যানটাসটিক !'

পরমেশ্বর খুব ঠাণ্ডা গলায় এবার বলল, 'স্যার, অনেক রাত হল। আজ এখানে ব্রেক কষে দিন ! পরে আবার কথা হবে।'

সোমেশ্বর হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ,-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

পরমেশ্বর ফোনটা ক্রেডেলের ওপর ঝড়াং করে রেখে দিল।

আরো খানিকক্ষণ পর ছোটি সিং ডিভানের পাশে একটা টেবিলে রাতের খাবার দিয়ে গেল। পরমেশ্বর ডিভানে বসেই খেতে শুরু করল।

খাওয়া যখন আধাআধি হয়েছে সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। ভুরু কুঁচকে তাকাল পরমেশ্বর। এত রাতে কে তাকে ফোন করতে পারে ? সোমেশ্বরই কি আবার তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন ?

দারুণ বিরক্তভাবে বাঁ হাত দিয়ে ফোনটা তুলে নিল পরমেশ্বর। 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'মিস্টার হালদার বলছেন ?'

হেমার গলা। পরমেশ্বর শিরদাঁড়া টান টান করে বসল। বলল, 'হ্যাঁ, আমিই। আপনি কোত্থেকে ?'

'আপনার তিনটে ফ্লোর মানে পাক্কা থার্টি সিক্স ফিট ওপর থেকে।' বলে একটু থামল হেমা। পরক্ষণে আবার শুরু করল, 'শুয়ে পড়েছিলেন নাকি ? ডিসটার্ব করলাম ?'

'বিলকুল না। আজ রাতের মতো স্টমাক বোঝাই করছি, মানে খাচ্ছি।'

'খাওয়া-দাওয়ার পর প্রোগ্রাম কী ? স্ট্রেট টু বেডরুম ?'

'সেই রকমই ইচ্ছা। করবার তো কিছুই নেই।'

'দেখুন, আমরা ছত্রিশ ফুট ডিস্ট্যান্সে থাকি কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ কারো ফ্ল্যাটে যাই নি। আমরা কিন্তু 'গুড নেবার' নই।'

'গুড নেবার হতে হলে কী করতে হবে ?'

'ডিনারের পর এক্ষুনি লিফটে ঢুকে তিনটে ফ্লোর ওপরে উঠে আসতে হবে।'

'কিন্তু এত রাতে ?'

গলার স্বরটা অনেকখানি খাদে নামিয়ে ফিস ফিস করল হেমা, 'ভয় পাচ্ছেন নাকি ? আমি একটা খুব নিরীহ ইনোসেন্ট বালিকা মাত্র। চলে আসুন—'

হেমার গলায় নিশির ডাকের মতো এমন কিছু ছিল যাতে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না পরমেশ্বর। বলল, 'আসছি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

দু মিনিটের মধ্যে খাওয়া চুকিয়ে হেমার ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়াল পরমেশ্বর। কলিং বেল টিপতেই একটা নেপালী বেয়ারা মঙ্গোলিয়ান চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ব্যস্তভাবে বলল, 'আপ হালদার সাব ?'

পরমেশ্বর বলল, 'জী জনাব।'

'মেমসাব ব্যালকনিমে আপকী ইন্তেজার কর রহী হ্যায়।'

এ বাড়ির ফ্ল্যাটগুলোর নক্‌শা একই রকমের। ব্যালকনিটা কোন্ দিকে হতে পারে সে সম্বন্ধে ধারণা আছে পরমেশ্বরের। বেয়ারাটার পাশ দিয়ে সে সোজা ঢুকে পড়ল। তারপর ডাইনে-বাঁয়ে বেডরুম, বাথরুম, ড্রইংরুম, কিচেন, প্যাণ্ট্রি ইত্যাদি ফেলে সোজা ব্যালকনিতে চলে এল।

ব্যালকনিটা প্রকাণ্ড। ফোম বসানো অগুনতি ফ্যাশনেবল বেতের সোফা এলোমেলো ছড়িয়ে আছে এখানে। আর রয়েছে একটা দোলনা।

এই হাই-রাইজ বিল্ডিংটার দক্ষিণ দিকটা পুরোপুরি খোলা। বেশ কিছুটা দূরে বাংলো ধরনের কিছু ছোট ছোট বাড়ি চোখে পড়ে, কিন্তু সেগুলো এ বাড়ির উচ্চতাকে আড়াল করে দাঁড়াতে পারে নি। ফলে হু হু করে হাওয়া ছুটে আসছিল।

ব্যালকনিতে একটা কম পাওয়ারের নীলাভ বাল্ব জ্বলছিল। নরম স্নিগ্ধ আলোয় দেখা গেল সামনের দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে হেমা একটা সোফায় গা এলিয়ে রেখেছে। তার পরনে এই মুহূর্তে বিকিনি আর সরু ব্রা ছাড়া কিছু নেই। পরমেশ্বরকে দেখেও সে একই ভাবে বসে রইল। অলস গলায় বলল, 'বসুন—'

ঝপ করে কাছাকাছি একটা সোফায় বসে পড়ল পরমেশ্বর। মোটে তিন ফুট দূরে হেমার দুই খোলা উরু মাখনের স্তূপের মতো পড়ে আছে, এর দেড় দু' ফুট ওপরে বুকের জোড়া পাহাড়। হেমার শরীরের এই জিওগ্রাফিটার মধ্যে পরমেশ্বরের দুই চোখ অনবরত ছোটাছুটি করতে লাগল।

পরমেশ্বর কোন্ ফাঁদে আটকে গেছে, দেখেও দেখছিল না হেমা। সে বলল, 'আপনার বিজনেস কিরকম চলছে?'

পরমেশ্বর অন্যমনস্কর মতো বলল, 'ওই এক রকম। ফরেন থেকে মাল ইমপোর্ট করে ফ্যাক্টরিওলাদের ঝেড়ে দিচ্ছি। আপনার বিজনেস কেমন?'

'আমার ইমপোর্টের ব্যাপার নেই। সবটাই এক্সপোর্ট। অর্ডার পেলে গারমেণ্টস তৈরি করে জাহাজে তুলে দিই।'

'অর্ডার কিরকম পান?'

'প্রফিউজ! যত অর্ডার পাই তার ওয়ান-টেনথও সাপ্লাই করতে পারি না।'

'তা হলে কাণ্ট্রির ফরেন এক্সচেঞ্জ খুব বাড়াচ্ছেন!'

হেমা অল্প একটু হাসল।

পরমেশ্বর এবার জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ কোন্ কাণ্ট্রিতে গারমেণ্টস পাঠান?'

'আফ্রিকার ডিফারেণ্ট কাণ্ট্রি আর মিডল ইস্টের কুয়েত, ইজিপ্ট আর লেবাননে।'

ব্যবসা সম্পর্কে খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর হেমা হঠাৎ বলল, 'আজ বিকেলে আপনার অফিসে গিয়েছিলাম। দেখা হল না।'

'স্যরি। আমি একটা কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।'

একটু চুপ করে থেকে হেমা এবার বলল, 'কে যেন বলছিল, আপনি অমিতাভ সেনের 'ইটারনাল 'ইণ্ডাস্ট্রিজ'এ গেছেন।'

পরমেশ্বরের খটকা লাগল। সে কি কাউকে অমিতাভর সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছিল। এই মুহূর্তে মনে করা গেল না। একটু ভেবে সে বলল, 'কে বলেছে?'

'নাম বলতে পারব না। তবে আপনাদের অফিসেরই কেউ হয়ত। অমিতাভ সেন আপনার খুব ফ্রেণ্ড —না?'

একটু ভেবে পরমেশ্বর বলল, 'তা এক রকম বলতে পারেন।'

'শুনেছি মিস্টার সেন বিগ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট।'

'হ্যাঁ।'

'আপনার সঙ্গে ওঁর কতদিনের ফ্রেণ্ডশিপ?'

হেমা কী বলতে চায়, ঠিক মতো বুঝতে না পেরে পরমেশ্বর ভাসা-ভাসাভাবে বলল, 'বেশ কিছু দিন হবে।'

হেমা অমিতাভর ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন করল না।

আরো খানিকক্ষণ এলোমেলো গল্পের পর পরমেশ্বর বলল, আজ তা

হলে ওঠা যাক। যেরকম ড্রেস করে বসে আছেন, আর কিছুক্ষণ থাকলে ক্যারেক্টারের ডায়নামো বার্স্ট করে যাবে।'

হেমা ঠোঁট এবং ভুরু কুঁচকে একটু হাসল।

এবার কব্জি উলটে ঘড়ি দেখে পরমেশ্বর বলল, 'রাত পোয়াতে আর মোটে ঘণ্টা চারেক বাকি আছে। আপনার ক্যারেক্টারে যাতে কোন মাকড়া আলকাতরা না ছিটায় সেইজন্য আমার এখন আউট হয়ে যাওয়া দরকার।'

'আমার ক্যারেক্টারে আলকাতরা লাগানো অত ইজি না মিস্টার হালদার। ইচ্ছে হলে বাকি রাতটা আপনি এখানে থেকে যেতে পারেন। আই ডোণ্ট কেয়ার।'

'আপনি ডোণ্ট কেয়ার করতে পারেন কিন্তু আমার হার্ট ভীষণ উইক ম্যাডাম। দয়া করে আমাকে যাবার পারমিশান দিন।'

'থাকবেনই না যখন, তখন কী আর করা যাবে। ও-কে বাই—'

'বাই—'

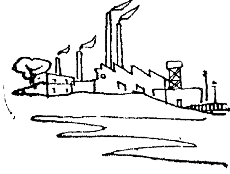
পরমেশ্বর সোফা থেকে উঠে পড়ল। ব্যালকনি থেকে বাইরের দরজার দিকে সে এগুতে যাবে, হেমা বলল, 'এবার থেকে যখন ইচ্ছে হবে, চলে আসবেন।'

পরমেশ্বর বলল, 'আপনিও মাঝে মাঝে কষ্ট করে তিনটে ফ্লোর নিচে নেমে আমার ওখানে যাবেন।'

নিশ্চয় যাব।

নিজের ফ্লাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল পরমেশ্বর কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুম এল না। হেমা সারিনের ভাবনাটা ঘুরে ফিরে বার বার তার মাথায় আসতে লাগল। প্রথম দিন ক্লাবে আলাপের পর থেকে আজ খানিকটা আগে পর্যন্ত যেটুকু দেখা গেছে তাতে কী মনে হয়? হেমা কি ভ্যাম্প টাইপের? কিন্তু তাই বা কী করে হবে? অত বড় একটা ইমপোর্ট এক্সপোর্টের বিজনেস যে চালায় তাকে একেবারে ভ্যাম্প ভাবা ঠিক নয়। হাই সোসাইটিতে ঐ রকম চালচলন পোশাক-টোশাক হয়ত চালু আছে।

আচমকা সেই খটকাটা ভাবনার কয়েক স্তর তলা থেকে বেরিয়ে এল। হেমা তখন বলছিল, তার অফিসের কেউ নাকি অমিতাভ সেনের কাছে যাওয়ার খবর দিয়েছে। তখন ভালো করে ভাবতে পারে নি কিন্তু এখন চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে পরমেশ্বরের পরিষ্কার মনে পড়ছে, অমিতাভ সেনের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সে যাবার কথা অফিসের কারো কাছে সে বলে নি। তবে কে খবর দিতে পারে? অফিসের কেউ কি তার ওপর নজর রাখছে? ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল পরমেশ্বর।



আরো সাতটা দিন কেটে গেল। এর মধ্যে তেমন কিছুই ঘটে নি। অফিস, ক্লাব, অমিতাভ আর হেমার সঙ্গে দেখা হওয়া আর দু-একবার সোমেশ্বরের সঙ্গে ফোনে কথা—এর মধ্যেই একটা সপ্তাহ শেষ হয়েছে।

আজ সকালে ফোনের আওয়াজে ঘুম ভাঙল পরমেশ্বরের। হাত বাড়িয়ে টেলিফোনটা তুলে এনে বিরক্তগলায় সে বলল, 'কাকে চাই?' এত তাড়াতাড়ি জাগিয়ে দেবার জন্যে চটে গেছে সে।

ওধার থেকে সোমেশ্বরের গলা ভেসে এল, "তোমাকেই চাই, ডার্লিং।'

'ও, আপনি। বলুন স্যার—!'

'আজ দশটার সময় একবার আমার অফিসে এসো।'

'কিছু দরকার আছে স্যার।'

'নিশ্চয়ই আছে। তখন কথা হবে।'

সোমেশ্বর লাইন ছেড়ে দিল। তার পরও ঘণ্টাখানেক বিছানায় ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে রইল পরমেশ্বর। সাড়ে-সাতটা নাগাদ চা নিয়ে এল ছোটি সিং। চায়ের সঙ্গে চলল ম্যাসাজ। আধঘণ্টা দলাই-মলাই এবং ডেইলি রুটিন অনুযায়ী চান-ফান সেরে ফেলল পরমেশ্বর। তারপর ব্রেকফাস্ট চুকিয়ে কাঁটায় কাঁটায় দশটায় সোমেশ্বরের অফিস-কাম-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সে চলে এল পরমেশ্বর।

সোমেশ্বর তার জন্যই আগে থেকে এসে বসে ছিলেন। তাঁর বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবলের ওপর একটা বিরাট নক্শা। তাছাড়া আরো অনেকগুলো টাইপ-করা কাগজ সাজানো রয়েছে। সোমেশ্বর বললেন, 'তোমার জিনিস রেডি। মাল ডেলিভারি নিয়ে যাও। তার আগে তোমাকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

পরমেশ্বর অবাক। সে বলল, 'এগুলো কী স্যার?'

সোমেশ্বর বললেন, 'তিরিশ একর ল্যাণ্ডের ওপর তোমার সেই ফ্যাক্টরির নক্শা আর তার ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেণ্টের বাজেট।'

সোমেশ্বর নক্শা ধরে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। ডিজাইনটা একটা কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির সামনের দিকের এলিভেসনের ছবি যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে কারখানার ভেতর দিকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ডিটেলের ছবি।

কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি বসাতে হলে গভর্নমেণ্টের নানা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলাপমেণ্ট ব্যাঙ্ক থেকে কিভাবে টাকা পাওয়া যাবে, পাবলিকের কাছে শেয়ার ছেড়ে কত টাকা তোলা যাবে—সব লেখা আছে। তাছাড়া 'র' মেটিরিয়াল কিভাবে পাওয়া যাবে, কারখানা পুরোদমে চালু হবার পর তার প্রোডাক্টের বাজার কিভাবে তৈরি করতে হবে—সব এখানে লেখা আছে। এ সব ছাড়া লেটার অফ ইনটেণ্ট থেকে শুরু করে লাইসেন্স পাওয়া পর্যন্ত দিল্লীতে কাকে কাকে গিয়ে ধরতে হবে তাদের নাম ঠিকানাও দিয়ে রেখেছেন সোমেশ্বর।

ইণ্ডাস্ট্রি-টিণ্ডাস্ট্রি সম্পর্কে পরমেশ্বরের একটুকু ধারণা নেই তবু সমস্ত ব্যাপারটা আধ ঘণ্টার ভেতর জলের মতো বুঝে গেল পরমেশ্বর।

সোমেশ্বর বললেন, 'ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে?'

পরমেশ্বর ঘাড় কাত করল, 'ইয়েস স্যার।'

'অমিতাভ সেনের জন্যে এরকম একটা প্ল্যানই তো চেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'সাত দিনের মধ্যে চেয়েছিলে। ঠিক সময়ের ভেতরেই রেডি করে দিয়েছি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার—এবার প্ল্যানটা নিয়ে আমি যেতে পারি?'

'অফ কোর্স।'

একটা বেয়ারাকে ডাকিয়ে প্ল্যান আর কাগজগুলো ঝকঝকে চমৎকার একটা এ্যাটাচি কেসের ভেতর পুরে দিলেন সোমেশ্বর। পরমেশ্বর কেসটা নিয়ে উঠে পড়ল।

সেমেশ্বর বললেন, 'বেস্ট অফ লাক।'

পরমেশ্বর বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

সোমেশ্বরের অফিস কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে গাড়িটা থামিয়ে দিল পরমেশ্বর। এখন তার কী করা উচিত? নিজের অফিসে চলে যাবে?

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মাথায় একটা প্ল্যান এসে গেল। ফ্যাক্টরির নক্শা যখন হাতে এসেই গেছে তখন আর দেরি করার মানে হয় না।

তা ছাড়া অমিতাভ সেনের 'ইটারনাল ইণ্ডাস্ট্রিজ' এখান থেকে আধ মাইলের ভেতর। এত কাছাকাছি এসে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। পরমেশ্বর ঠিক করে ফেলল, এখন স্ট্রেট সে 'ইটারনাল ইণ্ডাস্ট্রিজে' চলে যাবে। দশ-বারো দিন এই কনট্রাক্টটা নিয়েছে পরমেশ্বর। আর ঝুলে থাকা ঠিক না। নিশ্চয়ই জগদীশের শুঁড়িখানায় তার 'ইণ্টারন্যাশনাল সারভিস সেণ্টার'-এর হেড কোয়ার্টার থেকে রোজ দশ-বিশটা করে ক্লায়েণ্ট ফিরে যাচ্ছে। একটা কেস নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে কেমন করে?

পরমেশ্বর লিমুজিন স্টার্ট দিয়ে গাড়িটাকে 'ইটারনাল ইণ্ডাস্ট্রিজে'র দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল।

অমিতাভ সেনের ইণ্ডাস্ট্রাল কমপ্লেক্সে ঢুকে পার্কিং জোনে গাড়ি রেখে লিফটে করে সোজা ওপরে উঠে এল পরমেশ্বর। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেম্বারের বাইরে টুলের ওপর একটা বেয়ারা বসে ছিল। পরমেশ্বরকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল।

পরমেশ্বর বলল, 'সেন সাহাব হ্যায়?'

বেয়ারাটা বলল, 'জী সাব।'

পরমেশ্বর একটা স্লিপে নিজের নাম লিখে বেয়ারাটাকে দিতে দিতে বলল, 'সেন সাহাবকো পাস লে যাও।'

বেয়ারাটা ভেতরে ঢুকে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে বলল, 'আপ অন্দর যাইয়ে।'

দরজা ঠেলে ভেতরে যেতেই অমিতাভ বলল, 'আসুন আসুন—'

পরমেশ্বর বলল, 'আমি আসব, নিশ্চয়ই ভাবতে পারেন নি।'

'একেবারেই না। হোয়াট এ প্লেজাণ্ট সারপ্রাইজ। বসুন বসুন।'

পরমেশ্বর টেবলের উল্টোদিকে মুখোমুখি বসবার পর অমিতাভ বলল, 'এদিকে কোথাও এসেছিলেন বুঝি?'

পরমেশ্বর বলল, 'স্ট্রেট আপনার কাছেই এসেছি। কাজের সময় এসে হয়ত ডিসটার্ব করলাম।'

'একেবারেই না। ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম।'

একটু চুপ করে থেকে পরমেশ্বর এবার বলল, 'স্রেফ আড্ডা দেবার জন্যে আমি আসি নি; একটু দরকারেও এসেছিলাম মিস্টার সেন।'

অমিতাভ বলল, 'আড্ডা দেবার জন্যে এলেও খুশীই হতাম। আগে দরকারের কথাটা বলুন, তারপর গল্পটল্প করা যাবে। কী আনতে বলব—ঠাণ্ডা না গরম?'

'যা ইচ্ছে।'

অমিতাভ বেয়ারাকে ডেকে সফট্‌ ড্রিঙ্ক আনতে বলল।

ড্রিঙ্ক এলে স্ট্র দিয়ে খেতে খেতে পরমেশ্বর অ্যাটাচি কেস থেকে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির ব্লু-প্রিণ্ট, প্ল্যানিং-এর হিসাব ইত্যাদি বার করল। টেবলের ওপর সাজাতে সাজাতে বলল, 'এগুলো দেখুন।'

'কী ব্যাপার?'

'দেখুন না।'

'এ তো ফ্যাক্টরির ডিজাইন-টিজাইন মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ।'

'আপনি নতুন প্ল্যাণ্ট বসাচ্ছেন নাকি?'

পরমেশ্বর বলল, 'আমি বসাব না, এসব আপনার জন্যে।'

বিমূঢ়ের মতো অমিতাভ বলল, 'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

পরমেশ্বর এবার যা বলল, সংক্ষেপে এই রকম। অমিতাভর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সে যে তিরিশ একর ফাঁকা জমিটা রয়েছে এবং যে জমিটা নিয়ে অমিতাভ কী করবে ভেবে উঠতে পারছে না, সেখানকার জন্য কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির প্ল্যান করে এনেছে সে। কারখানাটা বসাতে হলে কী কী করতে হবে, সব এখানে লেখা আছে।

অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অমিতাভ। তারপর বলল, 'আপনি আমার জন্য এতো সব করে এনেছেন!'

পরমেশ্বর বলল, 'দেখুন, আমি ছোটখাটো ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের বিজনেস করি। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে, ইণ্ডাস্ট্রি-টিণ্ডাস্ট্রি করব। কিন্তু ল্যাণ্ড নেই, ক্যাপিটাল নেই, কিছু নেই। করব কোত্থেকে? আপনার জমিটার কথা ভাবতে ভাবতে সেদিন রাত্তিরে একটা প্ল্যান করে ফেললাম। আজ সকালে উঠে ভাবলাম, ব্লু-প্রিণ্টটা আপনাকে দিয়ে আসি, যদি আপনার কোন কাজে লাগে।'

ব্লু-প্রিণ্টগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে অমিতাভ বলল, 'আরে মশাই, আপনি একটা জিনিয়াস! যেভাবে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির প্ল্যান করেছেন, কোনদিন এত ডিটেলে আমি তা ভাবতে পারতাম না। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াল্ডে এলে পাঁচ বছরে আপনি পীকে চলে যেতে পারবেন।'

'কী যে বলেন সেন সাহেব!'

'কারেক্ট বলছি।'

একটু চুপ। তারপর অমিতাভ আবার বলল, 'আপনি আমার জন্যে

এত ভেবেছেন, কষ্ট করে ফ্যাক্টরির ব্লু-প্রিণ্ট করেছেন ; রিয়ালি কী বলে যে ধন্যবাদ দেব !'

পরমেশ্বর বলল, 'ধন্যবাদ-টন্যবাদের কথা বললে আমি খুব ঘাবড়ে যাই। আপনি আমার ফ্রেণ্ড। ভাবলাম, অতটা জায়গা তো পড়েই আছে— যদি কোনভাবে ইউটিলাইজ করা যায়। ভাবলাম প্ল্যান করে দিলে যদি আপনার কাজে লাগে।'

'নিশ্চয়ই লাগবে। কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিটা আমি করবই। আর এ ব্যাপারে আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে।

'কী ?'

'দেখছেনই তো আমি একা মানুষ। যে সাতটা ইউনিট আমার আছে, সেগুলো সামলাতেই প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার ইচ্ছা, দয়া করে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিটার ব্যাপারে আপনি আমার সঙ্গে থাকুন।'

পরমেশ্বর বুঝতে পারছিল, অমিতাভর আলটাকরায় বঁড়শি গেঁথে গেছে। অমিতাভ যা বলছে, সেটাই তো সে চায়। এর জন্যই তো তার এই ফাঁদ-পাতা। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি রাজী হওয়া ঠিক হবে না। তার আগে একটু খেলিয়ে-টেলিয়ে নেওয়া দরকার।

পরমেশ্বর বলল, 'দেখুন সেন সাহেব, আমি এর ভেতর থাকব, এসব ভেবে কিন্তু কিছু করি নি। জাস্ট ব্রেনে এসেছিল তাই। তা ছাড়া আমার ছোটখাটো একটা বিজনেসও আছে। সেসব করার পর সময় পাওয়াও মুশকিল।'

'বুঝেছি, নিজের ইণ্টারেস্টের কথা ভেবে এসব করেন নি। কিন্তু আপনাকে আমার খুব দরকার। প্লীজ জয়েন মী। আপনাকে সঙ্গে পেলে ফিউচারে অনেক বড় কিছু করা যাবে। রোজ খানিকটা সময় করে অন্ততঃ আপনাকে এখানে আসতেই হবে।'

পরমেশ্বর ভাবল, এখানে পার্মানেণ্টলি সে 'ইন' করতেই তো চায়। রোজ এখানে আসতে পারলে অমিতাভর প্ল্যাণ্টগুলোর বারোটা বাজতে আর কতক্ষণ! কিভাবে এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটগুলোকে সে মাটিতে মিশিয়ে দেবে তার প্ল্যান মোটামুটি ঠিকই করে ফেলেছে। একা তার পক্ষে সব-কিছু করা সম্ভব হবে না। একটা চান্স করে নিয়ে লোলেকেও সে এখানে ঢুকিয়ে দেবে। তারপর তার প্ল্যানমাফিক অপারেশন করে যাবে লোলে। কিন্তু সে-সব পরের কথা। নিজের খুব একটা গরজ নেই, নেহাত অমিতাভর রিকোয়েস্ট রাখতে হচ্ছে, এমন একটা ভঙ্গি করে পরমেশ্বর বলল, 'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন তখন আসব।'

অমিতাভ বলল, 'কাল থেকেই আসতে হবে কিন্তু।'

'আচ্ছা।'

'আপনার জন্যে একটা ভাল চেম্বারের অ্যারেঞ্জমেন্ট আজই করে রাখছি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

আরো দু ঘণ্টা বাদে নিজের ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের অফিসে এসে সোমেশ্বরকে ফোন করল পরমেশ্বর, 'স্যার, আপনার ফ্যাক্টরির ডিজাইনগুলো কামাল করে দিয়েছে।'

সোমেশ্বর বললেন, 'তাই নাকি!'

'ইয়েস স্যার। সাতদিনের ভেতর অমিতাভ মাকড়াকে ক্যায়সা ম্যাজিক দেখাই, সেটা শুধু মার্ক করে যান। ও-কে?'

'ও-কে। তাহলে সাতদিন বুকের ভেতর নিঃশ্বাস আটকে আমি ওয়েট করে থাকছি।'

পরমেশ্বর লাইন কেটে দিল।

দিন সাতেকের ভেতর অমিতাভর সঙ্গে দারুণ জমিয়ে ফেলল পরমেশ্বর। ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের অফিস ছুটি হয়ে গেলে একটা সেকেণ্ডও সে আর অপেক্ষা করে না; স্ট্রেট 'ইটারনাল ইণ্ডাস্ট্রিজের' অফিসে চলে আসে। আবার কোন কোন দিন ছুটির আগেই এসে পড়ে। যতক্ষণ একসঙ্গে থাকে, কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিটার প্ল্যানিং নিয়ে কথাবার্তা হয়। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে লেটার অফ ইনটেণ্ট পাবার জন্য সোমেশ্বরকে দিয়ে ড্রাফট্ করিয়ে একটা চিঠি এনে অমিতাভকে দেখিয়েছে পরমেশ্বর। সেই চিঠি অমিতাভ দিল্লীতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

শুধু নতুন কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি সম্পর্কেই না, অমিতাভর যে-সব কারখানা এখন রয়েছে, সে-সব ব্যাপারেও নানা কথাবার্তা হয়। কোন দিন প্রোডাকসান সম্বন্ধে ডিসকাসান, কোন দিন লেবার ট্রাবল সম্বন্ধে, কোন দিন মার্কেটিং এবং বিভিন্ন প্রোডাক্টের ডিস্ট্রিবিউসান সম্বন্ধে। কোন একটা বিষয়ে খটকা-টটকা লাগলে পরমেশ্বর করে কি, একদিনের সময় চেয়ে নেয়। তারপর সোমেশ্বরের কাছে জেনে নিয়ে পরের দিন এসে বুঝিয়ে দেয়।

পরমেশ্বরকে যত দেখছিল ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল অমিতাভ। পরমেশ্বরকে ছাড়া এখন তার একটা দিনও চলে না। অফিস বা ফ্যাক্টরির কোন ব্যাপারে ডিসিসান নেবার আগে পরমেশ্বরের মতামত সে জেনে নেয়। পরমেশ্বরের কাছে না থাকলে তার অফিস বা ফ্যাক্টরীতে ফোন করে। মোটকথা পরমেশ্বর তার ফ্রেণ্ড ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোন কোন দিন কোম্পানির নানা পলিসি নিয়ে ডিসকাসান করতে করতে অনেক রাত হয়ে যায়। সেদিন আর ক্লাব-ট্যাবে যাওয়া হয় না। ইটারনাল ইণ্ডাস্ট্রিজ থেকে স্ট্রেট সে নিজের অ্যাপার্টমেণ্টে চলে আসে।

এর মধ্যে হেমার সঙ্গে বার দুয়েক দেখা হয়েছে পরমেশ্বরের, আর তিনবার ফোনে কথা হয়েছে। এলোমেলো মামুলি টাইপের কথাবার্তা। আজকাল পরমেশ্বরকে বিশেষ দেখা যায় না কেন, সন্ধ্যেবেলা ক্লাবে না গিয়ে কোথায় যায়, খুব বিজি নাকি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাত দিন পর 'ইটারনাল ইণ্ডাস্ট্রিজে' এসে নিজের চেম্বারে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ ইণ্টারনাল কমুনিকেসনে তাকে ধরল। বলল, 'খবর পেলাম, আপনি এইমাত্র এসেছেন। কাইণ্ডলি যদি একবার আমার ঘরে আসেন—'

অমিতাভ আর পরমেশ্বরের চেম্বার একই ফ্লোরে। মাঝখানে চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট ডিসট্যান্স। পরমেশ্বর বলল, 'এক্ষুনি আসছি।'

কয়েক মিনিট পর অমিতাভর চেম্বারে এসে পরমেশ্বর দেখল, সতীনাথ সান্যাল বসে আছেন। মিডল-এজেড সতীনাথের গায়ে বেশ ফ্যাট জমেছে। ব্যাকব্রাশ-করা কাঁচা-পাকা চুল তাঁর, মোটা নাক, জোড়া ভুরু, পুরু ঠোঁট, শাণিতচোখে বাইফোকাল লেন্স। পরনে দামী ট্রাউজার্স এবং বুশ শার্ট। দেখামাত্র টের পাওয়া যায় মালটি বেশ 'হার্ড নাট।'

সতীনাথ 'ইটারনাল ইণ্ডাস্ট্রিজের' সবগুলো কোম্পানির সেক্রেটারি। আগেই তাঁর সঙ্গে পরমেশ্বরের আলাপ-টালাপ হয়ে গেছে এবং তাঁর মতো একটি খলিফাকে সে কাতও করে ফেলেছে। শুধু সতীনাথের সঙ্গেই না, 'ইটারনাল ইণ্ডাস্ট্রিজের' সব ভি. আই. পি.'র সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে এই সাত দিনে। সতীনাথের মতো তাদের সবাইকে কব্জাও করে নিয়েছে।

পরমেশ্বর বসতেই অমিতাভ বলল, 'একটা ব্যাপারে আপনাকে দায়িত্ব নিতে হবে।'

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'গ্ল্যাডলি। কী ব্যাপার বলুন তো?'

সতীনাথকে দেখিয়ে অমিতাভ বলল, 'মিস্টার সান্যাল বলছিলেন, আমাদের ইলেকট্রনিক ইউনিটে কিছু ক্লাস ফোর স্টাফ নেওয়া হবে। নিউজপেপারে অ্যাডভার্টাইজমেণ্টও করা হয়ে গেছে। এই মাসের সেভেন্থ পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশন নেওয়া হবে। তারপর ইণ্টারভিউ। ইণ্টারভিউ নিয়ে আপনি অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেবেন।'

বিদ্যুৎ চমকের মতো লোলের মুখটা মনে পড়ে গেল পরমেশ্বরের। অমিতাভর ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজে ওকে ঢুকিয়ে দেবার এই হল চান্স। এত

তাড়াতাড়ি যে চান্সটা এসে যাবে, ভাবতে পারা যায় নি। সুযোগটা কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। পরমেশ্বর কোন রকম তাড়াহুড়ো করল না, এমন কি বিশেষ আগ্রহও দেখাল না। আস্তে আস্তে বলল, 'এই ক্লাস ফোর স্টাফেদের কী কাজ করতে হবে?'

'যে সব প্রোডাক্ট তৈরী হয়ে যাবে সেগুলো সাজিয়ে গাড়িতে তুলে দিতে হবে। তা ছাড়া প্ল্যাণ্টের সুপারভাইজাররা যা বলবে তা করতে হবে।'

'এদের কোয়ালিফিকেশন কতটা দরকার?'

সতীনাথ তাঁর ব্রিফকেস থেকে একটা খবরের কাগজের কাট্রিং বার করে পরমেশ্বরের হাতে দিল। ওটায় ক্লাস ফোর স্টাফের জন্য বিজ্ঞাপনটা ছাপা রয়েছে।

পরমেশ্বর দ্রুত একবার অ্যাডভার্টাইজমেণ্টটা দেখে নিল। মিনিমাম ক্লাস নাইন পর্যন্ত এডুকেশন আর পঁচিশ বছরের ভেতর বয়স হওয়া চাই। যে স্কুলে সে পড়েছে সেখানকার সার্টিফিকেট এবং একজন এম-এল-এ বা ফার্স্ট ক্লাস গেজেটেড অফিসারের ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটও দরকার।

পরমেশ্বর ভাবল, এগুলো কোন প্রবলেমই না। দু-এক দিনের মধ্যে লোলের জন্য স্কুল আর গেজেটেড অফিসারের দুটো জাল সার্টিফিকেট সে বানিয়ে ফেলবে। তা ছাড়া আজ রাত্তিরেই জগদীশের শুঁড়িখানায় গিয়ে লোলেকে ধরতে হবে। একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখে দিয়ে সই করিয়ে ডাকে ফেলে দিতে হবে।

পেপার কাটিংটা থেকে মুখ তুলে পরমেশ্বর বলল, 'ঠিক আছে। ক্লাস ফোর স্টাফের রেসপন্সিবিলিটিটা আমি নিলাম।'

অমিতাভ বলল, 'মেনি মেনি থ্যাঙ্কস্।'

সতীনাথও ধন্যবাদ জানালেন। তারপর অল্প দু-একটা কথা বলে চলে গেলেন।

পরমেশ্বর সোজাসুজি অমিতাভর দিকে তাকিয়ে এবার জিজ্ঞেস করল, 'কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির জন্য দিল্লীতে যে চিঠি পাঠানো হয়েছিল তার রিপ্লাই এসেছে?'

অমিতাভ বলল, 'ওরা অ্যাপ্লিকেশন পাওয়ার খবরটা জানিয়েছে।' বলতে বলতেই কব্জি উলটে ঘড়ি দেখে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'ইস, সাড়ে-ছ'টা বেজে গেল। এক্ষুনি আমাকে একটু বেরুতে হচ্ছে।'

'আর্জেণ্ট কোনো ব্যাপার আছে নাকি?'

চোখ কুঁচকে অল্প একটু হাসল অমিতাভ! তারপর গলার স্বরটা ঝপ করে নামিয়ে বলল, 'তা বলতে পারেন।'

পরমেশ্বর বলল, 'আপনি তো আর্জেণ্ট কাজে যাচ্ছেন। আমিও কেটে পড়ি। ক্লাবে গিয়ে সেই ছুঁড়িটার সাঁতার-ফাতার দেখি।'

'নো স্যার।'

'কী হল? নেকেড মুর্গীদের সুইমিং-ফুইমিং দেখে ক্যারেক্টার খারাপ করব, সেটা হতে দেবেন না নাকি?'

'আপনি আমার সঙ্গে এখন যাবেন।'

'কোথায়?'

'চলুন না। দারুণ একটা সারপ্রাইজ দেব।'

ওরা বেরিয়ে পড়ল।



সিটির 'পশ' লোকালিটিতে একটি বড় শো হাউসের ভেতর এসে দু'জনে গাড়ি পার্ক করল। তারপর বাইরে বেরিয়ে চাবি লাগাতে লাগাতে ঝট করে চারদিক একবার দেখে নিল পরমেশ্বর।

হলটার সামনের দিকে লাল শালুতে লেখা আছে। 'অল ইণ্ডিয়া মিউজিক্যাল কনফারেন্স।' এধারে ওধারে প্রচুর লোকজন, পার্কিং জোনে গাদা গাদা গাড়ি।

পরমেশ্বর আগেই জানত, এই হলটা ভাড়া দিয়ে প্রায়ই জলসা-টলসা বসানো হয়। ইণ্ডিয়ার নানা জায়গা থেকে নামকরা সব ওস্তাদ-টোস্তাদ আর আর্টিস্টরা আসে। হোল সিটি, মানে এই মেট্রোপলিসের যে সব মাকড়ার পকেটে ব্ল্যাক মানি আছে তারা এখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যে শালাদের ঘরে কালো টাকা-ফাকা আছে তারা সে সব ওড়াবার জন্য সব সময় চান্স খুঁজছে। হাতের সামনে যা পাওয়া যায় তাতেই ওরা টাকা ওড়ায়। এত সারপ্লাস মানি থাকলে যা হয়।

পরমেশ্বর বলল, 'এখানে কী?'

অমিতাভ বলল, 'আমার দুটো টিকিট কাটা আছে। তাই আপনাকে ধরে নিয়ে এলাম।'

'আপনার কি মনে হয় আমি গান-বাজনার একজন টেরিফক সমঝদার!'

অমিতাভ হাসল, গেটের দিকে যেতে বলল, 'শুধু গান-টান শোনাবার জন্যে তো আপনাকে এখানে আনি নি।'

পরমেশ্বর পাশাপাশি হাঁটছিল। বলল, 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ কী একটা সারপ্রাইজ যেন দেবেন বলেছিলেন।'

'সেটাই আসল ব্যাপার। আগে ভেতরে চলুন।'

হলের ভেতর ঢুকে একেবারে ফ্রণ্ট রোতে এসে বসল দুজনে।

একটু পরেই ফাংশন শুরু হয়ে গেল। প্রথমে সাউথ ইণ্ডিয়ান একটা মেয়ে মুখে নানা রকম বোল-ফোল ফুটিয়ে গোটা ডায়াসে ঝড় তুলে কথক না ভরতনাট্যম্ কী সব নেচে-ফেচে গেল। তারপর চওড়া জুলপিওলা, গুরু-পাঞ্জাবি আর চুস্তপরা একটা লোক মাইকে যা অ্যানাউন্স করে গেল, তা এই রকম। এবার নতুন এবং অত্যন্ত প্রমিসিং আর্টিস্ট সুনেত্রা চ্যাটার্জি ক্ল্যাসিকাল গান গেয়ে শোনাবেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে সুনেত্রা চ্যাটার্জি তানপুরা নিয়ে ডায়াসে চলে এল। তার সঙ্গে সঙ্গত করার জন্য তবলচী-ফবলচী। তবলচীটা হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে বাঁয়া আর তবলার টিউনিং ঠিক করে নিল। আর তানপুরার কান মুচড়ে তারগুলোকে সুরে বেঁধে কিছুক্ষণ টুং টাং ঘ্যাঁও ঘোঁও করে বাজাল।

দারুণ দেখতে সুনেত্রাকে। গায়ের রং আশ্বিনের রোদের মতো। বাঙালি মেয়েদের তুলনায় তার হাইট বেশ ভালই। পাঁচ ফুট সাত-আটের মতো হবে। ঘন পালকে ঘেরা লম্বাটে চোখ, সোনার ফুলদানির মতো গলা, সরু কোমর, ঘন কোঁচকানো চুল, মুখটা পানপাতার কথা মনে করিয়ে দ্যায়। নাকটা সটান কপাল থেকে নেমে এসেছে। মোমে মাজা মসৃণ ত্বক। পরনে মুগার কাজকরা কাগজের মতো ধবধবে তাঁতের শাড়ি আর মুগার ব্লাউজ। হাতে সোনার একটি করে রুলি, কানে হীরের কানফুল। গলায় সরু হার, সেটার লকেটটা মাছের আকারের। সব মিলিয়ে দুর্দান্তব্যাপার।

তবলা আর তানপুরার টিউনিং হয়ে যাবার পর খানিকক্ষণ আলাপ-ফালাপ করে গান শুরু করল সুনেত্রা।

ক্ল্যাসিকাল গান-ফান বোঝে না পরমেশ্বর। হিন্দী ফিল্মী গান ছাড়া আর কিছুই তার ভালো লাগে না। কিন্তু সুনেত্রার গলায় এমন ম্যাজিক রয়েছে যাতে কয়েক মিনিটের মধ্যে ক্ল্যাসিকাল গানও তার দারুণ ভাল লেগে গেল।

আচমকা পাশ থেকে অমিতাভ বলল, 'গান কি রকম লাগছে?'

পরমেশ্বর বলল, 'আমি ক্ল্যাসিক-ফ্লাসিক বুঝি না। কিন্তু মেয়েটার গলা টেরিফিক।'

'মেয়েটাকে মার্ক করে যান।'

অমিতাভর গলায় এমন কিছু ছিল যাতে ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল পরমেশ্বর। দেখল মাকড়ার চোখে যেন টুনি লাইট জ্বলছে। সে বলল, 'মিস্টার সেন, ও-ই বুঝি আপনার সারপ্রাইজ!' বলে সুনেত্রাকে দেখিয়ে দিল।

অমিতাভ চমকে ঘাড় ফেরাল। তার পরেই হেসে ফেলল, 'ধরা পড়ে গেছি তা হলে?'

'ইয়েস, ক্যাচ কট কট—'

একটু হেসে আবার ডায়াসের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল অমিতাভ। পরমেশ্বর বুঝতে পারছিল, মাকড়াটার অন্য কোনদিকে তাকাবার সময় নেই এখন।

সুনেত্রার গান হয়ে যাবার পর চারদিক থেকে ক্ল্যাপ-ট্র্যাপের আওয়াজ হতে লাগল। কনগ্রাচুলেশনের উত্তরে ঘাড় ঝাঁকিয়ে দারুণ একটু হেসে আস্তে আস্তে তানপুরা নিয়ে উইংসের পাশ দিয়ে হার ম্যাজেস্টির মতো স্টাইলে ব্যাক স্টেজে চলে গেল সুনেত্রা। ছুঁড়ি আর্টিস্টদের সব স্টাইল-ফাইল শিখে নিয়েছে।

এদিকে সেই গুরু পাঞ্জাবি আর চুস্তওয়ালাটা আবার মাইকের সামনে এসে নেক্সট্ আইটেম জানিয়ে দিচ্ছিল। তার বলা শেষ হবার আগেই অমিতাভ উঠে পড়ল। বলল, 'চলুন।'

পরমেশ্বর উঠতে উঠতে বলল, 'এবার কোথায়?'

'বাঃ, সুনেত্রার সঙ্গে আলাপ করবেন না?'

পরমেশ্বর বলল, 'কাবাবের ভেতর হাড্ডি হয়ে থেকে কোন প্রফিট নেই। আমি আউট হয়ে যাচ্ছি।'

অমিতাভ তার একটা হাত ধরে টানল। 'ইউ আর ওয়ান অফ মাই বেস্ট ফ্রেণ্ডস। আসুন তো—'

একটু পর দুজনে ব্যাক স্টেজের কাছাকাছি আসতেই দেখতে পেল, সুনেত্রা দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছিল সে অমিতাভর জন্যই ওয়েট করছে।

অমিতাভ মুখ খোলার আগেই সুনেত্রা পরমেশ্বরের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই মিস্টার হালদার।'

পরমেশ্বর কিছুটা হকচকিয়ে গেল, 'আপনি আমাকে—'

তার শেষ কথা হতে না হতেই সুনেত্রা বলে উঠল, 'প্রথমে আমার একটা কথার উত্তর দিন তো।'

'বলুন।'

'অমিতাভর সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ?'

'ধরুন, এক ফোর্ট নাইট।'

'এই এক ফোর্টনাইট ধরে যখনই ওর সঙ্গে আমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে

তখনই শুধু আপনার কথা। মিস্টার হালদার আমি আপনার ওপর রিয়েলি জেলাস্ হয়ে পড়েছি।'

পরমেশ্বর হাসতে লাগল।

সুনেত্রা ফের বলল, 'যদিও ও আপনার নাম বলেছে তবু আমার ডাউট হচ্ছিল সত্যি সত্যিই আপনি পুরুষ কি না।'

পরমেশ্বর বলল, 'গার্ল ফ্রেণ্ড ভেবেছিলেন?'

'এক্‌জাক্টলি!'

অমিতাভ এতক্ষণ কথা বলার চান্স পাচ্ছিল না। এবার গলা বাড়িয়ে বলল, 'এইজন্যেই আপনাকে ধরে নিয়ে এসেছি।'

পরমেশ্বর বললে, 'তা হলে আগে থেকেই—'

অমিতাভ বলল, 'অ্যারেঞ্জমেণ্ট করে রেখেছিলাম। আপনাকে ধরে এনে সুনেত্রার কাছে ইনট্রোডিউস করে দেব। নিজের চোখে দেখলে ও বুঝতে পারবে, আপনি আমার গার্ল ফ্রেণ্ড না, একেবারে—'

অমিতাভর কথা শেষ হবার আগেই পরমেশ্বর বলে উঠল, 'আগমার্কা বয়ফ্রেণ্ড।'

পরমেশ্বর এবার বলল, 'আমাকে নিয়েই শুধু ডায়লগ হচ্ছে। মিস্ চ্যাটার্জি, একটু আগে আপনার গান শুনলাম। টেরিফিক!'

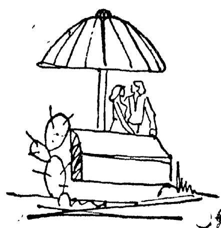
সুনেত্রা লাজুক মুখ করে হাসল, 'ধন্যবাদ!' একটু থেমে বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ আর পা ব্যথা করব? চলুন, আমাদের বাড়ি যাওয়া যাক। ভাল করে গান করা যাবে।'

পরমেশ্বর অমিতাভর দিকে তাকাল। অমিতাভ বলল, 'আজই যেতে বলছ?'

'সিওর। আসুন, আসুন। নতুন আলাপ হল, ভাল করে আড্ডাটা দিতে না পারলে আমার খুব খারাপ লাগবে। তা ছাড়া বাবা তোমাকে আজ বিশেষভাবে যেতে বলেছেন।'

'তা হলে আর কী। চল।'

তিনজন পার্কিং জোনের দিকে এগিয়ে গেল।



দুটো লিমুজিন পর পর এগিয়ে যাচ্ছিল। সামনের গাড়িটা অমিতাভর, পেছনেরটা পরমেশ্বরের। পরমেশ্বর সুনেত্রাদের বাড়িটা চেনে না। অমিতাভর গাড়িটা পাইলট কারের মতো তাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

ড্রাইভ করতে করতে সামনের গাড়িটার ব্যাক উইণ্ডো দিয়ে পরমেশ্বর দেখতে পেল, অমিতাভ আর সুনেত্রা ফ্রন্ট সীটে বসে আছে। অমিতাভ ওদের গাড়িটা চালাচ্ছিল।

অমিতাভ অবশ্য ভদ্রতা করে সুনেত্রাকে পরমেশ্বরের গাড়িতে যেতে বলেছিল। পরমেশ্বর রাজী হয় নি। একরকম জোরজার করে অমিতাভর গাড়িতে তাকে তুলে দিয়েছে। কোন ব্যাপারেই সে নিজেকে জড়াতে চায় না। এই যে অমিতাভরা সুনেত্রাদের বাড়িতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাতেও তার খুব একটা গরজ নেই। বেশি লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা মানে বাড়তি ঝঞ্ঝাট, এক্সট্রা লাফরা। তার যা প্রফেসান তাতে বেশি লোকজন তাকে চিনে রাখুক, এটা পরমেশ্বর চায় না। তার ফিউচারের পক্ষে ব্যাপারটা খুবই ডেঞ্জারাস।

সুনেত্রার আর অমিতাভর রিলেশনটা ওদের একসঙ্গে দেখামাত্র টের পেয়ে গেছে পরমেশ্বর। মাকড়া দুটো চুটিয়ে প্রেম-ফ্রেম যা খুশি করুক গে। পরমেশ্বরের এই ক্যাঁচাকলে নাক ঢোকানো ঠিক হবে না। সে এখানে এসেছে সোমেশ্বরের কনট্রাকট নিয়ে। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, অমিতাভর বারোটা বাজিয়ে সে এখান থেকে সরে পড়বে। অমিতাভর লাভারের বাড়ি যাওয়া ঠিক হচ্ছে কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। যাই হোক, সে ঠিক করে ফেলল, ওদের বিশেষ করে সুনেত্রার সঙ্গে খুব একটা ঘেঁষাঘেঁষি সে করবে না। যে শালার বারোটা বাজাতে এসেছে তার গার্লফ্রেণ্ডের সঙ্গে বন্ধুত্ব-টন্ধুত্ব করে ফায়দাটাই বা কী?

একসময় সাউথ ক্যালকাটার একটা নিরিবিলি পাড়ায় ছিমছাম বাংলো টাইপের দোতলা একটা বাড়ির কমপাউণ্ডে পর পর দুটো লিমুজিন এসে পার্ক করল।

বাড়ির সামনের দিকে দারুণ একখানা বাগান, নানা ধরনের মরসুমী ফুল-টুল আছে। মাঝখান দিয়ে বাদামী নুড়ির রাস্তা। এখন এই রাত্রিবেলা বাগানটাকে আলো করে বেশি পাওয়ারের একটা ফ্লুরোসেণ্ট আলো জ্বলছে। আলোটা এত জোরালো যে বাগান থেকে একটা পিন পর্যন্ত কুড়িয়ে নেওয়া যায়।

অমিতাভ আর সুনেত্রা আগের গাড়িটা থেকে নেমে পড়েছিল। ওদের দেখাদেখি পরমেশ্বরও নামল।

অমিতাভরা তার দিকে এগিয়ে এসেছিল। সুনেত্রা সমাদরের ভঙ্গিতে পরমেশ্বরকে বলল, 'আসুন আসুন—'

একটু পর তিনজন সাজানো-গোছানো বিরাট একটা ড্রইং রুমে এসে ঢুকল। সুনেত্রা ওদের বসতে বলে গলা তুলে ডাকতে লাগল, 'বাবা, বাবা—'

'কে রে, সুনি নাকি?' দোতলার দিক থেকে একটা গম্ভীর ভারী গলা ভেসে এল।

'হ্যাঁ, বাবা।'

'অমিতাভ এসেছে?'

'এসেছে। আরো একজনকে ধরে এনেছি।'

'কে?'

'তুমি নিচে এসো না—'

ড্রইং রুমের মাঝখান দিয়ে দোতলায় যাবার ফ্যাশনেবল রেলিং বসানো কায়দা-করা সিঁড়ি। দু মিনিটের মধ্যে দেখা গেল পাজামা-পাঞ্জাবি পরা মিডল-এজেড এক ভদ্রলোক সিঁড়ি দিয়ে ড্রইং রুমে এলেন। এ্যাভারেজ বাঙালীদের তুলনায় তাঁর হাইট বেশ ভালই। পাঁচ ফুট দশ এগারো ইঞ্চির মতো হবে। লম্বাটে মুখ, গায়ের রং না-ফর্সা না-কালো। বাজে ফ্যাট এক গ্রামও নেই শরীরে। হাতের হাড় বেশ মজবুত এবং চওড়া। আঙুলের ফাঁকে মোটা সিগার। সব মিলিয়ে তার মধ্যে দারুণ এক পার্সোনালিটি রয়েছে।

ভদ্রলোক যে সুনেত্রার বাবা, সেটা বোঝা গেছে। তিনি আসামাত্র অমিতাভ উঠে দাঁড়াল। দেখাদেখি পরমেশ্বরও। ওদের বসতে বলে ভদ্রলোক মুখোমুখি বসলেন।

সুনেত্রা প্রথমেই পরমেশ্বরের সঙ্গে তার বাবার আলাপ করিয়ে দিল, *'ইনি রণজয় হালদার, বিজনেসম্যান, অমিতাভর বন্ধু,'*—ইত্যাদি ইত্যাদি। *পরমেশ্বরকে বলল, 'উনি আমার বাবা, মণিমোহন চ্যাটার্জি, রিটায়ার্ড পুলিস* অফিসার—'

পুলিস অফিসার কথাটা বুলেটের মতো কানের ভেতর ঢুকে গেল পরমেশ্বরের। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল সে এবং শরীরের সবগুলো নার্ভ টান টান করে রাখল। পুলিসের চোখ অত্যন্ত ডেঞ্জারাস। সেখানে ধুলো ছিটানো খুব সোজা ব্যাপার না। পরমেশ্বর মনে মনে ঠিক করে ফেলল, এখন কিছু বলবে না বা করবে না যাতে সে ফেঁসে যায়। যতক্ষণ এখানে থাকবে চোখ-কান খুলে রাখবে। কে জানত, অমিতাভ মাকড়া পুলিস অফিসারের মেয়েকে ফাঁসিয়ে বসে আছে। আগে টের পেলে সে কিছুতেই এই গর্তে এসে ঠ্যাং ঢোকাত না। একটা-না-একটা বাহানা তুলে শো হাউস থেকেই সটকে পড়ত। কিন্তু এসেই যখন পড়েছে তখন যতটা সাবধানে থাকা যায়!

মণিমোহন দুই ঠোঁটের ফাঁকে চুরুটটা চেপে ধরে চুষতে চুষতে বললেন, 'কিসের বিজনেস তোমার?'

পরমেশ্বর ইমপোর্ট এক্সপোর্টের কথা বলল।

মণিমোহন বললেন 'গুড। এ বিজনেসের মার নেই। তোমার অফিস কোথায়?'

পুলিসের এই এক কারবার, একবার চোখাচুখি হলেই হাজার রকমের ক্রশ একজামিনেসন। পরমেশ্বর আস্তে করে তার অফিসের ঠিকানা বলল।

মণিমোহন এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'থাকো কোথায়?'

সে যে একটা পাক্কা ফেরেববাজ এবং ক্রিমিনাল তা কি দেখামাত্রই ধরে ফেলেছেন মণিমোহন? লোকটার চোখ কি এক্স-রে মেশিনের মতো? পরমেশ্বরের ভেতরকার সব কিছু ফোটোগ্রাফের মতো দেখতে পাচ্ছে? খুব সতর্ক ভঙ্গিতে অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের ঠিকানা দিল পরমেশ্বর। যেখানে সে এসে পেঁচেছে ঠিকানাটা না দিয়ে উপায় নেই। কেননা আগেই তার সার্কুলার রোডের অ্যাপার্টমেন্টের কথা অমিতাভর কাছে বলে ফেলেছে পরমেশ্বর। এখন আরেক রকম ঠিকানা দিলে অমিতাভই তার গলা টিপে ধরবে।

মণিমোহন বললেন, 'ম্যারেড?'

'না।'

'কে কে আছে বাড়িতে?'

'এখানে আমি একাই থাকি। দেশে মা-বাবা আর দুই বোন থাকে।' যা মুখে এল দুমদাম বলে ফেলল পরমেশ্বর।

মণিমোহন জিজ্ঞেস করলেন, 'দেশ কোথায় ?'

মুখের চামড়া এতটুকু না কুঁচকে পরমেশ্বর বলল, 'আসানসোলে।'

মণিমোহন আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। সোজা সুনেত্রার দিকে ফিরে বললেন, 'আজ তোর ফাংসান কেমন হল ?'

সুনেত্রা কিছু বলার আগে অমিতাভ দারুণ উচ্ছ্বাসের গলায় বলল, 'একসেলেণ্ট! হোল অডিয়েন্সকে আজ স্পেল-বাউণ্ড করে দিয়েছে সুনেত্রা। তাই না, মিস্টার হালদার ?'

পরমেশ্বর তিন মিটার ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'ডেফিনিটলি। গোটা হলে শুধু ক্ল্যাপ আর ক্ল্যাপ, কনগ্র্যাচুলেসন আর কনগ্র্যাচুলেসন—'

মণিমোহন মেয়ের গানের তারিফের কথা শুনে ভীষণ খুশী হলেন। টোকা দিয়ে দিয়ে অ্যাশ-ট্রে'তে চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'ইজ ইট ? ইজ ইট ?'

অমিতাভ বলল, 'আজ মিউজিক কনফারেন্সে না গিয়ে আপনি খুব মিস করেছেন।'

'সুনি অনেকবার যেতে বলেছিল কিন্তু প্রেসারটা বিকেলে এত বেড়ে গেল যে মাথা তুলতে পারছিলাম না। এতক্ষণ তো শুয়েই ছিলাম।'

'এখন কেমন ফীল করছেন ?'

'মাচ বেটার।'

একটু চুপ। এর মধ্যে সুনেত্রা বাড়ির কাজের লোককে দিয়ে প্রচুর খাবার-দাবার আর চা আনিয়ে সবাইকে দিয়েছে।

অমিতাভ একসময় বলল, 'সুনেত্রা বলছিল আপনি আমাকে আজ আসতে বলেছেন।'

বিনা চিনির চা খেতে খেতে মণিমোহন আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ।'

'দরকার আছে ?'

'হ্যাঁ।'

অমিতাভ চোখের তারা ফিক্সড করে মণিমোহনের দিকে তাকিয়ে রইল।

মণিমোহন বলতে লাগলেন, তুমি যা ডাউট করেছিলে মনে হচ্ছে তাই। আমি তো এখন আর সারভিসে নেই। তবে প্রাইভেটলি যেটুকু ইনভেস্টিগেট করেছি তাতে মনে হচ্ছে তোমার বাবার ডেথটা ন্যাচারাল নয়।'

খুব জোর শ্বাস টেনে অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কি তা হলে মার্ডার ?'

'আমার তা-ই সন্দেহ। এখন পর্যন্ত যে এভিডেন্স আর পেপার-টেপার পেয়েছি তাতে মনে হয় মার্ডারটা প্রুভ করতে পারব। বাইরে থেকে ইনভেস্টিগেট করতে অসুবিধে হচ্ছে। আরো কিছুদিন আগে তোমার সঙ্গে যদি আলাপটা হত! হল কিনা রিটায়ারমেন্টের সময়। যাক গে—'

'আপনার কি মনে হয় ঐ লোকটাই মার্ডারার?'

'আনডাউটেডলি। নিজের হাতে না মেরে অন্য কাউকে দিয়ে খুন করালে তাকে মার্ডারারই বলা হয়।'

অমিতাভর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল, চোখের তারা দুটো হল্কার মতো জ্বলছে, সারা গায়ের পেশীগুলো পাথরের মতো হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত চেপে তীব্র চাপা গলায় সে বলল, 'বাবার খুনীকে আমি ছাড়ব না। মার্ডারারকে যেভাবে হোক ফাঁসির দড়িতে ঝোলাবার ব্যবস্থা করুন।'

'আই অ্যাম ট্রাইয়িং মাই বয়। আমার দিক থেকে এতটুকু ত্রুটি হবে না। তবে অনেক দিন আগের ব্যাপার তো। তোমার বাবা খুন হয়েছেন ষোল-সতের বছর আগে। এর মধ্যে অনেক এভিডেন্স নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া মার্ডারার লোকটা খুবই ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। ওয়েলনোন, হাইলি প্লেসড পার্সন, তাকে ধরতে হলে সব দিক বেঁধে নিতে হবে। দেখতে হবে কোথাও কোনরকম ফ্ল না থেকে যায়।'

'যা করার তাড়াতাড়ি করুন। টাকা পয়সার জন্য চিন্তা করবেন না। যত টাকা লাগে, আই ডোণ্ট মাইণ্ড। লোকটার গলায় ফাঁসির দড়ি না লাগাতে পারলে বাবার কাছে সারা জীবন অপরাধী হয়ে থাকব।'

'টাকার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমার সঙ্গে আমার যে রিলেশন হতে যাচ্ছে তাতে টাকার প্রশ্নই ওঠে না।' বোঝা গেল, মণিমোহন সুনেত্রার সঙ্গে অমিতাভর বিয়ের ইঙ্গিত দিলেন।

অমিতাভ বলল, 'অন্য ব্যাপার হলে কিছু বলতাম না। কিন্তু বাবার কেসে সব খরচ আমার। এখানে আমার সেন্টিমেণ্টটা কী, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।'

মণিমোহন একটু চুপ করে থেকে সামান্য হাসলেন, 'ঠিক আছে।'

এ ব্যাপারটা এখানেই থেমে গেল। অমিতাভ, মণিমোহন বা সুনেত্রা কেউ লক্ষ্য করে নি, এই ড্রইং রুমের চতুর্থ মানুষটি অর্থাৎ পরমেশ্বর চুপচাপ এতক্ষণ সব শুনে যাচ্ছিল। দারুণ এক কৌতূহল তার শ্বাস যেন আটকে দিচ্ছিল।

আরো কিছুক্ষণ এলোমেলো কথা বলে অমিতাভ উঠে পড়ল, 'আজ তা হলে চলি।

মণিমোহন বললেন, 'এখনই যাবে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

একটু চিন্তা করে মণিমোহন বললেন, তোমার মাকে যেন বাবার সম্বন্ধে কিছু বোলো না। নরম ধাতের মানুষ তো। ক'দিন আগে একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। সে সব শুনলে খারাপ রিঅ্যাকশন হতে পারে।'

'না, মাকে এখন জানাচ্ছি না।'

একটু চুপ করে থেকে মণিমোহন এবার বললেন, 'তোমার মার কাছে শীগ্‌গিরই আমাকে একবার যেতে হবে। তোমার আর সুনির বিয়ের ব্যাপারটা এবার আমি ফাইন্যাল করে ফেলতে চাই।'

পরমেশ্বর লক্ষ্য করল, বিয়ের কথায় সুনেত্রা চোখ নামিয়ে নিয়েছে। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

এদিকে অমিতাভ বলতে লাগল, 'আপনাকে আগেই বলেছি বাবার মার্ডারারকে না ধরা পর্যন্ত বিয়ের কথা আমি ভাবতে পারি না।'

মণিমোহন বললেন, 'সে দায়িত্ব তো আমার। তোমাকে যখন কথা দিয়েছি, খুনীকে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতেই হবে। কিন্তু আমার দিকটা একটু কনসিডার কর। সুনির মা নেই, ওকে নিয়ে সব সময় আমার দুর্ভাবনা। বিয়েটা হয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।'

'আর কিছুদিন যাক।'

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, এখন বিয়েতে রাজী নয় অমিতাভ।

পাশে বসে পরমেশ্বর ভাবল, এমন একটা টেরিফিক ডবকা ইয়াং গার্ল চোখের সামনে ঝুলে আছে, আর অমিতাভ বিয়ে করতে চাইছে না। মাকড়াটা কি ব্রহ্মচারী-ট্রহ্মচারী হতে চায় নাকি?

যাই হোক, মণিমোহন একটু হতাশই হলেন। বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি যখন আরেকটু দেরি করতে চাইছ, তাই হবে।'

কথা বলতে বলতে অমিতাভ উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবাই।

মণিমোহন এবার পরমেশ্বরকে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুব ভাল লাগল। সময় পেলে মাঝে মাঝে চলে এসো।'

পরমেশ্বর মনে মনে বলল, 'তুমি শ্লা পুলিসের মাল। নাম শুনলে আমার হার্টে ক্যানসার হয়ে যায়! লাইফে আর তোমার এখানে আসছি না।' কিন্তু ঘাড়টা দেড় মিটার হেলিয়ে মুখে হাসিটি ফুটিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই আসব।'

একটু পর ওরা বাইরের বাগানে গাড়ি দুটোর কাছে চলে এল। মণিমোহন দরজা পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তবে সুনেত্রা অমিতাভদের সঙ্গেই এসেছে।

আজকের মতো ছাড়াছাড়ি হবার আগে দুই লাভারকে চান্স দেবার জন্য একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল পরমেশ্বর। তবু দুজনের কথা আবছাভাবে তার কানে আসতে লাগল।

সুনেত্রা বলছিল, 'আমার আর ভাল লাগছে না। তুমি একটু তাড়াতাড়ি কর।'

মণিমোহনকে যা বলেছিল সুনেত্রাকেও তাই বলল অমিতাভ, 'আরেকটু ওয়েট কর সুনু। বাবার ব্যাপারটা তো জানো। তাঁর মার্ডারার চোখের সামনে ঘুরে বেড়াবে আর আমি সানাই বাজিয়ে বিয়ে করতে ছুটব, এটা কি হয়? ছেলে হিসেবে আমার একটা কর্তব্য আছে। জানো রাতে খুনীটার কথা ভাবতে ভাবতে আমার ঘুমই আসে না। রাতের-পর-রাত আমি জেগে কাটিয়ে দিই।'

সুনেত্রা আস্তে করে বলল, 'এ সব তো আমি জানিই; আগে অনেকবার বলেছ।'

তার কথা যেন শুনতেই পেল না অমিতাভ। নিজের ঝোঁকেই বলে যেতে লাগল, 'এত বড় একটা ক্রিমিন্যাল পানিশমেণ্ট তো পাচ্ছেই না, সোসাইটির একেবারে টপে বসে আছে। ভাবতে গেলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। তোমার বাবা দায়িত্ব নিয়েছেন। আর কিছুদিন আমি দেখব, তার পরও যদি কিছু না হয় আই উড গো স্ট্রেটওয়ে এ্যাণ্ড শুট দা সোয়াইন।'

'না না, রাগের মাথায় কিছু করো না।'

অমিতাভ উত্তর দিল না।

সুনেত্রা ফের বলল, 'আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে?'

অমিতাভ বলল, 'যেদিন তুমি বলবে।'

'কাল আমি তোমাকে ফোন করব।' বলতে বলতেই অমিতাভর খেয়াল হল, পরমেশ্বর দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যস্তভাবে সে তাকে ডাকল, 'ও কি, ওখানে কেন? এধারে আসুন।'

এগিয়ে আসতে আসতে পরমেশ্বর বলল, 'আপনারা কথা বলছিলেন; তাই ভাবলাম—'

'মিস্টার হালদার, আমরা কি টীন-এজার লাভার যে যা বলব তা শুনলে অন্যের কান গরম হয়ে উঠবে। আরে মশাই আমার বয়েস বত্রিশ আর সুনুর ছাব্বিশ। লাইফের ম্যারাথন রেসের হাফ তো ফিনিশ করেই ফেলেছি। এই বয়েসে কে আর সেক্স-ফেক্স নিয়ে ডিসকাস করে!' বলতে বলতে একটু থামল অমিতাভ। কয়েক সেকেণ্ড পর ফের শুরু করল, 'তিন চার বছর

ধরে সুনির সঙ্গে আমার 'লাভ' চলছে। ফার্স্ট ইয়ারেই আমরা খচড়ামোর কথাগুলো শেষ করে ফেলেছি।'

সুনেত্রা লজ্জা পেয়ে গেল। আঙুলের ডগা দিয়ে অমিতাভর হাতে একটা খোঁচা দিয়ে বলল, 'কী অসভ্যতা হচ্ছে? মুখে কিছু আটকায় না।'

'সারাদিন অফিসে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের রোলে গম্ভীর হয়ে থাকতে হয়। সব সময় হাই টেনশন, আজ লেবার ট্রাবল, কাল স্ট্রাইক, পরশু লোড শেডিং, তরশু ঘেরাও। নার্ভগুলো কি রকম এক্সাইটেড হয়ে থাকে ভাবতে পারবে না। কোথাও-না-কোথাও খিস্তিখাস্তা করে নিজেকে একটু রিলিজ না করতে পারলে স্রেফ মরে যাব।'

'তাই বলে ঐরকম বাজে বাজে কথা!'

'আরে বাবা ঐসব কথা বললে কতটা লাইট হওয়া যায়, তুমি বুঝবে না।' বলে পরমেশ্বরের দিকে তাকাল অমিতাভ, 'চলুন হালদার সাহেব—'

এই সময় সুনেত্রা পরমেশ্বরকে বলল, 'বাবা আগেই ইনভাইট করে রেখেছেন। নেমন্তন্নটা আমি রিনিউ করে রাখছি। আসবেন কিন্তু—'

'আসব।' বলে অমিতাভর দিকে ফিরল পরমেশ্বর, 'এখান থেকে কোথায় যাবেন?'

অমিতাভ বলল, 'একবার ওরিয়েন্টাল ক্লাবে যেতে হবে। ইন্টিগেন্স ইন্ডাস্ট্রিজের মিস্টার সাকসেরিয়া আমার জন্যে ওয়েট করবেন। ওঁর সঙ্গে একটু দরকার আছে।'

'কতক্ষণ লাগবে ওখানে?'

'কতক্ষণ আর। মিনিট দশেক ম্যাক্সিমাম। কেন বলুন তো?'

পরমেশ্বর বলল, 'আপনার সঙ্গে আমিও ওরিয়েন্টাল ক্লাবে যাচ্ছি। ওখানে গিয়েই বলব।'

অমিতাভ বলল, 'চলুন।'

দুজনে নিজের নিজের লিমুজিনে উঠে পড়ল।



'ওরিয়েণ্টাল ক্লাবে' এসে সাকসেরিয়ার সঙ্গে দরকারী কাজটা সারতে দশ মিনিটও লাগল না। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে কথাবার্তা সেরে লনে একটা মাল্টি কালার্ড গার্ডেন আমব্রেলার তলায় চলে এল অমিতাভ। ওখানে একটা ফ্যাশনেবল বেতের চেয়ারে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল পরমেশ্বর।

মুখোমুখি অন্য একটা চেয়ারে বসতে বসতে অমিতাভ বলল, 'কী বলবেন বলুন—'

বেয়ারা দুজনের জন্য কফি আর বীয়ার দিয়ে গেল। পরমেশ্বর এখানে এসেই অর্ডার দিয়ে রেখেছিল।

কফি খেতে খেতে পরমেশ্বর বলল, 'একটা ব্যাপার আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।'

বীয়ারে চুমুক দিয়ে অমিতাভ বলল, 'আমার বাবার ব্যাপারে তো?'

'কারেক্ট।' আস্তে ঘাড় কাত করল পরমেশ্বর। কনট্রাক্টের বাইরে অন্য কোন কিছু সম্পর্কেই তার কৌতূহল থাকা উচিত নয়। যত ইনভলভমেণ্ট, ততই ফেঁসে যাবার ভয়। কিন্তু অমিতাভর বাবার সম্বন্ধে না জানা পর্যন্ত সে যেন ভাল করে নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে না।

অমিতাভ বলল, 'আমি আগেই গেস করেছিলাম। যাক গে, শুনুন—' এর পর সে যা বলল,, সংক্ষেপে এই রকম।

অমিতার বাবা সর্বেশ্বর সেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বেরুবার পর বড় বড় ফার্ম থেকে চাকরির অফার পেয়েছিলেন। ছাত্র হিসেবে ব্রিলিয়াণ্ট কেরিয়ার ছিল তাঁর। সর্বেশ্বরের চাকরি-বাকরি করার দিকে একেবারেই ঝোঁক ছিল না। একটা অফারও তিনি নেন নি। তার বদলে এক বন্ধুকে নিয়ে ছোটখাটো একটা ফ্যাক্টরি করেছিলেন।

দিন রাত ঐ কারখানাতেই পড়ে থাকতেন সর্বেশ্বর। বাড়িঘর কোন দিকেই তাঁর নজর ছিল না। প্ল্যান্ট, প্রোডাকসন, লেবার—সর্বক্ষণ এই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। বন্ধুটি দেখতেন অ্যাডমিনিস্ট্রেসন, অ্যাকাউন্টস ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপার।

সাত আট বছরের মধ্যে ফ্যাক্টরি বিরাট হয়ে উঠল। প্রথমে শুধু প্রিসিসান টুলস ফুলস ম্যানুফ্যাকচার করা হত। তারপর আস্তে আস্তে মেডিসিন প্ল্যান্ট, ইলেকট্রনিক ইউনিট, একঝস্ট ফ্যান ইউনিট—এমনি অনেকগুলো প্ল্যান্ট খুললেন সর্বেশ্বর। তাঁর কোম্পানির প্রোডাক্টের ডিমাণ্ড হল সারা ইণ্ডিয়া জুড়ে। টার্নওভার দিনের-পর-দিন বাড়তেই লাগল। তাঁদের কোম্পানির রেপুটেসন কান্ট্রি ছাড়িয়ে, কান্ট্রির বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল। তাঁদের মালের যা ডিমাণ্ড সেই অনুযায়ী সাপ্লাই দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। কারখানা বড় করে এমপ্লয়ীদের স্ট্রেনথ্ বাড়িয়েও ডিমাণ্ড আর সাপ্লাইয়ের মাঝখানের গ্যাপটা কিছুতেই আর কমানো যাচ্ছিল না। যাই হোক, দেখতে দেখতে সর্বেশ্বরদের কোম্পানির ইণ্ডিয়ার একটা অত্যন্ত রেপুটেবল কনসার্ন হয়ে উঠল।

এর মধ্যে অবশ্য বিয়ে করেছেন সর্বেশ্বর; একটি ছেলেও হয়েছে। কিন্তু আগের মতোই স্ত্রী বা ছেলে কোন-দিকেই তাঁর নজর ছিল না। কোম্পানির সুনামের সঙ্গে তার প্রোডাকসান ক্যাপাসিটি বাড়ানো ছাড়া তিনি আর কিছু ভাবতে পারতেন না।

এইভাবে চলতে চলতে হঠাৎ একদিন সর্বেশ্বরের খেয়াল হল, কোম্পানির যা আউটপুট এবং সেল, তাতে প্রফিট আরো অনেক বেশি হওয়া উচিত। কোম্পানি বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এটাকে পাবলিক লিমিটেড করা হয়েছিল। কনট্রোলিং শেয়ার নিজেদের হাতে রাখলেও বাইরের লোকের জন্য কিছু শেয়ার বাজারে ছাড়া হয়েছিল। ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো বিক্রি হয়ে যায়। সর্বেশ্বর এতকাল প্ল্যান্ট এবং প্রোডাকসান নিয়ে মেতে ছিলেন। এবার খোঁজ নিয়ে দেখলেন, শেয়ার হোল্ডারদের খুব সামান্যই ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে তাদের মধ্যে দারুণ ক্ষোভ।

শুধু ডিভিডেণ্ড প্রফিটের ব্যাপারেই না, আরো নানা ব্যাপারে অনেক কারচুপি চোখে পড়তে লাগল সর্বেশ্বরের। তা ছাড়া গভর্নমেন্টের প্রচুর ট্যাক্স দেওয়া হয় নি। কণ্ট্রাক্টর আর সাপ্লায়ারদের লাখ লাখ টাকা বাকী পড়ে আছে। দশ বিশ বার ঘুরিয়ে হয়ত সামান্য কিছু পেমেন্ট করা হয়। এই সব কারণে বাজারে কোম্পানির রেপুটেসন নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

সর্বেশ্বর বুঝতে পেরেছিলেন, কোম্পানিকে ঝাঁঝরা করে তাঁর বন্ধুটি লাখ লাখ টাকা সরিয়েছে। তা ছাড়া খোঁজখবর নিয়ে দেখলেন অত্যন্ত

বিপজ্জনক একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। বিভিন্ন সময়ে বন্ধুর দেওয়া কাগজপত্রে সরল বিশ্বাসে প্রায় চোখ বুজেই তিনি সই করে গিয়েছিলেন। হঠাৎ চমকে উঠে দেখলেন, ঐ সব সই-টইয়ের জোরে বন্ধুটি কোম্পানির সর্বেসর্বা হয়ে বসেছেন আর তাঁর অবস্থা হয়েছে ভয়াবহ রকমের খারাপ। লক্ষ্য করলেন নিজের হাতে গড়ে-তোলা এই বিপুল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারে তাঁর স্ট্যাটাস একজন খুব বড় মাইনের এমপ্লয়ীর বেশি নয়। অবশ্য সামান্য কিছু শেয়ার তাঁর ছিল।

সব জানার পর স্বাভাবিক কারণেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন সর্বেশ্বর। সোজাসুজি বন্ধুকে তিনি চার্জ করেছিলেন—এই প্রতারণা এবং নির্লজ্জ জোচ্চুরির কারণ কী? এ নিয়ে তর্কাতর্কি বচসা এবং তিক্ততা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সর্বেশ্বর ঠিক করেছিলেন কোর্টে যাবেন; এই শঠতা কিছুতেই সহ্য করবেন না। সমস্ত ব্যাপারটা যখন বিরাট এক এক্সপ্লোসানের মুখোমুখি সেই সময় দার্জিলিঙে কোম্পানির ডিলারদের একটা অ্যানুয়াল কনফারেন্স হল। কনফারেন্সের ডেটটা অনেক আগের থেকেই ঠিক করা ছিল। কোম্পানির টপ ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে সর্বেশ্বর এবং তাঁর বন্ধুকেও যেতে হয়েছিল।

কনফারেন্সের পর ডিলাররা তখনও দার্জিলিঙে রয়েছে। ওদের ইচ্ছা, এত উঁচুতে কুইন অফ দি হিল স্টেশনসে যখন এসেই পড়েছে তখন কয়েকটা দিন চারদিকের সাইট সীয়িং করে কাটাবে। সেই সঙ্গে হৈচৈ আর রিল্যাক্সেসন তো আছেই। নিচে নামলেই তো আবার সেই কাজ-আর-কাজ, উন্মাদের মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে ডগ রেস।

ডিলাররা থাকার জন্য সর্বেশ্বর আর তাঁর বন্ধু দার্জিলিঙ থেকে কলকাতায় ফিরতে পারছিলেন না। ওঁরা অবশ্য এক হোটেলে থাকেন নি; আলাদা হোটেলে উঠেছিলেন। নিজেদের মধ্যে সম্পর্কে যে রকমই দাঁড়াক, কোম্পানির ইণ্টারেস্টে ডিলারদের সামনে খানিকটা অভিনয় করেই গিয়েছিলেন। ভেতরকার এক্সপ্লোসিভ অবস্থাটা বাইরের লোককে বুঝতে দ্যান নি।

সর্বেশ্বর অবশ্য ভেতরে ভেতরে ঠিকই করে রেখেছিলেন, কলকাতায় ফিরেই বন্ধুর বিরুদ্ধে ড্র্যাস্টিক স্টেপ নেবেন। দার্জিলিঙে আসার আগে লইয়ারের সঙ্গে দেখা করে কাগজপত্র ঠিক করে রাখতে বলেছিলেন। ফেরার পরই যাতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

কিন্তু লীগ্যাল স্টেপ আর নেওয়া সম্ভব হয় নি। ডিলারদের কনফারেন্স যেদিন শেষ হল, তার দু দিন পর সর্বেশ্বরের হোটেলের একটা বেয়ারা ভোরবেলা বেড-টী দিতে গিয়ে দেখল, তাঁর ঘর ভেতর থেকে বন্ধ। বার-কয়েক ডাকাডাকির পর সে চলে যায়। তাঁর ধারণা হয়েছিল, সর্বেশ্বর

গম্ভীরভাবে ঘুমিয়ে আছেন ; ঘুম ভাঙিয়ে তাঁকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না।

বেলা করে সাড়ে-সাতটা আটটা নাগাদ বেয়ারাটা আবার চা নিয়ে এসেছিল কিন্তু এবারও ডাকাডাকি করে সর্বেশ্বরের সাড়া পাওয়া যায় নি। ফলে বেয়ারাটার সন্দেহ হয়, কেননা সর্বেশ্বর আসার পর থেকে কোনদিন ছ'টার পর তাঁকে শুয়ে থাকতে দ্যাখে নি সে। বেয়ারাটা দৌড়ে গিয়ে তখন ম্যানেজারকে খবর দ্যায়। ম্যানেজার এসে প্রথমে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে। সাড়াশব্দ না পেয়ে দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে। তাতেও যখন কোন কাজ হল না তখন পুলিশে খবর দিল।

পুলিশ এসে দরজা ভেঙে দেখল, সর্বেশ্বরের বডি সীলিং থেকে ঝুলছে। অর্থাৎ তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

খবর পেয়ে সর্বেশ্বরের সেই বন্ধু এবং কোম্পানির ডিলাররা দৌড়ে এল, কিন্তু কেউ আত্মহত্যার কারণটা খুঁজে পেল না। সর্বেশ্বরের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছিল। তাঁর ফ্যামিলি বলতে স্ত্রী এবং একমাত্র ছেলে অমিতাভ। বয়স তখন হার্ডলি চোদ্দ কি পনের। সর্বেশ্বরের দুই ভাই আর অমিতাভকে সঙ্গে করে দার্জিলিঙ দৌড়ে গিয়েছিল তাঁর স্ত্রী। যাই হোক, লোকাল পুলিশের ইনভেস্টিগেসন এবং পোস্ট মর্টেমের পর সর্বেশ্বরের বডি নিয়ে ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়।

পোস্টমর্টেম রিপোর্টে সন্দেহজনক এমন কিছুই ছিল না যাতে মনে হতে পারে এই মৃত্যু অস্বাভাবিক। গলায় দড়ির ফাঁস লাগালে যে স্ট্র্যাঙ্গুলেসন হয় শুধু তারই দাগ পাওয়া গেছে ইনভেস্টিগেসনে। কিন্তু সর্বেশ্বরের স্ত্রীর মন থেকে একটা খটকা কিছুতেই যায় নি। ফ্যামিলি লাইফে সর্বেশ্বর ছিলেন অত্যন্ত সুখী। বাবা এবং স্বামী হিসেবে খুবই দায়িত্বশীল। অমিতাভকে ঘিরে নানা রকম পরিকল্পনা ছিল তাঁর। তাকেও নিজের মতো একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার করে তোলবার কথা ভাবতেন। ভাবতেন, ছেলে তাঁর মতো নানা টাইপের ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলবে। অমিতাভর মা ছিলেন আদুরে ধরনের হাসিখুশী মানুষ। স্বামীর সব ব্যাপারেই তাঁর সায় ছিল নিঃশর্ত। ষোল সতের বছরের বিবাহিত জীবনে কোন কারণেই একদিনের জন্যও দু'জনের মতের বা মনের অমিল ঘটে নি। ফ্যামিলি লাইফে যাঁর কোন দুঃখ নেই টাকা-পয়সার ব্যাপারে ফ্রাসট্রেসন নেই, সেই মানুষ দুম করে গলায় দড়ি দিতে যাবেন কেন ? স্ত্রী এবং নাবালক ছেলের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন না করে হঠাৎ নিজের জীবন শেষ করে দেবার মানুষ তিনি ছিলেন না।

অবশ্য বন্ধুর ব্যবহারে সর্বেশ্বর খুবই উত্তেজিত এবং ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তবে তারও তো ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিলেন। লইয়ারের সঙ্গে সব অ্যারেঞ্জমেণ্ট পাকা করে লীগ্যাল অ্যাকসনটা নেবার আগেই তাঁর এভাবে মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। তা ছাড়া তিনি যে আত্মহত্যা করবেন, আগে থেকে তাঁর কথায় বা আচরণে কোন ইঙ্গিতই পাওয়া যায় নি। কিন্তু পুলিশ ইনভেস্টিগেসনে যখন কিছুই পাওয়া গেল না তখন কী আর করা যায়। সর্বেশ্বরের আত্মহত্যার ব্যাপারটা ক্রমশঃ চাপা পড়ে যায়।

কিন্তু আর সবাই ভুলে গেলেও স্বামীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা অমিতাভর মা ভোলেন নি। স্বামীর বন্ধু সম্পর্কে তাঁর সন্দেহটা চিরস্থায়ী হয়ে মাথার ভেতর আটকে গিয়েছিল। যে কোম্পানি এবং ফ্যাক্টরিগুলো সর্বেশ্বর নিজের রক্ত দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন শেষ পর্যন্ত তার সামান্য কিছু শেয়ার ছাড়া আর কিছুই ছিল না। স্বামীর বন্ধু অবশ্য তিন চার লক্ষ টাকা দিতে চেয়েছিল। অমিতাভর মা তা নেন নি। মৃত্যুর পর শেয়ারগুলো বেচে দিয়ে ভাইদের কাছে চলে গিয়েছিলেন এবং স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী অমিতাভকে গড়ে তুলতে শুরু করেছিলেন।

অমিতাভ ইঞ্জিনীয়ার হয়ে বেরিয়ে আসার পর তার মা বলেছিলেন, 'তোমার বাবার ইচ্ছা ছিল তুমি পরের দাসত্ব না করে নিজের হাতে কল-কারখানা গড়ে তুলবে। আমি চাই তোমার বাবার ইচ্ছাকে তুমি মর্যাদা দাও।'

অমিতাভ বলেছিল, 'বেশ, তাই হবে।'

অমিতাভর মা বলেছিলেন, 'তোমার বাবা যে-সব জিনিসের ফ্যাক্টরি করেছিলেন তোমাকেও তাই করতে হবে।'

'করব।'

'আমি তোমাকে জায়গা দেখিয়ে দেব। সেখানে ফ্যাক্টরিগুলো করতে হবে।'

'আচ্ছা। কিন্তু টাকা পাব কোথায়?'

'আমি দেব! তোমার বাবার মৃত্যুর পর শেয়ার বিক্রি করে দেড় লাখ টাকা পেয়েছিলাম। সেই টাকা তখনই ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করে রাখি। তের বছরে টাকাটা আড়াই গুণ বেড়ে গেছে। আগে যতটা পারিস জায়গা কিনে নে। তারপর ছোট করে কারখানা শুরু করে দে।'

মা যে সাইট দেখিয়েছিলেন সেখানেই অনেকটা জমি কিনে নিয়েছিল অমিতাভ। তখন জমির দাম এত ছিল না। দেড় লাখ টাকায় প্রায় সোয়াশো একর ল্যাণ্ড হয়ে গিয়েছিল।

জমিটা হয়ে যাবার পর ছোট মাপে প্রিসিসান টুলসের ফ্যাক্টরি দিয়ে শুরু করেছিল অমিতাভ। দু বছরের মধ্যে তার প্রোডাক্টের রেপুটেসন হয়ে গিয়েছিল বাজারে। ফলে ডিম্যাণ্ডও বেড়ে গিয়েছিল কয়েক গুণ। কাজেই ফ্যাক্টরিটা বড় করতে হয়েছিল।

প্রিসিসান টুলসের পর ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট, ইলেকট্রনিকস ইউনিট, একঝস্ট ফ্যান ইউনিট—অর্থাৎ সর্বেশ্বর যে যে ইউনিট বসিয়েছিলেন, এক এক করে সবগুলো ছেলেকে দিয়ে করিয়েছিলেন অমিতাভর মা। অমিতাভর ইণ্ডাস্ট্রিগুলো যখন পুরোপুরি এস্টাব্লিশড্ তখন একদিন মা বলেছিলেন, 'তোকে দিয়ে কেন এগুলো করালাম জানিস?'

অমিতাভ বলেছিল, 'জানি। বাবার এ রকমই ইচ্ছা ছিল।'

সর্বেশ্বরের হাত থেকে প্রতারণা করে তাঁর বন্ধু যে কোম্পানি কেড়ে নিয়েছিল সেটার নাম করে মা এবার বলেছিলেন, 'ওরা যে সব জিনিস বানায় তোর ফ্যাক্টরিগুলোতে সে সবই তৈরি হয়!'

'হ্যাঁ।'

'আমার ইচ্ছা, এমন জিনিস বাজারে দিবি যাতে ওদের কোম্পানি কমপিটিসনে পেরে না ওঠে। পারবি তো?'

'ওরা পারছে না। সব জায়গায় ওদের প্রোডাক্ট আমাদের কাছে মার খাচ্ছে।'

'খুব ভাল। এবার আমার শেষ কথাটা বলি।'

'কী?'

'তোমার বাবা যখন মারা যান তখন তুমি খুবই ছোট। তোমার হয়ত সব পরিষ্কার মনে নেই।'

অমিতাভ বলেছিল, 'মনে আছে। বাবা দার্জিলিঙের এক হোটেলে আত্মহত্যা করেছিলেন।'

'ভুল, একেবারে ভুল। আমার স্থির বিশ্বাস, ওভাবে উনি আত্মহত্যা করতে পারেন না। ওঁকে খুন করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।'

এর পর বন্ধুর সঙ্গে স্বামীর কোম্পানি তৈরি থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় খবর দিয়ে অমিতাভর মা বলেছিলেন, 'আমার ধারণা তোমার বাবার মৃত্যুর জন্য তোমার বাবার বন্ধু পুরোপুরি দায়ী। আমি যে তোমাকে এভাবে মানুষ করেছি, তার একটাই লক্ষ্য ছিল। তুমি এখন দাঁড়িয়ে গেছ। আমি চাই তুমি তোমার বাবার খুনের প্রতিশোধ নেবে। প্রথমতঃ, ঐ কোম্পানিকে বাজার থেকে মুছে দিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, খুনী যাতে উপযুক্ত শাস্তি পায় তার ব্যবস্থা করবে।'

এই সময় দার্জিলিঙ থেকে একটা বেনামী চিঠি পায় অমিতাভ। চিঠির লেখক জানিয়েছে, 'দীর্ঘকাল আগে দার্জিলিঙের হোটেলে সর্বেশ্বর যে গলায় ফাঁস দিয়ে মারা গিয়েছিলেন সেটা আত্মহত্যা নয়, মার্ডার। এই হত্যার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের দু'জন মারা গেছে, বাকী দু'জন এখনও জীবিত। পুরো পরিকল্পনাটা যার সে এখনও কলকাতায় আছে। বাবার খুনের প্রতিশোধ যদি অমিতাভ নিতে চায় তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোন সীনিয়ার পুলিস অফিসার দিয়ে যেন কেসটার ইনভেস্টিগেসন করায়। বিশেষ করে যে হোটেলে সর্বেশ্বরের মৃত্যু ঘটেছিল, এখনও সেখানে খোঁজ করলে কিছু ক্লু পেতে পারে।

পত্রলেখক জানিয়েছে, সে এই হত্যার ব্যাপারটা মোটামুটি জানে কিন্তু নিজের পরিচয় দিতে সাহস পাচ্ছে না। কারণ সে খুবই গরিব মানুষ। মার্ডারাররা যদি জানতে পারে সে এসব জানিয়ে দিয়েছে, তবে নির্ঘাত তাকে খুন করে ফেলবে। অথচ বিবেকের তাড়ায় অমিতাভকে না জানিয়েও পারছে না। এতদিন যে জানায় নি, তার কারণ অমিতাভ ছোট ছিল। সে এস্টাব্লিশড্ না হওয়া পর্যন্ত পত্রদাতা অপেক্ষা করেছে। তার আগে জানালে রাগের মাথায় পাওয়ারফুল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে বিপদে পড়ে যেত অমিতাভ। এখন তার টাকাপয়সা হয়েছে, সোসাইটিতে প্রতিষ্ঠা হয়েছে, অনেক বড় বড় লোকের সাহায্য সে সহজেই পেতে পারে। বাবার খুনের প্রতিশোধ নেবার এই হল কারেক্ট সময়।

চিঠিটা নিয়ে স্ট্রেট মণিমোহনের কাছে চলে গিয়েছিল অমিতাভ। তখন রিটায়ারমেন্টের আর মাসছয়েক বাকী তাঁর।

সমস্ত কেসটা দারুণ আগ্রহ নিয়ে শুনেছিলেন মণিমোহন এবং সর্বেশ্বরের মৃত্যুর মিস্ট্রিটা সলিউসানের দায়িত্বও নিয়েছিলেন।

কেসটা ইনভেস্টিগেট করতে করতে চাকরির মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছিল মণিমোহনের। রিটায়ারমেন্টের পরও তিনি কেসটা ছাড়েন নি। কত বছর আগের ঘটনা, সাক্ষ্য-প্রমাণ-ক্লু সবই প্রায় লোপাট হয়ে গেছে। তাই সময় লেগেছিল অনেক।

এদিকে আরো একটা ব্যাপার ঘটেছিল। আগে আগে কেসের ব্যাপারে মণিমোহনের অফিসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করত অমিতাভ। মণিমোহন রিটায়ার করার পর তাঁর বাড়ি যেতে লাগল সে। ওখানে যাতায়াত করতে করতে সুনেত্রার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতা। দুবাড়ির লোকই ওদের সম্পর্কের কথা জানে। অমিতাভ এবং সুনেত্রার বিয়েতে কোন পক্ষেরই আপত্তি নেই। মণিমোহন অবশ্য এ ব্যাপারটা

ঢুকিয়ে ফেলতে চাইছেন কিন্তু অমিতাভ তাড়াহুড়োর রাজি নয়। বাবার মার্ডারের সঙ্গে জড়িত খুনীকে ফাঁসিতে না ঝোলানো পর্যন্ত বিয়েটা সে স্থগিত রাখতে চায়।

সর্বেশ্বরের মৃত্যু ঘিরে যা-যা ঘটেছে সব বলে গেল অমিতাভ। তারপর সোজা পরমেশ্বরের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ অবস্থায় চট করে বিয়েটা করে ফেলা কি ঠিক?'

পরমেশ্বর অন্যমনস্কর মতো বলল, 'না। আগে বাবার মার্ডারের ফয়সলা, তারপর বিয়ে।' একটু থেমে ফের বলল, 'আপনি কিন্তু একটা কথা বলেন নি।'

'কী?'

'আপনার বাবার সেই ফ্রেন্ডের নামটা।'

'প্লীজ, ওটা এখন জিজ্ঞেস করবেন না। খুনী সোসাইটির একজন অত্যন্ত এস্টাব্লিশড্ পার্সন। আমরা তাকে ধরতে চাইছি, এটা জানতে পারলে সে কসাস হয়ে যাবে। এখনও যা প্রমাণ-ট্রমান আছে সব নষ্ট করে ফেলবে। তাতে মিস্টার চ্যাটার্জির ইনভেস্টিগেসনে ভীষণ অসুবিধা হবে! আর ঐ শয়তান খুনীটার একটা চুলও ছুঁতে পারব না।'

পরমেশ্বর বলল, 'তাহলে নামটা বলার দরকার নেই।'

অমিতাভ বলল, 'প্লীজ কিছু মনে করবেন না। মিস্টার চ্যাটার্জি বিশেষভাবে আমাকে বারণ করে দিয়েছেন—নামটা যেন না বলি।'

পরমেশ্বর ভাবল, নামটা জানতে তার দু'দিনও লাগবে না। সর্বেশ্বর সেন কার সঙ্গে পার্টনারশিপে কোম্পানি করেছিলেন, একটু খোঁজ নিলেই সেটা বার করা যাবে। ইচ্ছা করলে গভর্নমেন্টের 'টপ সিক্রেট' ডকুমেন্ট ফাঁস করে দিতে পারে সে, আর এ তো সামান্য একটা নাম। তবে এ ব্যাপারে তার কোন ইন্টারেস্ট নেই। সে এসেছে অমিতাভর ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের বারোটা বাজাতে; তার বাবার মার্ডারারের নাম জানতে নিশ্চয়ই নয়। সে বলল, 'ঠিক আছে মিস্টার সেন। নাম বলার জন্যে আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব না। তবে আপনার মা'র সম্বন্ধে আমার টেরিফিক রেসপেক্ট হচ্ছে। কিভাবে হাজব্যান্ডের মার্ডারের রিভেঞ্জ নেবার জন্যে তিনি আপনাকে তৈরি করেছেন, শুনতে শুনতে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।'

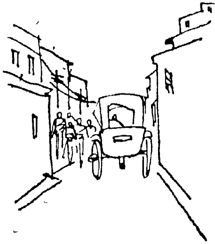
অমিতাভ বলল, 'একদিন আপনাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব। মা'র সঙ্গে আলাপ হলে আপনার খুব ভাল লাগবে।'

পরমেশ্বর বলল, 'নিশ্চয়ই যাব। অমন মা'র কাছে যাওয়া তো লাকের ব্যাপার।'

আরো দু'-একটা কথার পর অমিতাভ বলল, 'অনেক রাত হল। চলুন, এবার বাড়ি ফেরা যাক।'

পরমেশ্বর চট করে ঘড়িটা দেখে নিল ; প্রায় এগারটা বাজে। ক্লাব ফাঁকা হয়ে এসেছে। লনে, সুইমিং পুলে কি মেইন বিল্ডিং-এ অল্প দু'চারজন মেম্বার বসে বসে ড্রিঙ্ক করছিল। চেয়ারের হাতলে হাতের ভর দিয়ে উঠতে উঠতে পরমেশ্বর বলল, 'হ্যাঁ, চলুন।'

একটু পর ওরা পার্কিং জোনে এসে লিমুজিনে উঠে পড়ল।



অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে এসে গাড়ি পার্ক করল পরমেশ্বর। তারপর আঙুলের ডগায় চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে আর টুইস-টুইস করে শিস দিতে দিতে লিফট বক্সের সামনে চলে এল। দেখল, হেমা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার দু'হাতে প্রচুর লোমওলা ধবধবে দু'টো কুকুর। বোঝা গেল হেমাও লিফটের জন্য অপেক্ষা করছে।

চট করে পরমেশ্বর একবার দেয়ালের গায়ে ইনডিকেটরটা দেখে নিল লিফটটা এখন ফোরটীনথ্ ফ্লোর থেকে নেমে আসছে। ইনডিকেটর থেকে চোখ সরিয়ে এবার হেমার দিকে তাকাল পরমেশ্বর। বলল, 'কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন ?'

হেমা বলল, 'মিনিট দুয়েক। আমি এসে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই একজন লিফট্ নিয়ে ওপরে উঠে গেল। তাই ওয়েট করতেই হচ্ছে। তারপর এখন কোত্থেকে ?'

'ক্লাব থেকে—' উত্তর দিতে দিতে হেমার কুকুর দুটোকে দেখতে লাগল পরমেশ্বর! চমৎকার কুকুর; পাউডারের নরম পাফের মতো। ঝোলা ঝোলা কানদুটো গালের ওপর এসে পড়েছে। চকচকে কাচের গুলির মতো দুটো বাদামী চোখ। দেখামাত্র কোলে তুলে আদর করতে ইচ্ছে করে।

এক সময় পরমেশ্বর ছিল কুকুরপ্রেমিক অর্থাৎ ডগলাভার। দু-দুবার দু'টো ভালো জাতের কুকুর যোগাড় করেছিল সে। একটা ফক্স টেরিয়ার আরেকটা একেবারেই দিশি। এমন ফেইথফুল সঙ্গী জীবনে আর কখনও পায় নি। ফক্সটেরিয়ারটা বুড়ো হয়ে মারা যায়, দিশিটাকে কারা যেন বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছিল। দিশিটা মার্ডার হয়ে যাবার পর খুব কষ্ট হয়েছিল পরমেশ্বরের। তার পর থেকে আর সে কুকুর পোষে নি।

হেমার প্লাক-করা সরু ভুরু কুঁচকে গেল। সে বলল, 'কোন্ ক্লাব থেকে ?

হেমার কুকুর দেখতে দেখতে পরমেশ্বর বলল, 'ওরিয়েণ্টাল ক্লাব।'

'আমি ওখানে দশটা পর্যন্ত ছিলাম। আপনাকে দেখি নি তো।'

'আমি দশটার পর ওখানে গিয়েছিলাম।'

'আই সী—'

পরমেশ্বর এবার বলল, 'আপনার কুকুর দু'টো লাভলি। পিকিনীজ না?'

আস্তে ঘাড় কাত করল হেমা, 'হ্যাঁ।'

'খুব ভাল জাতের পিকিনীজ। এগুলো রেয়ার দেখা যায়।'

'আপনি কুকুর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন, মনে হচ্ছে।'

'এক সময় ইণ্টারেস্ট ছিল। আই ওয়াজ এ প্যাসনেট ডগ-লাভার। যাক গে, এগুলো কিনলেন নাকি?'

'আরে না না; আমার এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ফ্রেণ্ড আজ বিয়ে করে অস্ট্রেলিয়া চলে গেল। যাবার সময় এই কুকুর দু'টো প্রেজেণ্ট করে গেছে। একটা হলেও না হয় কথা ছিল; একেবারে পেয়ার। দু'-দু'টো কুকুর নিয়ে যে কী করব, ঠিক করতে পারছি না। অন্ততঃ একটা কাউকে দিয়ে দিতে হবে। দুটো কুকুরের ট্রাবল আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব না।'

এই সময় লিফট্‌টা নেমে এসে ওদের সামনে থমকে দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকে বোতাম টিপে দিল পরমেশ্বর। ওপরে উঠ্‌তে উঠতে হেমা বলল, 'একটা কুকুরও যদি কাউকে গছাতে পারতাম, রেসপনসিবিলিটি হাফ কমে যেত। দেখবেন তো, কেউ যদি ইণ্টারেস্টেড হয়—'

পরমেশ্বরের ভেতর থেকে পুরনো সেই ডগ-লাভার যেন জেগে উঠল। সে বলল, 'আপনি যদি সত্যিই একটাকে দিতে চান, আমি নিতে রাজী আছি।'

দারুণ খুশী হয়ে গেল হেমা। তার ঘাড় থেকে যেন পঁচিশ টনের একটা ওয়েট নেমে গেছে এমনভাবে বলল, 'আপনি নেবেন! এর চাইতে বড় রিলিফ আর হয় না। কার-না-কার হাতে পড়ত, যত্ন-টত্ন পেত না। আনকেয়ারড পড়ে থাকত। আফটার অল, এটা আমার বন্ধুর জিনিস। নেগলেকটেড হয়, এটা আমি চাই না।'

'ঠিক।'

'তা ছাড়া আপনি নিলে কাছাকাছি থাকবে। আমি এসে মাঝে মাঝে দেখে যেতে পারব।'

'সিওর। যখন ইচ্ছে আসবেন।'

'তা ছাড়া দুটোতে মিলে পেয়ার। একটা মেল, একটা ফিমেল। দুটোকে

দূরে দূরে রাখাও ঠিক হবে না। ইট উড বী এ ক্রুয়েলটি—তাই না?' বলে ঠোঁট কুঁচকে খচড়ামোর ভঙ্গিতে একটু হাসল হেমা।

মেয়েরা যে সেক্সের ব্যাপার নিয়ে এ রকম সিগন্যাল-টিগন্যাল দিয়ে হাসতে পারে, পরমেশ্বর কোন দিন ভাবতে পারে নি। তার ভুরুও কুঁচকে গেল। সে কিছু বলার জন্য ঠোঁট ফাঁক করতে যাচ্ছিল, তার আগেই লিফটটা ফোরটীনথ ফ্লোরে এসে দাঁড়িয়ে গেল। এখানেই তাকে নামতে হবে।

হেমা চট করে একটা কুকুর পরমেশ্বরের দিকে বাড়িয়ে বলল, 'এই নিন! প্রেজেণ্টেসন সেরিমনিটা লিফটেই হয়ে যাক।'

পরমেশ্বর বলল, 'আজই দেবেন?'

'হ্যাঁ আজই। শুভ কাজ ফেলে রাখতে নেই।'

এক হাতে কুকুরটাকে ধরে কোলে তুলে নিল পরমেশ্বর। আরেক হাতে লিফটের দরজা খুলতে খুলতে বলল, 'অল রাইট। এমন একটা প্রেজেণ্টেসন দিলেন। আমার ফ্ল্যাটে চলুন; একটু সেলিব্রেট করা যাক।'

'প্লীজ, আজ না। আই অ্যাম অ-ফুলি টায়ার্ড। সেলিব্রেসানটা পেণ্ডিং থাক। পরে একদিন হবে।'

পরমেশ্বর বলল, 'ঠিক আছে। আমার ফ্ল্যাটেই কিন্তু হবে।'

হেমা হাসল, 'অ্যাকসেপ্টেড।'

'থ্যাঙ্কস। কবে হলে আপনার সুবিধা হবে?'

'আপনাকে জানিয়ে দেব।'

লিফট্ থেকে বাইরে বেরিয়ে ফের দরজা বন্ধ করে দিতে দিতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল পরমেশ্বরের। একটু ব্যস্তভাবেই সে বলল, 'আমি আপনার অ্যাপার্টমেণ্টে গেছি। কথা ছিল, আপনিও রিটার্ন ভিজিট দেবেন। কিন্তু একদিনও আমার অ্যাপার্টমেণ্টে আসেন নি।'

হেমা গলার স্বরটা অনেকখানি নামিয়ে ফিস ফিস করল, 'দেখবেন, এবার থেকে প্রায় রেগুলারই আসব। অন্ততঃ বন্ধুর কুকুরের জন্যে আসতেই হবে। এত আসব যে আপনি অতিষ্ঠ হয়ে যাবেন।'

পরমেশ্বর হাসল, 'দেখা যাবে।'

হেমা আর কিছু না বলে বোতাম টিপে দিল। লিফটটা পরমেশ্বরের চোখের সামনে দিয়ে হাউইয়ের মতো ওপরে উঠে গেল।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, পরমেশ্বর তার অ্যাপার্টমেণ্টের ড্রইংরুমের ডিভানে একটা ফোমের বালিশ মাথায় দিয়ে আরেকটা জড়িয়ে ধরে কাত হয়ে আছে। এর মধ্যে তার স্টমাকে দশ খোরা বাংলা মাল, খানিকটা কষা মাংস,

মেটে চচ্চাড়ি আর পাঁপড় ঢুকে গেছে। হেমার দেওয়া পিকিনীজ কুকুরটা তার বুকের ভেতর ঢুকে গুটিসুটি মেরে রয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে কুকুরটা তার 'পেট' হয়ে গেছে।

মাথার ভেতর সোনার বাংলা যখন লাগাতার হুলাহুপ নাচ চালিয়ে যাচ্ছে সেই সময় নেক্সট আটচল্লিশ ঘণ্টার একটা প্রোগ্রাম মনে মনে তৈরি করে ফেলল পরমেশ্বর। কালকের মধ্যেই লোলের জন্য মফঃস্বলের কোন একটা স্কুলের ক্লাস টেনের জাল সার্টিফিকেট, সেই সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাস কোন গেজেটেড অফিসারের নকল ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট বানিয়ে অমিতাভর 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজে' একটা দরখাস্ত পাঠানো দরকার। নকল করার সাজসরঞ্জাম সব পড়ে আছে শহরতলীর সেই বস্তিতে। কাল সকালে গিয়ে সেগুলো নিয়ে আসতে হবে। তা ছাড়া লোলে, এলিজাবেথ, লক্ষ্মী, ছররা বা লাট্টুর সঙ্গে অনেক কাল দেখা হয় নি। ওদেরও দেখে আসা দরকার।

প্ল্যানটা ঠিক করার পর সে যখন ছোটি সিংকে আরো দু-খোরা বাংলা দেবার কথা বলতে যাবে সেই সময় সোমেশ্বরের ফোন এল। পরমেশ্বর বলল, 'আপনার কেস স্মুথলি এগিয়ে যাচ্ছে। ঘাবড়াবার কিছু নেই।'

সোমেশ্বর বললেন, 'আমি ঐ জন্যে ফোন করি নি।'

'তবে ?'

'অন্য একটা ব্যাপারে তোমার হেল্প চাই।'

'কী ব্যাপার বলুন—'

'তোমার কাছাকাছি আর কেউ নেই তো ? মানে ব্যাপারটা টপ সিক্রেট।'

'কেউ নেই। ছোটি সিং এখন কিচেনে।'

'ফাইন। এবার শুনে নাও, কাল আমাদের এক ফ্রেণ্ড আসছে ব্যাঙ্কক থেকে। সকাল সাড়ে-ন'টায় তার প্লেন এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করবে। শুনতে পাচ্ছ ?'

'পাচ্ছি। বলে যান।'

'ওর সঙ্গে একটা সাদা ফোমের স্যুটকেশ থাকবে। কাল সকালে তোমাকে ঐ সুটকেশের ব্যাগেজ টিকিটের নাম্বারটা জানিয়ে দেব। খবর পেয়েছি, এয়ারপোর্টে কাল হেভি চেকিং-এর অ্যারেঞ্জমেণ্ট করা হয়েছে। যেভাবেই হোক সুটকেশটা তোমাকে বার করে আনতে হবে।'

পরমেশ্বর বলল, 'কিন্তু এটা তো সেপারেট ব্যাপার। আমি 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজের' ব্যাপারে কনট্রাক্ট নিয়ে এসেছি।'

সোমেশ্বর বললেন, 'আই অ্যাম কোয়াইট অ্যাওয়ার অফ ইট। এটা সেপারেট কনট্রাক্ট হবে। যে অ্যামাউণ্ট চাও তাতে আমি রাজী।'

'আপনার তো দেখছি স্যার, থাউজেণ্ড টাইপের অ্যাকটিভিটি।'

'যা বলেছ। ইন ফ্যাক্ট, আমার সঙ্গে যোগাযোগটা যখন হয়েই গেছে তোমাকে আর অন্যের কাজ করতে হবে না। আমার কাছে এত মালটিফেরিয়াস কাজ রয়েছে যে সেসব করতে করতে লাইফ কাটিয়ে দিতে পারবে।'

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'ক'টা কথা জানতে ইচ্ছে করছে।'

সোমেশ্বর বললেন, 'এক নম্বর দু নম্বর করে জিজ্ঞেস করে যাও। আমি উত্তর দিয়ে যাচ্ছি।'

'ফার্স্ট, ব্যাংককে যে ব্যাগেজ নাম্বার দেবে সেটা আপনি কলকাতায় বসে জানবেন কী করে?'

'ফ্লাইটের ঠিক এক ঘণ্টা আগে ব্যাগেজ নেবার জন্য এয়ারপোর্টে কাউণ্টার খোলে। আমার বন্ধু কাউণ্টার খুললেই ব্যাগেজ ঢুকিয়ে নাম্বারটা নিয়ে আরেকজনকে বলে দেবে। একটা লং ডিসট্যান্স লাইন আগে থেকেই আমার জন্যে 'বুক' করা আছে। নাম্বারটা পেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানিয়ে দেবে ওরা।'

'শুনেছি, ইণ্টারন্যাশনাল ফ্লাইটে মালপত্র দারুণ চেক করা হয়।'

'রাইট। চেক যাতে দারুণ না হয়, তার ব্যবস্থা ওখানে করা আছে। তবে আমাদের এখানে অ্যারেঞ্জমেণ্ট কিছুই করা যায় নি। তাই তোমার শরণ নেওয়া হয়েছে। এখন তোমাকেই সোভিয়ারের রোল নিতে হবে।'

'আমার সেকেণ্ড প্রশ্ন হল, ওই স্যুটকেশটায় কী আছে?'

'রণজয় হালদারের নামে ফরেন ব্যাঙ্কে তিন কোটি টাকার মতো রাখা হয়েছে। স্যুটকেশটায় তার কাগজপত্র রয়েছে। ওটা কাস্টমসের লোকেদের হাতে পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে সোমেশ্বর একটু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে রণজয় হালদার তো তুমিই। ব্রাদার তোমার কাগজপত্র তোমাকেই বার করে আনতে হবে।'

'আমাকে ফাঁসাবার সব রকম অ্যারেঞ্জমেণ্টই করে রেখেছেন দেখছি।'

সোমেশ্বর বেশ পরিতৃপ্ত ভঙ্গিতে জোরে জোরে শরীর ঝাঁকিয়ে হাসতে লাগলেন। ফোনের রিসিভারে কান রেখে তাঁকে যেন চোখের সামনে দেখতে পেল পরমেশ্বর। সে বলল, 'এবার আপনার সেই বন্ধুটির নাম বলুন।'

সোমেশ্বর হাসিতে ব্রেক কষতে কষতে বললেন, 'হাফেজ পীরভয়।'

'ডেসক্রিপসন?'

'টকটকে গায়ের রং, এরিয়ান চেহারা, চোখ নীলচে, হাইট সিক্স-সিক্স, এজ অ্যারাউণ্ড ফিফটি, ব্যাক ব্রাশ-করা চুল, পরনে থাকবে ধবধবে স্যুট, কোটের বাটন হোলে লাল গোলাপের কুঁড়ি। এনিথিং মোর?'

'আরেকটু—'

'কী?'

'স্যুটকেশটা বার করে আনার পর কী করব?'

'স্ট্রেট তোমার ফ্ল্যাটে নিয়ে যাবে। গিয়েই আমাকে ফোন করবে। কী করতে হবে, তখন জানিয়ে দেব। ও-কে?'

'ও-কে। স্যার কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলছি।'

'আরে মনে করার কী আছে। বলে ফেল, বলে ফেল—'

পরমেশ্বর বলল, 'আমি নিজে একটা পাঁড় হারামী কিন্তু স্যার আপনার মতো ফিনিশড প্রোডাক্ট লাইফে কখনও দেখি নি।'

'খচ্চর কাঁহিকা!' বলে আগের মতো গা দুলিয়ে হাসতে হাসতে লাইন কেটে দিলেন সোমেশ্বর।

টেলিফোনটা ক্রেডেলে নামিয়ে রাখতে রাখতে পরমেশ্বর ঠিক করে ফেলল, কালকের প্রোগ্রামটা চেঞ্জ করতে হবে। সকালে উঠে ক্যালকাটার আউটস্কার্টে বস্তির ভেতর তার সেই পুরনো অ্যাড্রেসে যাবার বদলে সোজা এয়ারপোর্টে চলে যাবে। এর আগেও এয়ারপোর্টে দু-একটা অপারেশন সে করেছে। তবে সেগুলো অন্য টাইপের।

এয়ারপোর্টে দু-একজনের সঙ্গে তার খুবই ঘনিষ্ঠতা আছে। মানে নানা ধরনের কেসের জন্য নানা জায়গায় কনট্যাক্ট তো রাখা দরকার। যাই হোক, কাল ভোরে গিয়ে সীয়াশরণকে ধরতে হবে। সে যেন টারমাকে যেতে তাকে একটু হেল্প করে। কিভাবে সে যাবে মনে মনে তা-ও ছকে নিয়েছে। তারপর দেখা যাক, কী করা যায়!

প্ল্যানটা ঠিক করে নেবার পর ডিভান থেকে নেমে নিজের বেডরুমের দিকে যাবার জন্য পরমেশ্বর সবে পা বাড়িয়েছে, আবার টেলিফোন বেজে উঠল। বিরক্ত চোখে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে ফোনটা তুলে নিল সে। এবার হেমার গলা শোনা গেল, 'ঘুমের ডিসটার্ব করলাম বোধহয়।'

পরমেশ্বর বলল, 'একেবারেই না। সবে চাট-ফাট দিয়ে মাল খাওয়া ফিনিশ করেছি। এবার ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়ব।'

'আমার ভয় ছিল ঘুমটা বুঝি নষ্ট করে দিলাম। এনিওয়ে যে জন্যে ফোন করা সেটাই বলি। কুকুরটা কোনরকম ট্রাবল দিচ্ছে না তো?'

'না-না, ফাইন কুকুর। একেবারে আমার বুকের ভেতর ঢুকে শুয়ে ছিল।'

'যাক, চিন্তা কাটল। অনেকদিন ধরে বন্ধুর বাড়ি আমার যাতায়াত। মার্ক করেছি কুকুর দুটো খুবই ওয়েল-বিহেভড্। ওটা এখন কী করছে?'

'আমার পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছে।'

'ওটাকে তুলে টেলিফোনের সামনে ওর মুখটা নিয়ে আসুন। দেখবেন কথা বলবে।'

সত্যিই কুকুরটার মুখ ফোনটার কাছে আনতে বার দুই নরম গলায় ঘেউ ঘেউ করে উঠল কুকুরটা। দারুণ ট্রেনিং তো! পরমেশ্বরের রিসিভাবে আটকানো রয়েছে নিজের কানটা। একটু সরিয়ে কুকুরটার একটা কান রিসিভারে লাগিয়ে দিল সে, যাতে দুজনেই শুনতে পায়।

ওধার থেকে আদরের গলায় হেমা কুকুরটাকে বলল, 'ডার্লিং, ডোণ্ট মিসবিহেভ উইথ ইয়োর নিউ মাস্টার। সব সময় ওঁর কাছে কাছে থাকবে। গুড নাইট টু বোথ অফ ইউ।'

পরমেশ্বর বলল, 'গুড নাইট।' তারপর ফোন রেখে কুকুরটাকে কোলে করে ডাইনিং রুমের দিকে চলে গেল।



কাঁটায় কাঁটায় সকাল সাতটায় টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল পরমেশ্বরের। বুকের কাছে সেই পিকিনীজ কুকুরটা গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। কুকুরটা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার ফেভারিট হয়ে উঠেছে। এত ফেভারিট যে এই ছ' ঘণ্টা এক সেকেণ্ডের জন্য তার সঙ্গ ছাড়ে নি। একেবারে স্টিকিং গামের মতো তার গায়ে আটকে থেকেছে।

যাই হোক, ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ ফোনটার দিকে তাকিয়ে রইল পরমেশ্বর তারপর হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে কানে ঠেকাতেই সোমেশ্বরের গলা ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে তার নার্ভগুলো টান-টান হয়ে গেল। আজ সারাদিন ঠাসা প্রোগ্রাম। স্টার্ট হবে এয়ারপোর্ট থেকে সিক্রেট ডকুমেণ্টে বোঝাই একটা স্যুটকেস হাপিস করে।

সোমেশ্বর বললেন, 'শোন, একটু আগে ব্যাংকক থেকে ফোন পেয়েছি। ওদের সঙ্গে কথা শেষ করেই তোমার লাইন ধরেছি।'

পরমেশ্বর বলল, 'ব্যাগেজের নাম্বারটা বলুন।'

'ব্যাগেজের নাম্বার দিয়ে কিছু হবে না। লাস্ট মোমেণ্টে প্ল্যানটা একটু চেঞ্জ করা হয়েছে।'

'আবার কী ঝামেলা পাকালেন স্যার?'

'ঝামেলা না; এখন ব্যাপারটা তোমার পক্ষে অনেক ইজি হয়ে যাবে।'

'বলে ফেলুন, আপনার ফ্রেণ্ড পীরভয় সাহেব মাল-টাল কোথায় ঢুকিয়ে আনছে?'

'ছোট্ট একটা হ্যাণ্ডব্যাগে। ব্যাংকক থেকে ওটা নিয়ে প্লেনে উঠতে অসুবিধা হচ্ছে না। সে অ্যারেঞ্জমেণ্ট করা হয়ে গেছে। কিন্তু মুশকিল বাধবে এখানে। প্লেন থেকে নেমে অ্যারাইভ্যাল লাউঞ্জে এলেই কাস্টমস আর পুলিশের লোকেরা আমার ফ্রেণ্ডটিকে ছেঁকে ধরবে। এয়ারক্র্যাফট

থেকে নেমে ভেতরে ঢুকবার আগেই তার কাছ থেকে হ্যাণ্ডব্যাগটা নিয়ে নিতে হবে। সময় পাবে তুমি ম্যাক্সিমাম দুই থেকে আড়াই মিনিট।' বলতে বলতে ব্রেক কষার মতো একটু থামলেন সোমেশ্বর। পরক্ষণেই ফের শুরু করলেন, 'এখন তুমি কিভাবে টারম্যাকে ঢুকে পীরভয়ের সঙ্গে কনট্যাক্ট করবে সেটা তোমাকে প্ল্যান করতে হবে। প্লেনটা ব্যাংকক থেকে ছাড়বে কাঁটায় কাঁটায় আটটায়; এখানে ল্যাণ্ড করবে এগারটা নাগাদ। এখন বাজে সাতটা। তার মানে ফ্রেণ্ডটিকে বাঁচাতে হলে এই ক' ঘণ্টার মধ্যে যা করবার তোমাকে করে ফেলতে হবে।'

পরমেশ্বর বলল, 'লাইনটা একটু ধরে থাকুন স্যার।'

'ঠিক আছে, ধরছি!'

পুরো এক মিনিট চুপচাপ কী ভাবল পরমেশ্বর। তারপর বলল, 'ও-কে স্যার সব ঠিক হয়ে যাবে। তার আগে একটা কথা—'

সোমেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, 'কী?'

'পীরভয় সাহেব আমাকে চিনবে কী করে?'

'আরে তোমাকে বলতেই ভুলে গেছি। পীরভয়কে জানানো হয়েছে, তোমার বুক পকেটে একটা লাল রুমালের খানিকটা বেরিয়ে থাকবে। তাতে থাকবে ইংরেজী 'N' লেটারটা। এটা দেখলে তোমাকে উনি ডিটেক্ট করতে পারবেন। যেমন করে পারো একটা 'N' লেটার মার্কা লাল রুমাল যোগাড় করে ফেল।'

'নো প্রবলেম স্যার। এবার আপনি লাইন ছেড়ে দিন। আমি আরেকটু ঘুমিয়ে নিই। আপনি স্যার কাঁচা ঘুমটার কিচাইন করে দিয়েছেন।'

সোমেশ্বর প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন, 'এখন ঘুমোলে এয়ারপোর্টে যাবে কখন?'

পরমেশ্বর বলল, 'আপনি স্যার ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে ভেবে ব্রেনের ডায়নেমো ফিউজ করে ফেলবেন না। নো মোর স্যার, লাইন ছাড়ছি।' বলেই ফোনটা দুম করে নামিয়ে ফের স্ট্রেট শুয়ে পড়ল। পিকিনীজ কুকুরটাও তার বুকের কাছে ঘন হয়ে ঘুমোতে লাগল।

ঘণ্টাখানেক পর বিছানা থেকে উঠে শেভ-টেভ করে ওয়ার্ডরোব হাতড়াতে হাতড়াতে সত্যি সত্যিই একটা লাল রুমাল পেয়ে গেল পরমেশ্বর। বেয়ারা ছোটি সিংকে দিয়ে একটা ছুঁচ আর সাদা সুতো আনিয়ে দশ মিনিটের ভেতর একটা 'N' অক্ষর বানিয়ে ফেলল। ত্যরপর রুমালটা ভাঁজ করে এমনভাবে বুক পকেটে গুঁজে রাখল যাতে অক্ষরটা বাইরে বেরিয়ে থাকে।

রুমালের ব্যাপারটা কমপ্লীট হয়ে যাবার পর চা আর ব্রেকফাস্ট চুকিয়ে

কুকুরটাকে আদর টাদর করে পরমেশ্বর এয়ারপোর্টের বদলে সোজা চলে এল পার্ক সার্কাসে। ওখানে এয়ারপোর্ট পোর্টারদের হেড মেট সীয়াশরণ থাকে। সীয়াশরণ তার অনেক কালের ফ্রেণ্ড। কয়েক বছর আগে এক ইণ্টারন্যাশনাল স্মাগলারের কনট্রাক্ট নিয়ে বার কয়েক তাকে এয়ারপোর্টে যেতে হয়েছিল। এ ব্যাপারে সীয়াশরণ তাকে দারুণ সাহায্য করেছিল। পরমেশ্বর জানে, সীয়াশরণ এবারও তাকে ফেরাবে না।

পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপোর কাছে একটা পুরনো একতলা বাড়ি সীয়াশরণের অ্যাড্রেস। সীয়াশরণ বাড়িতেই ছিল। পরমেশ্বরকে অনেকদিন বাদে দেখে সে দুর্দান্ত খুশী। এতদিন সে কোথায় ছিল, কাম-কাজ কী করছে, সাদী-উদি হয়েছে কিনা, নাকি পুরনো ধান্দা নিয়েই রয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথার ফাঁকে ফাঁকে নতুন করে চা-ফা চলল। তারপর মওকা বুঝে দুম করে আসল ব্যাপারে চলে এল পরমেশ্বর। অর্থাৎ যেমন করে হোক তাকে ট্যারম্যাকে ঢুকিয়ে দিতে হবে।

সীয়াশরণ কপাল কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'মতলব কী রে হারামী? গড়বড় কুছ?'

পরমেশ্বর চোখ টিপে একটু হাসল।

সীয়াশরণ ফের বলল, 'আমাকে শালা ফাঁসাবি না তো? আজ কী একটা ঝামেলার ব্যাপার আছে। শুনছিলাম কাস্টমস আর পুলিসের লোকেরা কাকে ধরবার জন্যে এয়ারপোর্টে রেইড করবে। কিছু ইধার-উধার হলে আমার নোকরি তো খতম হবেই, জেলে বসে লাপসি খেতে হবে।'

পরমেশ্বর সীয়াশরণের নাকে একটা টুসকি মেরে বলল, 'আমার হাতের কাজ কি রকম ক্লীন, তুমি তো জানোই। কেনো মাকড়া তোমাকে টাচ করতে পারবে না গুরু।'

'ঠিক হ্যায়। আগের মতো একটা পোর্টারকে বসিয়ে তোমাকে টেম্পোরারি বানিয়ে নেব। লেকিন দেখিস ভাইয়া, আমার বারোটা বাজাস না।'

'ঘাবড়াও মাত গুরু। নো ওরি। স্রেফ আমার হাতের খেল দেখে যেও। তুমি আমার এত উপকার কর, আর আমি তোমাকে ফাঁসাব। আমার শালা পাপ-ফাপের ভয় নেই!'

'ঠিক আছে। তুমি তা হলে এয়ারপোর্টেই চলে এসো।'

'কখন যাব?'

'বারোটায়।'

'উঁহু, উঁহু। দশটায় যেমন করে হোক আমাকে 'ইন' করিয়ে দিতে হবে।'

'কিন্তু বারোটায় যে আমার ডিউটি।'

'ডিউটি যখনই হোক, দশটায় আমাকে এয়ারপোর্টে ঢুকতেই হবে।'

একটু ভেবে সীয়াশরণ বলল, 'ঠিক আছে। তোমার জন্যে তা হলে দু' ঘণ্টা আগে গিয়েই হাজির হব। ভাল কথা, যাবার সময় সস্তা ফাটাফুটো জামাপ্যাণ্ট পরে আসবে।'

'কেন গুরু?'

'অন্য পোর্টারদের বোঝাতে হবে তো, তোমার পোর্টারগিরিটা বহোত জরুরী।'

'ঠিক বলেছ গুরু। আগে এটা আমার মাথায় আসে নি। আচ্ছা, তা হলে এখন উঠলাম। ফির মিলেঙ্গে।'

'আচ্ছা। দেখো ভাইয়া, আমি গরিব আদমী—'

হাত তুলে সীয়াশরণকে নিশ্চিন্ত থাকার সিগন্যাল দিয়ে চলে গেল পরমেশ্বর।



সীয়াশরণের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরমেশ্বর প্রথমে এল ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের একটা গ্যারেজে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান গ্যারেজওলা ফ্রিসকিনের সঙ্গে তার অনেক কালের খাতির। লোকটা মিডল-এজেড, দুর্দান্ত মেকানিক, প্রচন্ড হেল্‌থ্‌। তবে ফ্রিসকিনের যে ব্যাপারটা তার সব চাইতে ভালো লাগে, সেটা হল ড্রিঙ্ক। বিলাতি-ফিলাতি না, স্রেফ বাংলা মাল। সোনার বাংলার এ রকম অ্যাডমায়ারার ওয়ার্ল্ডে দু' চারটের বেশী জন্মায় নি। পাকি দু-বোতল স্টমাকে পুরে ফেললেও তার মাথা এক মিলিমিটার কোন দিকে হেলবে না, স্ট্রেট খাড়া হয়ে থাকবে। জগদীশের শুঁড়িখানায় ফ্রিসকিনের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল পরমেশ্বরের। আলাপ থেকে ফ্রেণ্ডশিপ। হাতে খানিকটা ফালতু টাইম পেলেই সে এই গ্যারেজে এসে চুটিয়ে আড্ডা মেরে যায়। অবশ্য শুধু আড্ডার জন্যই সে এখানে আসে না। তার যা প্রফেশন তাতে অনেক সময় দামী মডেলের ইমপোর্টেড কার থেকে স্কুটার, মোটর সাইকেল, স্পোর্টস কারের দরকার হয়ে পড়ে। ফ্রিসকিনের 'ইণ্টার-কণ্টিনেণ্টাল গ্যারেজ' থেকে মাঝে মাঝে দু'চার দিনের কিংবা দু-চার ঘণ্টার জন্য গাড়ি-ফাড়ি নেয়। অবশ্য সে জন্যে ন্যায্য ভাড়াও দিয়ে থাকে। ফ্রেণ্ডশিপ এক ব্যাপার, প্রফেসন আরেক ব্যাপার। দুটোকে কখনই মেশায় না পরমেশ্বর।

আজও খানিকক্ষণ আড্ডা দেবার পর ফ্রিসকিনের কাছ থেকে একটা মোটর সাইকেল ভাড়া করে বেরিয়ে পড়ল পরমেশ্বর।

আরো আধ ঘণ্টা বাদে দেখা গেল, এয়ারপোর্টের পার্কিং জোনে মোটর সাইকেলটা রেখে ছেঁড়া চিটচিটে ময়লা ট্রাউজার আর শার্ট-পরা পরমেশ্বর মেইন বিল্ডিং-এ ঢুকছে।

বিশাল কাচের দরজার ওধারে পোর্টারের ড্রেসে সীয়াশরণ তারই জন্য দাঁড়িয়েছিল। পরমেশ্বর ঢোকা মাত্র সে তাকে নিয়ে ইণ্টারন্যাশনাল উইংয়ের দিকে যেতে যেতে বলল, 'পুরা ইন্তেজাম করে রেখেছি। অন্য পোর্টারদের বুঝিয়ে

বলেছি তোমার রুপাইয়ার বহোত জরুরত। একটা কাম-কাজ না হলে ভুখা মরে যাবে। তাই ওরা তোর টেম্পোরারি কামে রাজী হয়েছে। বলেছি, বদলির কাম করবে তুমি। একদিন কেউ না এলে তুমি তার হয়ে করবে। রোজ কেউ-না-কেউ ডুব মারে, আজও মেরেছে। তুমি তার হয়ে কাজ করতে যাচ্ছ।'

পরমেশ্বর বলল, 'কিন্তু কাল থেকে আমি আর আসব না। তখন?'

'তখন ওদের বলব, আচানক তুমি একটা নোকরি পেয়ে গেছ, তাই আসো নি।'

'তুমি গুরু খলিফা মাল।'

'লেকেন এক বাত পরমেশ্বর—'

'বল।'

'এয়ারপোর্ট বহোত গরম। মালুম হচ্ছে, সি-আই-ডি-র লোকেরা ভিজিটার আর প্যাসেঞ্জারের ভেতর ঘুষে আছে। হোঁশিয়ার—'

'ডরো মাত ভাইয়া।'

সীয়াশরণ পরমেশ্বরকে নিয়ে একটা ঘরের ভেতর চলে এল। এই ঘরটা পোর্টারদের।

এখন ঘরে আর কেউ নেই। পোর্টারদের জন্য নির্দিষ্ট এক সেই ইউনিফর্ম বার করে সীয়াশরণ বলল, 'ড্রেসটা পরে নাও।'

ড্রেস পালটে ওরা বেরিয়ে এল। এরপর দু'মিনিটের মধ্যে অন্য পোর্টারদের ঝাঁকে পরমেশ্বর আর সীয়াশরণ মিশে গেল। সীয়াশরণ যদিও পোর্টারদের সঙ্গে পরমেশ্বরের আলাপ করিয়ে দিল, কিন্তু এখন কারো কথা বলার সময় নেই। এইমাত্র টোকিও আর লন্ডন থেকে ইস্ট আর ওয়েস্ট বাউন্ড দুটো প্লেন এসে ল্যান্ড করেছে। পোর্টাররা টেরিফিক বিজি। তারা দারুণ ব্যাস্তভাবে অ্যারাইভ্যাল লাউঞ্জ আর কনভেয়র বেল্ট লাগানো লাগেজ রুমের দিকে দৌড়ুতে লাগল।

পোর্টারদের দু-ধরনের ডিউটি। একদল প্লেন ল্যান্ড করার পর এয়ার-ক্লাফটের পেট থেকে মালপত্র বার করে লাগেজ রুমে নিয়ে আসে। এরা ডাইরেক্ট এমপ্লয়ী। প্যাসেঞ্জার চাইলে আরেক দল লাগেজ রুম থেকে এয়ারপোর্টের বাইরে ট্যাক্সি কি প্রাইভেট কারে এনে মাল তুলে দিয়ে যায়। এরা কনট্র্যাক্ট সারভিসের লোক।

সীয়াশরণ পরমেশ্বরকে ডাইরেক্ট এমপ্লয়ী অর্থাৎ এয়ারক্র্যাফট থেকে মাল নিয়ে আসার কাজে লাগিয়েছে।

একটু পর দেখা গেল পরমেশ্বর আর সীয়াশরণ কথা বলতে বলতে রানওয়েতে এসে ঢুকল। চারদিকে সিকিউরিটির লোকেরা ঘোরাঘুরি করছে। তা ছাড়া রাইফেল হাতে অজস্র আর্মড পুলিস। যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, হেভী গার্ড।

সীয়াশরণ কানের কাছে মুখ এনে কাঁপা গলায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'দেখছ তো কি রকম পুলিস দিয়েছে। অন্য দিন এত সিকিউরিটির লোক থাকে না। দেখো ভাইয়া, বালবাচ্চা যেন পথে না বসে।'

সকালবেলার মতোই সীয়াশরণের নাকে আরেক দফা টুসকি মেরে পরমেশ্বর বলল, 'আমার ওপর ভরসা রাখো গুরু। ফাঁসলে আমিই ফাঁসব। তোমার চামড়ায় কাউকে নখ বসাতে দেব না। ও-কে "বস্"?'

সীয়াশরণ আর কিছু বলল না।

এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে টারম্যাকে আসার সময় ঘড়ি দেখে নিয়েছিল পরমেশ্বর। এখন দশটা বেজে কুড়ি একুশ হবে। ব্যাংককের প্লেনটা আসবে এগারটা পনেরতে। তার মানে এখনও ঘন্টাখানেকের মতো সময় হাতে রয়েছে।

পরমেশ্বরের টার্গেট ব্যাংককের প্লেনটা। কিন্তু এখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে পরে শুধু ওটার পেট থেকেই সে যদি মালপত্র বার করে, তা হলে সন্দেহ হবার কথা। তা ছাড়া সিকিউরিটির লোকেরা নিশ্চয়ই চারদিক থেকে নজর রাখছে। কাজ-টাজ না করে অকারণে দাঁড়িয়ে থাকলে কারো-না-কারো চোখে অবশ্যই পড়ে যাবার সম্ভাবনা। তাতে কাজ তো হবেই না, ফালতু ঝামেলাও হয়ে যেতে পারে। তাই চোখে ধুলো দেবার জন্য জাপান থেকে আসা প্লেনটার দিকে চলে গেল পরমেশ্বর।

বিরাট বোয়িং প্লেনটার গায়ে আগেই সিঁড়ি লাগানো হয়েছিল। প্যাসেঞ্জাররা নামতে শুরু করেছে। এয়ারক্র্যাফটের গেট এইমাত্র খোলা হয়েছে। অনেকগুলো পোর্টার প্লেনের ডানার তলায় দাঁড়িয়েছিল। তারা দ্রুত হাত চালিয়ে সুটকেশ, বাস্কেট, ঢাউস্ ঢাউস স্টীল এবং বেতের বাক্স নামিয়ে পাশের লম্বা ট্রলিগুলোতে রাখতে লাগল। পরমেশ্বরও তাদের সঙ্গে হাত লাগাল।

এয়ারক্র্যাফটের পেটের খোল পরিষ্কার করতে মিনিট কুড়ি বাইশ লেগে গেল। তারপর পরমেশ্বর ছুটল লন্ডন থেকে আসা ইস্ট-বাউন্ড প্লেনটার দিকে। সেটার মালপত্র ট্রলিতে তুলতে তুলতে ব্যাংককের প্লেন এসে বাজপাখির মতো ছোঁ দিয়ে রানওয়ের ওপর নেমে পড়ল। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে খানিকটা দৌড়ে টার্মিনাল বিল্ডিং থেকে তিন সাড়ে-তিনশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে গেল।

প্লেনটা দেখতে দেখতে হাত-পায়ের মাস্‌ল্‌গুলো এবং চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল পরমেশ্বরের। দ্রুত চারপাশটা একবার দেখে নিল সে। নতুন কিছুই চোখে পড়ছে না। প্লেনটা নামার আগে যেমন ছিল অ্যাটমসফীয়ার, ঠিক তাই রয়েছে। দূরে আর্মড গার্ডরা আগের মতোই দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবে সিক্রেট পুলিস কোন গোপন জায়গায় ওত পেতে বসে লক্ষ্য রাখছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

চারদিক দেখতে দেখতে ইন্টারন্যাশনাল উইংয়ের ভিজিটর্স লাউঞ্জে চোখ গেল পরমেশ্বরের। ওখানে এখন অগুনতি ভিজিটরের ভিড়। প্লেনে করে যারা ইস্ট কিংবা ওয়েস্ট থেকে এল, এয়ারপোর্ট থেকে তাদের নিয়ে যাবার জন্য আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবরা এসে এখানে দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যাংককের প্লেনটা থামার সঙ্গে সঙ্গে চাকা বসানো সিঁড়ি নিয়ে কয়েকটা লোক সেদিকে চলে গেল। ওদিকে এয়ারক্র্যাফটার পেটের দিকটা খুলে গেছে। কয়েকটা ট্রলি মাল আনার জন্য ছুটে গেল; পোর্টাররাও ছুটল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বরও ছুটল।

এয়ারক্র্যাফটের পেট থেকে অন্য পোর্টারদের সঙ্গে মাল বার করতে করতে পরমেশ্বর নজর রাখতে লাগল, কখন প্যাসেঞ্জাররা প্লেন থেকে নামবে।

মিনিট তিন-চারেকের মধ্যে লোকজন সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের নার্ভগুলোকে টান টান করে দাঁড়িয়ে পড়ল পরমেশ্বর এবং প্যান্টের পকেট থেকে সেই লাল রুমালটা বার করে বুক পকেটে এমনভাবে রাখল যাতে বাইরে থেকে 'N' অক্ষরটা দেখা যায়। রুমালটা সে লুকিয়ে নিয়ে এসেছিল।

সিঁড়ি দিয়ে প্যাসেঞ্জাররা নেমে যাচ্ছে। নানা দেশের নানা চেহারার মানুষ। ইন্ডিয়ান, আমেরিকান, ফিলিপিনো এবং ফার ইস্টের নানা দেশের সিটিজেন। আচমকা পরমেশ্বরের চোখে পড়ল সাড়ে ছ' ফুট লম্বা, টকটকে কমপ্লেকসান, পুরো এরিয়ান চেহারা, কোটের বাটনহোলে গোলাপের কুঁড়ি।

সোমেশ্বর যেমন যেমন ডেসক্রিপশন দিয়েছিলেন, হুবহু সেই চেহারার একটি প্যাসেঞ্জার দারুণ সতর্ক ভঙ্গীতে চারপাশ দেখতে দেখতে অন্য সবার সঙ্গে নেমে আসছে। তার হাতে একটা এক ফুটের মতো লম্বা এবং ইঞ্চি দেড়েকের মতো পুরু হ্যান্ডব্যাগ।

চোখের কোণ দিয়ে দ্রুত একবার পোর্টারদের দেখে নিল পরমেশ্বর। সবাই দারুণ ব্যস্ত। তার দিকে তাকাবার সময় কারো নেই। আস্তে আস্তে সে এয়ারক্র্যাফটের তলা থেকে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

একটা সুবিধা হয়েছে পরমেশ্বরের পক্ষে। ব্যাংককের এই প্লেনটার কয়েক গজ সামনে জাপানের বোয়িং প্লেনটা এমনভাবে আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে আছে যাতে টার্মিনাল বিল্ডিং-এর অনেকটা অংশ আড়ালে পড়ে গেছে। ফলে ওদিক থেকে ব্যাংককের প্লেনটার ওপর নজর রাখতে খুবই অসুবিধা হবার কথা।

সিঁড়ির গা ঘেঁষে ঘেঁষে এগুতে লাগল পরমেশ্বর। হাফেজ পীরভয় একেবারে শেষ স্টেপে চলে এসেছে। যা করবার তিন-চার সেকেন্ডের মধ্যে করে ফেলতে হবে। কেন না, ট্যারম্যাকে নেমে কয়েক ফুট ডান দিকে

ঘুরলেই জাপানের বোয়িং প্লেনটার আড়াল সরে যাবে। তারপর কয়েক পা গেলেই ইন্টারন্যাশন্যাল উইং-এর অ্যারাইভ্যাল লাউঞ্জ। জাপানের প্লেনটার ওধারে গেলেই আড়ালের সুযোগ আর নেওয়া যাবে না। ওখানে কিছু করতে গেলেই কারো চোখে পড়ে যাবেই।

হাফেজ পীরভয় যেই টারম্যাকে পা দিয়েছে, পরমেশ্বর বেড়ালের মতো নিঃশব্দে তার গা ঘেঁষে এসে চাপা নিচু গলায় বলল, 'রেড হ্যান্ডকারচিফ, 'N' লেটার স্যার, প্রসীড। ডোণ্ট লুক অ্যাট মী।' বলে অন্যদিকে তাকাতে তাকাতে এমনভাবে চলতে লাগল যাতে মনেই হয় না হাফেজ পীরভয়ের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে।

তাকাতে বারণ করেছে। তবু চোখের কোণ দিয়ে দ্রুত একবার পরমেশ্বরের জামার পকেটে লাল রুমাল এবং "N" অক্ষরটা দেখে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল হাফেজ পীরভয়।

অন্য প্যাসেঞ্জাররা লম্বা ফ্লাইটের পর এখন এয়ারপোর্টে গিয়ে বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। কোন্ পোর্টার কোন্ প্যাসেঞ্জারের গা ঘেঁষে চলছে, সেদিকে কেউ লক্ষ্যও করল না।

হাঁটতে হাঁটতে পরমেশ্বররা যখন জাপানের বোয়িংটার একেবারে কাছে চলে এসেছে, তখন বিশাল পাখির মতো প্লেনটার ওপাশে টার্মিনাল বিল্ডিংটা পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেছে। এই হলো লাস্ট চান্স এবং এর চাইতে ভাল সুযোগ আর কখনও আসবে না।

চোখের পাতা পড়তে-না-পড়তেই জামার বোতামগুলো পটাপট খুলে ফেলল পরমেশ্বর। তারপর পিঠ দিয়ে অন্য প্যাসেঞ্জারদের পুরোপুরি আড়াল করে বলল, 'গিভ মী দ্য ব্যাগ। কুইক!'

একদিকে পরমেশ্বরের পিঠের দেওয়াল, আরেক দিকে বোয়িং প্লেন। মাঝখানে তিন-চার ফুট জায়গার ভেতর ওরা কী করছে কেউ দেখতে পেল না। ওদের কথাও কারো কানে গেল না।

হাফেজ পীরভয় দ্রুত হ্যাণ্ডব্যাগটি পরমেশ্বরের হাতে চালান করে দিল। পরমেশ্বর ব্যাগটা জামার ভেতর ঢুকিয়ে দু-সেকেণ্ডের মধ্যে নিচে নামিয়ে একেবারে প্যাণ্টের ভেতর ঢুকিয়ে দিল। প্ল্যান করেই ঢলঢলে একটা প্যাণ্ট পরে এসেছিল সে। কেননা, টাইট প্যাণ্ট পরলে ভেতরে অন্য কিছু থাকলে চট করে চোখে পড়বে। যাই হোক, প্যাণ্টের ভেতর প্ল্যাস্টিকের একটা জ্যাকেট রয়েছে, হ্যাণ্ডব্যাগটা সেখানে ঢুকিয়ে জামার বোতামগুলো লাগাতে লাগাতে লম্বা লম্বা পা ফেলে জাপানের বোয়িংটার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। হাফেজ পীরভয়ের দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। প্লেনের

আড়ালটা সরে যাবার পর হঠাৎ দূরে দোতলায় ভিজিটর্স গ্যালারির দিকে চোখ গেল পরমেশ্বরের। অগুনতি ভিজিটরের মধ্যে একজনের ওপর দৃষ্টিটা কিছুক্ষণের জন্য আটকে গেল। কেননা, প্রথমতঃ সে একটি ইয়াং গার্ল। দ্বিতীয়তঃ তার চোখে বাইনাকুলার। বাইনাকুলার না থাকলে এই ভিড়ের ভেতর সে তাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করত না। ভিজিটর্স গ্যালারিতে এই মেয়েটি ছাড়া আর কারো চোখে বাইনাকুলার নেই।

কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভীষণ চমকে উঠল পরমেশ্বর। মেয়েটা তার খুবই চেনা—হেমা সারিন।

এখন, এই মুহূর্তে হেমাকে এয়ারপোর্টের ভিজিটার্স লাউঞ্জে দেখা যাবে, এটা ভাবতে পারে নি পরমেশ্বর। চোখে দূরবীন সেট করে সে কাকে মার্ক করছে? জাপান ব্যাংকক কিংবা লণ্ডনের ইস্ট আর ওয়েস্ট বাউণ্ড প্লেনগুলোর কোন একটায় তার কোন রিলেটিভ বা ফ্রেণ্ড এসেছে কি? ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। হেমার ব্যাপারে মনে একটা খিঁচ লেগে রইল পরমেশ্বরের। যাই হোক, সে আর এক সেকেণ্ডও দাঁড়াল না।

হাফেজ পীরভয় অন্য প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে ইণ্টারন্যাশনাল উইংয়ের অ্যারাইভ্যাল লাউঞ্জে ঢুকে গেছে। পরমেশ্বর ফের ব্যাংককের প্লেনটার পেটের তলায় চলে এল। এখনও এয়ারক্র্যাফট থেকে মালপত্র বার করা হচ্ছে। অন্য পোর্টারদের মতো পরমেশ্বরও ব্যাগেজ বার করে ট্রলিতে রাখতে লাগল।

পর পর তিনটে ট্রলি দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখতে দেখতে সামনের ট্রলিটা লটবহরে বোঝাই হয়ে গেল। মালপত্র এত বেশী যে পাহাড়ের মতো ডাঁই হয়ে আছে। চার বগীওলা ট্রলিটার একেবারে শেষ বগীতে মালপত্রের পেছনে উঠে বসলে এয়ারপোর্টের দিক থেকে কেউ দেখতে পাবে না। তা ছাড়া যদি দ্যাখেও, কেউ তাকে সন্দেহ করবে না। ভাববে, ট্রলির মালপত্র এয়ারপোর্টের লাগেজ রুমের কনভেয়র বেল্টে তুলে দেবার জন্য সে এসেছে। কিন্তু হেমা—হেমা সারিন? হেমার কথাটা মাথার ভেতর থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলা যাচ্ছে না।

যাই হোক, ট্রলির পেছনে উঠে লাগেজ রুমের কাছে চলে এল পরমেশ্বর। সে যেখানে এসেছে, সেখানে তার মাথার ওপর চওড়া কার্নিস। কার্নিসটা থাকার জন্য ওপর থেকে এ জায়গাটা দেখা যায় না।

পরমেশ্বর একাই নয়, অন্য তিন-চারজন পোর্টারও ট্রলিটার সঙ্গে এসেছিল। তারা অবশ্য তার মতো মালপত্রের পেছনে লুকিয়ে আসে নি। একেবারে সামনের দিকে ড্রাইভারের কেবিনের পাদানিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসেছে।

অন্য পোর্টারদের সঙ্গে দু-চারটে স্যুটকেস-টুটকেস কনভেয়র বেল্টে রাখতে লাগল পরমেশ্বর। ট্রলিটা ফাঁকা হয়ে গেলে পোর্টাররা আবার যখন মাল আনার জন্য সেটা নিয়ে এয়ারক্র্যাফটের দিকে ফিরে গেল, সেই সময় পরমেশ্বর কিন্তু তাদের সঙ্গে গেল না। কার্নিসের তলা দিয়ে দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল উইংয়ের দিক থেকে ডোমেস্টিক অ্যারাইভ্যালের কাচের দরজা দিয়ে টার্মিনাল বিল্ডিং-এর ভেতর ঢুকে পড়ল।

ডোমেস্টিক লাউঞ্জেও হেভী গার্ডের ব্যবস্থা। কিন্তু পোর্টারের ইউনিফর্মপরা পরমেশ্বরের দিকে কেউ তাকালোও না।

ডোমেস্টিক অ্যারাইভ্যালের লাউঞ্জ পার হতে হতে সতর্ক ভঙ্গিতে চারদিক দেখছিল পরমেশ্বর। এখান থেকে তিন-চারশো গজ দূরে সুবিশাল লবি পেরিয়ে ইন্টারন্যাশনাল উইংয়ের বিরাট কাচের পার্টিশান ওয়াল। ওয়ালের গায়েই ভেতরে ঢোকার দরজা।

পরমেশ্বর বড় বড় পা ফেলে বাঁ দিকে হাঁটতে লাগল। এয়ারপোর্ট থেকে বেরুবার দরজাটা এদিকেই। এটা ডোমেস্টিক লাউঞ্জের 'একজিট'। ইন্টারন্যাশনাল উইংয়ের দিকেও একটা 'একজিট' রয়েছে।

পরমেশ্বর যখন একজিটের কাছে চলে এসেছে, সেই সময় আচমকা চোখে পড়ল ইন্টারন্যাশনাল উইংয়ের কাচের দেয়ালের ওধারে ভিজিটার্স লাউঞ্জের সিঁড়ি বেয়ে ঝড়ের মতো নেমে আসছে হেমা আর দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে-ফিরিয়ে চারদিক দেখছে। তার কাঁধে সেই বাইনোকুলারটা।

এক সেকেণ্ড থমকে দাঁড়িয়ে রইল পরমেশ্বর। তারপর ঝট করে একজিট পেরিয়ে স্ট্রেট পার্কিং জোনে। ভাড়াকরা সেই মোটর বাইকটায় উঠে চোখের পলক পড়তে-না-পড়তেই স্টার্ট দিল।

টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের পাশ থেকে যে রাস্তাটা সিটির দিকে গেছে, সেখানে পর পর ক'টা বাম্প কোন রকমে পেরিয়েই দারুণ স্পীড তুলল পরমেশ্বর।

দু-মিনিটের ভেতর এয়ারপোর্টের কম্পাউণ্ড পেরিয়ে অ্যাসফাল্টে মোড়া ঝকঝকে বিশাল রাস্তায় এসে পড়ল পরমেশ্বর।

আরো মিনিট পাঁচেক চালাবার পর হঠাৎ পরমেশ্বর মোটর বাইকের সামনের ছোট্ট মিররটায় দেখতে পেল, একটা জীপ রকেটের গতিতে ছুটে আসছে, আর সেটার ফ্রন্ট সীটে স্টীয়ারিং হাতে যে বসে আছে সে হেমা সারিন।

তা হলে? হেমা কি তাকে 'চেজ' করছে? তার জন্যই কি ছুকরীটা আজ এয়ারপোর্টে এসেছিল? কী চায় হেমা? সত্যি সত্যিই সে ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের বিজনেস করে, না অন্য কিছু? এমনি গাদা গাদা প্রশ্ন পরমেশ্বরের মাথার ভেতর তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল।

জীপটা যে স্পীডে আসছে তাতে পরমেশ্বরকে ধরে ফেলতে তিন-চার মিনিটও লাগবে না। মোটর বাইকের চাইতে জীপের স্পীড অনেক বেশী। এই অল্প সময়ের মধ্যেই যা করবার করে ফেলতে হবে। কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর ডিসিসান নিয়ে নিল পরমেশ্বর। রাস্তাটা টু-ওয়ে, মাঝখানে বুলেভার। বুলেভার একেবারে টানা নয়, খানিকটা পর পর এক লেন থেকে আরেক লেনে যাবার জন্য ফাঁক রয়েছে। পরমেশ্বর স্পীডের মাথায় সট্ করে একটা টার্ন নিয়েই ডান ধারে ঘুরল। ওধারে বড় রাস্তার গা থেকে একটা সরু রাস্তা বেরিয়ে গেছে। পরমেশ্বর সোজা সেই রাস্তায় গাড়ি ঢুকিয়ে দিল।

এদিকটায় নতুন টাউনশিপ গড়ে উঠেছে। যেদিকে তাকানো যাক, অগুনতি নতুন নতুন বাড়ি, ফাঁকে ফাঁকে রাস্তা। এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরে নতুন টাউনশিপ পেরিয়ে এল পরমেশ্বর। টাউনশিপটার গায়েই জবরদখল কলোনি, কিছু ফ্যাক্টরি, ওয়ার্কারদের থাকার বস্তি-টস্তি। সে সবের ভেতর দিয়ে অনেক ঘুরে রাস্তা দিয়ে দেড়টার সময় সিটির নর্থ আউটস্কার্টে বস্তির ভেতর তার সেই পুরনো এড্রেসে এসে উঠল।

এয়ারপোর্টের সেই রাস্তা থেকে টার্ন নিয়ে নতুন টাউনশিপে ঢোকার পর হেমার জীপটা আর দেখতে পায় নি পরমেশ্বর। হেমা যদি সত্যি সত্যিই তাকে ফলো করে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারে নি, ওভাবে অত স্পীডে সে ডাইনে মোটর বাইক ঘোরাবে। 'চেজ' করে থাকলে হেমা নিশ্চয়ই টাউনশিপে ঢুকে খোঁজাখুঁজি করেছে, কিন্তু তাকে ধরতে পারে নি। আর যদি ফলো করে না থাকে তা হলে আলাদা কথা। সোজা এয়ারপোর্টের রাস্তা ধরে সিটির দিকে চলে গেছে।

পুরনো ঠিকানায় আসার কারণ তিনটে। নাম্বার ওয়ান, পরমেশ্বরের পরনে পোর্টারের ইউনিফর্ম। এই ড্রেসে 'ওভারসীজ ইমপোর্ট অ্যাণ্ড এক্সপোর্টের' ম্যানেজিং ডিরেক্টর রণজয় হালদার হয়ে তো আর সার্কুলার রোডের অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে ঢুকতে পারে না। সেখানে 'ইন' করার আগে এই খোলস ছেড়ে দামী ট্রাউজার পরা দরকার। নাম্বার টু, লোলেকে অমিতাভ সেনের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সে ঢোকাবার জন্য একটা স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট, আর একজন গেজেটেড অফিসারের ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট জাল করতে হবে! জাল করার মেসিন-টেসিন সব এখানে রয়েছে। সেগুলো নিয়ে যেতে হবে। এই দুটো কারণ ছাড়াও লোলেদের সঙ্গে অনেকদিন দেখাটেখা হয় নি। ভেতরে ভেতরে ওদের দেখতেও ইচ্ছে করছিল।



পরমেশ্বরকে ক'দিন পর দেখে সবাই দারুণ খুশী।

ছর্‌রা আর লাট্টু তক্ষুণি তার দুটো ঠ্যাং কোলের ওপর তুলে নিয়ে টিপতে লাগল। এক দেড় সপ্তাহ ম্যাসাজ করতে পারে নি তারা।

ছর্‌রা বলল, 'তোমার টেংরি ক'দিন দাবাই নি। আমাদের হাতে জং ধরে যাচ্ছে গুরু।'

ঠ্যাং দুটো আরেকটু ছড়িয়ে দিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'টেপ মাকড়ারা, প্রেমসে টিপে যা।'

লক্ষ্মী দৌড়ে চা করে নিয়ে এল। টগর একটা হাতপাখা এনে হাওয়া করতে বসল।

পরমেশ্বরের ইণ্টারন্যাশনাল ফ্যামিলির হেড এলিজাবেথ কাছে বসে বলল, 'কি রে, তোর কাজ কবে শেষ হবে?'

পরমেশ্বর বলল, 'বেশী দেরি হবে না। অপারেশন ফিনিস করে এনেছি।'

'তুই এখানে নেই, আমাদের একেবারে ভালো লাগে না।'

'আর ক'টা দিন মাদার। তার পরেই তোমার "সান" তোমার কোলে রিটার্ন করছে।'

লোলে এধারে দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে দারুণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরমেশ্বরকে দেখছিল। আঙুল দিয়ে পোর্টারের ইউনিফর্মটা দেখিয়ে সে বলল, 'এ কি ড্রেস তোমার, গুরু?'

পরমেশ্বর বলল, 'একটা অপারেশনের জন্য বডিতে এই ড্রেস তুলতে হয়েছে। তারপর বল্‌, তোরা কেমন আছিস?'

'ভালই আছি গুরু। তবে দু-তিন দিন ধরে মনে হচ্ছিল, তুমি মাইরি, আমাদের বুঝি ভুলেই গেছ। অপারেশনের বাহানা করে এই যে স্লিপ কেটে

বেরিয়ে গেলে আর হয়ত এখানে ভিড়বে না। বেফায়দা এত লোকের ঝামেলা কে আর কাঁধের ওপর চড়িয়ে হোল লাইফ কাটাতে চায় বল?'

'শালা হারামী কাঁহিকা—' বলে আদরের ভঙ্গীতে একটা লাথি হাঁকাল পরমেশ্বর। বলল, 'তোরা ছাড়া আমার আর কে আছে বল? ফাদার-মাদার-সিস্টার ওয়ার্ল্ডে আমার কেউ নেই রে মাকড়া। তোদের নিয়ে একটা ইণ্টারন্যাশনাল ফ্যামিলি বানিয়েছি। ফ্যামিলিটাকে ডুবিয়ে হড়কে এখান থেকে চলে যাব, তেমন মাল আমি না। এখন বল, আমাদের ইন্টারন্যাশনাল সারভিস সেণ্টারে নতুন ক্লায়েন্ট-ট্যায়েন্ট আসছে?'

লোলে বলল, 'আসছে মানে! রোজ আটটা-দশটা করে খচড়া থোবড়া দেখাচ্ছে। তোমার সারভিস নেবার জন্যে সবাই শালা লাইন মেরে আছে। আর আমি "আজ-না-কাল দেখা হবে" করে খচড়াগুলোকে ঠেকিয়ে রাখছি।'

'আমাদের খুব গুড উইল হয়েছে, নাকি কি বলিস?'

'জরুর হয়েছে। নইলে চারদিক থেকে এত সব মাল আমাদের কাছে বডি ফেলতে চাইবে কেন? ঐ শালাদের কী বলব, বলে দাও।'

'বলবি আরো পনের দিন পর যেন আসে।'

'ও-কে গুরু।'

খানিকক্ষণ বসে থাকার পর দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল এলিজাবেথ। ছর্রাকে বলল, 'এখন পা ম্যাসাজ বন্ধ রেখে চট করে মাংস আর ডিম কিনে নিয়ে আয়।'

ডিম-মাংসের ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল পরমেশ্বর। এলিজাবেথকে বলল, 'কী মাদার, আমার জন্যে আনাচ্ছ নাকি?'

মাই সন, এত দিন পর এলি, আনাবো না? পুরো দশ দিন তোকে নিজের হাতে খাওয়াই নি।'

'কিন্তু মাদার, আমাকে যে এক্ষুনি ফিরে যেতে হবে।' সোমেশ্বরের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল পরমেশ্বরের। এয়ারপোর্ট থেকে পারিভয়ের হ্যাণ্ড-ব্যাগটা সরিয়ে ফ্ল্যাটে ফিরেই তাঁকে ফোন করতে বলেছিলেন। পরমেশ্বরের ফোন না পেয়ে মাকড়ার ব্লাডপ্রেসারটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই তিন গুণ চড়ে গেছে।

এলিজাবেথ বলল, 'যত আর্জেণ্ট কাজই থাক, এখন তোকে ছাড়ছি না। খাওয়া-দাওয়া করে রেস্ট নিবি, তারপর যেতে দেবো।'

লক্ষ্মী লোলে ছর্রা টগর লাট্টু—সবাই কোরাসে এলিজাবেথের কথায় সায় দিল। অর্থাৎ এখন পরমেশ্বরকে কিছুতেই ছাড়া হবে না।

পরমেশ্বর ভাবল, সোমেশ্বরের ব্লাডপ্রেসার যখন চড়েই গেছে তখন শালা ভালো করেই চড়ুক। এখন আর সে যাচ্ছে না। খেয়ে-দেয়ে দুপুরে টানা

ঘুম লাগিয়ে একেবারে সন্ধ্যেবেলাতেই ফিরবে। পরমেশ্বর বলল, 'ছোটি সিং-এর হাতের লাঞ্চ-ডিনার খেয়ে জিভের বারোটা বেজে গেছে। ফিশ-কারি আর আলুগোবির শালা এক টেস্ট। মাদার, ফিস্ট লাগিয়ে দাও।'

পরমেশ্বর খেয়ে যেতে রাজী হয়েছে। সবাই দারুণ খুশী। এলিজাবেথ বলল, 'ছোটি সিং কে?'

'যে ফ্ল্যাটে আছি, সেখানে আমার বেয়ারা-কুক-সেক্রেটারি থেকে শুরু করে গার্জেন পর্যন্ত সব।'

এলিজাবেথ আর জিজ্ঞেস করল না। ছর্‌রা লক্ষ্মী আর টগরকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। এখন তার অনেক কাজ। বাজারে পাঠাতে হবে, নতুন করে উনুন-ফুনুন ধরিয়ে রান্না চাপাতে হবে।

এলিজাবেথরা চলে গেলে, ঘরের ভেতর এখন পরমেশ্বর লাট্টু আর লোলে রয়েছে। লাট্টু একটা পা তো ম্যাসাজ করছিলই ছর্‌রার পা'টাও নিজের ঊরুর ওপর তুলে নিয়ে সমানে টিপে যেতে লাগল।

পরমেশ্বর লোলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাই মাকড়া, কোন দিন চাকরি-ফাকরি করেছিস?'

লোলে বলল, 'ধুস, আমার মতো মাল কখনও চাকরি করতে পারে! তোমাকে তো আমার লাইফ হিস্ট্রি বলেছি; মা'র পেট থেকে মাটিতে যেদিন বডি ফেলেছি, সেদিন থেকে আমি ফুল-টাইম পকেটমার।'

'শালা হারামী। শোন, এখন থেকে একটা ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতে হবে।'

লোলে চমকে উঠল, 'চাকরি! জেণ্টলম্যানদের মতো!'

পরমেশ্বর আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, 'ইয়েস।'

'তার চাইতে তুমি গুরু আমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দাও।'

'আরে বাবা, বেশীদিন চাকরিটা করতে হবে না। ম্যাক্সিমাম দশ-বারো দিন। আমি যে কনট্র্যাক্টটা নিয়েছি সেটার জন্যে তোকে একটা ফ্যাক্টরিতে ঢোকাতে হবে।'

'আমি ভাবলাম, এখন থেকে হোল লাইফ বুঝি আমাকে ফ্যাক্টরিতে "সেট" করে দিতে চাইছ। টেম্পোরারি দশ বারো দিনের জন্যে হলে কাজটা চালিয়ে দিতে পারব। তা গুরু—'

'কী?'

'কারখানায় ঢুকে আমাকে কী ডিউটি দিতে হবে?'

'সব বলে দেব।'

'কবে থেকে চাকরিতে "ইন" করছি?'

'পরে জানতে পারবি। একটা কথা শোন।'

'কান খাড়া করে রেখেছি। বলে ফেল গুরু।'

পরমেশ্বর বলল, 'পরশু সকাল আটটার ভেতর আমার সঙ্গে দেখা করবি।'

লোলে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

লোয়ার সার্কুলার রোডে তার সেই অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসের ঠিকানা এবং ফ্ল্যাটের নম্বরটা বলে দিল পরমেশ্বর।

লোলে ঠিকানাটা বেশ কয়েক বার আওড়াতে লাগল।

পরমেশ্বর বলল, 'ভুলিস না। টেরিফিক আর্জেণ্ট ব্যাপার।'

'ঘাবড়াও মাত। তোমার অ্যাড্রেস আমার মাথায় সেট করে গেছে। লেকিন গুরু—'

'বল্।'

'আমাকে মাইরি দশ বারো দিনের বেশী ফ্যাক্টরিতে রেখো না। হ্যাবিট নেই তো। বেশীদিন চাকরি করতে হলে আমার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে।'

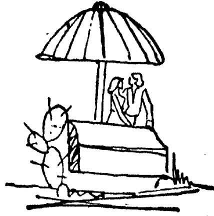
'দশ বারো দিনের বেশী এক সেকেণ্ডও থাকতে হবে না। তার আগেও অপারেশন হয়ে যেতে পারে।'

খাওয়া-দাওয়া চুকোতে চুকোতে সাড়ে-তিনটে বেজে গেল। তারপর ঝাড়া তিন ঘণ্টা ঘুমলো পরমেশ্বর। সাড়ে-ছটায় ঘুম থেকে উঠে চা-ফা খেয়ে পোর্টারের ইউনিফর্ম চেঞ্জ করে দামী ট্রাউজার্স পরে নিল পরমেশ্বর। তারও পর সার্টিফিকেট জাল করার যন্ত্রপাতি একটা চামড়ার ব্যাগে পুরে মোটর বাইকে উঠল।

এলিজাবেথ বলল, 'যত তাড়াতাড়ি পারবি চলে আসবি।'

টগর-ফরগররাও বলল, 'তুমি না থাকলে আমাদের একদম ভালো লাগে না দাদা।'

পরমেশ্বর জানালো, শীগগিরই সে ফিরে আসছে। জানিয়েই মোটর বাইকে স্টার্ট দিল।



অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে নিজের ফ্ল্যাটে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ছোটি সিং জানালো, এর মধ্যে সোমেশ্বর কম করে আটচল্লিশ বার ফোন করেছেন। ছোটি সিং মাকড়াটাকে দারুণ উদ্বিগ্ন আর চিন্তিত দেখাচ্ছিল। সে জানে, পরমেশ্বরের কাছে কাজ করলেও আসল লোক হলেন সোমেশ্বর। তিনি বার বার ফোন করেও পরমেশ্বরকে পাচ্ছেন না, এটাই তাঁর দুর্ভাবনার কারণ।

পরমেশ্বরের গন্ধ পেয়ে পিকিনীজ কুকুরটা দৌড়ে এসেছিল। তাকে তুলে আদর করতে করতে পরমেশ্বর ছোটি সিংকে বলল, 'ঘাবড়াস না। জরুরত হলে মাল আবার ফোন করবে।' বলতে বলতে তার পাশ দিয়ে ড্রইংরুমে এসে সোফায় নিজেকে ছুঁড়ে দিল। পাউডারের ধবধবে পাফের মতো ছোট সাদা কুকুরটা তার কোলের ভেতর আটকেই রইল। আর সে বসতে-না-বসতেই টেলিফোন বেজে উঠল। অবধারিত সোমেশ্বরের ফোন। আস্তে আস্তে সেটা তুলে কানে লাগিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'গুড ইভনিং স্যার।'

সোমেশ্বর প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'আরে তুমি তো আরেকটু হলে আমার থ্রম্বসিস ধরিয়ে দিতে। তোমার ওখানে ক'বার ফোন করেছি জানো?'

'আটচল্লিশ বার। ছোটি সিং বলেছে।'

'পীরভয় বলছিল, হ্যাণ্ডব্যাগটা তার কাছ থেকে নিয়ে তুমি লাগেজ রুমের দিকে গেছ। তারপর থেকে টোটালি মিসিং। আমার ব্লাড সুগার কোথায় "ফল" করে গেছে, আইডিয়া করতে পারবে না।'

'হ্যাণ্ডব্যাগটা যাতে হাত থেকে আউট হয়ে না যায়, সেই জন্যে আমাকে নানা জায়গায় ঘুরে এতটা সময় নষ্ট করতে হয়েছে।' ফিফটি পারসেন্ট সত্যির সঙ্গে ফিফটি পারসেন্ট মিথ্যে মিশিয়ে বলল পরমেশ্বর।

দমবন্ধ চাপা গলায় সোমেশ্বর এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাণ্ডব্যাগটা কোথায়?'

জিনিসটা তলপেটের কাছে একটা গোপন পকেটের ভেতর রয়েছে। পরমেশ্বর বলল, 'আমার কাছেই আছে।'

যাক বাবা, বাঁচালে!' সোমেশ্বর হ্যাণ্ডব্যাগটার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। তারপর আচমকা কী মনে পড়ে যেতে বললেন, 'ঐ দ্যাখো, তোমাকে এখনও কনগ্র্যাচুলেশন জানানো হয় নি।'

'কিসের কনগ্র্যাচুলেশন স্যার?'

'তুমি যেভাবে হ্যাণ্ডব্যাগটা এয়ারপোর্ট থেকে বার করে নিয়ে এসেছ, হোল ইণ্ডিয়ায় কেউ তা পারত না। রিয়ালি তুমি জিনিয়াস। পীরভয়ও সেই কথাই বলছিল। তোমার মতো ট্যালেন্টেড ম্যান সে নাকি আগে কখনও দ্যাখে নি।'

মনে মনে একটা খিস্তি ঝেড়ে পরমেশ্বর দারুণ বিগলিত গলায় বলল, 'স্যার, সবই আপনাদের ব্লেসিং।'

কথাটা খুব ভালো লাগল সোমেশ্বরের। টেনে টেনে হেসে তিনি বললেন, 'পীরভয় তোমার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে। আমার সামনেই সে এখন বসে আছে। আজ একবার আসতে পারবে নাকি?'

এখন ঐ মাকড়াদের কাছে যাবার খুব একটা ইচ্ছে নেই পরমেশ্বরের। কাটিয়ে দেবার জন্য বলল, 'স্যার, আজ ক্ষমা করে দিন। ভীষণ টায়ার্ড। কাল আপনাদের সঙ্গে দেখা করব।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। বুঝতে পারছি, তোমার নার্ভের ওপর দিয়ে দুর্দান্ত ঝামেলা গেছে। পীরভয় দিন কয়েক কলকাতায় আছে। পরে দেখা হবে। আজ রেস্ট নাও।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।' লাইনটা কেটে দিতে গিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'আরেকটা কথা—'

সোমেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, 'কী?'

'হ্যাণ্ডব্যাগটা কী করব?'

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, আসল ইনস্ট্রাকশানটা দিতেই তো ভুলে গেছি।'

পরমেশ্বর কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগে বাইরের প্যাসেজে কী যেন দেখে পিকিনীজ কুকুরটা হঠাৎ লাফ দিয়ে দৌড়ে গেল।

সোমেশ্বর ওধার থেকে বলতে লাগলেন, 'তোমার বেডরুমের যে দেওয়াল-আলমারিটা রয়েছে, সেটা খুলে দু নম্বর ড্রয়ারে ডান দিকের সিক্রেট পকেট থেকে দুটো সরু চাবি বার করবে। তারপর তিন নম্বর ড্রয়ারটা পুরো খুললেই দেখতে পাবে ওয়ালে দুটো ফুটো। বড় ফুটোটায় বড় চাবিটা ঢুকিয়ে বাঁ দিক থেকে পুরো এক রাউণ্ড ঘোরালেই দেয়াল ফাঁক হয়ে যাবে।

সেখানে দেখতে পাবে পর পর অনেকগুলো তাক। হ্যাণ্ডব্যাগটা যে কোন একটা তাকে রেখে ছোট ফুটোটায় ছোট চাবিটা ঢুকিয়ে পুরো এক রাউণ্ডের একটা পাক দেবে। তাহলেই ওয়ালটা আবার আগের মতো হয়ে যাবে। কাজটা হয়ে যাবার পর—'

পরমেশ্বর বলল, 'বলে যান স্যার—'

সোমেশ্বরের কথা শেষ হবার আগেই কুকুরটা ফিরে এসে আবার পরমেশ্বরের কোলে সেঁটে গেল।

সোমেশ্বর বলে যাচ্ছেন, 'ছোট চাবিটা ড্রইংরুমে অ্যাটাচড্ বাথে শাওয়ারের মাথায় সিক্রেট পকেটে রাখবে। ড্রইংরুমের ডিভানের একটা পায়ায় গর্ত আছে। বড় চাবিটা ওটার ভেতরে ঢুকিয়ে পুডিং দিয়ে গর্তটা আটকে দেবে। স্টোররুমে আলমারির ভেতর পুডিংয়ের কৌটো আছে। হ্যাণ্ডব্যাগ যখন রাখবে, তখন যেন কেউ টের না পায়, নট ইভন ছোটি সিং। ঘরের দরজা বন্ধ করে করে নেবে। চাবিগুলো রাখার সময়ও ঘর বন্ধ করে নিও।'

'নেব।' বলে একটু চুপ করে থেকে পরমেশ্বর ফের শুরু করল, 'আপনি স্যার একখানা টেরিফিক মাল। কত কারবার যে করে রেখেছেন—'

'আমার সঙ্গে কিছু দিন থাকো। দেখবে আরো কত কারবার করে রেখেছি।'

'আপনাকে যেটুকু দেখেছি, তাতেই আমার ব্রেনে চক্কর লেগে গেছে। আরো দেখলে স্যার আমি বাঁচব না।'

'অতিশয় হারামজাদা তুমি! ফোন ছাড়ছি। তুমি রেস্ট-ফেস্ট নাও।'

ফোনটা ক্রেডেলে রেখে আরো খানিকক্ষণ বসে রইল পরমেশ্বর। ঠিক বসে রইল না, কুকুরটাকে চটকে-মটকে আদর করতে লাগল।

আধ ঘণ্টা আদর-টাদরের পর বেডরুমের দরজা বন্ধ করে দেয়াল-আলমারি খুলে চাবি বার করে আলিবাবার মতো দেয়াল ফাঁক করল পরমেশ্বর। ভেতরে সিক্রেট গুহার মতো অনেকখানি জায়গা। সেখানে পরপর কয়েকটি র‍্যাকে নানা চেহারার ফাইল।

পরমেশ্বর বুঝতে পারল, তার হ্যাণ্ডব্যাগের ভেতরকার ডকুমেণ্টগুলোর মতো এই ফাইলগুলোতে নানা রকম সিক্রেট ডকুমেণ্ট রয়েছে। সি-বি-আইয়ের লোকেদের হাতে পড়লে নিশ্চয়ই সোমেশ্বরের বিপদ ঘটে যাবে। তাই এভাবে লুকিয়ে-চুরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছেন সোমেশ্বর। পরমেশ্বর মনে মনে বলল, 'শালা কী টেরিফিক হারামী!'

যাই হোক, হ্যাণ্ডব্যাগটা ভেতরে রেখে চাবি ঘুরিয়ে দেয়াল বন্ধ করল

পরমেশ্বর। ছোটি সিং এখন কিচেনে ছ্যাঁকছোঁক করে কী সব রাঁধছে। আপাততঃ সে এদিকে আসবে না। পরমেশ্বর সট করে বাথরুমে গিয়ে শাওয়ারের মাথায় একটা চাবি রাখল। তারপর ড্রইংরুমে ফিরে এসে ডিভানের পায়ার গোপন গর্তে দু' নম্বর চাবিটা পুরে পা ছড়িয়ে সোফায় বসল।

পিকিনীজ কুকুরটা এতক্ষণ তার পায়ে পায়ে বেডরুম থেকে বাথরুমে, বাথরুম থেকে ড্রইংরুমে বেড়াচ্ছিল। পরমেশ্বর বসতেই লাফ দিয়ে সেটা তার কোলে উঠে এল। .

আজকের সব প্রোগ্রাম কমপ্লিট। এয়ারপোর্টের এত বড় একটা অপারেশন সে সাকসেসফুলি করেছে। সে জন্যে ভেতরে ভেতরে সারাদিন এক ধরনের টেনসান গেছে। আর এখন টেনসানটা নেই। নার্ভগুলো এখন বেশ আলগা। যাকে রিল্যাক্সিং মুড বলে, এখন তা-ই চলছে।

কুকুরটার ঘন লোমের ভেতর হাত চালিয়ে সুড়সুড়ি দিতে দিতে আচমকা হেমার কথা মনে পড়ে গেল। এয়ারপোর্টে সে কী জন্য গিয়েছিল? ইণ্টারন্যাশনাল উইংয়ে ভিজিটার্স লাউঞ্জে ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে কী দেখছিল? এয়ারপোর্ট—

পরমেশ্বরের ভাবনাটা পুরো হল না। তার আগেই কলিংবেলের আওয়াজ শোনা গেল। এই রাত্রিবেলা কে আসতে পারে? সোফায় বসে বসেই চিৎকার করে সে বলল, 'ছোটি সিং, দেখো, কৌন আয়া?'

'যাতা হুঁ।' কিচেন থেকে বেরিয়ে প্যাসেজ দিয়ে বাইরের দরজার দিকে দৌড় দিতে লাগল ছোটি সিং এবং মিনিট খানেকের ভেতর যাকে নিয়ে ফিরে এল, এই মুহূর্তে তাকে এখানে দেখবে—এটা ভাবতে পারে নি পরমেশ্বর। দু সেকেণ্ড অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকার পর স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠল সে। একটা সোফা দেখিয়ে দারুণ ব্যস্তভাবে বলল, 'বসুন, বসুন মিস সারিন। কী সৌভাগ্য আমার—'

হেমা সোফাটায় বসতে বসতে হেসে হেসে বলল, 'উইদাউট নোটিশ, উইদাউট ইনভিটেশনে চলে এলাম কিন্তু। অসময়ে এসে নিশ্চয়ই ডিসটার্ব করলাম।'

হেমা যখন নিজের থেকেই এসে পড়েছে, তখন তার এয়ারপোর্টে যাবার কারণটা খোঁচাখুঁচি করে বার করতে চেষ্টা করবে পরমেশ্বর। তবে নার্ভগুলোকে সজাগ রেখে সে আস্তে আস্তে এগুবে। কোন রকম তাড়াহুড়ো দেখাবে না।

হেমা বসার পর মুখোমুখি একটা সোফায় বসল পরমেশ্বর। তারপর বলল, 'কি দিতে হবে ম্যাডাম—সফট্ না হট?'

‘এক কাপ চা হলেই চলবে।’

‘হুইস্কি—জীন—রাম—পোর্ট—যা চাইবেন, সব স্টকে আছে।’

‘না। ড্রিঙ্ক করব না।’

‘দুম করে ব্রহ্মচারী-ট্রহ্মচারী হয়ে যাচ্ছেন নাকি?’

হেমা হাসল। বললে, ‘এত তাড়াতাড়ি হবার ইচ্ছে নেই।’

পরমেশ্বর খচড়ামো করে বলল, ‘হবেন না ম্যাডাম। আপনাদের মতো বিউটি কুইনরা ফটাফট ব্রহ্মচারী হয়ে গেলে আমরা কাদের দিকে তাকাব! আমাদের মতো মালেদের পাক্কা বারোটা বেজে যাবে।’

হেমা বলল, ‘কিছু মনে করবেন না, আগাপাশতলা আপনি একজন পাক্কা হারামজাদা।’

পরমেশ্বর খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল, ‘দারুণ বলেছেন ম্যাডাম। আমি শালা তা-ই।’

‘যাক গে, একটা দরকারে আপনার কাছে এসেছিলাম হালদারসাহেব।’

আচমকা ব্রেক কষার মতো হাসিটা থামিয়ে খুব সতর্ক চোখে তাকাল পরমেশ্বর। আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, ‘কী দরকার?’

সেই পিকিনীজটা পরমেশ্বরের কোলেই রয়েছে। সেটাকে দেখিয়ে হেমা বলল, ‘কুকুরটা কি রকম বিহেভ করছে?’

‘ফাইন।’

‘কোন কমপ্লেন?’

‘একেবারেই না।’

‘যে রকম কোলে উঠে বসে আছে, তাতে তো মনে হচ্ছে দু’দিনেই আপনার ভীষণ ফেভারিট হয়ে গেছে।’

‘তা বলতে পারেন। ফেভারিট তো হবেই। আমি ম্যাডাম একজন এক্সপিরিয়েন্সড ডগ-লাভার।’

একটা চোখ কুঁচকে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে হেমা বলল, ‘শুধু কুকুরপ্রেমিক হয়েই থাকবেন? মানুষেরা আপনার ভালবাসা পাবে না?’

পরমেশ্বর চোখের তারা নাচাতে নাচাতে বলল, ‘তেমন মানুষ পেলে ভেবে দেখতে পারি!’

‘যাক, আপনি তা হলে মানবপ্রেমিকও হতে পারেন—লাভার অফ ম্যানকাইণ্ড! গুড!’ বলে একটু থেমে পরক্ষণে হেমা ফের শুরু করল, ‘আসল কথাটা এবার বলি। আপনার কুকুরটার হ্যাবিট হল পাঁচ দিন পর পর স্নান-করা। দু’ দিন আগেও স্নান করেছে। নেক্সট বাথের ডেট হল পরশুদিন। আমার কুকুরটাকে তো সেদিন স্নান

করাবোই ; সেদিন আপনারটাকেও নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে আবার ফেরত দিয়ে যাব।'

পরমেশ্বর বলল, 'আপনি আবার শুধু শুধু কষ্ট করবেন কেন? আমার বেয়ারা ছোটি সিংই চান-ফান করিয়ে দেবে।'

হেমা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'না-না, প্লীজ, আপনার বেয়ারাকে স্নান করাতে দেবেন না। দারুণ সুখী টাইপের ডগ। আমার বন্ধু বলে গেছে, কানে জল-টল ঢুকলে ওরা বাঁচবে না। এমনি কুকুরটাকে গছিয়ে অনেক ট্রাবল দিচ্ছি আপনাকে। স্নানটা আমি করিয়ে দিয়ে যাব। আফটার অল বন্ধু আমার ওপর ভরসা করে কুকুরটাকে দিয়ে গেছে।'

পরমেশ্বর আর কী বলবে? হট প্যাণ্ট আর ব্রা টাইপের জামা-পরা একটা টেরিফিক চেহারার ইয়াং গার্ল যদি বডির সেভেনটি ফাইভ পারসেণ্ট খুলে রিকোয়েস্ট করে যায়, তখন সেটা মেনে নিতেই হয়। পরমেশ্বর বলল, 'ও-কে, আপনার যখন কুকুরের বডির নোংরা ধুয়ে দেবার ইচ্ছে, তাই করবেন।'

'অনেক রাত হল। এবার তা হলে ওঠা যাক।' বলতে বলতে উঠে পড়ল হেমা।

'এখনি যাবেন?' পরমেশ্বরও কুকুরটাকে বুকে করে উঠে দাঁড়াল।

ঘড়ি দেখে হেমা ঘাড় কাত করে বলল, 'বারোটা বাজে। আর রাত করা কি ঠিক হবে?'

'ভাবছেন আমার ক্যারেকটারের বারোটা বেজে যাবে!'

হেমা পরমেশ্বরের কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'আজ চলি। অ্যাফুলি টায়ার্ড। সী ইউ—'

ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে হেমা সামনের প্যাসেজে চলে এল। পরমেশ্বরও তার সঙ্গে সঙ্গে গেল। ছুকরী অতি খলিফা। এয়ারপোর্ট সম্পর্কে গলা দিয়ে একটা শব্দও বার করে নি। শুধু কি কেবল কুকুর চান করাবার প্রোপোজাল নিয়েই সে এসেছিল, না কি অন্য কোন ব্যাপারে?

বাইরের দরজার কাছাকাছি এসে আচমকা পরমেশ্বর বলে ফেলল, 'আপনাকে আজ এক জায়গায় দেখলাম।'

হেমা বলল, 'কোথায় বলুন তো?'

'এয়ারপোর্টে।' বলেই স্ট্রেট হেমার চোখের দিকে তাকাল পরমেশ্বর। ছুকরীর রিঅ্যাকশান কী হয়, সেটা মার্ক করাই তার উদ্দেশ্য।

হেমার মুখের চামড়া এতটুকু এদিক-ওদিক হল না। অত্যন্ত ন্যাচারাল ভঙ্গীতে সে বলল, 'হ্যাঁ, সকালে একবার যেতে হয়েছিল। জাপান থেকে

আমার এক বন্ধুর আসার কথা ছিল। আনফরচুনেটলি সে আসে নি। কিন্তু আমি যে এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম, আপনি কেমন করে জানলেন ?'

'আমিও এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম। একজন অফিসারের সঙ্গে দেখা করার দরকার ছিল। তাই যেতে হল।'

'আপনি আমাকে দেখলেন, তবু ডাকলেন না কেন ?'

'ডিসটার্ব করতে ইচ্ছা করে নি। তা ছাড়া আপনি অনেকটা দূরে ছিলেন।'

'আই সী। আচ্ছা, গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

হেমা চলে গেল। সে যদি সত্যিই 'ফলো' করার ব্যাপারটা চেপে গিয়ে থাকে, তা হলে বলতে হবে, এ রকম অ্যাকটিং সোফিয়া লোরেন কি জিনা লোলোব্রিজিডাও করতে পারবে না। অ্যাকটিং-এ ওয়ার্ল্ডের বেস্ট হীরোইনের নাক ও কেটে নিতে পারে। কিন্তু সত্যি সত্যিই কি জাপান থেকে আসা কোন ফ্রেণ্ডকে রিসিভ করার জন্যই হেমা এয়ারপোর্টে গিয়েছিল ? ব্যাপারটা পরমেশ্বরের কাছে ঠিক পরিষ্কার হল না। তার ভাবনার মধ্যে একটা খিঁচ থেকেই গেল।

পরের দিন সকালে উঠে চা-ফা খেয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে লোলের জন্য দুটো সার্টিফিকেট জাল করতে বসল পরমেশ্বর। একটা স্কুল সার্টিফিকেট, আরেকটা গেজেটেড অফিসারের দেওয়া ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট। জাল করার সাজ-সরঞ্জাম আগের দিনই সে এনে রেখেছিল।

পিকিনীজ কুকুরটা তার পিঠে গা ঠেকিয়ে বসে রইল।

পরমেশ্বরের অ্যাক্টিভিটি তো এক রকমের নয়, হাজার টাইপের। সিক্রেট রেকর্ড জাল, ডকুমেণ্ট জাল, ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট জাল, ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি-ডিপ্লোমা জাল—তার জিনিয়াস এই ব্যাপারটায় দুর্দান্ত ফুটে ওঠে। পরমেশ্বরের হাতের কাজ এত পারফেক্ট যে, হ্যাণ্ড-রাইটিং এক্সপার্টদের সাধ্য নেই যে তারা বুঝতে পারে, ওটা অরিজিন্যাল না নকল। ইচ্ছা করলে, কারেন্সি নোটও নিখুঁত জাল করে দিতে পারে পরমেশ্বর কিন্তু গভর্নমেণ্টের নোট ছাপার কারখানা নাসিক প্রেসের সঙ্গে কমপীটিসনে নামার খুব একটা ইচ্ছা নেই তার। কেন না ওটা একটা হোল টাইম জব। আরো পরিষ্কার করে বলা যায়, পুরোপুরি সাধনা-টাধনার ব্যাপার ওটা। সাধু-ফাদুদের মতো পবিত্র মন নিয়ে ওতে কনসেনট্রেট করতে হয়। কিন্তু শুধু একটা ব্যাপার নিয়ে থাকলে অন্য অ্যাক্টিভিটি পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হবে। বিগ ইণ্ডাস্ট্রি হাউসের অগুনতি ডিভিসনের মতো তার কাজকর্ম।

কোন ডিভিসনেই সে ক্লোজার চায় না। তার ইচ্ছা সব ব্রাঞ্চই একসঙ্গে চালু থাকুক। জনগণ তার কাছে কত আশা নিয়ে আসে। সে কাউকে বঞ্চিত করতে পারে না।

জাল করার এই ব্যাপারটাকে পরমেশ্বর বলে 'রেকর্ড মেকিং ডিভিসন'। পীপল অর্থাৎ জনগণের সেবার জন্য হোল ইণ্ডিয়ার কয়েক শো স্কুলের হেড মাস্টার, কয়েক শো কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সিগনেচারের নমুনা এবং সেই সেই স্কুল-কলেজের লেটার হেডের একখানা করে খাতা, রবার স্ট্যাম্পের সীল ইত্যাদি ইত্যাদি যোগাড় করে রেখেছে। তা ছাড়া কয়েক শো এম-এল-এ এম-পি, ছোটখাটো মিনিস্টার ও গেজেটেড অফিসারের সই-টই এবং তাঁদের লেটারহেডের একখানা করে পাতাও তার কালেকসানে রয়েছে।

অবশ্য ক্যারেক্টার বা স্কুল-কলেজের সার্টিফিকেট জালের ব্যাপারে কিছু ঝামেলা রয়েছে। কখন কোন হেডমাস্টার, প্রিন্সিপ্যাল আর গেজেটেড অফিসার রিটায়ার করছেন, কখন কোন্ এম-এল-এ, এম-পি বা ছোট মিনিস্টার ইলেকসানে হেরে ঘাড় গুঁজে পড়ছেন—সে সব খবর রাখতে হয়। তখন নতুন হেডমাস্টার, প্রিন্সিপ্যাল, এম-এল-এ বা এম-পির সিগনেচার-টিগনেচার কালেক্ট করতে হয়। মোট কথা 'ইয়ার বুকে'র মতো প্রতি বছরই এই সব ভি-আই-পি-দের লিস্ট একবার করে চেক করে নেয় পরমেশ্বর।

যাই হোক, লোলের জন্য আধ ঘণ্টার মধ্যে বীরভূম ডিস্ট্রিক্টের একটা স্কুলের সার্টিফিকেট তৈরি করে ফেলল পরমেশ্বর। ঐ স্কুলের হেডমাস্টার যেন সার্টিফাই করছেন, লোলে ক্লাশ টেন পর্যন্ত পড়েছে। এরপর বীরভূমেরই এক ব্লক ডেভলাপমেণ্ট অফিসারের ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট নকল করতে বসল পরমেশ্বর।

ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটের বাঁধা একটা গত রয়েছে। সেটা লেখা যখন শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় বন্ধ দরজার বাইরে ছোটি সিংয়ের গলা শোনা গেল, 'সাব, এক জেণ্টলম্যান আপকো সাথ মিলনে আয়া—'

এই সকালে কোন্ হারামী আবার তার সঙ্গে দেখা করতে এল? পরমেশ্বর চেঁচিয়ে বলল, 'কোন জেণ্টলম্যান আমার মতো মাকড়ার সঙ্গে দেখা করতে আসে না।' বলতেই আচমকা খেয়াল হল, সে এখানে পরমেশ্বর নয়, দুটো 'পশ' ক্লাবের মেম্বার, ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের বিগ বিজনেসম্যান এবং আগাপাশতলা জেণ্টলম্যান রণজয় হালদার।

একটু চুপ করে থেকে পরমেশ্বর ফের বলল, 'কে এসেছে?'

ছোটি সিং মুখ খোলার আগেই এবার লোলে বলে উঠল, 'আমি গুরু—তোমার চামচে।'

'ও রে হারামী—তুই!' বলেই পরমেশ্বরের মনে পড়ল, আজ সকালে লোলেকে এখানে আসতে বলে এসেছিল।

ছোটি সিং ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, যে লোকটাকে ড্রইংরুমে বসিয়ে পরমেশ্বরকে খবর দিতে এসেছিল কখন তার অজান্তে সে যেন উঠে এসেছে। এভাবে চলে আসার জন্য দারুণ বিরক্ত হয়েছে সে কিন্তু লোকটাকে যখন সাহেব অর্থাৎ পরমেশ্বর চেনে তখন আর বলার কিছু নেই। পরমেশ্বর ছোটি সিংকে বলল, 'ঠিক হ্যায়, তুমি যাও। আমার এই দোস্ত এসেছে। দুপুরে আমার সঙ্গে 'লাঞ্চ খাবে। এর খানাও পাকিও।'

'জী—' ঘাড় কাত করল ছোটি সিং। তারপর লোলেকে দেখতে দেখতে কিচেনের দিকে চলে গেল।

এবার দরজাটা আরেকটু ফাঁক করে পরমেশ্বর বলল, 'ল্যাম্প পোস্ট হয়ে দাঁড়িয়ে না থেকে ভেতরে "ইন" কর।'

লোলে বলল, 'ঘরের ভেতর কেন গুরু; তুমি বাইরে এসো না—'

'রেকর্ড মেকিং-এ বসেছি। আমার "বয়" ছোটি সিং জানলে কি ভালো হবে? ঢুকে পড় মাকড়া।'

রেকর্ড মেকিংয়ের ব্যাপারটা লোলে খুব ভালো করেই জানে। পরমেশ্বর জনগণকে সারভিস দেবার জন্য যতরকম ডিভিসন খুলেছে তার সবগুলোতেই লোলে একমাত্র অ্যাসিস্ট্যান্ট-কাম-একজিকিউটিভ। "রেকর্ড মেকিং ডিভিসনে" কোন্ প্রিন্সিপ্যাল রিটায়ার করলেন, কোন্ কোন্ এম-পি পলিটিক্সের "ডগ রেসে" দৌড়ুতে দৌড়ুতে চিৎ হয়ে পড়লেন—এসব খবর লোলেই জুটিয়ে আনে।

'ইয়েস গুরু। তুমি এখন কী অপারেশন চালাচ্ছ, বুঝতে পারি নি—' বলেই ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল লোলে।

তক্ষুণি দরজায় "লক" লাগিয়ে আবার নকল ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটটার ওপর ঝুঁকে পড়ল পরমেশ্বর। পিকিনীজ কুকুরটা তার গায়ের সঙ্গে লেপ্টে বসে রইল।

এই অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে ঢোকার পর থেকে চোখের তারা একেবারে ফিক্সড হয়ে আছে লোলের। পরমেশ্বরের কাছ থেকে তিন গজ দূরে একটা দুর্দান্ত ফেশানেবল চেয়ারে গিয়ে বসেছিল সে। সেখান থেকে ইন্টিরিয়র ডেকরেসন, দামী দামী ক্যাবিনেট, ছ ইঞ্চি পুরু জয়পুরী কার্পেট ইত্যাদি দেখতে দেখতে বলতে লাগল, 'গুরু' আমাকে একটু চিমটি কাটো তো মাইরি—'

সার্টিফিকেটের বাঁধা বয়েত লেখা হয়ে গিয়েছিল। এবার বি-ডি-ওর সিগনেচারে ফিনিশিং টাচ দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, 'কেন রে?'

'আমি ড্রিমের ভেতর আছি কিনা মালুম পাচ্ছি না।'

'তুমি মাকড়া ড্রিমের বাইরেই আছ।'

'গুরু, এ তুমি কোথায় এসে উঠেছ! শ্লা, এরকম কার্পেট, আলমারি, সোফা—এ সব মাল হিন্দী ফিল্মের হিরোইনদের বাড়িতে ছাড়া আর কোথাও দেখি নি।'

'হুঁ—' অন্যমনস্কর মতো গলার ভেতর আবছা একটা শব্দ করল পরমেশ্বর।

এবার লোলের চোখ দুটো চারদিকে চরকির মতো ঘুরতে ঘুরতে পিকিনীজ কুকুরটার ওপর এসে আটকে গেল। বলল, 'তুমি মাইরি আবার একটা টেরিফিক কুকুরও জুটিয়ে ফেলেছ। তোমাকে, তোমার ফ্ল্যাট আর কুকুরকে দেখে কী মনে হচ্ছে জানো?'

'কী?'

'কী যেন, মানে ঠিক—' "জুতসই" শব্দটা মনে করতে না পেরে ঘাড় চুলকোতে লাগল লোলে।

পরমেশ্বর বলল, 'ক্রোড়পতি ক্যাপিটালিস্টদের মতো—তাই না?'

লোলের বত্রিশটা দাঁত একসঙ্গে পেখম মেলে দিল। সে বলল, 'ইয়েস গুরু।'

'শালে খজড়া—' বেশ আদরের ভঙ্গিতেই খিস্তিটা ঝাড়ল পরমেশ্বর। সার্টিফিকেট দুটো কমপ্লীট হয়ে গিয়েছিল। লোলের দিকে সেগুলো বাড়িয়ে বলল, 'মাল রেডি; ডেলিভারি নিয়ে নে—'

'কী জিনিস গুরু?' কাগজ দুটো নিতে নিতে জিজ্ঞেস করল লোলে।

পরমেশ্বর চোখ কুঁচকে বলল, 'শালা, কিসের জন্যে তোমাকে এখানে আসতে বলেছিলাম, সব ভুলে মেরে দিয়েছ! মাকড়া চাকরির জন্যে "ইটার্নাল ইন্ডাস্ট্রিজে" অ্যাপ্লিকেশন ঝাড়তে হবে না? তখন এগুলোর দরকার হবে না?'

'আরে গুরু, তাই তো! তোমার ফ্ল্যাট-টগ্যাট দেখতে দেখতে আমার ব্রেনে পুরো চক্কর লেগে গেছে।'

পরমেশ্বর এবার উঠে গিয়ে বালিশের তলা থেকে একটা টাইপ-করা কাগজ নিয়ে এল। লোলেকে সেটাও দিতে দিতে বলল, 'এটাও রাখ—'

লোলে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী গুরু?'

'দরখাস্ত। এর তলায় একখানা সিগনেচার ঝাড়। নামটা লিখতে পারবি তো? নাকি কলমের নিব হাঁ হয়ে যাবে?'

'পারব গুরু। ক্লাস টেন সার্টিফিকেট দিচ্ছ আর নিজের নামটা কাগজের ওপর বসাতে পারব না?'

'নিজের নাম না—দ্যাখ, কী নাম সার্টিফিকেটে লেখা আছে !'

নকল সার্টিফিকেট খুলে চট করে দেখে নিল লোলে। বলল, 'হরিপদ গড়াই।'

পরমেশ্বর বলল, 'অ্যাপ্লিকেসনে ঐ নামটাই লিখে ফেল চাঁদ।'

নামটা লিখতে লিখতে লোলে বলল, 'বাপের দেওয়া নামটা বদলে দিলে গুরু ?'

'নিজের রিয়েল নামটা দরখাস্তে বসিয়ে কোনদিন যদি "ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজের" ব্যাপারে ধরা পড়ে যাস, পুলিস বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বে। তার চাইতে হরিপদ গড়াই হয়ে যাওয়া কি ভালো না ?'

লেখা হয়ে গিয়েছিল। মুখ তুলে কালচে ছোপ-ধরা বত্রিশখানা ট্যারাবাঁকা দাঁত আবার বার করল লোলে।

পরমেশ্বর বলল, 'আজই এখান থেকে বেরিয়ে স্ট্রেট জি-পি-ও-তে চলে যাবি। একটা ঠিকানা দিয়ে দেব। বড় খামের ভেতর অ্যাপ্লিকেশন আর সার্টিফিকেট দুটো পুরে রেজিস্ট্রি করে পাঠিয়ে দিবি। মাথায় ঢুকল ?'

'ঢুকেছে গুরু।'

'চল, এবার যাই।'

জাল করার সাজ-সরঞ্জাম একটা বড় অ্যাটাচি কেসে পুরে আলমারির ভেতর ঢুকিয়ে চাবি দিয়ে বন্ধ করল পরমেশ্বর। তারপর ঘরের দরজা খুলে লোলেকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। সাদা ধবধবে পিকিনীজ কুকুরটা হঠাৎ একটা বলের মতো লাফ দিয়ে তার কোলে উঠে এল।

পরমেশ্বর সোজা ড্রইং রুমের দিকে যাচ্ছিল। লোলে বলল, 'গুরু তোমার ফ্ল্যাটটা একটু দেখাও।'

পরমেশ্বর বলল, 'দেখবি ? আচ্ছা চল—' বেশ খানিকটা সময় ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লোলেকে সাজানো-গোছানো বিরাট ফ্ল্যাটটা দেখাল সে। তারপর ড্রইং রুমে এসে বসল।

লোলে ফ্ল্যাটটা সম্পর্কে কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল, সেই সময় কলিং বেল বেজে উঠল।

ভুরু কুঁচকে পরমেশ্বর বলল, 'এখন আবার কোন্ মাকড়া জ্বালাতে এল !' বলেই গলার স্বর চড়ায় তুলল, 'ছোটি সিং—'

ছোটি সিংকে আর কিছু বলতে হল না। কিচেন থেকে বেরিয়ে প্যাসেজের শেষ মাথায় গিয়ে সে বাইরের দরজা খুলে দিল।

একটু পর দেখা গেল, হেমা এসে ড্রইং রুমে ঢুকছে। তার পরনে যথারীতি হট প্যান্ট আর ব্রা-টাইপের ব্লাউজ।

পরমেশ্বর বলল, 'আরে আপনি, আসুন।'

লোলের পাশের সোফাটায় বসে পড়ল হেমা।

'কেমন আছেন', 'বিজনেস কেমন চলছে', ইত্যাদি দু-একটা এলোমেলো কথার পর পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'তারপর এই অসময়ে? আমার কাছে কিছু দরকায় আছে মিস সারিন?'

হেমা একটু হাসল 'আপনার কিছুই মনে থাকে না দেখছি। কী কথা ছিল?'

'কী বলুন তো?' হেমা তাকে কী বলেছিল, সত্যি সত্যিই তা মনে করতে পারল না পরমেশ্বর।

'আজ এসে কুকুরটাকে স্নান করাবার জন্যে নিয়ে যাব।'

'আরে তাই তো। কিন্তু—'

'কী হল?'

'আপনি আমার কুকুরকে স্নান করিয়ে দেবেন; ভীষণ খারাপ লাগছে।'

আগেও এই কথাই বলেছিল পরমেশ্বর। হেমা হাত বাড়িয়ে বলল, 'সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। দিন স্যার, কুকুরটা দিন।'

পরমেশ্বরের কোলের ভেতর পিকিনীজটা চুপচাপ আদুরে ভঙ্গিতে শুয়ে ছিল। সেটাকে তুলে হেমার দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে সে বলল, 'আপনাকে নিয়ে আর পারা যায় না।'

কুকুরটা পরমেশ্বরের হাত থেকে নিতে নিতে উঠে দাঁড়াল হেমা। বলল 'এখন যাই। স্নান-ট্যান করিয়ে অফিসে বেরুবার সময় আবার দিয়ে যাব।'

পরমেশ্বরও উঠে পড়েছিল। বলল, 'আমার কিছু বলার নেই।'

হেমাকে বাইরের লিফট্ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে একটু পর আবার ড্রইং রুমে ফিরে এল পরমেশ্বর।

হেমাকে দেখার পর থেকে লোলের চোখ-দুটো সার্কেল হয়ে গিয়েছিল। সেখানে পাতা পড়ছিল না। তাছাড়া বুকের ভিতর নিঃশ্বাস আটকে গিয়েছিল। বারকতক চোখ পিটপিট করে কানাডিয়ান ইঞ্জিনের মতো নাকের ভেতর দিয়ে হুস করে অনেকখানি গরম বাতাস ছাড়ল লোলে। তারপর বলল, 'গুরু, এবার রিয়েল একটা চিমটি কাটো তো।'

পরমেশ্বর বলল, 'চিমটি কাটতে হবে না। যার গা এতক্ষণ চোখ দিয়ে চাটছিলি সে ড্রিম না, একেবারে আসলী চীজ।'

'গুরু এমন জিনিস আমি লাইফে আর দেখি নি। কী ড্রেস! হুইস্কির সঙ্গে তাড়ি মহুয়া আর কালীমার্কা পাঞ্চ করলে যা দাঁড়ায়, এ হল সেই মাল। গুরু কী হিট মাইরি—যেন এইট এইট্টি ভোল্ট!'

পরমেশ্বর চোখ কুঁচকে দাঁতে দাঁত চেপে হাসতে হাসতে বলল, 'শলা খচড়া। একেবারে হানড্রেড পারসেণ্ট লুচ্চা অ্যাণ্ড ক্যারেক্টারলেস।'

লোলেও খ্যা খ্যা করে হাসল, 'গুরু জিনিসটাকে কোত্থেকে জোটালে!'

'জোটালাম!' বলে দারুণ রহস্যময় ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে লাগল পরমেশ্বর।

'বল না মাইরি, কোথায় পেলে?'

'এই বাড়িতেই থাকে। আমাদের এই ফ্ল্যাটটা থেকে দু-তলা ওপরে।'

'শলা ক'দিন এসেছ। এর ভেতর টেরিফিক জমিয়ে নিয়েছ তো।'

'কী করে বুঝলি?'

'গুরু তোমার কুকুর চান করিয়ে দিচ্ছে; ঐ ড্রেসে সটাসট এখানে "ইন" করে যাচ্ছে। আর জিজ্ঞেস করছ, কী করে বুঝলাম!'

পরমেশ্বর খ্যা খ্যা করে খচড়ামোর হাসি হাসতে লাগল।

লোলে বলল, 'গুরু তোমার এ্যায়সা ফ্ল্যাট, দু-তলা ওপরে এইট এইট্টি ভোল্ট। আমার কী ইচ্ছে করছে জানো?'

'কী?'

'তোমার সঙ্গে আমিও এখানে বডি ফেলে রাখব।'

পরমেশ্বর একটু ভেবে বলল, 'তোকে তো আরেকটা জিনিস এখনও দেখাই নি।'

লোলে বলল, 'কী?'

পরমেশ্বর উঠে গিয়ে একটা দেয়াল আলমারির পাল্লা খুলে ফেলল। লোলে দেখল সেখানে তাকে তাকে বেঁটে মোটা লম্বা সরু, নানা আকারের ব্রিটিশ ফ্রেঞ্চ রাশিয়ান নরোয়েজিয়ান ইণ্ডিয়ান আইরিশ ড্যানিশ পোলিশ হুইস্কি রাম, জিন, ওয়াইন, কনিয়াক সাজানো রয়েছে।

পরমেশ্বর খাঁটি দেশপ্রেমিকের মতো স্বদেশের ভাঁটিখানায় প্রস্তুত কালী-মার্কা বা সোনার বাংলা ছাড়া আর কিছুই স্টমাকে ঢোকায় না। কিন্তু লোলের কেস অন্য-রকম। বিলিতি। হুইস্কি-টুইস্কি দেখলে তার জিভ দিয়ে কুকুরদের মতো অনবরত লালা ঝরতে থাকে।

লোলে বলল, 'গুরু, যা দেখালে তাতে এখানে যে বডি ফেলব লাইফে আর তুলব না।'

পরমেশ্বর বলল, 'মাকড়া, এখানে আমরা অপারেশন করতে এসেছি; পার্মানেণ্টলি "বডি" ফেলার জন্যে নয়। কাজ ফিনিস হয়ে গেলেই "গুডবাই" করে সরে পড়তে হবে।'

হুস করে লু-বাতাসের মতো আরেক দফা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোলে। তারপর হাত উল্টে বলল, 'অপারেশন কমপ্লীট করতে কদ্দিন লাগবে?'

'আট-দশ দিন ম্যাক্সিমাম।'

'যাঃ শলা ; দশদিনের জন্যে আর এসে কী হবে? ঘেয়ো রুদ্দি বস্তি ছাড়া আমাদের আর ভালো অ্যাড্রেস হবে না দেখছি।'

'যা বলেছিস। আর গ্যাজর গ্যাজর না করে চান-ফান সেরে ফ্যাল। খেয়েদেয়ে আমাকে বেরুতে হবে।'

দুপুরবেলা লাঞ্চ সারতে সারতে একটা বেজে গেল। তারপর লোলে বলল, 'খ্যাঁটটা দারুণ হেভি হয়ে গেল গুরু। এক ঘণ্টার জন্যে বিছানায় বডি ফেলব?'

পরমেশ্বর বলল, 'এক মিনিটের জন্যেও না। এক্ষুণি জি-পি-ওতে গিয়ে অ্যাপ্লিকেসনটা পোস্ট করে দিবি। কালকের ভেতর যেন "ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজে" পেঁ‌ৗছে যায়।'

মুখ-চোখ করুণ করে লোলে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ অ্যাপ্লিকেসনটা ঝেড়ে দিই গে—তবে ঘুমে চোখ শলা জুড়ে আসছে।'

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘুমিয়ে নেওয়া তার অনেক কালের অভ্যাস। এখন শুতে দিলে আজ আর অ্যাপ্লিকেসনটা পোস্ট করা হবে না। লোলে তো একাই না, আরো গণ্ডা গণ্ডা লোক দরখাস্ত পাঠাবে। সেই সব দরখাস্ত ঝাড়াই বাছাই করে ইণ্টারভিউক জন্য কয়েক-জনকে ডাকা হবে। তারপর হবে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট। তাড়াতাড়ি অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের ব্যবস্থা না করলে লোলেকে "ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজে" ঢোকানো যাবে না। আর লোলে ওখানে না ঢুকলে অমিতাভর বারোটা বাজানোর ব্যাপারে দেরি হয়ে যাবে। একটা কনট্রাক্ট নিয়ে এত দিন পড়ে থাকার মানে হয় না। এই অপারেসনটা খুব তাড়াতাড়িই চুকিয়ে ফেলতে চায় পরমেশ্বর। তার সারভিসের জন্য গাদা গাদা ক্লায়েণ্ট এখন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পরমেশ্বর বলল, 'চোখ জুড়ে যাক আর যা-ই হোক, এখন ফোটো তো চাঁদ। আমাকেও বেরুতে হবে।'

লোলে জিজ্ঞেস করল, 'এক্ষুণি বেরুবে গুরু?'

পরমেশ্বর এখন তার ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের অফিসে যাবে। বলল, 'এক্ষুণি।'

'চল, তা হলে একসঙ্গেই বেরুনো যাক।'

পরমেশ্বর ঝটপট ড্রেস-ট্রেস পাল্টে চুল আঁচড়ে নিল। তারপর বলল, 'চল্—'

ওরা যখন বেরুতে যাবে সেই সময় পিকিনীজটা নিয়ে হেমা আবার এল। বলল, 'এই দিন আপনার কুকুর।'

দেখেই বোঝা যায় সাবান-টাবান দিয়ে কুকুরটাকে স্নান করানো হয়েছে। সাদা ধবধবে একটা পাউডারের পাফের মতো দেখাচ্ছে সেটাকে। পরমেশ্বর কুকুরটাকে নিয়ে তার নাকে-মুখে-ঘাড়ে-গলায় নাক এবং গাল ঘষে আদর করতে করতে হেমাকে বলল, 'শুধু শুধু কষ্ট করলেন তো?' কুকুরটাকে স্নান করিয়ে দেবার ইঙ্গিত দিল সে।

হেমা বলল, 'এই কথাটা অনেকবার বলেছেন।'

পরমেশ্বর এবার হাসল; তবে কিছু বলল না।

হেমার পরনে এখন দামী বেলবটম আর শার্ট, পায়ে উঁচু হিলের প্ল্যাটফর্ম। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল হেয়ার টনিক দিয়ে চকচকে করে মাজা, ঠোঁটে গাঢ় করে রঙ লাগানো, গালেও রঙের কোটিং। পুরোপুরি বাইরে বেরুবার মেক-আপ। খুব সম্ভব সে তার অফিসে যাচ্ছে।

হেমা বলল, 'আচ্ছা চলি। সী ইউ এগেন। অল দি বেস্ট—' বলেই হাত নেড়ে হেমা চলে গেল।

বাইরের প্যাসেজে যখন হেমার প্ল্যাটফর্মের খট খট শব্দ ক্রমশঃ মিলিয়ে যেতে লাগল সেই সময় জলে বুজকুড়ি কাটার মতো শব্দ করে লোলে বলে উঠল, 'গুরু একটা কথা—'

কুকুরটাকে তখনও আদর করছিল পরমেশ্বর। লোলের দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'তোমার এই এইট-এইট্টি ভোল্টের ছোট বোন-ফোন নেই?'

ঝট করে এবার মুখ তুলল পরমেশ্বর। চোখ আর কপাল কুঁচকে গালের ভেতর জিভটা ঘোরাতে ঘোরাতে আস্তে আস্তে বলতে লাগল, 'থাকলে একটা চান্স লড়িয়ে দিতিস—না?'

হলদে ট্যারাবাঁকা দাঁতগুলো বার করে লোলে বলল, 'তুমি গুরু অন্তর্যামী না কী যেন বলে তা-ই। ঠিক মাইরি ক্যাচ করে ফেলেছ। তোমার জবাব নেই।' একটু থেমে বলল, 'তোমার ঐ গেরেল ফ্রেণ্ডের (গার্ল ফ্রেণ্ডের) একটা বোন থাকলে জান ঠিক লড়িয়ে দিতাম। তারপর দুই ব্রাদার দুই সিস্টারকে নিয়ে সুখের কারেণ্টে পানসী ভাসিয়ে শলা স্রেফ উড়তাম।'

পরমেশ্বর বলল, 'ওর কোন সিস্টার নেই চাঁদু!'

'নেই!' ঠোঁট-ফোট উল্টে একটা দারুণ হতাশার 'পোজ' করল লোলে।

'শুধু নিজের বোনই না, খুড়তুতো জ্যাঠতুতো মামাতো পিসতুতো মাসতুতো পাড়াতুতো—কোনোরকম সিস্টার নেই।'

'গুরু এমন একটা খবর দিলে! আমার হার্টে আজই শলা ক্যানসার হয়ে যাবে।'

পরমেশ্বর এবার আলতো করে লোলের পাছায় একটা লাথি হাঁকিয়ে বলল, 'মাকড়া তখ্ন থেকে ভ্যাজর ভ্যাজর করছে। চল্ শলা—' বলেই গলা কয়েক পর্দা তুলে ডাকল, 'ছোটি সিং—'

ছোটি সিং দৌড়ে এলে তার হাতে কুকুরটাকে দিতে যাবে, আচমকা বেডরুমে টেলিফোন বেজে উঠল। এই দুপুরবেলা কে ফোন করতে পারে?

পরমেশ্বর লোলেকে বলল, 'তুই জি-পি-ওতে চলে যা। আমার বেরুতে একটু দেরি হবে।'

'ও-কে বস।' লোলে ঘাড় ঝুঁকিয়ে প্যাসেজের মাথার দরজাটার দিকে এগুতে এগুতে বলল, 'আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে?'

'শীগগিরই।'

'আমি কি এখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব?'

একটু ভাবল পরমেশ্বর। লোলের পক্ষে এখানে ঘন ঘন আসাটা ঠিক হবে না। অমিতাভ এখনও এই ফ্ল্যাটে আসে নি কিন্তু যে কোন সময় এসে পড়তে পারে। লোলে যে তার লোক, এটা অমিতাভ কোনরকমে জেনে ফেললে তার ফলাফল ভালো হবে না। তা ছাড়া লোলেকে দিয়ে অনেক সিক্রেট কাজ করাতে হয়। তার মুখটা লোকে চিনে ফেলুক, এটা চায় না পরমেশ্বর। ওকে সে পর্দার আড়ালেই রাখতে চায়।

পরমেশ্বর বলল, 'না। আমি না বললে কক্ষণো এখানে আসবি না। দরকার হলে আমি নিজে গিয়ে তোর সঙ্গে দেখা করব।'

'ঠিক হ্যায়।' লোলে দরজার বাইরে উধাও হয়ে গেল।

টেলিফোনটা বেজেই যাচ্ছিল। লম্বা লম্বা পা ফেলে পরমেশ্বর বেডরুমে এসে সেটা তুলে কানে ঠেকাল। 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে সোমেশ্বরের গলা ভেসে এল, 'আরে তুমি এখানে! আর দশবার করে আমি তোমার অফিসে ফোন করে যাচ্ছি!'

পরমেশ্বর বলল, 'আমার বেরুতে আজ দেরি হয়ে গেছে।'

'শরীর খারাপ নাকি?'

'না, শরীর ঠিকই আছে। আমার এক অ্যাসিস্টাণ্টকে আসতে বলেছিলাম। অমিতাভ সেনের ফ্যাক্টরিতে নেক্সট উইকে অপারেসন কমপ্লীট করে ফেলতে হবে। অপারেসনের প্ল্যানটা ওকে বুঝিয়ে কয়েকটা ইনস্ট্রাকশন দিতে দিতে লেট হয়ে গেল।'

'ওই অপারেসনে অ্যাসিস্টাণ্টের দরকার হবে নাকি?'

'আপনার সঙ্গে কণ্ডিশান ছিল, আমি যেটুকু জানাব, তার বাইরে আপনি আর কোন কিউরিওসিটি দেখাবেন না।'

'আই অ্যাম স্যরি। এবার থেকে কণ্ডিসানটার কথা সবসময় মনে রাখব।'

'এটাই কিন্তু লাস্ট ওয়ার্নিং। আগেও আপনি অনেকবার গলা বাড়িয়ে কিউরিওসিটি দেখিয়েছেন। আর যদি এরকম করেন স্যার, আমি এই কনট্রাক্ট ছেড়ে দেব।'

'ভেরি ভেরি স্যরি। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।'

পরমেশ্বর বলল, 'এখন বলুন, কী জন্যে এত বার ফোন করেছেন?'

একটা বিরাট ফাইভ স্টার হোটেলের নাম করে সোমেশ্বর বললেন, 'হাফেজ পীরভয় ওখানে আছেন। তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছেন। তা ছাড়া অন্য একটা অ্যাসাইনমেণ্টও তোমাকে আমরা দিতে চাই। তুমি একবার ঐ হোটেলটায় আসতে পারবে?'

'কখন?'

'ধর, দুটো থেকে তিনটের ভেতর।'

'পারব।'

'ভেরি গুড!'

'কী অ্যাসাইনমেণ্ট দিতে চাইছেন?'

'হোটেলেই সে কথা হবে।'

'ও-কে স্যার।'

লাইন কেটে গেল।

তাড়াহুড়োয় কুকুরটাকে বুকের ভেতর নিয়েই ফোন ধরতে বেডরুমে চলে এসেছিল পরমেশ্বর। ছোটি সিংকে ডেকে সেটা তার হাতে দিয়ে বলল, 'এটাকে দেখো।' বলেই আর দাঁড়াল না। সোজা বাইরের দরজার দিকে চলে গেল।



এমনিতেই দেরি করে এসেছিল। অফিসে এসে স্টেনোগ্রাফারকে ডেকে তিন-চারটে ডিক্টেসন দিল পরমেশ্বর। তারপর পার্সোনাল সেক্রেটারি রোজির থামের মতো উরু, জোড়া পাহাড়ের মতো বুক, সরু কোমর আর সেক্সি চাউনি এবং হাসি দেখতে দেখতে দুটো বেজে গেল। আর তখনই হাফেজ পীরভয়ের কথা মনে পড়ল পরমেশ্বরের। এক সেকেণ্ডও দেরি না করে লিমুজিনের চাবির রিং আঙুলের ডগায় ঘোরাতে ঘোরাতে সে লিফটে করে নিচে পার্কিং এরীয়াতে চলে এল।

আধ ঘণ্টা পর দেখা গেল সেণ্ট্রাল ক্যালকাটার বিরাট একটা হোটেলের সামনে গাড়ি পার্ক করে ভেতরে ঢুকছে পরমেশ্বর। আগেও নানা অপারেসনের ব্যাপারে এই ফাইভ স্টার হোটেলে বার কয়েক এসেছে সে। এখানকার সবই তার চেনা।

ভেতরে ঢুকলেই কার্পেট-মোড়া লম্বা প্যাসেজ। তার দু'ধারে দামী দামী অজস্র দোকানের ঝলমলে শো-উইণ্ডো। খানিকটা যাবার পর হঠাৎ পরমেশ্বরের মনে পড়ল, হাফেজ পীরভয়ের স্যুইট নাম্বারটা সোমেশ্বরের কাছ থেকে জেনে নেওয়া হয় নি। একটু ভেবে সোজা সে রিসেপসানে চলে গেল।

রিসেপসানিস্ট ছুকরিটার চেহারা দুর্দান্ত। লোলে সঙ্গে থাকলে বলত 'এইট-এইট্টি ভোলট'। আঙুলের ডগায় দামী লিমুজিনের চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে মেয়েটার কাছে এসে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'হাফেজ পীরভয় কত নম্বর স্যুইটে আছেন, দয়া করে একটু বলবেন ম্যাডাম?'

মেয়েটা ব্যস্তভাবে বলল, 'উইথ প্লেজার স্যার।' তারপর দ্রুত বোর্ডারদের নামের বিরাট একটা শীট বার করে দেখতে দেখতে মুখ তুলল, 'ফোর হানড্রেড অ্যাণ্ড থার্টি থ্রী স্যার।'

'মেনি মেনি থ্যাঙ্কস—'

মেয়েটি কিছু বলল না; দারুণ মিষ্টি করে একটু প্রফেসানাল হাসি হাসল। এভাবে হাসাটা তার সারভিসের একটা শর্ত।

পরমেশ্বর আর দাঁড়াল না। রিসেপসানের সামনেই বিরাট লাউঞ্জ। সেটার ওধারে পর পর অনেকগুলো লিফট্ বক্স। পরমেশ্বর সোজা সেখানে এসে একটা বক্সের ভেতর ঢুকে বলল, 'চারশো তেত্রিশ মে যায়েগা।'

লিফটম্যান তক্ষুণি দরজা বন্ধ করে বোতাম টিপে দিল।

কিছুক্ষণ পর ফোর্থ ফ্লোরে এসে লম্বা করিডোরের দু-ধারে পর পর সাজানো স্যুইটের দরজার মাথায় নম্বর দেখতে দেখতে চারশো তেত্রিশের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল পরমেশ্বর। কলিং-বেল টিপতেই ভেতর থেকে ভারী-গলা ভেসে এল, 'কাম ইন—'

দরজা ভেজানো ছিল। ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল পরমেশ্বর। সামনেই ছ' ইঞ্চি পুরু কার্পেটে মোড়া স্যুইটের বিশাল ড্রইং রুম। সেখানে হাফেজ পীরভয় এবং সোমেশ্বর বসে ছিলেন।

পীরভয়কে কাল দু-এক মিনিটের জন্য এয়ারপোর্টে দেখেছিল পরমেশ্বর। অবশ্য সোমেশ্বর তার আগেই ভালো করে চিনে রাখার জন্য পীরভয়ের একটা ফটো দিয়ে রেখেছিলেন। কাজেই হোটেলের এই স্যুইটে তাকে দেখা মাত্র চিনতে অসুবিধা হল না।

সোমেশ্বর হাতের কব্জি উল্টে ইলেকট্রনিকসের ঘড়ি দেখতে দেখতে বললেন, 'একেবারে রাইট টাইমে এসেছে। পাংচুয়ালিটির দিক থেকে পরমেশ্বর একেবারে পারফেক্ট ব্রিটিশার।'

এদিকে হাফেজ পীরভয় পরমেশ্বরকে দেখেই উঠে পড়েছিলেন। যদিও কাল এয়ারপোর্টে পোর্টারের মেক-আপে যে পরমেশ্বরকে দেখেছিলেন, তার সঙ্গে আজকের এই পরমেশ্বরের আদৌ কোন মিল নেই, তবু তাকে চেনা গেল এই কারণে যে, এখন পরমেশ্বর ছাড়া আর কারো আসার কথা নেই। তা ছাড়া সোমেশ্বর এই মুহূর্তে তার নামটাও বলেছেন।

সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে পীরভয় বললেন, 'ওয়েলকাম, মোস্ট ওয়েলকাম। কী নাম বলব আপনার—মিস্টার পরমেশ্বর না মিস্টার হালদার?'

বোঝা গেল, সোমেশ্বর তার আসল-নকল দুটো নামই বলে দিয়েছেন পীরভয়কে। তার বাড়ানো হাতটা ধরে আস্তে আস্তে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে পরমেশ্বর বলল, 'যে নামে ডেকে আরাম হয়। আপনার জিভের ওপর ওটা ছেড়ে দিলাম।'

পীরভয় বললেন, আমি আপনাকে মিস্টার হালদারই বলব।'

'ও-কে "বস"। আমার অবজেকসান নেই। মনে হলে আমাকে এইচ. ডি. পাল বলেও ডাকতে পারেন।'

'এইচ. ডি. পাল কী?'

'হরিদাস পাল।'

হরিদাস পালের ইন্টারন্যাল গভীর মানেটা পীরভয়ের মতো একজন ননবেঙ্গলীর পক্ষে বোঝা সম্ভব না। একবার পরমেশ্বরের দিকে, আরেকবার সোমেশ্বরের দিকে তাকাতে লাগলেন তিনি!

সোমেশ্বর বললেন, 'ও কিছু না। হী ইজ কাটিং জোক।' 'পরমেশ্বরকে বললেন, 'বোসো।'

পীরভয়ের হাত ছেড়ে দিয়ে পরমেশ্বর একটা সোফায় বসে পড়ল। মুখোমুখি আরেকটা সোফায় বসলেন পীরভয়। তারপর বললেন, 'আমার কমপ্লিমেণ্টস নিন মিস্টার হালদার—'

পরমেশ্বর বলল, 'কিসের কমপ্লিমেণ্টস?'

'আপনি মশাই ইণ্টারন্যাশনাল স্ট্যাণ্ডার্ডের জিনিয়াস। আমি হোল ওয়ার্ল্ড চষে বেড়াই। কিন্তু আপনার ধারে-কাছে আসতে পারে এমন ট্যালেণ্টেড লোক দু-চারজনের বেশী দেখি নি।'

পরমেশ্বর মনে মনে বলল, 'শালা মাকড়া, এই কথা বলার জন্যে দুপুর রোদে আমাকে ঘোড়দৌড় করিয়ে এনেছ!' মুখে অবশ্য কিছু বলল না, শুধু একটু হাসল।

পীরভয় গ্যাদগেদে গলায় বলে যাচ্ছিলেন, 'কাল যেভাবে সিক্রেট ডকুমেণ্টগুলো এয়ারপোর্ট থেকে পাচার করলেন, আমার ফোরটিন জেনারেশন [illegible] বছর চেষ্টা করলেও তা পারত না। আমি তো মশাই এয়ারপোর্টে নেমে রীতিমতো নার্ভাসই হয়ে পড়েছিলাম। ভয় ছিল, সিক্রেট পেপারসুদ্ধু যদি কাস্টমসের হাতে পড়ি তাহলে আর দেখতে হবে না। বাকী লাইফটা স্রেফ জেলের লাপসি খেয়ে-খেয়েই কেটে যাবে। মশাই, ভাবতেই পারি নি, একজন পোর্টার আমাকে এভাবে উদ্ধার করবে। আবারও বলছি, আপনি একজন হাই স্টণ্ডার্ডের ক্রিয়েটিভ জিনিয়াস। অবশ্য—'

'কী?'

'আপনার জিনিসই আপনি এয়ারপোর্ট থেকে বার করে এনেছেন!'

'আমার জিনিস মানে?'

ওধার থেকে সোমেশ্বর বললেন, 'রণজয় হালদারের নামে সুইস ব্যাঙ্কের পেপারগুলো!'

পরমেশ্বর দুই হাত চিত করে দিয়ে বলল, ‘আপনারা স্যার আমাকে শেষ পর্যন্ত রণজয় হালদার করেই ছাড়বেন দেখছি।’

‘আপত্তির কী আছে? রণজয় হালদার ট্রেড অ্যান্ড কমার্সের ওয়ার্ল্ডে একটা ভেরী বিগ নেম।’

পীরভয় ওধার থেকে সোমেশ্বরকে বললেন, ‘স্যার, আমার একটা প্রোপোজাল আছে।’

সোমেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী?’

‘ক্যালকাটা বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের ছোট এরীয়াতে আটকে না রেখে মিস্টার হালদারের ট্যালেন্টকে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে কাজে লাগানো উচিত। আমাদের তো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ডে এ রকম সুপার স্ট্যান্ডার্ডের স্কিল্ড লোক দরকার।’

‘ওকে দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ডে কী কাজ করাতে চাও?’

পরমেশ্বর টের পাচ্ছিল এই সোমেশ্বর মাকড়াটি দুর্দান্ত খলিফা টাইপের মাল। শুধু কলকাতাতেই না, হোল ওয়ার্ল্ডে নানা রকম র‍্যাকেটের সঙ্গে লোকটা জড়িয়ে আছে। তার বিরাট নেট-ওয়ার্কের একজন হলেন এই পীরভয়।

পীরভয় বললেন, ‘এই ধরুন লন্ডনের জেলে আমাদের একজন মেয়াদ খাটছে। তাকে বার করে আনার যদি কোন প্ল্যান করতে পারেন মিস্টার হালদার। যে-সব কান্ট্রিতে গোল্ড চীপ, সে-সব জায়গা থেকে এনে ইন্ডিয়ান টেরিটোরিতে সোনা নিয়ে আসা। আমেরিকা থেকে ডলার এনে ইন্ডিয়ায় ব্ল্যাক করা, আফ্রিকা থেকে যে-সব ইন্ডিয়ান ইমিগ্রান্টস ইউ. কে.-তে ঢুকতে চায় তাদের জন্য দরকারী পাসপোর্ট আর জব ভাউচার জাল করা—এই রকম ক্রিয়েটিভ কাজ ওঁকে দেওয়া যেতে পারে।’

শুনতে শুনতে চমকে উঠল পরমেশ্বর। সোমেশ্বর নামে এই মালটি কত রকম কারবারের সঙ্গে যে জড়িয়ে আছে, কে জানে।

এদিকে সোমেশ্বর বললেন, ‘ভেরি নাইস প্রোপোজাল। এ ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে দেখা যাবে। মোট কথা, যেভাবে হোক, একটার-পর-একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে ওকে আমাদের মধ্যে ধরে রাখতে হবে। ফ্রম নাউ অনওয়ার্ড হী উইল বী আওয়ার লাইফ লং পার্টনার—না কি বল পীরভয়?’

পীরভয় ঘাড়খানা দেড় মিটার হেলিয়ে দিলেন, ‘একজাক্টলি স্যার।’

পরমেশ্বর বলল, ‘আপনি স্যার, এ কথাটা আমাকে আগেও বলেছেন কিন্তু তা হয় না।’

‘কী হয় না?’

‘শুধু আপনার কাজ করে যাওয়া। হোল লাইফ আপনার সারভিস

করলে আমার অন্য ক্লায়েণ্টদের কাজ করব কখন ? তারা মাইরি লাইন দিয়ে আমার সারভিসের জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

'আরে ওদের যত ডার্টি ছ্যাঁচড়া কাজ। তোমার মতো জিনিয়াসের ওসব নিয়ে পড়ে থাকার মানে হয়! আমাদের সঙ্গে থাকলে ইণ্টারন্যাশনাল লেভেলে কাজ করতে পারবে। আমি তোমাকে সব রকম স্কোপ করে দেব।'

'কিন্তু—'

'কী ?'

'আমি স্যার ফ্রী প্রোফেসনে থাকতে চাই। কারো চামচা কি চাকর-বাকর হয়ে কাজ করতে পারব না।'

'আরে বাবা তুমি ফ্রী প্রোফেসনেই থাকবে। আমার চামচা বা চাকর তোমাকে হতে হবে না! তবে আমার কাছে হাজার রকমের কাজ রয়েছে। এত কাজ যে, কেউ এক লাইফে তা কমপ্লীট করতে পারবে না। তা ছাড়া ছুঁচোদের ছোটখাটো বাজে থার্ড ক্লাস কাজের চাইতে বিগ ফিল্ডে বড় কাজ করার প্লেজারই অন্য রকম। এসব করতে করতে দেখবে তোমার ট্যালেণ্ট টেন টাইমস বেড়ে যাবে।'

পরমেশ্বর তবু গাঁইগুঁই করতে লাগল, 'আমি স্যার ফ্রী ম্যান ; আজাদী ছাড়তে কিন্তু পারব না।'

সোমেশ্বর বললেন, 'আরে বাবা, তোমার ফ্রীডমে কোনো হারামী হাত দেবে না।' মুড চেগে উঠলে মাঝে-মধ্যে দু-একটা রদ্দি খিস্তিও তিনি ঝেড়ে থাকেন।

পরমেশ্বর এবার আর কিছু বলল না।

সোমেশ্বর বললেন, 'ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাসাইনমেণ্ট পরে দেওয়া যাবে। এখন যে জন্যে তোমাকে এখানে আসতে বলেছি, সেটা ভালো করে শোন।'

পরমেশ্বর মুখ তুলে তাকিয়ে রইল।

সোমেশ্বর বললেন, 'আজ হচ্ছে সোমবার। কামিং ফ্রাইডে বা শুক্রবারে বম্বে থেকে একটা গুডস ট্রেনে পাঁচ কোটি টাকার ওষুধ আসছে। সবই লাইফ সেভিং ড্রাগ। ইঞ্জিনের ঠিক পরেই তিনটে ওয়াগনে ওষুধগুলো রয়েছে। এ ওষুধগুলো তোমাকে যেভাবেই হোক লোপাট করে দিতে হবে। ইটস এ সেপারেট কনট্রাক্ট। টাকার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'ওষুধটা নষ্ট করে আপনার কী লাভ ?'

'আমার নিজেরও মেডিসিন প্ল্যাণ্ট রয়েছে। ঐ সব ওষুধ এলে মার্কেটে আমার ওষুধ কেউ ছোঁবেও না। কাজেই বুঝতেই পারছ—'

উত্তর না দিয়ে সোফার পিঠে আস্তে আস্তে হেলান দিয়ে চোখ বুজল

পরমেশ্বর। এক মিনিট দু-মিনিট করে ঝাড়া সাতটা মিনিট কেটে যাবার পরও যখন পরমেশ্বর কোন রকম সাড়াশব্দ দিল না, তখন সোমেশ্বর কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়লেন, 'কী হল তোমার, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?'

চোখ মেলল না পরমেশ্বর। যেভাবে হেলান দিয়ে ছিল ঠিক সেভাবে থেকেই বলল, 'না স্যার, ঘুমোই নি। স্লাইট ধ্যান করতে করতে আপনার কথাই ভাবছিলাম।'

'আমার কথা!' সোমেশ্বর একটু অবাকই হলেন।

'ইয়েস স্যার। স্মাগলার, ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, ফোরটোয়েণ্টি, অ্যাণ্টিসোসাল, অ্যাণ্টিন্যাশনাল, লোকের বারোটা বাজাবার ধান্দা করনেবালা—আপনি মাইরি কী যে মাল ঠিক মালুম করে উঠতে পারছি না।'

সোমেশ্বরের একটা ব্যাপার আছে। তিনি হানড্রেড পারসেণ্ট স্পোর্টসম্যান। পরমেশ্বরের কথায় একটুও চটলেন না। চোখ কুঁচকে খচড়াদের মতো মিটি মিটি হাসতে হাসতে বললেন, 'শ্রীমদ্ভাগবত গীতা পড়েছ ?'

'আমার ফোরটিন জেনারেশনে কেউ কোনো দিন বইটার নামও শোনে নি।'

'তুমি একটি সুপার ক্লাসের হারামজাদা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলে একটা ক্যারেক্টার আছে। সে নিজের মধ্যে বিশ্বরূপ মানে হোল ওয়ার্ল্ডের সব কিছু দেখাতে পারত। কিছুদিন আমার কাছে থাকো, বিশ্বরূপ দেখতে পাবে।'

'তাই মনে হচ্ছে স্যার! যাক গে, আপনার ওষুধের ট্রেনটা বম্বে থেকে কবে ছাড়ছে ?'

'আজ ইভিনিং-এ।'

'খবর আগে থেকেই রেখেছেন দেখছি।'

'তা তো রাখতেই হবে।'

'হাওড়ায় কবে ট্রেনটা রীচ করছে ?'

'শুক্রবার।'

'এত দেরি হবে কেন ?'

'ওটা তো প্যাসেঞ্জার ট্রেন নয়। গুডস ট্রেনকে এমনিতেই সাইডিং-এ ফেলে রেখে প্যাসেঞ্জার ট্রেনকে আগে যেতে দেওয়া হয়। এভাবে নানা জায়গায় ঠেক খেয়ে খেয়ে ডেস্টিনেসনে রীচ করতে দেরি হয়ে যায়।'

'ট্রেনটা কোন্ রুটে আসছে ?'

'বম্বে-ক্যালকাটা ভায়া নাগপুর রুটে।'

'কোন্ কোন্ সাইডিং-এ কত দিন করে ট্রেনটা পড়ে থাকবে ?'

'শুনেছি, নাসিকে থাকবে চার ঘণ্টা, নাগপুরে ছ' ঘণ্টা, বিলাসপুরে তিন ঘণ্টা আর টাটানগরে পুরো একটা রাত।'

'টাটানগর! টাটানগর!' বারকয়েক নামটা আওড়াল পরমেশ্বর। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ট্রেনটা কবে আসছে টাটানগরে?'

'বুধবার সন্ধ্যেবেলা।'

এর পর ট্রেনটার নাম্বার, গার্ড এবং ড্রাইভারের নামও জিজ্ঞেস করল পরমেশ্বর। আশ্চর্য, সোমেশ্বরের কাজের ভেতর কোথাও এতটুকু ফাঁক থাকে না। সব ব্যাপারেই লোকটা একেবারে পারফেক্ট। গার্ড এবং ড্রাইভারের নামও তিনি যোগাড় করেছেন। গার্ডের নাম আবদুল রসিদ আর ড্রাইভারের নাম মাইকেল পেরেরা। তবে ট্রেনের নম্বরটা এখনই দিতে পারলেন না সোমেশ্বর। আজই ওটা পেয়ে যাবেন। রাত্রে কোন এক সময় ফোনে পরমেশ্বরকে বলে দেবেন।

পরমেশ্বর বলল, 'ও-কে স্যার, তাই দেবেন। সময় কিন্তু বেশী নেই, কাল থেকেই অপারেশনে নেমে পড়তে হবে।'

সোমেশ্বর বললেন, 'অল রাইট!'

পীরভয় অবাক হয়ে শুনছিলেন। এবার তিনি নড়েচড়ে বসে বললেন, 'আপনি কি মনে করেন মিস্টার হালদার, এ কাজটা করা পসিবল?'

পরমেশ্বর বলল, 'আপনি আমাকে আকাশ থেকে চাঁদটাদ পেড়ে আনতে বললে পারব না। কিন্তু যে মালগাড়িটা বম্বে থেকে কলকাতায় আসতে লাগাচ্ছে পুরো পাঁচ দিন; তার ওপর এখানে-ওখানে সাইডিং-এ পড়ে থাকছে কয়েক ঘণ্টা করে; হয়ত অত বড় গাড়িতে আর্মর্ড গার্ড থাকবে দু' একজন। এমন একটা ট্রেন থেকে তিনটে ওয়াগন হাপিস করে দেওয়া খুব একটা শক্ত কাজ বলে মনে হয় না। অবশ্য তার আগে প্ল্যানিংটা ঠিকমতো করে নিতে হবে। দেখতে হবে সেখানে কোন গড়বড় থেকে না যায়।'

'আপনার এই অপারেশনটার জন্যে আমি দমবন্ধ করে থাকব।'

'দম বন্ধ করে থাকতে হবে না! আরাম করে দম নিতে-নিতেই আপনি ওয়েট করতে থাকুন। দেখবেন কাজটা হয়ে গেছে।' বলে সোমেশ্বরের দিকে তাকাল পরমেশ্বর, 'আর কোনো কথা আছে স্যার?'

সোমেশ্বর ঘাড় নাড়লেন, 'না।'

তাহলে এখন উঠি। আবার দেখা হবে। বাই—' পরমেশ্বর উঠে বাইরের করিডোরে চলে এল।

করিডোরটার এক মাথায় সারি সারি লিফট্ বক্স। আরেক মাথায় সিঁড়ি। সিঁড়িটা এই ফোর্থ ফ্লোর টাচ করে এঁকেবেঁকে নিচে এবং ওপরে চলে গেছে।

আচমকা পরমেশ্বরের চোখে পড়ল, একটা মেয়ে ঝড়ের গতিতে সিঁড়ির

দিকে চলে যাচ্ছে। পেছন থেকে শরীরের ফ্রেমটা দারুণ চেনা-চেনা লাগছে। কে যেন? কে যেন? ভাবতে ভাবতেই তার মাথায় ইলেকট্রিসিটি খেলে গেল। হেমা—নিশ্চয়ই হেমা সারিন। কিন্তু ভাবতে যেটুকু সময় লাগল তার মধ্যে সিঁড়ির কাছে অদৃশ্য হয়ে গেছে হেমা।

পরমেশ্বর একবার ভাবল সিঁড়ির দিকে যাবে। কিন্তু সে ওপরে গেল কি নিচে বোঝা যাচ্ছে না। আন্দাজে পরমেশ্বর তাকে কোথায় খুঁজবে? যদি নিচেই গিয়ে থাকে, তা হলে এতক্ষণে অন্ততঃ একটা ফ্লোর ক্রস করে গেছে। দৌড়ে গিয়ে তাকে আর ধরা যাবে না। লম্বা লম্বা পা ফেলে পরমেশ্বর একটা লিফটে এসে ঢুকল। এক মিনিটও লাগল না, গ্রাউণ্ড ফ্লোরে চলে এল। তারপর লাউঞ্জ, রিসেপশন, বিরাট আলোকোজ্জ্বল হল, লম্বা প্যাসেজ—সব জায়গায় গাদা গাদা ফরেন ট্যুরিস্ট আর ইণ্ডিয়ার নানা প্রান্তের মানুষের ভিড়ে খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করল পরমেশ্বর। কিন্তু হেমা কোথাও নেই, ছুকরি স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছে।

কী আর করা যায়! পরমেশ্বর আস্তে আস্তে হোটেলের বাইরে চলে এল। প্রকাণ্ড পোর্টিকোর তলায় আসতেই চোখে পড়ল সামনের বিশাল অ্যাসফাল্টের রাস্তাটা পার হয়ে ওপারে যেখানে প্রায় হাজারখানেক গাড়ি পার্ক করা আছে সেখানে চলে যাচ্ছে হেমা। পরমেশ্বর রাস্তার দিকে ছুটল কিন্তু ওপারে যাওয়া সম্ভব হল না। আপ আর ডাউনে এখন বাস-মিনি-ট্যাক্সি আর প্রাইভেট কারের স্রোত চলেছে।

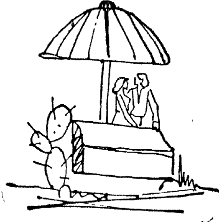
মিনিট পাঁচেক বাদে রাস্তা ক্রস করতে পারল পরমেশ্বর। এ ধারের পার্কিং জোনে এসে হেমাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। অজস্র ট্রাফিক আর মানুষের ভিড়ে কখন যেন সে মিলিয়ে গেছে।

পরমেশ্বর তার লিমুজিনে উঠে স্টার্ট দিল। এখন তাকে নিজের অফিসে ফিরে যেতে হবে। বিকেল হয়ে আসছে। পাঁচটা পর্যন্ত অফিসে কাটিয়ে তারপর ক্লাব।

অগুনতি গাড়ির ভেতর পরমেশ্বরের লিমুজিনটাও ছুটছিল। স্টিয়ারিংএ হাত রেখে অন্যমনস্কর মতো সে ভাবছিল, হেমা হঠাৎ এই হোটেলে এসেছিল কেন? তার খোঁজেই কি, না অন্য কোন দরকারে? এর আগেও এয়ার-পোর্টে তাকে দেখেছে পরমেশ্বর। অবশ্য হেমা বলেছিল এক বন্ধুকে রিসিভ করার জন্য সে গিয়েছিল। মেয়েটা যদি অন্য কাজে আজ হোটেলে এসে থাকে তা হলে আলাদা কথা। আর যদি তারই জন্য এসে থাকে তা হলে? আর যদি তারই জন্য এসে থাকে? এখানে একটা দুর্দান্ত ঝামেলার ব্যাপার থেকে যাচ্ছে। পরমেশ্বর যে আজ এখানে আসবে, সেটা

আগে থেকে হেমা জানলো কী করে? কেউ কি তার ওপর নজর রেখে হেমাকে খবর দিচ্ছে? কে দিতে পারে? অফিসের কেউ দিতে পারে না। তবে কি তার ফ্ল্যাটের কেউ? তার ওখানে ছোটি সিং ছাড়া আর কেউ নেই। কিন্তু ছোটি সিং তো সোমেশ্বরের রিক্রুট-করা বেয়ারা। নিশ্চয়ই না দেখেশুনে তাকে দ্যান নি সোমেশ্বর। তা ছাড়া সোমেশ্বরের সঙ্গে এয়ারপোর্টে অপারেশন বা হোটেলে পীরভয়ের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে যে কথাবার্তা হয়েছিল, তখন ধারে-কাছে ছোটি সিং কোথাও ছিল না। লুকিয়ে চুরিয়ে তার কথা শুনছে না তো ছোটি সিং? এবার থেকে এ ব্যাপারটায় নার্ভগুলোকে খুব সজাগ রাখতে হবে।

আচমকা আর একটা কথা মনে পড়ে গেল পরমেশ্বরের। সোমেশ্বরের ওখান থেকে খবরটবর 'লীক' হয়ে যাচ্ছে না তো? এ সম্পর্কে সোমেশ্বরকে একটা ওয়ার্নিং দিয়ে রাখতে হবে। তার আগে অবশ্য হেমাকে একবার টোকা মেরে দেখতে হবে, সত্যিসত্যিই সে তাকে 'ফলো' করতে হোটেলে গিয়েছিল, না তার অন্য কোন দরকার ছিল?



অফিসে ফিরে এসে পরমেশ্বর দেখল, অমিতাভ আর সুনেত্রা বসে আছে। আগে তারা কখনও এখানে আসে নি। অমিতাভ অবশ্য বলেছিল, দুম করে একদিন তার অফিসে বা ফ্ল্যাটে এসে হাজির হবে। কিন্তু সুনেত্রাও যে আসবে, এটা ভাবতে পারা যায় নি। পরমেশ্বর দারুণ অবাকই হয়ে গেল। হঠাৎ কী এমন ঘটল যাতে ওরা খবরটবর না দিয়েই চলে এল! একবার মনে হল, এমনিই আড্ডা-টাড্ডা দিতে এসেছে। পরক্ষণেই ভাবল, পাঁচটার এক সেকেণ্ড আগে হলেও অমিতাভ তার ফ্যাক্টরি-কাম-অফিস কমপ্লেক্স থেকে বেরোয় না। কিন্তু এখন তো সবে চারটে বেজে পনের। নিশ্চয়ই এমন কোনো জরুরী ব্যাপার ঘটে গেছে যার জন্য তাকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে।

ওরা বাইরে রিসেপশনের সামনে একটা সোফায় বসেছিল। পরমেশ্বর কাছে এসে বলল,—'এ কি আপনারা!'

সুনেত্রা আর অমিতাভ একই সঙ্গে বলে উঠল, 'আপনাকে একটা দুর্দান্ত সারপ্রাইজ দিতে এলাম।'

পরমেশ্বর হাসল, 'ইজ ইট। আসুন আমার চেম্বারে।'

নিজের চেম্বারে এসে টেবলের একধারে বসল পরমেশ্বর। তার মুখোমুখি অমিতাভ আর সুনেত্রা। একটা বেয়ারাকে ডেকে আগে কফি আনতে বলল। তারপর অমিতাভদের দিকে আবার ফিরল, 'আমার এখানে কখন এসেছেন?'

অমিতাভ বলল, 'অ্যাবাউট অ্যান আওয়ার।'

যেন দারুণ লজ্জা পেয়েছে, এ রকম একটা ভঙ্গী করে জিভ কাটল পরমেশ্বর। বলল, 'ইস, দেখুন দেখি, কতক্ষণ বসে থাকতে হয়েছে। আই অ্যাম স্যরি।'

'আপনার স্যরি ফিল করার কোন কারণ নেই। আমরা নোটিশ না দিয়েই তো এসে পড়েছি।'

গলায় এক কেজি চিনির সিরাপ ঢেলে পরমেশ্বর বলল, 'আপনারা এসেছেন, কী খুশী যে হয়েছি!' মনে মনে বলল, 'আর ক'টা দিন ওয়েট কর মাকড়া, তোমার হাড্ডি আমি ঢিলে করে দিচ্ছি।'

বেয়ারা কফি, কাজু বাদাম, দামী বিস্কুট আর প্যাস্ট্রি কেক-টেক দিয়ে গেল। সুনেত্রা বা অমিতাভ কফি ছাড়া কিছু খাবে না, কিন্তু পরমেশ্বর ছাড়ল না। জোরজার করে প্লেট থেকে কেক আর কাজু তুলিয়ে ছাড়ল।

খেতে খেতে অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, 'অফিস ফেলে কোথায় গিয়েছিলেন?'

সোমেশ্বর তাকে নতুন অ্যাসাইনমেণ্টের জন্য যে হোটেলে ডেকেছিলেন তা তো আর অমিতাভকে বলা যায় না। পরমেশ্বর বলল, 'একটা দরকারী কাজে বেরিয়েছিলাম'।

'আমাদেরও তাই মনে হয়েছিল। আপনার জন্যে ওয়েট করতে করতে এই অফিসটা দেখছিলাম। আপনার টেস্ট আছে। ভেরি ওয়েল-ডেকরেটেড অফিস।'

পরমেশ্বর ভাবল, অফিসটা কে সাজিয়ে দিয়েছে তা তো জানো না। শালা! জানলে এর দু-হাজার কিলোমিটারের ভেতর তুমি ঢুকতে না। তুমি মাল এ-ও জানো না, তোমাকে ফাঁদে ফেলবার জন্য এভাবে সাজিয়ে এই অফিস বসানো হয়েছে! মনে মনে যাই ভাবুক, বিনয়ে মোমের মতো গলতে গলতে পরমেশ্বর বলল, 'আপনার ঐ টেরিফিস সাইজের বিরাট ফ্যাক্টরি আর অফিসের কাছে এটা কিছুই না। কোথায় আপনার 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজ', আর কোথায় আমার মতো হরিদাস পালের "ওভারসীজ ইমপোর্ট অ্যাণ্ড এক্সপোর্ট সোসাইটি"। যাক গে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে।'

'কী?'

'পিওর আগমার্কা আড্ডা মারার জন্যে আপনারা পেয়ারে এখানে আসেন নি। নিশ্চয়ই অন্য কোন আর্জেণ্ট ব্যাপার আছে। কী বলুন তো?'

একটু হেসে সুনেত্রার দিকে তাকাল অমিতাভ। তার পর পরমেশ্বরকে বলল, 'কী করে ধরলেন?'

তার পি-এ রোজি সুনেত্রাদের দেখে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। পরমেশ্বর বলল, 'আড্ডা-ফাড্ডা দিতে হলে ওঁকে নিয়ে এখানে আসতেন না। তার জন্যে ক্লাব ছিল, রেস্তোরাঁ ছিল, আরো দারুণ দারুণ সব জায়গা ছিল। এ জন্যে কেউ নিজের ফিয়াঁসীকে ঘাড়ে করে অফিসে আসে না।'

অমিতাভ হাসতে লাগল, 'কারেক্ট কারেক্ট। তবে আমার কোন দরকারে আজ আসি নি।' সুনেত্রাকে দেখিয়ে বলল, 'আর্জেণ্ট ব্যাপারটা এঁর।'

পরমেশ্বর সুনেত্রার দিকে তাকাল, 'ম্যাডাম, আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যাট

ইওর সারভিস। আপনার জন্যে লাইফ পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারি। বলুন, এখন আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

সুনেত্রা বলল, 'লাফইটা এখনি অন্ততঃ দিতে হবে না। শুধু গুড বয় হয়ে এক্ষুণি উঠে পড়ুন।'

'বেশ উঠলাম। তারপর?'

'তারপর আমাদের সঙ্গে নিচে গিয়ে গাড়িতে বসবেন। ব্যাক বা ফ্রন্ট, যে কোনো সীটে বসতে পারেন।'

'বেশ, বসলাম। তারপর?'

'তারপর আমরা কী করি মুখ বুজে শুধু দেখে যাবেন।'

'কোনো কথা বলতে পারব না?'

'নো।'

'একেবারে ঠোঁটে স্টিকিং গাম লাগিয়ে বসে থাকতে হবে?'

'ইয়েস স্যার।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

'নো কোশ্চেন। প্লীজ গেট আপ।'

অমিতাভর লাভার এই মেয়েটাকে প্রথম দিনই ভালো লেগেছিল পরমেশ্বরের। দারুণ গায়, ফাইন দেখতে। তার ওপর খুব হাসিখুশী মেয়ে। শুধু একটা-মাত্র খিঁচ রয়েছে। তার বাবা এক্স-পুলিস অফিসার। পুলিসের নামে কি একটা অ্যালার্জি হয় পরমেশ্বরের। যাক গে, সুনেত্রার বাবা তো আর এখন ধারে-কাছে নেই। পরমেশ্বর হাত ঝাঁকিয়ে মুখটা করুণ করে বলল, 'ও-কে ম্যাডাম, এই উঠলাম। আপনার কাছে বডি ফেলে দিলাম। যা খুশী করুন।'

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, ওরা তিনজন গ্রাউণ্ড ফ্লোরে এসে মেরুন রঙের একটা বিশাল লিমুজিনের ফ্রন্ট সিটে উঠল। এ গাড়িটা অমিতাভর।

অমিতাভ ড্রাইভারের সিটে স্টিয়ারিং নিয়ে বসেছে। মাঝখানে সুনেত্রা, এ ধারের জানলার ধার ঘেঁষে পরমেশ্বর।

পরমেশ্বর বলল, 'গাড়ি স্টার্ট করার পর তো আর গলার ভেতর থেকে আওয়াজ বার করতে পারব না। আগেই একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।'

'কী?' সুনেত্রা তার ফুলদানির মতো সুন্দর গলাখানা ঘুরিয়ে পরমেশ্বরের দিকে তাকাল।

পরমেশ্বরের মাথায় বম্বে থেকে আসা গুডস্ ট্রেনটা ঘুরছিল। আজ রাত্তিরে সেটার নম্বর জানিয়ে দেবেন সোমেশ্বর। ওটা জানার পর কাল থেকেই অপারেশনে নেমে পড়তে হবে। কাজেই সন্ধ্যের পর বেশীক্ষণ বাইরে

থাকা যাবে না। সোমেশ্বরের ফোনের জন্য নিজের ফ্ল্যাটে বসে ওয়েট করতে হবে।

পরমেশ্বর বলল, 'আমাকে কিন্তু আটটার ভেতর ছুটি দিতে হবে। খুব আর্জেণ্ট একটা ব্যাপার আছে।'

সুনেত্রা বলল, 'আটটায় ছাড়া যাবে না। ইটস্ ইমপসিবল্।'

'কোনো উপায় নেই ম্যাডাম। একটা দারুণ জরুরী খবর আসবে। সেটা জানতে না পারলে আমার অনেক "লস" হয়ে যাবে।'

'খবরটা কাল জেনে নেবেন।'

'কাল জানার উপায় নেই। আজই জানতে হবে।'

'ভেবেছিলাম অনেক রাত পর্যন্ত আপনাকে ধরে রাখব।'

পরমেশ্বর বলল, 'আজকের রাতটা আমাকে ক্ষমা করে দিন। এর পর যখন ইচ্ছে পর পর তিনটে নাইট কোমরে দড়ি আর হাতে হ্যাণ্ডকাফ লাগিয়ে আটকে রাখবেন।'

অনেক টানাহেঁচড়ার পর ঠিক হলো ন'টার সময় পরমেশ্বর মুক্তি পাবে। কিন্তু আরেকটা প্রবলেম দেখা দিল। পরমেশ্বর বলল, 'আমি তো আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি। গাড়ি-ফাড়ি নিলাম না। আমাকে কে পেঁৗছে দেবে?'

অমিতাভ বলল, 'সে রেসপনসিবিলিটি আমার।'

'থ্যাঙ্কস।' বলতে বলতে হঠাৎ একটা ব্যাপার মনে পড়ে গেল পরমেশ্বরের। সুনেত্রার কাঁধের ওপর দিয়ে অমিতাভর দিকে তাকাল সে। বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

'কী কথা?'

'একটা দারুণ জরুরী কাজে কাল মর্নিং-এ আমাকে কলকাতার বাইরে যেতে হচ্ছে।'

'কাল বিকেলে আপনার সঙ্গে দেখা হল। তখনও তো যাবার কথা বলেন নি।' দস্তুর মতো অবাকই হয়ে গেল অমিতাভ।

পরমেশ্বর বলল, 'আজ দুম করে যাবার ব্যাপারটা ফাইনাল হয়েছে।'

'কতদূর যাবেন।'

'কাছাকাছি।'

'ফিরছেন কবে?'

সেই গুডস ট্রেনটা যদি বুধবার রাত্তিরে টাটানগরে আসে আর সেই রাত্তিরেই যদি অপারেশনটা সাকসেসফুল করা যায় তা হলে বৃহস্পতিবার বিকেল বা শুক্রবার মর্নিং-এ ফিরে আসা যাবে। পরমেশ্বর তাই বলল।

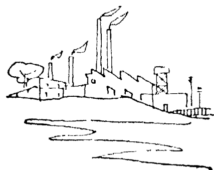
অমিতাভ বলল, 'এত দিন ক্যালকাটা থেকে অ্যাবসেণ্ট থাকবেন।'

পরমেশ্বর অল্প একটু হেসে বলল, 'কী করব, কাজের ব্যাপার—'

'কিন্তু আপনি আমার অনেকগুলো রেসপনসিবিলিটি নিয়েছেন। এক নম্বর, ইলেকট্রনিক ডিভিসনে ক্লাস ফোর স্টাফের ইণ্টারভিউ। নাম্বার টু, একটা বড় কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি সেট-আপ করার প্রাইমারি অ্যারেঞ্জমেণ্ট করা—'

'বৃহস্পতিবার যদি ফিরি শুক্রবার থেকে আপনার কাজ স্টার্ট করব। আর শুক্রবার ফিরলে স্যাটারডে থেকে।'

'ঠিক আছে—' এবার চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট দিয়ে লিমুজিনটাকে পার্কিং জোন থেকে বাইরের রাস্তায় নিয়ে এল অমিতাভ।



ক্যালকাটা মেট্রোপলিসের ওপর বিকেলটা এখনও আটকে আছে। আকাশ যেখানে শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে গঙ্গার ওপারে হাওড়া সিটির বাড়ি-ঘর কল-কারখানা, ঢ্যাঙা গাছপালা বা ঢেউ-খেলানো অগুণতি বস্তির পেছনে নেমে গেছে ঠিক সেইখানে সিনেমার ফ্রিজ সটের মতো গনগনে লাল সূর্যটা ফিক্সড হয়ে রয়েছে। মনে হয়, কেউ যেন আকাশের বিশাল ক্যানভাসে ওটাকে পেইন্ট করে রেখেছে।

চলতে চলতে অমিতাভর ফ্যাক্টরি, লেবার প্রবলেম, ফিউচার প্রোগ্রাম ইত্যাদি নিয়ে এলোমেলো কিছু কথা হল। এইসব কথাবার্তার ফাঁকে পরমেশ্বর দুম করে এক সময় বলল, 'আচ্ছা, আপনার বাবার সেই কেসটার কী হল?'

অমিতাভ সুনেত্রার কাঁধের ওপর দিয়ে পরমেশ্বরের দিকে তাকাল। পরমেশ্বরের কথা সে ঠিক বুঝতে পারে নি। জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ কেসটা বলুন তো?'

'আপনার বাবার তো একটাই কেস। বলছিলেন না, তাঁকে মার্ডার করা হয়েছে।' বলে সুনেত্রাকে দেখাল পরমেশ্বর, 'ওঁর বাবা তো মার্ডারারকে খুঁজে বার করার রেসপনসিবিলিটি নিয়েছেন—'

'হ্যাঁ।'

'সেদিন যখন ম্যাডামদের বাড়ি গিয়েছিলাম তখন ওঁর ফাদার বলছিলেন, খুব তাড়াতাড়িই মার্ডারারকে ফাঁসিতে চড়াতে পারবেন। তার কী হ'ল?'

অমিতাভ আর সুনেত্রা দ্রুত একবার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নিল। তারপর পরমেশ্বরকে বলল, 'দেখা যাক—'

পরমেশ্বর এবার সুনেত্রার দিকে ফিরল, 'ম্যাডাম, আপনাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। আপনি একখানা লক্কড় জিনিস—' বলেই দু'কান ধরে জিভ কাটল। বলল, 'এক্সকিউজ মী ম্যাডাম, জিভ থেকে স্লিপ কেটে খারাপ কথাটা বেরিয়ে পড়েছে।'

পরমেশ্বরের বলার ধরনে ওরা হেসে ফেলল। সুনেত্রা বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন বলুন আমি লক্কড় জিনিস হলাম কেন ?'

'ফাদারের ওপর একটু দশ টনের প্রেসার চাপান।'

'কেন বলুন তো ?'

'তাহলে ঝট করে মার্ডারারটা ধরা পড়ে যাবে। খুনীটাকে ফাঁসির ফান্দায় ঝোলাতে না পারলে আপনাকে আর এই মিস্টারকে যে ঝুলে থাকতে হচ্ছে।' বলে চোখের কোণ দিয়ে অমিতাভকে দেখাল পরমেশ্বর। তারপর নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বলল, 'আপনারা যতদিন ঝুলে থাকবেন, ততদিন আমার মতো মাকড়ার টেরিফিক একটা খাওয়া ঝুলে থাকবে।' বলেই আরেক বার জিভ কেটে কান ধরল পরমেশ্বর, 'ঐ দেখুন ম্যাডাম, আবার 'মাকড়া' বলে ফেললাম। জিভটা কেন যে বার বার ব্রেক ফেল করছে !'

অমিতাভ আর সুনেত্রা ভাবল, মজা করার জন্যই এভাবে কথা বলছে পরমেশ্বর। ওরা তো আর জানে না, এটাই হল ওর কথা বলার স্টাইল।

হাসতে হাসতে সুনেত্রা বলল, 'আর বেশিদিন বোধ হয় আপনার টেরিফিক খাওয়াটা ঝুলে থাকবে না।'

শিরদাঁড়া স্ট্রেট করে বসল পরমেশ্বর। বলল, 'তা হলে কি মার্ডারারকে ঝোলাবার অ্যারেঞ্জমেণ্ট ঠিক হয়ে গেছে ?'

কী বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল সুনেত্রা। তারপর বলল, 'একটু ওয়েট করুন, সব জানতে পারবেন।'

'আরে বলুনই না—'

'আমার পক্ষে বলার অসুবিধা আছে মিস্টার হালদার।'

চোখের তারা ফিক্সড করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল পরমেশ্বর। তারপর বলল, 'আপনার বাবা নিশ্চয়ই আপনার ঠোঁট স্টিকিং গাম দিয়ে আটকে দিয়েছেন, তাই না ?'

পরমেশ্বরকে ঝট করে একবার দেখে নিয়ে চোখ নামাল সুনেত্রা। তারপর আস্তে করে মাথা নাড়ল—অর্থাৎ তাই। মণিমোহন এখন ব্যাপারটা লীক করতে চান না।

পরমেশ্বর আবার বলল, 'মার্ডারারকে ফাঁসাবার জন্য আপনার বাবা সব সাক্ষী-ফাক্ষী আর কাগজপত্তর কালেক্ট করেছেন ?'

'অত সব আমি জানি না। একটু ধৈর্য ধরুন না মশাই।'

'ও-কে ম্যাডাম। আপনি একজন টেরিফিক আর্টিস্ট হলেও যে পুলিস অফিসারের মেয়ে—সেটা মালুম পাওয়া যাচ্ছে। বুঝতে পারছি আপনাকে

দিয়ে সিক্রেট খবর "লীক" করানো যাবে না। ঠিক হ্যায়, ধৈর্যই ধরে থাকি।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। উইন্ডস্ক্রিনের বাইরে তিন জনই তাকিয়ে রয়েছে এখন।

আচমকা কিছু মনে পড়তে লিমুজিনের স্পীড কমিয়ে দ্রুত পরমেশ্বরের দিকে তাকাল অমিতাভ। বলল, 'মিস্টার হালদার, একটা কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।'

'কী কথা?' পরমেশ্বর রাস্তার দিক থেকে মুখ ফেরাল।

'আমার মা আপনাকে একবার আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে বলেছেন। আপনার সঙ্গে আলাপ করবেন।'

'আপনার মা আমাকে চিনলেন কী করে?'

'চেনেন না। আমি আপনার কথা মাকে বলেছি।'

পরমেশ্বর বলল, 'মা যখন বলেছেন, ডেফিনিটলি যাব। কাল গিয়ে বাইরের কাজটা ফিনিশ করে আসি। তারপর যেদিন বলবেন মায়ের কাছে যাব।' বলতে বলতেই চমকে উঠল, 'একি!'

পরমেশ্বরের চমকানোর কারণটা এই রকম। সে খেয়াল করে নি, কখন যেন তাদের গাড়িটা সাউথ ক্যালকাটার নিরিবিলি 'পশ' লোকালিটিতে সুনেত্রাদের দোতলা বাংলোটার কাছে চলে এসেছে। অমিতাভরা আগে জানায় নি যে, আলটিমেটলি তারা এখানেই আসবে। অমিতাভর লাভার সুনেত্রা পর্যন্ত ঠিক আছে কিন্তু তার ফাদার রিটায়ার্ড পুলিস অফিসার মণিমোহন চ্যাটার্জি সম্পর্কে দারুণ অ্যালার্জি পরমেশ্বরের। আসলে যে কোন পুলিস সম্বন্ধেই তার দুর্দান্ত অ্যালার্জি। আগের দিনই মনে মনে সুনেত্রাদের এই বাড়িটাকে দুশো বার স্যালুট হাঁকিয়ে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর কখনও এখানে আসবে না। পুলিস একটা ডেঞ্জারাস ব্যাপার। একবার যদি তার ওপর সন্দেহ হয়, স্টিকিং গামের মতো গায়ের সঙ্গে এমন সেঁটে যাবে যে, হোল লাইফ আর ছাড়ানো যাবে না। কথা বলতে বলতে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, তাই অমিতাভ যে এদিকেই গাড়ি চালিয়ে আসছে সেটা খেয়াল করে নি।

এখন আর গাড়ি থামিয়ে নামাও যায় না। তবু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সে কিন্তু তার আগেই অমিতাভর লিমুজিন গেট পেরিয়ে কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সুতরাং কী আর করা, এখানে যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ সবগুলো নার্ভ টান টান করে থাকতে হবে।

পোর্টিকোর তলায় গাড়িটা এনে থামাল অমিতাভ। একটা চাকর দৌড়ে

এসে দরজা খুলে দিল। নিচে নেমে অবাক হয়ে গেল পরমেশ্বর সুনেত্রাদের গোটা বাংলোটা অগুণতি টুনি লাইটের লম্বা লম্বা মালা দিে সাজানো। তা ছাড়া ক'দিনের মধ্যে গোটা বাড়িটা চমৎকার রং করানে হয়েছে। লনের ঘাস সমান করে ছাঁটা হয়েছে। বাগানের ফুলগাছগুলোতে একটা পুরনো পাতা বা বাজে বাসি ফুল নেই। লনের মাঝখান দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে, তার দু-ধারের লোহার ফেন্সিং-এ নতুন করে রং লাগানো হয়েছে। যেদিকেই তাকানো যাক, সব ঝকঝকে, সুন্দর। দেখা মাত্র টের পাওয়া যায়, এখানে কিছু একটা উৎসব-টুৎসবের কারবার হচ্ছে। অবশ্য এই বিকেলবেলায় এখনও টুনি লাইটগুলো জ্বলে নি, তবু সন্ধ্যের পর ওগুলো জ্বললে বাড়িটার চেহারা কি রকম জমকালো হয়ে উঠবে সেটা আন্দাজ করা যাচ্ছে।

পরমেশ্বর সুনেত্রাকে বলল, 'কী ব্যাপার? বাড়িতে এত মেক-আপ চড়িয়েছেন যে!'

চোখেমুখে মিস্টিরিয়াস হাসি ফুটিয়ে সুনেত্রা বলল, 'আরেকটু ওয়েট করুন। বাবার কাছে শুনবেন। চলুন, ভেতরে যাই—'

ড্রইং রুমে ঢুকতেই আজ মণিমোহনকে পাওয়া গেল। বিশাল বসবার ঘরটা ফুল পাতা-ফাতা দিয়ে আজ দুর্দান্ত সাজানো হয়েছে। আগের দিন সোফা-টোফাগুলো ঘরের মাঝখানে ছিল। আজ দেখা গেল, সেগুলো দেয়ালের গা ঘেঁষে বসানো হয়েছে। তা ছাড়া আরো অনেক গদিমোড়া ফ্যাশনেবল চেয়ারও আনা হয়েছে। এক কোণে রয়েছে উঁচু মঞ্চের মতো একটা জায়গা। মেরুন রঙের ভেলভেট দিয়ে সেটা আগাগোড়া মোড়া। সেটাও ফুল-টুল দিয়ে সাজানো।

মণিমোহন ছাড়া আরো কয়েকজনকে ড্রইং রুমে দেখা গেল। এ ঘরের মাঝখান দিয়ে দোতলায় উঠবার কায়দা-করা সিঁড়ি। দোতলাতেও বেশ কয়েকজন মহিলা, পুরুষ এবং ছোট ছেলেমেয়েকে দেখা যাচ্ছে।

আগের দিন এখানে এত লোকজন দ্যাখে নি পরমেশ্বর। যত দেখছিল ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিল সে।

মণিমোহন ওদের দেখতে পেয়েছিলেন। ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে বললেন, 'এসে গেছ তোমরা! গুড, ভেরি গুড। কেমন আছ রণজয়?'

পরমেশ্বর যে আসবে বা তাকে ধরে আনা হবে, সেটা তা হলে আগে থেকেই জানতেন মণিমোহন। তাকে দেখে ভদ্রলোক খুশীও হলেন। কিন্তু একজন পুলিস অফিসারটিকে দেখে ভেতরে ভেতরে দারুণ সতর্ক হয়ে রইল পরমেশ্বর। পুলিস দেখলেই তার মধ্যে আপনা থেকেই এ রকম একটা রিঅ্যাকশান হয়। অনেক দিনের হ্যাবিট কিনা।

গলায় তিন কেজি বিনয় ঢেলে পরমেশ্বর বলল, 'ভাল আছি। আপনি?'

'আগের চাইতে ফার বেটার। একি, এখনও দাঁড়িয়ে রইলে যে। বোসো বোসো—' বলে নিজেই প্রথমে একটা সোফায় বসলেন মণিমোহন।

দেখাদেখি পরমেশ্বররাও বসল। পরমেশ্বর কোন রকম ভ্যানতাড়া না করে স্ট্রেট জিজ্ঞেস করল, 'বাড়িটা এত সাজিয়েছেন; আজ কোন ফাংসান আছে?'

দারুণ খুশির গলায় মণিমোহন বললেন, 'আজকের দিনটা ডে অফ অল ডেজ। বাড়ি সাজাবো না, বল কী!' একটু থেমে বললেন, 'সুনি আর অমিতাভ তোমাকে কিছু বলে নি?'

'আজ্ঞে না। অফিস থেকে আমাকে ওঁরা তুলে নিয়ে এলেন। ব্যাপারটা কী, যতবার জানতে চেয়েছি ততবার বলেছেন, পরে নাকি জানতে পারব। আর আমি ঘণ্টাখানেক ধরে ঝুলে আছি।'

'আমার কথা কী বলেছে?'

'আজ কী হবে-না-হবে, সেটা নাকি আপনি ছাড়া আর কারো বলার রাইট নেই।'

তিন মেগাটন বোমা ফাটানোর মতো আওয়াজ করে ঘর ফাটিয়ে খানিকক্ষণ হাসলেন মণিমোহন। তারপর পাঞ্জাবির পকেট থেকে চুরুট আর দেশলাই বার করে ধরিয়ে নিলেন। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'তোমার কাছেও ওদের লজ্জা!'

সুনেত্রা বলে উঠল, 'লজ্জা না বাবা, মিস্টার হালদারকে আমরা একটা দারুণ সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সাসপেন্সে আটকে রেখে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসব। তারপর তুমি সারপ্রাইজটা দেবে।'

পরমেশ্বর বলল, 'লজ্জা, সারপ্রাইজ—কিছুই আমার ব্রেনে ঢুকছে না।'

মণিমোহন বললেন, 'আজ সুনি আর অমিতাভর এনগেজমেণ্টটা অ্যানাউন্স করব। তাই একটা ছোটখাটো ফাংশানের ব্যবস্থা করেছি।' চারপাশের লোকজন, কাচ্চা-বাচ্চাদের দেখিয়ে বললেন, 'এরা সব আমাদের আত্মীয়স্বজন। ফাংশান উপলক্ষে এসেছে।'

পরমেশ্বর এবার অমিতাভর দিকে তাকাল, 'রোজ আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে যে এ রকম একটা কারবার করছেন তার সিগন্যাল-ফিগন্যাল তো দ্যান নি।'

অমিতাভ হাসল, 'কারণটা তো আগেই বলেছি।'

'ও, সেই সারপ্রাইজ! ও-কে!'

সুনেত্রা এই সময় মণিমোহনকে বলল, 'বাবা, মিস্টার হালদার অমিতাভর

বাবার কেসটা সম্পর্কে জানতে চাইছিলেন। তুমি আমাকে বারণ করেছ, তাই কিছুই বলি নি।'

মণিমোহন একটু চুপ করে থেকে পরমেশ্বরকে বললেন, 'অলমোস্ট সব ডকুমেণ্ট আমার হাতে এসে গেছে। যে লোকটা চিঠি দিয়ে অমিতাভকে তার বাবার মার্ডার সম্পর্কে জানিয়েছিল, তাকে ট্রেস করতে পেরেছি। ইন ফ্যাক্ট, তাকে খুঁজে বার করতে আমার প্রায় তিনটে বছর লেগে গেল।'

একটা ব্যাপারে দারুণ কৌতূহল হচ্ছিল পরমেশ্বরের। সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি সেদিন বলেছিলেন মার্ডারার টাইপ-করা কাগজে মিস্টার সেনকে তাঁর বাবার মার্ডারার সম্পর্কে জানিয়েছিল। নিচে নিজের কোন নাম দ্যায় নি।'

'রাইট।'

'একটা বেনামা চিঠি থেকে কেমন করে তাকে ট্রেস করলেন?'

মণিমোহন আস্তে আস্তে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হাসলেন। বললেন, 'নিজের নাম না দিলেও চিঠিটায় তার আনসীন অটোগ্রাফ ছিল। নিজের অজান্তে চিঠিটা এনভেলাপে পুরবার সময় তার আঙুলের ছাপ পড়ে গিয়েছিল। ফিঙ্গার প্রিণ্ট এক্সপার্টদের কাছে চিঠিটা পাঠিয়ে আঙুলের ছাপ ডেভলাপ করিয়ে নিলাম।'

'তারপর—'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন না মণিমোহন। মনে মনে কিছু ভেবে নিয়ে একটু পর বললেন, 'দেখ, যে লোকটা চিঠি লিখেছিল সে নিজের সম্পর্কে একটা কথা জানিয়েছে। মনে আছে তোমার?'

পরমেশ্বর মনে করতে পারল না। বলল, 'কী কথা বলুন তো?'

'লোকটা লিখেছে সে খুব গরিব মানুষ, আচমকা অমিতাভের বাবার মার্ডারের ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। নিজের নাম ঠিকানা সে গোপন রাখতে চায়, কেননা খুন সম্পর্কে সে যে লিখেছে এটা মার্ডারার জানতে পারলে তার লাইফ বিপন্ন হবে। চিঠিটা পড়ার পর কিন্তু আমার মনে হয় নি লোকটা একেবারে ইনোসেণ্ট বা হঠাৎই সে খুনের ব্যাপারটা জানতে পারে। কেন আমার এই সন্দেহ হল, বলে বোঝাতে পারব না। ক্রিমিন্যাল আর ক্রিমিনোলজি নিয়ে যারা ঘাঁটাঘাঁটি করে, কমন ম্যানদের চাইতে তাদের নাক অনেক বেশী পাওয়ারফুল হয়। তারা একটুতেই অনেক কিছুর গন্ধ পায়। যাই হোক, যে চিঠিটা এসেছিল তাতে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটার একটা পোস্ট অফিসের স্ট্যাম্প ছিল। এ থেকে বোঝা যায়, চিঠির লেখক চিঠিটা পোস্ট করার সময় কলকাতায় ছিল। কারণ এ জাতীয় গোপন লেটার কেউ অন্যকে দিয়ে পোস্ট করায় না। তা ছাড়া চিঠিটা ভালো করে পড়লে আরো একটা

ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লোকটা অমিতাভকে খুব ভালো করেই চেনে এবং সে বড় হওয়া পর্যন্ত লোকটা ওয়েট করে ছিল। মার্ডারার ধরা পড়ে ফাঁসিতে ঝুলুক, এটাই তার কাম্য। এর থেকে গেস করা যায় মার্ডারারের ওপর তার রাগ আছে; সে রিভেঞ্জ নিতে চায় কিংবা সর্বেশ্বর সেনকে সে ভালোবাসত বা কোন কারণে তাঁর সম্বন্ধে তার কৃতজ্ঞতা ছিল। এই সব কারণে এই খুনের জন্য মার্ডারারের শাস্তি চায়। এখন কথা হলো, বেনামা চিঠি থেকে তাকে ইণ্ডিয়ার সেভেণ্টি মিলিয়ান লোকের ভেতর থেকে কেমন করে খুঁজে বার করব?' বলতে বলতে একটু থামলেন মণিমোহন। নেক্সট মোমেণ্টে আবার শুরু করলেন, 'তোমার হয়ত জানা নেই, দাগী ক্রিমিন্যালদের আঙুলের ছাপ পুলিসের কাছে থাকে। ফিঙ্গার প্রিণ্ট এক্সপার্টরা বেনামা চিঠি থেকে যে ছাপ তুলে দিয়েছিল, তা প্রথমে পাঠালাম কলকাতার পুলিস হেড কোয়ার্টারের ফিঙ্গার প্রিণ্ট ডিপার্টমেণ্টে। না, তাদের কালেকশানে ও রকম কোন আঙুলের ছাপ নেই।'

শুনতে শুনতে কৌতূহলে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল পরমেশ্বরের। একজন ঝানু এক্সপীরিয়েন্সড পুলিস অফিসারের তিন ফুট দূরে সে যে বসে আছে সেটা তার খেয়াল নেই। পরমেশ্বর দম আটকানোর গলায় বলল, 'তারপর—'

'তারপর ওয়েস্ট বেঙ্গলের যত ডিস্ট্রিক্ট আছে, সব জায়গায় আঙুলের ঐ ছাপগুলো পাঠালাম। শেষ পর্যন্ত যা সন্দেহ করেছিলাম তাই হল। দার্জিলিং পুলিস খবর দিল, মোতি বাহাদুর নামে একজন ক্রিমিন্যালের আঙুলের ছাপের সঙ্গে আমার পাঠানো আঙুলের ছাপ মিলে যাচ্ছে। আমি তক্ষুণি ছুটলাম দার্জিলিঙ। পুলিস রেকর্ডে মোতি বাহাদুরের একটা অ্যাড্রেস ছিল। কিন্তু এত বছর বাদে সেই অ্যাড্রেসে গিয়ে দেখলাম ওখানে কোন বাড়ি-টাড়ি নেই। সাত-আট বছর আগে যে বাড়ি ছিল, সেটা ভেঙে সেখানে একটা পার্ক বানানো হয়েছে। ডিসঅ্যাপয়েণ্টেড না হয়ে মোতি বাহাদুরের খোঁজখবর নিতে লাগলাম। আর পুলিস রেকর্ডে আঙুলের ছাপের সঙ্গে তার যে ফোটো ছিল তার একটা কপি করিয়ে নিলাম। সারা দার্জিলিং চষে মোতি বাহাদুরের ট্রেস পাওয়া গেল না। তবে তার এক ছোট বোনের হদিস মিলল। প্রথমে মেয়েমানুষটা মুখ খুলতে চায় না। তারপর ভয় দেখাতে বলল, বছর দুই আগে মোতি বাহাদুর মাদ্রাজ চলে গেছে। সেখানকার একটা ঠিকানাও দিল সে। আমি মাদ্রাজ ছুটলাম। মোতি সত্যি সত্যিই মাদ্রাজে ছিল। একটা কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের দায়িত্বে ছিল। আমি যাবার ক'দিন আগেই

সে হায়দ্রাবাদ চলে যায়। ছুটলাম হায়দ্রাবাদ। কিন্তু সেখানেও তাকে পাওয়া গেল না। হায়দ্রাবাদ থেকে তার খোঁজে গেলাম বোম্বাই, বোম্বাই থেকে কানপুর, কানপুর থেকে ধানবাদ—এইভাবে অলমোস্ট দুটো বছর হোল ইণ্ডিয়া ঘোড়দৌড় করে লাস্ট উইকে ক্যালকাটায় তাকে ধরেছি। তবে দিস ইজ ভেরি মাচ সিক্রেট। সে কোথায় আছে, তোমাকে বলব না। তোমাকে অবিশ্বাস করছি যে, তা নয়। তবে কোন কারণে তোমার মুখ ফসকে যদি খবরটা বেরিয়ে যায়, তা হলে মোতির বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠবে। কারণ সর্বেশ্বর সেনের মার্ডারার যেভাবেই হোক জানতে পেরেছে মোতির সঙ্গে পুলিস আর অমিতাভর যোগাযোগ হয়েছে। তারা তাকে উন্মাদের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে। এনিওয়ে, মোতি সম্পর্কে আমার ধারণাটা কারেক্ট। সে একজন ক্রিমিন্যালই। এক সময় খুন-টুনের চার্জে কয়েক বছর জেলও খেটেছিল। প্রথমে সর্বেশ্বর সেনকে খুন করার জন্য তাকেই কনট্যাক্ট করে একটা চিঠি লেখে মার্ডারার। তবে মার্ডারার তলায় নিজের নাম দ্যায় নি, অন্য একটা ফিকটিশাস নাম বসিয়েছিল, কিন্তু হাতের লেখাটা তারই।'

পরমেশ্বর বলল, 'ও রকম একটা হারামী নিজের হাতে চিঠি লিখতে গেল! এভাবে কেউ রেকর্ড রাখে!'

'ক্রিমিন্যাল যত ইনটেলিজেণ্টই হোক, কখনও-না-কখনও ছোটখাটো এক-আধটা ভুল করে ফেলে। তা না করলে তাদের ধরা যেত না! সে যাক গে, মার্ডারারের চিঠিটা মোতি বাহাদুরের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছি। তোমাকে আগেই বলেছিলাম, খুনীকে ফাঁসিতে লটকাবার ব্যাপারে মোতি বাহাদুরের একটা মোটিভ আছে। আমার এই আন্দাজটাও কারেক্ট। সর্বেশ্বর সেনের সঙ্গে মোতি বাহাদুরের অনেকদিনের জানাশোনা ছিল। ছেলেবেলায় এবং যৌবনে বহুকাল তাঁরা জলপাইগুড়িতে কাটিয়েছেন। তখন দার্জিলিঙের স্কুল এবং কলেজে কয়েক বছর হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেছেন সর্বেশ্বর। সেই সময় মোতির সঙ্গে তাঁর আলাপ অল্পবয়সে, দার্জিলিঙে। ট্যুরিস্টদের টাট্টুতে চাপিয়ে তাঁকে ঘোরাতে নিয়ে যেত মোতি।' মণিমোহন বলে যেতে লাগলেন, 'দার্জিলিঙ সম্পর্কে সর্বেশ্বরের একটা উইকনেস ছিল। পরে লাইফে এস্টাব্লিশড্ হবার পর সময় পেলেই ওখানে যেতেন। মোতি বাহাদুরের সঙ্গে তখনও দেখা হত। এইভাবে যাওয়া-আসা করতে করতে হঠাৎ সর্বেশ্বর খবর পেলেন, একটা মার্ডার চার্জে জড়িয়ে জেলে গেছে মোতি। তিনি দার্জিলিঙে এলেই জেলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতেন। জেল থেকে বেরুবার পর কোথাও কাজ জোটাতে পারছিল না মোতি। একটা ক্রিমিন্যালকে কে আর বিশ্বাস করে চাকরি-বাকরি দেবে? পুরো ব্যাকগ্রাউণ্ড জানার পরও তার জন্য

নানা জায়গায় কাজের চেষ্টা করেছেন সর্বেশ্বর, কিন্তু কিছুই করা যায় নি দার্জিলিঙে দেখা হলে তিনি তাকে টাকা-পয়সা দিতেন। কিন্তু লোকের দয়ার ওপর বেঁচে থাকা যায় না। তাই বাঁচার জন্য নানা রকম ক্রাইমে জড়িয়ে গিয়েছিল মোতি। অনেক পরে তারই কাছে সর্বেশ্বরের খুনের প্রোপোজাল গিয়েছিল।'

'স্বাভাবিক কারণেই এই মার্ডারে সে রাজী হতে পারে নি। মোতি পরে টের পায়, সর্বেশ্বরকে খুন করার জন্য মার্ডারার অন্য লোকদের এনগেজ করেছে। তাঁকে সাবধান করার চান্স সে পায় নি। কিন্তু কারা কিভাবে তাঁকে খুন করেছে সে জেনে ফেলে। তবে মার্ডারার এত পাওয়ারফুল আর সোসাইটিতে এত এস্টাব্লিশড্ যে তার গায়ে একটা আঁচড় কাটার ক্ষমতা মোতির নেই। তা হলে সে শেষ হয়ে যাবে। তাই অমিতাভ যতদিন না বড় হয়েছে সে ওয়েট করে গেছে। যিনি তার এত উপকারী, তাঁর খুনের বদলা যেভাবেই হোক নিতে হবে। কিন্তু মার্ডারার যে চারটে লোককে সর্বেশ্বরকে খুন করার জন্য লাগিয়েছিল, তাদের দু'জন এর ভেতর মরে গেছে। বাকী দু'জন এখনও বেঁচে আছে। তারা জানে না, মোতি তাদের ওপর বরাবর নজর রেখে আসছে।'

পরমেশ্বর এবার কিছু জিজ্ঞেস করল না ; চোখের তারা ফিক্সড করে বসে রইল।

মণিমোহন বলে যেতে লাগলেন, 'মোতির কাছ থেকে ঐ লোক দুটোর নাম আদায় করেছি। প্লেন ড্রেসের পুলিস টোয়েন্টি-ফোর আওয়ার্স তাদের ফলো করে যাচ্ছে। আর কিছু সারকামস্টেনসিয়াল এভিডেন্স আমার দরকার। সেটা যোগাড় করতে আরেক বার আমাকে দার্জিলিঙ যেতে হবে। তারপরেই এই ভাড়াটে খুনী দুটোর সঙ্গে আসল মার্ডারারকে ধরে ফেলতে পারব। ম্যাক্সিমাম এক মাস ; তার বেশী লাগবে না। সেই জন্যেই আজ অমিতাভ আর সুনির এনগেজমেন্ট অ্যানাউন্স করার ব্যবস্থা করেছি। এখান থেকে ঠিক এক মাসের মধ্যে মার্ডারারের কোমরে দড়ি পরাবার ঠিক সাত দিন পর ওদের বিয়ে হবে।'

পরমেশ্বর এতক্ষণে মুখ খুলল, 'মার্ডারারকে ধরার ডেট দিলেন, ওটা চেঞ্জ হবে না ?'

মণিমোহন বললেন, 'সূর্য ভুল করে দু-চার দিন না উঠতে পারে। কিন্তু আমার টার্গেট ডেট নড়চড় হবে না।' বলতে বলতেই খেয়াল হল, পশ্চিম আকাশের ক্যানভাস থেকে সূর্যটা উধাও হয়ে গেছে। সন্ধ্যা নেমে আসতে শুরু করেছে। ঘরের ভেতরে এখন আবছা অন্ধকার। দ্রুত একবার

বাইরের দিকে তাকিয়ে প্রায় হাই জাম্পের মতো একটা ভঙ্গি করে উঠে পড়লেন। চিৎকার করে বললেন, 'রঘুয়া, রঘুয়া, বাতি জ্বলা দো—'

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গোটা বাড়িটা নানা রঙের আলোর ফোয়ারায় একটা ড্রিমল্যান্ড হয়ে উঠল যেন।

আলো জ্বালানো ছাড়াও আচমকা আরো কিছু মনে পড়ে গেল মণিমোহনের। দারুণ ব্যস্তভাবে বললেন, 'রণজয়, অমিতাভ—তোমরা একটু বোসো; একটা কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। আমাকে একটু বেরুতে হবে। যাব আর আসব। প্লীজ, তোমরা কিছু মনে করো না।' বলেই গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'সুশোভন, সুশোভন—'

'যাই—' একটু পর মণিমোহনেরই প্রায় সমবয়সী গোলগাল সুখী চেহারার টকটকে ফর্সা এক ভদ্রলোক দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন। পরমেশ্বরের সঙ্গে তাঁর আলাপ-টালাপ করিয়ে দিয়ে মণিমোহন বললেন, 'ইনি আমার সম্বন্ধী মানে সুনির মামা, আর এ হলেন অমিতাভর বন্ধু রণজয়।' সুশোভনকে বললেন, 'তুমি এদিকে একটু নজর রাখো। খানিকটা পরেই গেস্টরা আসতে শুরু করবে। আমি একটা আর্জেণ্ট কাজ সেরে আসি।'

সুশোভন বললেন, 'তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ সেরে আসতে পার। এদিকের ব্যাপারটা আমি দেখব'খন।'

মণিমোহন চলে গেলেন। তিনি চলে যাবার আধ ঘণ্টা পর থেকে গেস্টরা আসতে শুরু করল। বেশীর ভাগই সুনেত্রার বন্ধু-টন্ধু জনকয়েক মণিমোহনের বন্ধু এবং তাঁদের স্ত্রীরাও আছেন। সুশোভন খুবই সমাদরের ভঙ্গিতে দরজার কাছ থেকে অতিথিদের নিয়ে এসে ড্রইং রুমে বসাতে লাগলেন।

এদিকে সুনেত্রার বন্ধুরা এসে অমিতাভর সঙ্গে খানিকক্ষণ ঠাট্টা-ফাট্টা করে এক রকম ছোঁ মেরেই সুনেত্রাকে তুলে নিয়ে দোতলায় চলে গেল। অমিতাভ আর পরমেশ্বর একতলায় বসে রইল।

মিনিট চল্লিশেক বাদে সুনেত্রাকে নিয়ে তার বন্ধুরা আবার দোতলা থেকে ড্রইং রুমে নেমে এল। তারপর শুরু হল নাচগান।

সুনেত্রা ক্লাসিক্যাল মিউজিকের আর্টিস্ট। কিন্তু বন্ধুরা আজ তাকে ঘিরে পুরোপুরি 'পপ' সঙ আর ড্যান্স শুরু করে দিল। ডে অফ অল ডেজ। এর ফাঁকে উর্দিপরা বেয়ারারা ট্রে-তে করে সফট্ ড্রিঙ্ক, ফিশ ফিঙ্গার, কাবাব, কাজু বাদাম, চিপস, চীজ-মীট এমনি নানা রকমের খাবার-দাবার নিয়ে গেস্টদের মধ্যে ঘুরতে লাগল।

পরমেশ্বর গোটা দুই সফট্ ড্রিঙ্কের সঙ্গে গুচ্ছের কাবাব-টাবাব খেতে খেতে দুর্দান্ত ফিগারওয়ালা ছুকরীদের নাচ-ফাচ দেখছিল। হঠাৎ তার খেয়াল

হল, প্রায় ন'টা বাজে। এতক্ষণে সোমেশ্বর নিশ্চয়ই তার ফ্ল্যাটে কম করে পঞ্চাশ-ষাট বার ফোন করেছেন। কাল গুডস ট্রেনের অপারেশন শুরু করতে হলে আজ ওটার নাম্বার জানা খুবই জরুরী। পরমেশ্বর অমিতাভকে বলল, 'এবার কিন্তু আমাকে উঠতে হচ্ছে।'

অমিতাভ শিরদাঁড়া টান টান করে 'উড-বী' ওয়াইফ আর তার টেরিফিক টেরিফিক সেক্সি চেহারার বান্ধবীদের হিপ আর বুক নাচিয়ে নাচিয়ে নাচ দেখে যাচ্ছিল। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে সে বলল, 'সে-কী, এখন যাবেন মানে? ন'টায় তো আপনার যাবার কথা।'

'ড্যান্স দেখতে দেখতে আপনার হুঁশ নেই, ন'টা বাজতে চলেছে। ওনলি পাঁচ মিনিট বাকী।'

ঘড়ি দেখে অমিতাভ বলল, 'আরে তাই তো। কিন্তু সুনেত্রার বাবা সেই যে গেলেন এখনও তো ফিরলেন না।'

'হয়ত কোন ব্যাপারে আটকে গেছেন।'

'আরেকটু ওয়েট করুন না। প্লীজ। উনি এলেই চলে যাবেন।'

'কিছু মনে করবেন না। আজ আর থাকতে পারছি না। এখানকার ফাংশান ভালোভাবে হোক। পরে আপনার কাছে ডিটেলে রিপোর্ট শুনব। আপনার ফাদার-ইন-ল'কে বলবেন, পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।'

অমিতাভকে কিছুটা বিমর্ষ দেখাল। সে বলল, 'আর্জেণ্ট কাজ যখন আছে তখন কী আর করা! ঠিক আছে, সুনেত্রার বাবাকে বলে দেব।'

পরমেশ্বর উঠে এবার সুনেত্রার কাছে চলে এল। অমিতাভর সঙ্গে তার যে টাইপের কথা হয়েছে, সুনেত্রার সঙ্গেও সেই রকম কথাই হলো। ফাংশানের মাঝখানে পরমেশ্বর চলে যেতে চাওয়ায় সুনেত্রারও খারাপ লাগছিল, কিন্তু আগের থেকেই কথা হয়ে আছে, ঠিক ন'টায় সে চলে যাবে। অগত্যা তাকে আর আটকে রাখা ঠিক হবে না।

ড্রইং রুম থেকে বেরুতে যাবার সময় হঠাৎ পরমেশ্বরের মনে পড়ল, সে গাড়ি নিয়ে আসে নি। অমিতাভ অবশ্য তাকে ফ্ল্যাটে পেঁছে দেবার কথা বলেছিল। কিন্তু এক ঘণ্টা পর যার বিয়ের এনগেজমেণ্ট অ্যানাউন্স করা হবে আর চোখের সামনে ফিল্মের হিরোইনদের মতো টেরিফিক সব ছুঁড়িরা এক্সপ্লোসিভ জায়গাগুলো কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে যখন ড্রিমল্যাণ্ড তৈরি করে চলেছে, তখন সে মাকড়া নিশ্চয়ই তাকে পেঁছে দেবার কথা বেমালুম ভুলে গেছে। সে ঠিক করে ফেলল, বাইরে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেবে।

পরমেশ্বর আর দাঁড়াল না। বাইরে এসে পোর্টিকো পেরিয়ে নুড়ির

রাস্তায় নামল। সেখান থেকে একটু পর একেবারে গেটের বাইরে। কয়েক স্টেপ যাবার পর হঠাৎ সে দেখতে পেল, একটা পুরনো মডেলের হিলম্যান উল্টো দিক থেকে আসছে। গাড়িটার ব্যাক সীটে মণিমোহন এবং মধ্যবয়সী একটি মহিলাকে দেখা গেল।

পানপাতার মতো মুখ ভদ্রমহিলার ; গায়ের রঙ এই বয়সেও পাকা গমের মতো। নাক মুখ ধারালো, ত্বকে একটুও ভাঁজ পড়ে নি। তবে বয়সের কিছু ভার নেমেছে শরীরে। ফাঁকা সিঁথির দু'ধারে, কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে রুপোর কিছু কিছু সুতো। পরনে ধবধবে সাদা সিল্কের শাড়ি। দেখেই বোঝা যায়, ভদ্রমহিলা বিধবা। তা হলে এঁকে আনার জন্যই তখন মণিমোহন চলে গিয়েছিলেন ?

মহিলাটিকে দেখতে দেখতে আচমকা পরমেশ্বরের মনে হল, আগে যেন কোথায় এঁকে দেখেছে। ঠিক এই মুখ, এই চোখ, এই গলা, এই থুতনি। খুব চেনা, খুবই চেনা। কিন্তু কোথায়, কোথায় দেখেছেন ? শালা মেমোরিটা এই মোমেণ্টে পুরো ব্রেক ডাউন করে বসে আছে।

মণিমোহন পরমেশ্বরকে দেখতে পায় নি। ভদ্রমহিলার সঙ্গে হেসে হেসে দারুণ মজার কথা-টথা বলছিলেন।

একটু পরেই পুরনো হিলম্যান সামনের গেটের ভেতর ঢুকে পড়ল। পরমেশ্বর অন্যমনস্কর মতো ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগল। কোথায় ভদ্রমহিলাকে সে দেখেছে, কিছুতেই মনে করতে পারছে না।

আরো আধ ঘণ্টা বাদে পরমেশ্বর তার অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসের নিচে এসে একটা ট্যাক্সি থেকে নামল। ভাড়া-ফাড়া মিটিয়ে দিয়ে এক রকম দৌড়তে দৌড়তে লিফট্ বক্সে গিয়ে ঢুকল সে। ফোরটীনথ ফ্লোরে তার ফ্ল্যাটে পেঁছুতে আরো মিনিট দুয়েক লাগল। তারপর কলিং বেল টিপতেই ছোটি সিং দরজা খুলে তাকে দেখামাত্র দারুণ উদ্বিগ্নমুখে বলতে লাগল, বড়ে সাব আপকো দশ দফে ফোন কিয়া—'

বড়ে সাব অর্থাৎ সোমেশ্বর। পরমেশ্বর কোন রকম তাড়াহুড়ো করল না। সে আগেই জানত, সোমেশ্বর তাকে ফোনের-পর-ফোন করে যাবেন। পিকিনীজ কুকুরটা ছোটি সিংয়ের সঙ্গে দৌড়ে এসেছিল। সেটা পায়ের কাছে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। অর্থাৎ আমাকে একটু আদর-টাদর কর। পরমেশ্বর কুকুরটাকে কোলে তুলে ধীরে-সুস্থে বেড রুমে গিয়ে ঢুকল। তারপর বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে ফোন তুলে ডায়াল ঘোরাতে লাগল। একটু পরই সোমেশ্বরকে পাওয়া গেল।

সোমেশ্বর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'সন্ধ্যে থেকে তোমাকে ক'বার ফোন করেছি জানো ?'

'জানি স্যার, দশ বার।' দারুণ শান্তগলায় বলল পরমেশ্বর, 'গুডস ট্রেনের নাম্বারটা বলুন—'

'টু হানড্রেড অ্যান্ড ফাইভ।'

'ও-কে।'

'আর কিছু জানবার আছে ?'

'না।'

একটু চুপ করে থেকে সোমেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি মনে হয়, গুডস ট্রেনের অপারেশনটা সাকসেসফুল করতে পারবে ?'

মাকড়ার সন্দেহটা কিছুতেই যাচ্ছে না। ঠাণ্ডা গলায় পরমেশ্বর বলল, 'সেভেন্টি টু আওয়ার্স ওয়েট করুন। আপনার কোশ্চেনের অ্যানসার পেয়ে যাবেন।' বলেই লাইনটা কেটে দিল।



সোমেশ্বরের সঙ্গে ফোনে কথাবার্তার পর আজ আর লেট নাইট করল না পরমেশ্বর। আধ ঘণ্টার মধ্যে শুধু কাজু বাদাম আর ফ্রায়েড প্রনের চাট দিয়ে আট খোরা সোনার বাংলা স্ট্রেট স্টমাকে চালান করে দিল। তারপর খানচারেক তন্দুরি আর চিকেন কারির ডিনার চুকিয়ে কুকুরটাকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে যখন শুয়ে পড়ল তখন দশটা বাজে।

শোওয়া-মাত্রই কিন্তু ঘুম এল না। গুডস ট্রেন অপারেশনটা কিভাবে করবে, মনে মনে মোটামুটি তার একটা ব্লু-প্রিণ্ট তৈরী করে ফেলল পরমেশ্বর। অবশ্য প্ল্যানটা পুরোপুরি ফাইনাল করা হবে প্লেস অফ অপারেশনে যাবার পর। কেননা, ওষুধের ওয়াগনগুলো কিভাবে নষ্ট করা হবে, কিংবা ওয়াগনগুলো ঠিক রেখে ওষুধগুলো হাপিস করা হবে কিনা, এ সবই সাইটে গিয়ে ঠিক করতে হবে। এখন যেভাবে সে এগুবে ভাবছে, জায়গামতো গিয়ে হয়ত দেখা যাবে সে প্ল্যানটা আগাপাশতলা পালটে দিতে হচ্ছে। এসব ব্যাপারে প্রচুর ইমপ্রোভাইজেশন করে নিতে হয়। তবে এটা ঠিক, ওষুধের ওয়াগন তিনটেকে গুডস ট্রেন থেকে আলাদা করে ফেলতেই হবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

ওয়াগন অপারেশনের কাজ আগেও বার কয়েক করেছে পরমেশ্বর। এ ব্যাপারে সে রীতিমতো একজন এক্সপার্ট। আজকাল হোল কাণ্ট্রিতে ওয়াগন ব্রেকিংটা একটা বিগ বিজনেসে দাঁড়িয়ে গেছে। নানা এরিয়ার ওয়াগন ব্রেকাররা তার কাছ থেকে ওয়াগন ভাঙার ব্যাপারে টেকনিক্যাল 'নো-হাউ' নিতে আসে। ইদানীং সামান্য কিছু 'ফি' নিয়ে 'নো-হাউ' বেচে দেয় পরমেশ্বর। কিন্তু অনেকদিন পর কাল আবার ওয়াগন অপারেশনে তাকে নিজেকে নামতে হচ্ছে।

পরমেশ্বর ভাবল, খুব সতর্কভাবে তাকে এগুতে হবে এ ব্যাপারে। ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙল তখনও ভালো করে ভোর হয় নি। আবছা অন্ধকার ক্যালকাটা মেট্রোপলিসের গায়ে জড়িয়ে আছে। রাস্তায় রাস্তায় কর্পোরেশনের আলোগুলো তখনও জ্বলছে।

এক সেকেণ্ডও দেরি করল না পরমেশ্বর। প্রথমে ছোটি সিংকে জাগিয়ে চা করতে বলল। তারপর বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

মিনিট পনের পর চা-ফা খেয়ে ড্রেস পালটে নিল। তার পরনে এখন টাইট জীনস আর পাতলা স্পোর্টস গেঞ্জি, পায়ে স্পোর্টস শ্যু। এ রকম লাইট পোশাক ছোটাছুটি বা জাম্প করার পক্ষে খুবই সুবিধাজনক। বেস অব অপারেশনে গিয়ে কি রকম সিচুয়েশনে পড়তে হবে, কেউ আগে থেকে বলতে পারে না। হয়ত দেখা যাবে, চারদিকে হেভি গার্ড রয়েছে। সব রকম অবস্থার জন্য আগে থেকে প্রিপারেশন নেওয়া দরকার। ড্রেস বদলানো হলে পিকিনীজ কুকুরটাকে আদর করে চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে লিফটে করে নিচে নেমে এল।

পার্কিং এরিয়াতে দামী লিমুজিনটা দাঁড়িয়ে ছিল। চটপট গাড়িটায় উঠে চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট দিল পরমেশ্বর। এখনই সে যাবে তার পুরনো অ্যাড্রেসে।

এত ভোরে রাস্তা-টাস্তা প্রায় ফাঁকাই। পঁচিশ মিনিটের মধ্যে ক্যালকাটা মেট্রোপলিসের উত্তর দিকে বি. টি. রোডের গায়ে তাদের সেই স্লামে পেঁছে গেল পরমেশ্বর।

বস্তির ভেতর লিমুজিন ঢোকানোর মতো জায়গা নেই। বাইরের রাস্তায় গাড়িটাকে পার্ক করে পরমেশ্বর স্ট্রেট তাদের ঘরগুলোর সামনে এসে দাঁড়াল।

এখনও এই বস্তির ঘুম ভাঙে নি। প্রায় সব ঘরেরই ঝাঁপ ফেলা কিংবা দরজায় খিল আটকানো। ক্বচিৎ দু-একজনকে দেখা যাচ্ছে।

পরমেশ্বর ভাবল, মাকড়ারা ঘুমোতেও পারে! রোদ উঠতে চলল, এখনও খচড়াগুলো বউকে জাপটে ধরে ঘুমিয়েই চলেছে! যাই হোক, বাজে খরচ করার মতো অঢেল সময় তার হাতে নেই। পরমেশ্বর ডাকাডাকি শুরু করে দিল, 'মাদার, লোলে. লক্ষ্মী, টগর—'

এক মিনিটের মধ্যে পাশাপাশি তিনটে ঘরের দরজা খুলে গেল এবং সেগুলোর ভেতর থেকে তার ইণ্টারন্যাশনাল ফ্যামিলির মেম্বাররা চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে এল। এত ভোরে পরমেশ্বরকে দেখে সবাই অবাক। প্রায় কোরাসেই তারা চেঁচিয়ে উঠল, 'কী ব্যাপার, এত সকালে!'

'দরকার আছে। লোলে, দু মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে নে। আমি যে ড্রেস পরেছি ঠিক সেই রকম ড্রেস করে নিবি।' বলতে বলতে তার *নিজের ঘরটায় ঢুকে পড়ল পরমেশ্বর। একই কাপড় আর একই ডিজাইনের জামা-প্যাণ্ট সব সময় দু সেট করে বানায় সে। এক সেট নিজের জন্য, এক সেট লোলের জন্য।*

তার পেছন পেছন লোলেরাও ঘরে চলে এসেছিল। লোলে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার গুরু? এই সক্কালবেলা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ মাইরি?'

একটা প্রকাণ্ড কিট ব্যাগ বার করে বড় বড় স্ক্রু-ড্রাইভার, প্লাস, রেঞ্চ, অ্যাসিডের বোতল, এবং ওয়াগন খোলার নানা যন্ত্রপাতি পুরতে পুরতে পরমেশ্বর বলল, 'একটা অপারেশন করতে হবে।'

'কত দূরে?'

'গেলেই দেখতে পাবি। আর ল্যাম্পপোস্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না মদনা। মুখ-ফুখ ধুয়ে প্যাণ্ট-ফ্যাণ্ট গলিয়ে নে। কুইক—'

পরমেশ্বরের গলায় এমন কিছু ছিল যাতে আর দাঁড়াল না লোলে। ঝটপট বাইরে বেরিয়ে বস্তির বারোয়ারি টিউবওয়েলের দিকে চলে গেল।

এদিকে এলিজাবেথ বলছিল, 'তুই কি এখনই চলে যাবি?'

পরমেশ্বর বলল, 'ইয়েস মাদার, এখন টাইম নষ্ট করা যাবে না। খুব আর্জেণ্ট কাজ।'

'যত আর্জেণ্টই হোক, একটু চা না খাইয়ে তোকে ছাড়ব না।'

'আমি চা খেয়ে এসেছি, মাদার।'

পরমেশ্বরের কথা কানেও তুলল না এলিজাবেথ। তাড়াতাড়ি কেরোসিনের স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে বাসি মুখ ধুয়ে এল। চা হয়ে গেলে সিলভারের প্যানে ডিমের ওমলেট ভেজে দুটো প্লেটে সাজিয়ে দিল। ততক্ষণে লোলে টিউবওয়েল থেকে ফিরে এসে পরমেশ্বরের কথামতো মেক-আপ নিয়ে ফেলেছে।

এলিজাবেথ দু'জনকে চা ওমলেট দিয়ে বলল, 'কখন ফিরছিস তোরা?'

ডবল ডিমের ওমলেটের বারো আনা একবারে মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে পরমেশ্বর বলল, 'আজ আর ফিরছি না মাদার। ফিরতে ফিরতে হয় কাল রাত, নইলে পরশু মর্নিং।'

একটু চুপ করে থেকে এলিজাবেথ এবার বলল, 'মনে হচ্ছে কোন একটা ঝঞ্ঝাটের কাজে যাচ্ছিস তোরা। কোন রকম বিপদ-টিপদ হবে না তো?'

খেতে খেতে এলিজাবেথের একটা হাত টেনে নিয়ে নিজের মাথায় ঠেকাল পরমেশ্বর। বলল, 'তোমার ব্লেসিং থাকলে কোন মাকড়া আমার চামড়া টাচ করতে পারবে না।'

এলিজাবেথের দুশ্চিন্তা তবু কাটল না। সব মেয়েমানুষের মধ্যেই একটা করে মাদার রয়েছে। সে বলল, 'ব্লেসিং তো সব সময়ই রয়েছে। তবু খুব কেয়ারফুল থাকবি।'

'ও-কে মাদার, তুমি ভেবো না।'

খাওয়া হয়ে গেলে হাতে কিট ব্যাগটা ঝুলিয়ে লোলেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পরমেশ্বর। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়ে প্রথমেই যে রিফিলিং স্টেশনটা পাওয়া গেল, সেখানে ঢুকে গাড়ির ট্যাঙ্ক বোঝাই করে পেট্রোল পুরে নিল। তারপর আবার দৌড়।

আরো কিছুক্ষণ পর ওরা বালি ব্রিজ পার হয়ে বম্বে রোডে এসে পড়ল। তেলের মতো মসৃণ অ্যাসফাল্টের রাস্তা। পরমেশ্বরের লিমুজিনটা পাখির মতো উড়তে লাগল যেন।

নর্থ ক্যালকাটার স্লাম থেকে বেরুবার পর মাঝে মধ্যে এলোমেলো কথাবার্তা হচ্ছিল দু'জনের। আচমকা লোলে জিজ্ঞেস করল, 'গুরু, এবার বল আমরা কোথায় যাচ্ছি? আর মাইরি, নাকে বঁড়শি গেঁথে রেখো না।'

'টাটানগর যাচ্ছি।'

দুপুর বারোটায় ওরা টাটানগর পেঁছে গেল। তখন সূর্যটা খাড়া মাথার ওপর। চারদিক রোদে ঝাঁ ঝাঁ করছে।

লোলে বলল, 'গুরু, মাদার ডাবল ডিমের যে মামলেট খাইয়েছিল, সেগুলো স্রেফ ভস্মো হয়ে গেছে। এখন স্টমাকে কিছু না পড়লে আমি কিন্তু লাট খেয়ে পড়বো।'

পরমেশ্বর কিছু বলল না। স্টেশনের গায়ে গাড়িটা পার্ক করে দু'জনে রেলওয়ে কেটারিং-এর রেস্তোরাঁয় ঢুকল। ফুল কোর্স ইওরোপীয়ান আর ইণ্ডিয়ান লাঞ্চ সেরে দুটো নাগাদ বেরিয়ে এল।

লোলে জিজ্ঞেস করল, 'এবার কী প্রোগ্রাম, গুরু?'

পরমেশ্বর বলল, 'গুডস্ ট্রেনের সাইডিংটা একবার দেখে নিতে হবে।'

প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলো যে সব প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ায়, সেখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে গুডস্ ট্রেনের সাইডিং। আধ ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করে জায়গাটা ওরা পুরোপুরি দেখে নিল। লাক ভালই বলতে হবে। সাইডিং-এ গুডস্ ট্রেন খুব একটা বেশী নেই। ভিড় থাকলে রীতিমতো ঝামেলা হত। কম গাড়ির ভেতর থেকে, বম্বে থেকে হাওড়া বাউণ্ড গুডস্ ট্রেনটা বার করতে অসুবিধা হবে না।

দেখা কমপ্লিট হবার পর পরমেশ্বর বলল, 'চল, এবার যাওয়া যাক।'

কাল রাত্তিরে আবার আসব। তার আগে চারপাশটা ভালো করে দেখে নিতে হবে।'

সাইডিং থেকে মেইন স্টেশনে চলে এল দু'জনে। এখানে ঢোকার আগে প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে নিয়েছিল। টিকেট দুটো গেটে জমা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে সেই লিমুজিনটায় গিয়ে উঠল।

পরমেশ্বর গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে স্টেশন কমপাউন্ডের বাইরে নিয়ে এল। এখন শহরের বাইরে যাবে সে। পঞ্চাশ ষাট কি একশো মাইলের মধ্যে একটা সুবিধামতো জায়গা তাকে খুঁজে বার করতে হবে। তার উদ্দেশ্য, সেই জায়গায় সে অপারেশনটা করবে।

পছন্দমতো একটা জায়গা খুঁজে বার করার পর তারা টাটানগরে ফিরে আসবে। আজকের রাত এবং কালকের সন্ধ্যে পর্যন্ত গোটা দিনটা কোন হোটেলে কাটিয়ে দেবে। কাল বোম্বের ট্রেনটা আসার পর সত্যিকারের অপারেশনে হাত পড়বে। তার আগে শুধু প্ল্যানিং আর প্ল্যানিং। কিন্তু বেস অফ অপারেশনটা খুঁজে বার না করা পর্যন্ত প্ল্যানিংটা পুরো ঠিক করা যাচ্ছে না।

ওরা শহরের বাইরে অনেকদূর চলে এসেছিল। তবে রেল লাইনের ধারে ধারেই চলেছে। কেন না, ট্রেনটা তো আর লাইনের বাইরে টেনে আনা যাবে না।

মাঝে মাঝে গাড়ি থামিয়ে নেমে অনেকটা হাঁটাহাঁটি করে দেখছে পরমেশ্বর আর লোলে, কিন্তু না, কোন জায়গাই পছন্দ হচ্ছে না।

ঘণ্টা আড়াই খোঁজাখুঁজির পর হঠাৎ পরমেশ্বরের চোখে পড়ল, মেইন ট্রেন লাইন থেকে বাঁ দিকে একটা ব্রাঞ্চ লাইন চলে গেছে। লাইনটা দেখে মনে হয়, অনেককাল ঐ লাইনটায় কোন গাড়ি-টাড়ি যায় নি। লোহার চকচকে ভাবটা নেই। জং ধরে গেছে। এই ব্রাঞ্চ লাইনটা যেদিক গেছে, সেখানে নির্জন পাহাড় আর নদী দেখা যাচ্ছে।

লিমুজিন থামিয়ে এক মিনিট কি ভাবল পরমেশ্বর। তারপর লোলেকে বলল, 'নেমে পড়।'

'কী ব্যাপার গুরু?' লোলে জিজ্ঞেস করল।

'নাম না মাকড়া।'

অগত্যা নামতেই হল। পরমেশ্বরও ততক্ষণে নেমে পড়েছে।

মেইন লাইন থেকে ব্রাঞ্চ লাইনটা যেখানে বাঁক ঘুরেছে, সেই জোড়ের জায়গাটা খুব ভালো করে লক্ষ্য করল পরমেশ্বর। তারপর হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। মেইন লাইন থেকে এখন আর ট্রেনকে বাঁ দিকে নেওয়া যায় না।

কেননা, কাছাকাছি রেল কনট্রোল কেবিন থেকে পুলি টেনে লাইনটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

পরমেশ্বর জানে, মেইন লাইন দিয়ে কলকাতার দিকে গুডস্ ট্রেনটা যাবে। সেই ট্রেনটার ইঞ্জিনসুদ্ধু প্রথম দিকের তিনটি ওয়াগন যদি এই নির্জন ব্রাঞ্চ লাইনে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে হ্যাণ্ড গ্রেনেড দিয়ে ভেতরকার ওষুধগুলো নষ্ট করে দেওয়া যাবে। কিন্তু তার আগে দেখা দরকার, ওদিকে ঐ পাহাড়ে বা নদীর ধারে লোকজন আছে কিনা। লোকজন থাকলে এখানে অপারেশন করা সম্ভব হবে না।

পরমেশ্বর বলল, 'চল লোলে, ওদিকটা দেখে আসি।'

গাড়ি রেখে দু'জনে ব্রাঞ্চ লাইনের ওপর দিয়ে প্রায় মাইল খানেক হেঁটে পাহাড় এবং নদীর কাছে পেঁছুল। প্রায় কুড়ি বাইশ মিনিট ওরা হেঁটেছে, কিন্তু একটা লোকও ওদের চোখে পড়ে নি। জায়গাটা পুরোপুরি জনশূন্য।

ব্রাঞ্চ লাইনটা একটা হাঁ-মুখ গুহার পাশ দিয়ে বেরিয়ে নদী পর্যন্ত চলে গেছে।

গুহাটার মুখ এত বড় যে দু-তিনটে বিশ হাজার টনের জাহাজ সেটার ভেতর ঢুকে যেতে পারে। গুহাটার চার পাশে এলোমেলো কয়লার টুকরো পড়ে আছে। দেখেই টের পাওয়া যায়, এই গুহাটা এক সময় কয়লার খনি ছিল। কোল রিজার্ভ শেষ হয়ে যাবার পর খনিটা এখন পরিত্যক্ত।

খনির ধার দিয়ে ওরা নদীর পাড়ে চলে এল। লাইনটা যেখানে শেষ হয়েছে, তারপর পঞ্চাশ ফুট খাড়াইয়ের নিচে বিশাল নদী।

চারদিকের জনশূন্য অ্যাটমসফিয়ার, নদী, পাহাড় ইত্যাদি দেখতে দেখতে পরমেশ্বরের ব্রেনে একটা প্ল্যান এসে গেল। মনে মনে সে ঠিক করে ফেলল, অপারেশনের পক্ষে এর চাইতে ভালো জায়গা আর পাওয়া যাবে না। এখন দেখতে হবে কেমন করে ট্রেনটাকে এই নদী পর্যন্ত টেনে আনা যায়।

পরমেশ্বর বলল, 'চল, এবার ফেরা যাক।'

মেইন লাইনে ফিরে এল ওরা। মেইন আর ব্রাঞ্চ লাইনের জোড়ের কাছটা যেখানে জং ধরে আটকে আছে, হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে ফাঁক করতে চেষ্টা করল পরমেশ্বর, কিন্তু লাইনটা এক সেন্টিমিটারও নড়ানো গেল না। অথচ লাইনটা সরিয়ে ফাঁক না করতে পারলে গুডস্ ট্রেনটাকে ব্রাঞ্চ লাইনে ঢোকানো যাবে না।

পরমেশ্বর বলল, 'রেঞ্চ আর মোটর স্টার্ট দেবার ডাণ্ডাটা নিয়ে আয়।'

লোলে দৌড়ে গিয়ে গাড়ি থেকে যন্ত্র দুটো নিয়ে এল। পরমেশ্বর

রেঞ্চ দিয়ে জোড়ের মুখের গোটা দুই মোটা কবজা খুলে ফেলল। তারপর *ডাণ্ডা দিয়ে চাড় দিতেই ব্রাঞ্চ লাইনের মুখটা সরে গিয়ে মেইন লাইন বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু ব্রাঞ্চ লাইনে যাবার রাস্তা তৈরি হল।*

নিজের অ্যাচিভমেণ্টে খানিকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল পরমেশ্বর। গুডস্ ট্রেনটাকে ব্রাঞ্চ লাইনে নিয়ে আসার প্রবলেমটা আর থাকল না। তবে আরেকটা ঝঞ্ঝাট থেকে গেল। এখানে মেইন রুটে পাশাপাশি দুটো লাইন রয়েছে। এক নম্বর লাইন দিয়ে যদি গুডস্ ট্রেনটা আসে, কোন সমস্যাই নেই। কেননা, ব্রাঞ্চ লাইনটা ওটা থেকেই বেরিয়েছে। কিন্তু দু' নম্বর লাইন দিয়ে এলেই ঝামেলা। যেভাবেই হোক ট্রেনটাকে এক নম্বর লাইন দিয়ে আনাতেই হবে।

সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। রেঞ্চ দিয়ে কবজা দুটো আটকে ডাণ্ডা দিয়ে চাড় মেরে লাইনটাকে আবার আগের মতো করে দিল পরমেশ্বর। তারপর লোলেকে বলল, 'চল মাকড়া, টাটানগরে ফিরে কোন হোটেলে গিয়ে বডি ফেলে দিই!'

লোলে ফিক্সড চোখে একবার পরমেশ্বরকে দেখে নিল। তারপর বলল, 'গুরু, মনে হচ্ছে অপারেশনটা এখানেই করবে।'

লিমুজিনে ফিরে যেতে যেতে পরমেশ্বর বলল, 'সেই রকম ইচ্ছে।'



টাটানগরে ফিরে একটা মাঝারি ধরনের খালসা হোটেলে উঠল দু'জনে। তারপর ঝটপট রাতের খাওয়া চুকিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল।

সেই যে শুল, পরের দিন রাত আটটা পর্যন্ত বিছানায় চিৎপাত হয়েই থাকল পরমেশ্বর। মাঝখানে চান আর খাওয়ার জন্য একবার শুধু উঠেছিল সে।

শুয়ে শুয়ে 'গুডস ট্রেন অপারেশনে'র প্ল্যানটা মনে মনে বারবার উলটে-পালটে ঠিক করে নিয়েছে পরমেশ্বর। কোথাও যাতে এতটুকু ফাঁক বা খুঁত না থেকে যায়। সামান্য গড়বড় হয়ে গেলে গোটা অপারেশনটারই বারোটা বাজবে না, তার আর লোলের লাইফ পর্যন্ত ফিনিশ হয়ে যেতে পারে।

পরমেশ্বর হোটেলে থাকলেও লোলে কিন্তু সারাদিন ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে থাকে নি। সকালে চা-ফা খেয়ে এক চক্কর ঘুরে এসেছে। তারপর দুপুরে খেয়ে-দেয়ে টানা একটি ঘুম লাগাবার পর আরেক পাক ঘুরতে গিয়েছিল। সেই যে বেরিয়েছিল, ফিরল রাত আটটায়।

লোলেকে দেখামাত্র বিছানা থেকে উঠে পড়ল পরমেশ্বর। বলল, 'মাল-ফাল সব গুছিয়ে নে। এক্ষুণি খেয়েই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। কুইক।' অপারেশনের পুরো প্ল্যানটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিভাবে এগুবে তার প্রত্যেকটা স্টেজ সে ঠিক করে নিয়েছে। মনে হচ্ছে প্ল্যানটার কোথাও আর এতটুকু খুঁত নেই।

মাল-টাল বলতে দুটো বড় প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ। একটা ব্যাগে রয়েছে স্ক্রু-ড্রাইভার, সরু ধারাল করাত, প্লাস, রেঞ্চ, অ্যাসিডের বোতল, ইত্যাদি। আরেকটা ব্যাগে মেক-আপ নেবার সাজসরঞ্জাম। জিনিসপত্র ব্যাগ দুটোর ভেতরেই ছিল। তবে কাল কোল মাইনের কাছে লাইন সরাবার পর প্লাস, রেঞ্চ ইত্যাদি যন্ত্রপাতি এলোমেলোভাবে ব্যাগে পুরে রেখেছিল পরমেশ্বর। চোখের পলকে লোলে সেগুলো ঠিকমতো গোছগাছ করে ফেলল।

তারপর খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে হোটেলের বিল মিটিয়ে ওরা যখন বাইরে বেরিয়ে এল, তখন প্রায় ন'টা বাজে।

হোটেল কম্পাউণ্ডের ভেতর লিমুজিনটা পার্ক করা ছিল। গাড়িটায় উঠে প্রথমে টাউন থেকে দূরে খুব একটা নির্জন জায়গায় চলে এল পরমেশ্বর। পাশে মাঠ। সেখানে জায়গায় জায়গায় বড় বড় ঝাঁকড়া গাছ আর ঝোপঝাড়। পরমেশ্বর গাড়িটাকে মাঠে নামিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে গেল।

লোলে বলল, 'এখানে কী গুরু?'

পরমেশ্বর বলল, 'একটু ওয়েট কর না মদনা।' বলতে বলতে চটপট মেক-আপের ব্যাগটা খুলে আয়না, আঠা, উইগ, ব্রাশ ইত্যাদি বার করে ফেলল।

'মেক-আপ চড়াবে নাকি গুরু?'

'ইয়েস মাকড়া—'

প্রথমে নিজে মেক-আপ নিল পরমেশ্বর। পনের মিনিটের ভেতর তেল চিটচিটে ঢলঢলে একটা ফুলপ্যাণ্ট পরে, গায়ে আর মুখে সাদাটে রঙ লাগিয়ে ঠোঁটের তলায় গোঁফ বসিয়ে আর চুল কপার কালারে 'ডাই' করে নিজেকে একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে মেকানিক বানিয়ে ফেলল। তারপর আয়নায় নিজের মুখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে লোলেকে জিজ্ঞেস করল 'কী রকম লাগছে?'

লোলে বলল, 'তুমি গুরু ইলিয়ট রোড-ফোডের ট্যাঁশ হয়ে গেছ!'

'ট্যাঁশ ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না?'

'বিলকুল না গুরু।'

'ঠিক হ্যায়। আয় এবার তোর মুখের ম্যাপ পালটে দিই।'

লোলের গালে চাপদাড়ি, মাথায় পাগড়ি ইত্যাদি চড়িয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে তার চেহারা পালটে দিল। তারপর তার মুখের সামনে আয়না ধরে বলল, 'আয়নায় কার থোবড়া দেখছিস?'

লোলে বলল, 'এ যে এক সর্দারজী, গুরু। তোমার হাতে মাইরি ভেলকি রয়েছে।'

'সর্দারজী ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না তো?'

'না গুরু। পাক্কা সর্দারজী—'

আয়না এবং মেক-আপের অন্যান্য সরঞ্জাম প্ল্যাস্টিকের ব্যাগে পুরতে পুরতে পরমেশ্বর বলল, 'তোকে একটা কাজ করতে হবে। এখন আমরা স্টেশনে যাব। তুই আমাকে নামিয়ে গাড়ি নিয়ে কাল আমরা যেখানে রেল-

লাইন ফাঁক করেছিলাম, স্ট্রেট সেখানে চলে যাবি। ওখানে অনেক উঁচু-নীচু ঢিবি রয়েছে। গাড়িটা কোন একটা ঢিবির আড়ালে এমন করে রাখবি যাতে ট্রেন বা হাইওয়ে থেকে কেউ দেখতে না পায়। হোল নাইট তুই গাড়িতে থাকবি। ইচ্ছে করলে ঘুমও লাগাতে পারিস। তারপর কাল সকাল ন'টায় আমি যেভাবে রেললাইন ফাঁক করেছিলাম ঠিক সেইভাবে লাইনটাকে ফাঁক করে রাখবি। ঠিক ন'টার সময়।'

লোলে বলল, 'ও-কে গুরু।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি মালগাড়িটাকে কোল মাইনের দিকে নিয়ে যেতে চাইছ?'

'দেখি কী করা যায়।' বলে একটা করে রেঞ্চ, করাত আর প্লাস ছোট হ্যান্ডব্যাগে পুরে নিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'লাইন ফাঁক করার যন্তর-ফন্তর বড় ব্যাগটায় রইল।'

আধ ঘণ্টার মধ্যে রেল স্টেশনে চলে এল। এখানে পরমেশ্বর হ্যান্ড-ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে নেমে পড়ল। আর লোলে ড্রাইভ করে লিমুজিনটাকে নিয়ে এক মিনিটের ভেতর উধাও হয়ে গেল।

লোলে তার প্রাইভেট সেক্রেটারি-কাম হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট হবার পর তাকে মোটর ড্রাইভিং, হর্স রাইডিং, লঞ্চ চালানো ইত্যাদি শিখিয়ে নিয়েছিল পরমেশ্বর। তাদের যা প্রোফেসন তাতে কোন্‌টা কখন কাজে লাগবে, কেউ বলতে পারে না।

যাই হোক, চেহারায় রেলওয়ে মেকানিকের পাক্কা স্ট্যাম্প থাকায় টিকেট চেকাররা পরমেশ্বরকে গেটে আটকালো না। প্যাসেঞ্জার ট্রেনের প্লাটফর্মগুলো পেরিয়ে গুডস ট্রেনের সাইডিং-এ চলে এল সে।

কাল খুব বেশী মালগাড়ি-টাড়ি ছিল না সাইডিং-এ। আজ দেখা গেল পনের-কুড়িটা গুডস ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কাণ্ট্রির নানা জায়গা থেকে এই মালগাড়িগুলো এসে হাজির হয়েছে। গুডস ট্রেনের এই চিড়িয়াখানা থেকে এখন দরকারী গাড়িটাকে খুঁজে বার করতে হবে।

গাড়িটার নম্বর, গার্ড এবং ড্রাইভারের নাম—সবকিছু সাপ্লাই দিয়েছেন সোমেশ্বর। নাম-টাম মুখস্থ হয়ে গেছে পরমেশ্বরের। গাড়ির নম্বর দুশো পাঁচ, গার্ডের নাম আবদুল রসিদ ড্রাইভারের নাম মাইকেল পেরেরা।

সাইডিং-এ অগুনতি তেজী ফ্লুরোসেণ্ট লাইট জ্বলছে। ঝকঝকে আলোয় পরমেশ্বর দুশো পাঁচ নম্বর গাড়িটাকে খুঁজতে লাগল। ঘণ্টাখানেক খোঁজা-খুঁজির পর গাড়িটাকে বার করল সে। সাইডিং-এর একধারে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এধারে-ওধারে অনেকগুলো মেকানিক নানা ট্রেনে উঠে 'চেক' করছিল। কোথাও কোন গোলমাল থাকলে মেরামত করে দিচ্ছে। কেউ কেউ রেললাইন

ইনসপেকসন করছিল। পারতপক্ষে পরমেশ্বর অন্য মেকানিকদের ধার ঘেঁষছিল না। কেননা এতে ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে। নিশ্চয়ই এখানকার মেকানিকরা একজন আরেকজনকে চেনে।

দুশো পাঁচ নম্বর গুডস ট্রেনটা বার করার পর সোজা ইঞ্জিনে চলে এল পরমেশ্বর। ট্রেনটা খুব সম্ভব এইমাত্র সাইডিং-এ এসে থেমেছে। ড্রাইভার এবং স্টোকাররা ইঞ্জিনেই ছিল। পরমেশ্বর দ্রুত একবার ড্রাইভার এবং তার সঙ্গীদের দেখে নিল। সবসুদ্ধ ওরা তিনজন। সে জিজ্ঞেস করল, 'ইঞ্জিনমে কুছ কমপ্লেন হ্যায় ?'

ড্রাইভার বলল, 'নেহী। ইঞ্জিন বিলকুল অল-রাইট।'

'তব ভি চেক করনা পড়েগা। রাস্তেমে কুছ ট্রাবল হো যায় তো বহোত মুসিবত হোগা—'

'তব চেক কীজিয়ে—'

পরমেশ্বর ইঞ্জিনে উঠে এল। নিজের প্রোফেশনের জন্য মোটর, ট্রেন, এমনকি প্লেনেরও কিছু কিছু মেকানিজম শিখে রেখেছে পরমেশ্বর। সে ইঞ্জিন এবং বয়লারের নানা চেম্বার খুলে দেখতে দেখতে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, 'কোত্থেকে এ ট্রেন আসছে ?'

ড্রাইভার বলল, 'বম্বে থেকে।'

'ওয়েস্টার্ন রেলের গাড়ি ?'

'জী।'

'আমি স্টিফেন হাওয়ার্থ—'

'আমি মাইকেল পেরেরা।'

'বাড়ি কোথায় ?'

'গোয়ায়। পাঞ্জিমের কাছে—'

ড্রাইভারের নাম জানা দরকার ছিল। সোমেশ্বর ঠিক নাম-টামগুলোই সাপ্লাই করেছেন।

নাম সম্বন্ধে নিশ্চিত হলেই চলবে না, মাইকেল পেরেরা নামের এই মালটির সঙ্গে জমিয়ে ফেলতে হবে। আর জমাতে গেলে কিছু কথাবার্তা বলা দরকার।

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'পেরেরা সাহেব, আপনি কি ক্যাথলিক ?'

মাইকেল পেরেরা বলল, 'হাঁ। আপনি ?'

'আমিও।'

মিনিট পনেরোর ভেতর মাইকেল পেরেরার বাড়ি-ঘর এবং ফ্যামিলি ছাড়াও চার জেনারেশনের খবর যোগাড় করে ফেলল পরমেশ্বর। পেরেরার ঠাকুর্দা-

ঠাকুমা এবং মা-বাবা এখনও বেঁচে আছে। তারা থাকে দেশের বাড়িতে। পেরেরা তার কুর্গী বউ আর পাঁচ ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে বম্বেতে ওয়েস্টার্ন রেলের কোয়ার্টারে। ছেলেমেয়েগুলো মানুষ হয় নি। বড় মেয়েটা এক কেরেলী ছোকরার সঙ্গে দু-দু'বার বাঙ্গালোরে পালিয়ে গিয়েছিল। ছেলেগুলো পড়াশোনা ছেড়ে ব্যালার্ড এস্টেট কি দাদাভাই নওরোজি রোডের ছ্যাঁচড়া স্মাগলারদের কাছে অ্যাপ্রেন্টিস খাটছে। বিগ স্মাগলাররা জাহাজে কি প্লেনে লুকিয়ে-চুরিয়ে, কাস্টমসের চোখে ধুলো ছিটিয়ে জাপানী রিস্টওয়াচ, শার্টিং, লাইটার, আমেরিকান টেপ-রেকর্ডার, ট্রানজিস্টর, সুইস ঘড়ি ইত্যাদি নিয়ে আসে। এসব স্মাগল-করা ফরেন মাল মার্কেটিং-র জন্য তারা গণ্ডা গণ্ডা ছোট স্মাগলার যোগাড় করেছে। এই ছোট স্মাগলাররা গোটা ব্যালার্ড এস্টেট, ফ্লোরা ফাউণ্টেন আর ক্রফোড মার্কেটের চারপাশ জুড়ে ফুটপাতে ফুটপাতে দোকান সাজিয়ে রয়েছে। ইণ্ডিয়ান গুডসের সঙ্গে তারা লুকিয়ে লুকিয়ে ফরেন জিনিসও বেচে। এই রকম এক ছোট স্মাগলারের কাছে পেরেরার তিন ছেলে অ্যাপ্রেন্টিস হয়ে আছে। তাদের কাজ হলো রাস্তার লোকের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলা, 'ফরেন গুডস হ্যায় স্যার। জাপানী শার্টিং, আমেরিকান ট্রানজিস্টর, জার্মান টেপ-রেকর্ডার—' ইত্যাদি ইত্যাদি। হাজার হাজার লোকের ভেতর থেকে তারা কাস্টমার ধরে নিয়ে আসে। বড় মেয়ে আর ছেলে তিনটে জাহান্নামে যাক, ছোট মেয়েটা কিন্তু দারুণ ভালো। নরম স্বভাব, লেখাপড়ায় ব্রিলিয়াণ্ট। কনভেণ্টে পড়ছে। এই মেয়েটাই তার একমাত্র আশা-ভরসা।

পেরেরা আরো জানালো তার বউটি রিয়েল খাণ্ডার। এমন কালো মোটা জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ ওয়ার্ল্ডে আর একটাও জন্মায় নি। গলার স্বর শেষ পর্দায় চড়ে আছে। গলা এমন বাজখাঁই যে তাদের রেল কলোনির ভিত সর্বক্ষণ কাঁপতে থাকে। মনে হয় ঐ দিকটায় একটা পার্মানেণ্ট ভূমিকম্প লেগে আছে। কুর্গী মেয়েমানুষগুলো এই রকম ডেঞ্জারাস ছিন্নমস্তা টাইপের হয়ে থাকে।

একটা গোটা লং-প্লেয়িং রেকর্ড চালানোর মতো একদমে নিজের ফ্যামিলি হিস্ট্রি বলে গেল পেরেরা। কিন্তু এসব ব্যাপারে একেবারেই ইণ্টারেস্ট নেই পরমেশ্বরের। তবু হাতে দুব্বো-টুব্বো নিয়ে বিধবারা যেভাবে ভগবানের কথা শোনে সেইভাবে দারুণ আগ্রহ নিয়ে তাকে পেরেরার কথা শুনতে হল। কারণ একটাই, এই মাকড়াটার সঙ্গে জমিয়ে নিতে হবে।

সব শোনার পর পরমেশ্বর বলল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভীষণ ভালো লাগল পেরেরা সাহেব।' মনে মনে অবশ্য বলল, 'খজড়া, ফোর জেনারেশনের হিস্ট্রি বলে বলে কানে র‍্যাঁদা ঘষে দিয়েছে।'

মাইকেল পেরেরাও একই কথা বলল, 'আমারও খুব ভালো লেগেছে। তা ছাড়া আমরা দুজনেই ক্যাথলিক ; প্রভু যীশুর অনুগত।'

পরমেশ্বর ভাবল, তার চোদ্দ গুষ্টিতে কেউ ক্যাথলিক নেই। খ্রীশ্চান, হিন্দু, বুদ্ধিস্ট, মুসলিম, জিওনিস্ট, পার্শী, জরথ্রুস্টপন্থী—আসলে সে যে কী, নিজেই জানে না। তবু এই পেরেরা শালাকে কব্জা করতে হলে টেম্পোরারিলি ক্যাথলিক হওয়া ছাড়া উপায়ই বা কী? সে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আচ্ছা পেরেরা সাহেব—'

'বলুন।'

'আপনারা তো বম্বে থেকে আসছেন। যাবেন কোথায়?'

'ক্যালকাটা।'

'কবে পেঁছুবেন?' পেরেরারা কোত্থেকে আসছে, কোথায় যাবে, কবে পেঁছুবে—সব জেনেশুনেও জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে পরমেশ্বর। আসলে অ্যাটমসফিয়ার তো তৈরি করতে হবে।

মাইকেল পেরেরা বলল, 'পরশু ইভনিং-এ।'

বয়লার এবং ইঞ্জিন-টিঞ্জিন দেখা হয়ে গিয়েছিল। পেরেরার দিকে ফিরে পরমেশ্বর বলল, 'এত দেরি হবে কেন? টাটানগর থেকে কলকাতায় যেতে দু'দিন দু'রাত লাগে নাকি?'

'গুডস ট্রেন তো। নানা জায়গায় থামতে থামতে যায়। প্যাসেঞ্জার ট্রেনকে পাস করাবার পর লাইন ক্লিয়ার পেলে তবে গুডস ট্রেন যেতে পারে।'

এ সবই পরমেশ্বরের জানা ব্যাপার। আসলে সে অন্য খবর জানতে চায়। পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'আজ রাত্তিরে আপনারা এখানেই থাকছেননাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কাল কখন এখান থেকে স্টার্ট করবেন?'

'সকালে। অ্যারাউন্ড ফাইভ অর ফাইভ থার্টি ইন দি মর্নিং। আপনার চেক হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। এখন খেয়েদেয়ে রেস্টরুমে গিয়ে শুয়ে পড়তে হবে।'

দারুণ ব্যস্তভাবে পরমেশ্বর বলল, 'ও, সিওর।'

একটু পরে পরমেশ্বর এবং পেরেরা তার দলবল নিয়ে নেমে পড়ল। ওরা সাইডিং-এর ওধারে স্টেশনের রেস্ট রুমে চলে যাবে। কিন্তু পরমেশ্বরের পক্ষে ওদিকে যাওয়া কিছুটা বিপজ্জনক। রেলওয়ে মেকানিক স্টাফের কারো মুখোমুখি পড়ে গেলে ঝামেলা হয়ে যেতে পারে। ভোর পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটা পর্যন্ত তাকে সাইডিং-এই কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে।

পেরেরা বলল, 'গুড নাইট।'

পরমেশ্বর বলল, 'গুড নাইট। আবার দেখা হবে।'

পেরেরা তার রেজিমেন্ট নিয়ে চলে গেল। আর পরমেশ্বর এখানে দাঁড়িয়ে এধার ওধার দেখতে লাগল। আজ রাতের জন্য একটা নির্জন জায়গা তার চাই। দেখতে দেখতে আচমকা তার খেয়াল হল, বম্বে থেকে আসা দুশো পাঁচ নম্বর গুডস ট্রেনটাই সব দিক থেকে নিরাপদ। ট্রেনটা সকাল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত নড়ছে না। পরমেশ্বর স্ট্রেট মালগাড়িটার কাছে এসে একটা বগির তলায় ঢুকে গেল। সেখানে অনেকগুলো আংটায় একটা লোহার পাত আটকানো রয়েছে। লোহার এই পাটাতনে তোফা শুয়ে থাকা যায়। পরমেশ্বর ঝুঁকে পাটাতনে ঢুকে গেল। তারপর যন্ত্রপাতি বোঝাই হ্যাণ্ডব্যাগটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ল।

কয়েক ঘণ্টা বাদে যখন পরমেশ্বরের ঘুম ভাঙল তখন ভোর হয়ে এসেছে। সাইডিং-এর যে যে গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো থেকে ইঞ্জিনের তীক্ষ্ম হুইসিল শোনা যাচ্ছে। দু-একটা মালগাড়ি চলার ঘন ঘন ভারী আওয়াজ কানে আসছে। এইমাত্র ওধারের প্ল্যাটফর্মে একটা মেইন ট্রেন এসে থামল। গুডস ট্রেনের বগির তলায় শুয়ে শুয়েও প্যাসেঞ্জারদের ওঠানামা, ব্যস্ততা, কুলীদের চিৎকার এবং হইচই টের পাওয়া যাচ্ছে।

পরমেশ্বর কব্জি উলটে ঘড়ি দেখল। এখন পাঁচটা বেজে সাত। বগির নিচে আর শুয়ে থাকা একেবারেই ঠিক হবে না। যে কোন সময় ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে পারে। এক সেকেণ্ড আর শুয়ে না থেকে ঝট করে বাইরে বেরিয়ে এল পরমেশ্বর। আর বেরুতেই তার চোখে পড়ল মাইকেল পেরেরা তার বাহিনী নিয়ে ইঞ্জিনে ফিরে এসেছে। গার্ড সিগন্যাল দিলেই সে স্টার্ট দেবে।

লাক ভালো, ঠিক সময়েই সে গাড়ির তলা থেকে বেরুতে পেরেছে। আর দেরী করলে আংটায় আটকানো পাটাতন থেকে পড়ে যেতে পারত। আর ট্রেনের তলায় পড়লে নীট রেজাল্ট কী হতে পারে, পরমেশ্বর তা ভালো করেই জানে। স্ট্রেট তাকে মর্গে চলে যেতে হতো।

গুডস ট্রেনটার পাশে দাঁড়িয়ে পরমেশ্বর ভাবতে লাগল, এখন সে কী করবে? অবশ্য মোটামুটি সে ঠিকই করে রেখেছে, এই ট্রেনে করেই যাবে। তারপর একটা চান্স তৈরি করে অপারেশন চালাবে কিন্তু ট্রেনটা স্টার্ট না করলে তো যাওয়া যায় না।

আচমকা গার্ডের হুইসিল শোনা গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভোঁতা গলায় চেঁচিয়ে উঠে মালগাড়িটা প্রেগন্যান্ট মেয়েমানুষের মতো হেলেদুলে গদাইলস্করী

চালে চলতে লাগল। পরমেশ্বর আর দেরি করল না। একটু দৌড়ে গিয়ে এক লাফে ইঞ্জিনের ফুটবোর্ডে উঠে পড়ল।

পেরেরা তাকে দেখতে পেয়েছিল। একটু অবাক হয়েই বলল, 'আ রে আপনি।'

পরমেশ্বর বলল, 'আমাকে একবার আসানসোল যেতে হবে। আপনাদের সঙ্গে গেলে আপত্তি নেই তো?'

'আপনি যাবেন, তাতে আপত্তি কিসের? উঠে আসুন মিস্টার স্টিফেন। বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'—বলতে বলতে সিঁড়ি বেয়ে ইঞ্জিনের ভেতর চলে এল পরমেশ্বর। তারপর পেরেরা এবং তার অ্যাসিস্ট্যাণ্টেদের একদিকে রেখে আরেক কোণে ইঞ্জিনের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

পেরেরা ভোরবেলা উঠেই রেস্ট রুম থেকে চলে এসেছিল। অত সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে আসতে পারে নি। তবে সঙ্গে করে রুটি, চীজ, কলা আস্ত ডিমসিদ্ধ আর ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে এসেছিল।

রুটি ফুটি বার করে পেরেরা সবার সঙ্গে পরমেশ্বরকেও দিল। পরমেশ্বর 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ' বলে খেতে শুরু করল। খেতে খেতে এলোমেলো গল্পও চলতে লাগল।

এক সময় দেখা গেল রোদ উঠে গেছে আর গুডস ট্রেনটা টাটানগর পেছনে ফেলে অনেক দূর চলে এসেছে।

পরমেশ্বর ঝট করে একবার ঘড়ি দেখে নিল। এখন আটটার মতো বাজে। কাঁটায় কাঁটায় ন'টায় লোলে রেল লাইন ফাঁক করে কোল মাইনে যাবার রাস্তা ক্লিয়ার করে রাখবে। হাতে মাত্র ঘণ্টাখানেকের মতো সময় রয়েছে। এর ভেতর অপারেশনের কাজ শুরু করে দিতে হবে।

পরমেশ্বর মুখ বাড়িয়ে এবার বাইরের দিকটা দেখে নিল। এখানে পাশাপাশি দুটো লাইন রয়েছে। গুডস ট্রেনটা সেকেণ্ড লাইন দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোল মাইনের দিকে গাড়িটাকে নিয়ে যেতে হলে ফার্স্ট লাইন দিয়ে যেতেই হবে।

পরমেশ্বর তার চোখ দুটো এবার পেরেরার দিকে ফেরাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা পেরেরা সাহেব, আপনি বম্বে থেকে ক্যালকাটা গুডস ট্রেন নিয়ে এই প্রথম যাচ্ছেন?'

পেরেরা বলল, 'প্রথম কি বলছেন! কম করে দু-তিন শো বার গেছি। এই মাসেই তো দু'বার এসেছি। দিস ইজ থার্ড টাইম।'

'ও, তাই নাকি। আচ্ছা—'

'বলুন।'

'বম্বে থেকে পরশুদিন ক'টায় স্টার্ট করেছিলেন?'

'বিকেলে।'

'বরাবর কি বিকেলেই বম্বে-ক্যালকাটা রুটে গুডস ট্রেন নিয়ে আসেন?'

'তা নয়, তবে বেশীর ভাগ সময়ই ওই সময়ে স্টার্ট করি।'

একটু ভেবে পরমেশ্বর বলল, 'বিকেলে স্টার্ট করলে এক রাত টাটানগরে হল্ট করে প্রত্যেক বারই এই সময়টা—' চটপট কব্জি উলটে ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে ফের বলল, 'মানে, এই আটটা দশ-ফশে এখন আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছি, সেখান দিয়ে যান?'

পেরেরা বলল, 'হ্যাঁ। তবে একজাক্ট আটটা দশ না-ও হতে পারে। দু-চার মিনিট এধার-ওধার হয়ে যায় অনেক সময়।'

'তা হোক। আমরা তো এখন সেকেণ্ড লাইন দিয়ে যাচ্ছি। একেবারে ক্যালকাটা পর্যন্ত কি সেকেণ্ড লাইনেই যাব?'

'না-না, তা কখনও হয় নাকি? খানিকক্ষণ পর ফার্স্ট লাইনে যাব।'

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'কখন ফার্স্ট লাইনে যাবেন?'

পেরেরা বলল, 'কনট্রোল কেবিন থেকে ফার্স্ট লাইনে যাবার ক্লিয়ারেন্স পেলেই।'

'কি রকম সময় ক্লিয়ারেন্স পাবেন বলে মনে হয়?'

'দশটার আগে নয়।'

মাকড়া বলে কী! তারা এখন যেখানে এসে পড়েছে সেখান থেকে কোল মাইনটা খুব দূরে নয়। ক্যালকুলেসন অনুযায়ী ঘণ্টা খানেকের ভেতর অর্থাৎ ন'টা নাগাদ তারা ওখানে পৌঁছে যাবে। কিন্তু দশটার আগে যদি ক্লিয়ারেন্স না পাওয়া যায় সেকেণ্ড লাইন থেকে ফার্স্ট লাইনে যাওয়া যাবে না। ফার্স্ট লাইনে যেতে না পারলে গোটা অপারেশনটারই বারোটা বেজে যাবে।

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'এই সময়টা ফার্স্ট লাইনে ক্লিয়ারেন্স দ্যায় না কেন?'

এমনভাবে পরমেশ্বর একের-পর-এক প্রশ্নগুলো করে যাচ্ছে যাতে সন্দেহ করার কিছু নেই। পেরেরা ভাবছিল এটা তার নতুন ফ্রেণ্ডের কৌতূহল মাত্র। সে বলল, 'দেবে কী করে? দশটার মধ্যে দু-দুটো মেইল ট্রেন ফার্স্ট লাইন দিয়ে ক্যালকাটার দিক থেকে আসবে। এখন ও লাইনে গেলে ডেফিনিট অ্যাকসিডেণ্ট।'

পরমেশ্বরের শিরদাঁড়া দিয়ে বরফের মতো কিছু যেন ছুটে গেল। ব্যাপারটা যত সহজ ভাবা গিয়েছিল ততটা সহজ নয়। ওয়ার্ল্ডে তার এখনও

অনেক কাজকর্ম পড়ে আছে। জনগণ তার সারভিস নেবার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এত লোককে পথে বসিয়ে ট্রেন অ্যাকসিডেণ্টে নিজেকে ফিনিশ করে ফেলার মানে হয় না। পীপল অর্থাৎ জনগণের জন্য তাকে এখনও অনেক, অনেক বছর সুস্থ দেহে বেঁচে থাকতে হবে।

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'মেইল ট্রেন দুটো ফাস্ট লাইন দিয়ে কখন পাস করবে?'

পেরেরা ভুরু কুঁচকে কী ভাবল। তারপর বলল, 'একটা ট্রেন যাবে ন'টা সোয়া ন'টায়। আরেকটা তার মিনিট কুড়ি-পঁচিশ বাদে।'

প্রথম মেইল ট্রেনটা যদি ন'টা সোয়া ন'টায় আসে তা হলে একটা রিস্ক নেওয়া যেতে পারে। নো রিস্ক নো গেইন। নেক্সট দু মিনিটের মধ্যে যা সে করবে সেটা ঠিক করে ফেলল পরমেশ্বর। নার্ভগুলোকে টান টান করে একবার পেরেরা এবং তার অ্যাসিস্ট্যাণ্টদের দেখে নিল সে। তার সামনের দিকে লোকগুলো রয়েছে। সেটা পরমেশ্বরের পক্ষে দারুণ অ্যাডভাণ্টেজ। অন্ততঃ পেছন দিক থেকে ওরা অ্যাটাক করতে পারবে না।

মিনিট খানেক কাটল। এখন আর পরমেশ্বর কিছু জিজ্ঞেস করছে না। পেরেরা দু পা এগিয়ে ইঞ্জিনের স্পীডোমিটারের কাঁটা দেখতে লাগল। একটা স্টোকার বেলচায় কয়লা তুলে বয়লারের ঢাকনা খুলে ভেতরে ছুঁড়ে দিল।

পরমেশ্বর আস্তে আস্তে একটা হাত হিপ পকেটে ঢুকিয়ে রিভলবার বার করে নিয়ে এল। সেটা পেরেরাদের দিকে তাক করে চাপা হিমমাখানো গলায় বলল, 'এই যে মিস্টাররা—'

ঘাড় ফিরিয়েই তিনটে লোক চমকে উঠল। পেরেরার পা দুটো কাঁপতে কাঁপতে হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি হয়ে যাচ্ছে। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে তার। অন্য লোক দুটোর চোখের তারা ফিক্সড হয়ে গেছে।

দাঁতকপাটি লাগা মুখে কাঁপা গলায় পেরেরা বলল, 'এটা কী মিস্টার স্টিফেন?'

'রিভলবার।'

'ওটা নামান স্যার। হুট করে বুলেট বেরিয়ে যেতে পারে। মজাক করবেন না, মিস্টার স্টিফেন।'

'মজাকের ব্যাপার নয় পেরেরা। ট্রেন থামিয়ে ফাদারের সুপুত্তুর হয়ে নেমে যাও।'

'কিন্তু স্যার, গার্ড সিগন্যাল না দিলে ট্রেন তো থামানো যায় না।'

একটা দুর্দান্ত খিস্তি ঝেড়ে পরমেশ্বর বলল, 'আমি সিগন্যাল দিচ্ছি। থামাও।'

—

পরমেশ্বর যখন পেরেরার সঙ্গে কথা বলছে, সেই সময় একটা স্টোকার কয়লার চাঙড়া তুলে নিয়েছে হাতে। উদ্দেশ্য, গায়ের জোরে চাঙড়াটা পরমেশ্বরের দিকে ছুঁড়ে মারা। কিন্তু পরমেশ্বরের চোখ হল কয়েক ডজন। সেখানে ধুলো ছিটানো সোজা না। চোখের পাতা নড়বার আগেই একটা বুলেট বেরিয়ে গিয়ে স্টোকারের হাতের চাঙড়াটা গুঁড়ো করে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পরমেশ্বর চিৎকার করে উঠল, 'কয়লাটা উড়িয়ে দিলাম। শুয়ারকে বাচ্চে এর পরের বুলেট তোর খুলির ভেতর ঢুকে যাবে।' বলেই পেরেরার দিকে ফিরল, 'এক মিনিটের মধ্যে গাড়ি থামিয়ে না নেমে গেলে তিনটি লাশ ফেলে দেব।'

পেরেরা আর একটা কথাও বলল না। কাঁপা হাতে কী সব পুলি-টুলি টেনে ট্রেন থামিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে ওধারের দরজা দিয়ে নেমে গেল। পেরেরা ভেবেই পাচ্ছিল না, এ রকম একটা ব্যাপার কী করে ঘটে গেল! যে লোকটা রেলের মেকানিক, তার মতোই যে ক্যাথলিক, যাকে তার একটা দারুণ ভালোমানুষ মনে হচ্ছে, বন্ধুর মতো যাকে আদর করে ইঞ্জিনে তুলে এনেছে, সেই লোকটা রিভলবারের নল দেখিয়ে তাকে যে নামিয়ে দিতে পারে, এ রকম একটা ব্যাপার কিছুতেই তার মাথায় ঢুকছিল না। ওয়াল্ডে কোন মানুষকেই বুঝি আর বিশ্বাস করা চলে না।

পেরেরারা যে দরজা দিয়ে নেমে গেছে, পরমেশ্বর সোজা সেখানে চলে এল। পেরেরারা নেমে ভ্যাবাচ্যাকা মেরে দাঁড়িয়ে ছিল। যেখানে গাড়িটা থেমেছে তার পাশেই খাদ। খাদের ওপারে মাঝারি পাহাড়। খাদে গাছপালা বিশেষ নেই।

এই লোকগুলো কাছাকাছি থাকলে অনেক অসুবিধা। যে কোন সময় তারা ঝামেলা পাবিয়ে ফেলতে পারে। ট্রেন ফেলে তারা সহজে পালিয়ে যাবে না।

পরমেশ্বর রিভলবার দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'মাকড়ারা ঐ খাদে নেমে ওধারের পাহাড়ে গিয়ে ওঠ। কুইক কুইক—'

ঊর্ধ্বশ্বাসে খাদে নেমে ওধারের পাহাড়ের দিকে চলে গেল পেরেরারা।

এখন খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। হাতের ফাঁক গলে টাইম বেরিয়ে যাচ্ছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। হ্যাণ্ডব্যাগটা নিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল পরমেশ্বর।

সোমেশ্বর খবর দিয়েছিলেন ইঞ্জিনের লাগোয়া পর পর তিনটে বগিতে লাইফ সেভিং ওষুধ রয়েছে। এতে সুবিধেই হয়েছে পরমেশ্বরের পক্ষে। এখন ইঞ্জিনসুদ্ধ এই বগি তিনটেকে আলাদা করে ফেলতে হবে।

তিন নম্বর বগিটা যেখানে মোটা হুক দিয়ে চার নম্বর বগির সঙ্গে আটকানো রয়েছে স্ট্রেট সেখানে চলে এল পরমেশ্বর। দুই বগির মাঝখানের হুক দুটো 'জ্যাম' হয়ে আটকে আছে। শরীরের সবটুকু জোর দুই হাতে জড়ো করে হুকটা খোলার চেষ্টা করল পরমেশ্বর কিন্তু হুক দুটো যেমন ছিল তেমনিই রইল ; এক চুলও নড়ানো গেল না।

পরমেশ্বর আর ট্যানাহ্যাঁচড়া করল না। হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে অ্যাসিডের বোতল বার করে হুকের ওপর অ্যাসিড ঢেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে হুকের লোহা ক্ষয়ে ক্ষয়ে নীল ধোঁয়া বেরুতে লাগল। নাকে রুমাল বেঁধে একটা করাত বার করে ক্ষয়ে যাওয়া জায়গাটা কাটতে লাগল পরমেশ্বর। তিন চার মিনিটও লাগল না ; হুক কেটে গেল।

কাজটা বিনা ঝামেলায় হয়ে যাবার পর পরমেশ্বর দুই বগির ফাঁক থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, হাতে ফ্ল্যাগ নিয়ে গার্ড দৌড়ে আসছে। তার সঙ্গে দুটো রাইফেলওলা আর্মড গার্ড। আচমকা বিনা সিগন্যালে ট্রেন থেমে যাওয়ায় ওরা দারুণ ঘাবড়ে গেছে। গার্ডের জন্য নির্দিষ্ট কামরা থেকে নেমে ওরা ইঞ্জিনের দিকে আসছে খোঁজখবর নেবার জন্য।

কিন্তু ইঞ্জিন পর্যন্ত ট্রেনের গার্ড আর আর্মড গার্ড দুটোকে পেঁছুতে হল না। তার আগেই ওয়াগনের আড়াল থেকে রিভলবার দিয়ে ফায়ার শুরু করল পরমেশ্বর। আর্মড গার্ডরা এবং রেলের গার্ড থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কেননা পরমেশ্বর তাদের দেখতে পাচ্ছে কিন্তু ওরা তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

এদিকে ঝাঁক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছে পরমেশ্বর। এমন ভাবে ছুঁড়ছে যাতে কারো গায়ে না লাগে।

অদৃশ্য অপোনেণ্টের সঙ্গে লড়াই করা অসম্ভব ব্যাপার। গার্ডরা অ্যাবাউট টার্ন করে পেছন দিকে টেরিফিক স্পীডে দৌড় লাগাল। আর সেই মওকায় পরমেশ্বর ওয়াগনের তলা দিয়ে দিয়ে ইঞ্জিনে এসে স্টার্ট দিয়ে দিল।

পেরেরারা ওধারের পাহাড়ে গিয়ে উঠেছিল। তিনটে বগিসুদ্ধু ইঞ্জিনটাকে চলে যেতে দেখে তারা হাত পা ছুঁড়ে চেঁচাতে লাগল, 'হারামী ডাকু গাড়ি নিয়ে ভেগে যাচ্ছে। পাকড়ো শালেকো, পাকড়ো শালেকো—'

পরমেশ্বর ওদের চিৎকার শুনেও শুনল না। শুধু বলল, 'শুয়ারের বাচ্চারা, কনট্রোল কেবিনে গিয়ে খবর দে, গুডস ট্রেনের বগিগুলো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। পেছন থেকে অন্য ট্রেন এলে অ্যাকসিডেণ্ট হবে।' তারপর টপ স্পীড তুলে ইঞ্জিন চালাতে লাগল। কিছুক্ষণ আগে পঁচিশ-তিরিশটা বগি টানতে ইঞ্জিনটার জিভ বেরিয়ে যাচ্ছিল। অ্যাডভান্স স্টেজের প্রেগনাণ্ট

মেয়েমানুষের মতো হ্যা হ্যা করতে করতে আসছিল সেটা। কিন্তু এখন মোটে তিনটে বগি নিয়ে লাইনের ওপর দিয়ে ঝড় তুলে উড়ে যাচ্ছে।

দুর্দান্ত স্পীড তোলার কারণও রয়েছে। পেরেরা বলেছে ন'টা সওয়া ন'টায় উল্টো দিক থেকে একটা ট্রেন আসবে। সেটার সঙ্গে ক্রসিং হবার আগেই ফার্স্ট লাইনে গিয়ে কোল মাইনের দিকে চলে যেতে হবে।

মিনিট পনেরো দারুণ জোরে চালাবার পর স্পীড কমিয়ে আনল পরমেশ্বর। কেন না এবার তাকে পাশের লাইনে যেতে হবে।

মিনিট দুই তিন আস্তে আস্তে যাবার পর সেকেণ্ড লাইন থেকে ফার্স্ট লাইনে যাবার জন্য কোণাকুণি একটা ছোট লাইন চোখে পড়ল। কিন্তু এমনিতে ফার্স্ট লাইনে যাবার উপায় নেই। কেননা কনট্রোল কেবিন থেকে পুলি টেনে ছোট লাইনটা যতক্ষণ না ফাঁক করে দিচ্ছে ততক্ষণ সেকেণ্ড লাইন দিয়েই যেতে হবে। কিন্তু কখন কনট্রোল কেবিনের মাকড়ারা পুলি টানবে, সেই আশায় বসে থাকলে অপারেশনটা কিছুতেই করা যায় না।

ইঞ্জিনটা ডেড স্টপ করে সেই হ্যান্ডব্যাগটা নিয়ে নেমে পড়ল পরমেশ্বর। তারপর প্লাস আর রেঞ্জ দিয়ে লাইনের গায়ের বিরাট বিরাট স্ক্রু খুলে চ্যাপ্টা-মতো এক রডের চাড় দিয়ে লাইন ফাঁক করে ফেলল। তারও পর ইঞ্জিনটাকে তিনটে বগিসুদ্ধ ফার্স্ট লাইনে খানিকটা ঢুকিয়ে এনে স্ক্রুগুলো ফের আটকে রডের চাড়ে ছোট লাইনটাকে আবার জুড়ে দিল। এখন কোন ট্রেন সেকেণ্ড লাইন থেকে ফার্স্ট লাইনে আসতে পারবে না।

পরমেশ্বর দৌড়ে গিয়ে আবার ইঞ্জিনে উঠে স্টার্ট দিল। তারপর মিনিট কুড়ি-পঁচিশের ভেতর অপারেশনের জায়গায় চলে এল। আর তখনই দুটো ব্যাপার তার চোখে পড়ল। লোলে কোল মাইনের দিকে যাবার লাইন ফাঁক করে একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর অনেক দূরে একটা ট্রেন দেখা যাচ্ছে। ফার্স্ট লাইন দিয়ে সেটা গাঁক গাঁক করতে করতে দৌড়ে আসছে। পেরেরা এই ট্রেনটার কথা আগেই জানিয়েছিল।

মেইল ট্রেনটা পাঁচ মিনেটের ভেতর এখানে চলে আসবে। কাজেই আর দেরি করা চলবে না। প্রথমত, অ্যাকসিডেণ্টের ভয়। দ্বিতীয়ত, পরমেশ্বর চায় না তার কাজের কেউ উইটনেস থাকুক। মেইল ট্রেনের ড্রাইভার, গার্ড বা প্যাসেঞ্জাররা যেন দেখতে না পায় একটা ইঞ্জিন তিনটে বগি নিয়ে কোল মাইনের দিকে যাচ্ছে। পরমেশ্বর দ্রুত ইঞ্জিনটাকে কোল মাইনের রাস্তায় ঢুকিয়ে চিৎকার করে লোলেকে বলল, 'ঝটপট রড দিয়ে লাইনের মুখটা বন্ধ করে ইঞ্জিনে উঠে পড়।'

বলামাত্র লাইনটাকে আবার আগের মতো আটকে দিয়ে ইঞ্জিনে উঠল লোলে।

পরমেশ্বর এক মিনিটের মধ্যে গাড়িটাকে সামনের একটা ছোটখাটো পাহাড়ের আড়ালে নিয়ে গেল। এখন আর মেইন লাইন থেকে তাদের কেউ দেখতে পাবে না।

পাহাড়টার ওধার থেকে রেল লাইনটা সোজা কোল মাইনের গা ঘেঁষে নদীর দিকে চলে গেছে। সেদিকে যেতে যেতে টের পাওয়া গেল, মেইন লাইন দিয়ে গাঁক গাঁক করে মেল ট্রেনটা বেরিয়ে যাচ্ছে। এখানে আসতে কয়েক মিনিট দেরি হলে কী হতো ভাবা যায় না! পরমেশ্বর অবশ্য তা ভাবতেও চায় না।

পাশ থেকে লোলে বলল, 'গুরু তোমার মতো চীজ হোল লাইফে দেখি নি। কী করে মালগাড়ি থেকে ইঞ্জিন আর বগি তিনটে হাপিস করে নিয়ে এলে?'

পরমেশ্বর 'গুডস ট্রেন অপারেশনের' ফাইনাল স্টেজের কথা ভাবছিল। অন্যমনস্কর মতো বলল, 'পরে শুনিস।'

'শলা ভগবানের চাইতেও তোমার পাওয়ার বেশি গুরু।'

'বলছিস?'

'ইয়েস। এখন কী করবে?'

'একটু ওয়েট কর।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। অনেক দিনের মরচে-ধরা অকেজো রেল-লাইনের ওপর দিয়ে ঘষর ঘষর শব্দ করতে করতে ইঞ্জিনসুদ্ধ বগি তিনটে এগিয়ে যেতে লাগল।

একসময় পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের গাড়িটা কোথায় রেখেছিস?

লোলে বলল, 'ওধারের একটা পাহাড়ের পেছনে।'

'তোকে কেউ রেল লাইন ফাঁক করতে দেখেছে?'

'এ শলা'র জায়গায় কোন লোক আছে যে দেখবে! কাল রাত্তিরে এখানে এসেছি। তুমি আসার পর এই ফার্স্ট মানুষের থোবড়া দেখলাম। মাইরি গুরু, এমন জায়গায় পাঠিয়েছিলে, হোল নাইট ঘুমোতে পারি নি। গাড়ির কাঁচ তুলে চোখের পাতা ফাঁক করে বসে ছিলাম।'

'কেন রে?'

'ভয়ে গুরু, ভয়ে। কোথাও শলা মানুষ-ফানুষ নেই, লাইট নেই। অন্ধকারে চারদিকে সাপ-ফাপ ঘোরাঘুরি করছিল; বাচ্চা ছেলেরা যে রকম করে কাঁদে সেরকম আওয়াজ ছেড়ে কী যেন শলা পাখি ডাকছিল। শিয়ালেরা কত বার যে আমাকে দেখে গেছে! দু বার দুটো চিতা এসে গাড়ির বডি আঁচড়ে দিয়ে গেছে। হর্ন ঝেড়ে ঝেড়ে খজড়াগুলোকে ভাগিয়েছি।'

'রাতটা তা হলে ফাইন কাটিয়েছিস!' বলে পরমেশ্বর হাসতে লাগল।

লোলে বলল, 'আমাকে চিতার স্টমাকে ঢোকাবার তাল করে এখন তুমি হাসছ গুরু !'

পরমেশ্বর উত্তর দিল না।

কথায় কথায় ইঞ্জিনটা কোল মাইনের হাঁ-করা মুখটার কাছাকাছি চলে এসেছিল। এখান থেকে তিন-চার শো গজ দূরে সেই নদীটা। নদীর ওপারে পাহাড় ; পাহাড়ের গায়ে ঘন জঙ্গল। রেল লাইনের মাঝখানে এবং দু-ধারে যত দূর চোখ যায়, ঝোপ-ঝাড় আর আগাছা গজিয়ে উঠেছে। সে সবের মধ্যে এলোমেলো কয়লার চাঙড়া ছড়িয়ে আছে। দেখামাত্রই টের পাওয়া যায় এই পরিত্যক্ত জায়গায় বেশ কয়েক বছর মানুষজন আসে নি।

ইঞ্জিনের শব্দে চারদিকের গাছপালার মাথা থেকে হাজার হাজার পাখি হঠাৎ ভয় পেয়ে ডানা ঝাপটিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে।

পরমেশ্বর কিছুই দেখছিল না। এখন অপারেশনের ব্যাপারটা ফাইনাল স্টেজে এসে গেছে। নার্ভগুলো টান টান করে সে দেখল, ইঞ্জিনটা এইমাত্র কোল মাইনের মুখ পেরিয়ে গেল। এখান থেকে নদী দুশো গজের মধ্যে।

পরমেশ্বর গাড়ির স্পীড খানিকটা কমিয়ে লোলেকে বলল, 'নামতে পারবি ?'

লোলে বলল, 'কী বলছ মাইরি গুরু। যখন অন্যের পকেট থেকে মালকড়ি হাপিস করে নিজের পকেটে ঢোকাতাম তখন ডেইলি কলকাতার চালু ট্রাম-বাস থেকে পাঁচশো বার উঠতাম, নামতাম।' বলতে বলতে ইঞ্জিনের পা-দানি বেয়ে ঝট করে নেমে গেল সে।

একটু পর ইঞ্জিনটা চালু রেখে পরমেশ্বরও নেমে পড়ল। আর গাড়িটা নদীর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

লোলে চলন্ত ইঞ্জিনটা দেখতে দেখতে চিৎকার করে উঠল, 'গুরু, গাড়িতে উঠে এক্ষুণি ইঞ্জিনটা বন্ধ কর। নইলে নদীতে পড়ে যাবে।'

পরমেশ্বর আস্তে করে বলল, 'মুখে তালা ঝুলিয়ে চুপচাপ দেখে যা মাকড়া—'

লোলে আবার কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই হোল ওয়াল্ডকে চমকে দিয়ে প্রচণ্ড একটা শব্দ উঠল। ইঞ্জিনসুদ্ধু তিনটে বগি ততক্ষণে খাড়া পাড় থেকে আড়াইশো ফুট নিচে নদীতে গিয়ে পড়েছে।

ভূমিকম্পের মতো অনেকক্ষণ চারপাশের গাছপালা, পাহাড়, নদী এবং ফাঁকা কোল মাইন থরথরিয়ে কাঁপল। ঝাঁক ঝাঁক পাখি এই এরিয়া ছেড়ে পালিয়ে গেল। ওধারের জঙ্গল ফুঁড়ে অগুণতি হরিণ, খরগোশ, শজারু এবং অন্যান্য জন্তু-জানোয়ার চিৎকার করতে করতে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুতে লাগল।

অনেকটা সময় পর মাটির থরথরানি যখন থামল, পাখি এবং জন্তুদের চিৎকার

থিতিয়ে জঙ্গল, পাহাড় আর কোল মাইনের চারপাশ শান্ত হয়ে এল, সেই সময় পরমেশ্বর লোলেকে নিয়ে নদীর একেবারে ধারে চলে গেল। ঝুঁকে দেখল, ইঞ্জিন বা তিনটে বগির এক টুকরো লোহা বা কাঠও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। গভীর জলের তলায় সেগুলো ডুবে গেছে।

লোলে বলল, 'এটা কী হলো গুরু?'

পরমেশ্বর বলল, 'অপারেশন কমপ্লীট করলাম। ওয়ার্ল্ডের কোন মাকড়া ঐ ইঞ্জিন-ফিঞ্জিনের খবর পাবে না। দুনিয়া থেকে ঐ গাড়িটা স্রেফ ভ্যানিশ হয়ে গেল। চল্ শ্লা—'

আরো ঘণ্টাখানেক বাদে দেখা গেল, মেন লাইনের কাছাকাছি একটা ছোটখাটো পাহাড়ের আড়ালে সেই লিমুজিনটায় এসে উঠেছে পরমেশ্বর আর লোলে। এখান থেকে আধ মাইলের মতো একটা সমতল মাঠ পেরুতে পারলেই হাইওয়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যে পরমেশ্বররা হাইওয়েতে এসে উঠল। তেলতেলে মসৃণ রাস্তাটা বাঁ দিকে গেছে টাটানগরে, ডান দিকে কলকাতায়। ওরা কলকাতার দিকে গাড়ি ছোটালো।

কয়েক শো গজ যাবার পর আচমকা দেখা গেল উল্টোদিক থেকে একটা প্রাইভেট কার বাতাসে ঝড় তুলে উড়ে আসছে। গাড়িটা চালাচ্ছে একটি মেয়ে। তার চোখে বিরাট গো গো চশমা। মুখটা খুব চেনা চেনা লাগছে। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল পরমেশ্বর।

কাছাকাছি আসতেই পাশ থেকে লোলে চেঁচিয়ে উঠল, 'গুরু, তোমার সেই এইট এইটি ভোল্ট মাইরি।'

পরমেশ্বর এবার চিনে ফেলল। হেমা—হেমা সারিন। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল সে। এই নিয়ে তিনবার তিন জায়গায় হেমার সঙ্গে দেখা হল। একবার এয়ারপোর্টে, একবার হোটেলে, একবার এইখানে। যেখানেই কোন অপারেশনে যাচ্ছে সেখানেই মেয়েটা হাজির হচ্ছে। প্রথম দু বার খটকা লাগলেও তেমন কোন সন্দেহ হয় নি। মনে হয়েছিল, হয়ত নিজের কোন দরকারী কাজে সে-ও হোটেলে বা এয়ারপোর্টে গেছে। কিন্তু এখন সে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হয়ে গেল; মেয়েটা তাকে অনবরত 'ফলো' করে যাচ্ছে। সে কোথায় কোন্ অপারেশনে যাবে, আগে থেকে নিশ্চয়ই খবর পেয়ে যাচ্ছে হেমা। কিন্তু খবরটা তাকে দিচ্ছে কে? তা ছাড়া হেমা মেয়েটা আসলে কে? বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে গারমেণ্ট এক্সপোর্টের একটা বিজনেস আছে তার। ইণ্ডিয়ায় বিজনেস ওয়ার্ল্ডে যে ক'জন এণ্টারপ্রাইজিং মেয়ে

আছে, হেমা তাদের একজন। একটা বিরাট অফিসও খুলেছে সে। তেমন অফিস তো পরমেশ্বরেরও আছে। তবে কি তার অফিসের মতো হেমার অফিসও একটা ক্যামোফ্লাজ? সে যেমন রণজয় হালদারের লেবেল গায়ে সেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে তেমনি ঐ মেয়েটাও কি আর কারো মেক-আপ এবং নাম নিয়ে ঘুরছে? তার মতো হেমাও কি নকলী মাল? হেমা যে-ই হোক, কলকাতায় ফিরে এবার হেমার ব্যাপারটা উল্টেপাল্টে দেখতে হবে।

ধাঁ ধাঁ করে হেমার গাড়িটা পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। পরমেশ্বর রেলের মেকানিক আর লোলে সর্দারজীর মেকআপ নিয়ে আছে। মেয়েটা নিশ্চয়ই তাদের চিনতে পারে নি।



বিকেলে কলকাতায় ফিরে এল পরমেশ্বররা। "গ্রুডস ট্রেন অপারেশনের" পর হাইওয়ে দিয়ে আসতে আসতে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে ওরা দু'জন মেক-আপ তুলে আবার অরিজিন্যাল পরমেশ্বর আর অরিজিন্যাল লোলে হয়ে গিয়েছিল।

নর্থ ক্যালকাটার সাবার্বে এসে তাদের সেই বস্তির কাছাকাছি লোলেকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিল পরমেশ্বর। বলল, 'তুই বাড়ি চলে যা।'

লোলে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি যাবে না গুরু?'

'না। এক্ষুণি গিয়ে সোমেশ্বর মাকড়াকে "গুডস ট্রেন অপারেশনে"র রিপোর্ট দিতে হবে। তা ছাড়া আসল কাজ এখনও স্টার্ট করতে পারি নি। অমিতাভ সেনের কেসটা দু-চার দিনের ভেতর ফিনিশ করে ফেলতে হবে।' বলতে বলতে আচমকা কিছু মনে পড়ে গেল তার। বলল, 'ইন্টার-ভিউর চিঠি পেয়েছিস?'

'পেয়েছি গুরু।'

'আজ বেস্পতিবার। নেক্সট মানডে ইন্টারভিউ। স্কুলের আর ক্যারেক্টারের সার্টিফিকেট দুটো নিয়ে যাবি।'

'ও-কে গুরু।'

লোলে চলে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে ফেরাল পরমেশ্বর। 'আরেকটা কথা শুনে যা।'

লোলে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বল।'

'ইন্টারভিউতে মেক-আপ নিয়ে যাবি। এমন মেক-আপ নিবি যাতে পরে তোর থোবড়া দেখলে যেন কেউ চিনতে না পারে।'

কেমন করে মেক-আপ নিতে হয় লোলেকে তা শিখিয়ে দিয়েছে পরমেশ্বর।

এককালের থার্ড ক্লাস ছিঁচকে পকেটমারকে ভেঙেচুরে ঘষে-মেজে নিজের মতো করে ঢালাই করে নিয়েছে সে। ছোকরার সারা গায়ে এখন পরমেশ্বরের স্ট্যাম্প মারা। লোলে বলল, 'মেক-আপের ঝামেলায় ফেলতে চাইছ কেন গুরু?'

পরমেশ্বর লোলের থুতনিতে টুসকি মেরে বলল, 'অমিতাভ সেনের ফ্যাক্টরিতে ধম্মকম্ম করতে তো যাচ্ছ না। অপারেশনের পর যদি তোমাকে চিনতে পারে পিঠের চামড়া খুলে হাতে ধরিয়ে দেবে। বুঝেছ মাকড়া?'

'বুঝেছি গুরু। এখন বল, কী মেক-আপ নেব?'

'গেঁয়ো ইয়ং ম্যানের। চিরুনি দিয়ে চুল সামনের দিকে টেনে দিবি। সিঁথি কাটবি না। থুতনির কাছে জড়ুল বসিয়ে দিবি, নাকের তলায় ঝাঁটা গোঁফ। কপালে একটা কাটা দাগ থাকবে। পরবি ঘরে কাচা খাটো ধুতি আর ফুলশার্ট। শার্টের গলার বোতামটাও আটকে দিবি। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত মোজা চড়িয়ে বুট জুতো। মনে থাকবে?'

'থাকবে গুরু। তুমি যা বল কান দিয়ে বিলকুল সেফ ডিপোজিট ভল্টে ঢুকে যায়। ফির মিলেঙ্গে। বাই—।' লোলে আর দাঁড়াল না। বি. টি. রোড থেকে ডান দিকের একটা সরু রাস্তায় গিয়ে ঢুকল।

আরো ঘণ্টাখানেক পর পরমেশ্বর তার অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে চলে এল। নিচের তলায় লিমুজিনটা পার্ক করে লিফটে সোজা ফোরটীনথ ফ্লোরে এসে বেল টিপতেই ছোটি সিং দরজা খুলে দিল। পিকিনীজ কুকুরটাও দৌড়ে এসেছিল, লাফ দিয়ে পরমেশ্বরের কোলে উঠে তার হাত এবং গাল চাটতে চাটতে কুঁই কুঁই করে গলার ভেতর থেকে অদ্ভুত শব্দ করতে লাগল। ঝাড়া দু'দিন পর নিজের মাস্টারকে পেয়ে একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে জন্তুটা।

নরম লোমের গোছার ভেতর হাত ডুবিয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে আদর করতে করতে পরমেশ্বর ড্রইং রুমে চলে এল। আর ছোটি সিং কোন রকমে বাইরের দরজায় ছিটকিনি তুলে দৌড়ুতে দৌড়ুতে পরমেশ্বরের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'সাব, কাল রাতকো হামারা ফ্ল্যাটমে চোর ঘুষা থা।' তার চোখে-মুখে এবং গলার স্বরে দারুণ উত্তেজনা।

ভুরু কুঁচকে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায় ছিলে?'

'ফ্ল্যাটমেই থা। লেকেন পাকড়ানে নেহী সাকা, শালে ভাগ গিয়া।'

'রাতে দরজা বন্ধ করে ঘুমোস নি?'

'জী।'

'তবে ঢুকল কী করে?'

'আপকো বেডরুমকে খিড়কিয়া তোড়কে ঘুষা।'

পরমেশ্বর কিছুটা চমকে উঠল। 'আমার শোবার ঘরের জানলা ভেঙে—'

ছোটি সিং ঘাড় কাত করল, 'জী।'

'চল তো, দেখি।'

বেডরুমে এসে পরমেশ্বর দেখল, সত্যি সত্যিই একটা জানলার গ্রিল কেটে কেউ ঢাউস গর্ত করেছে। সেই ফোকর দিয়ে যে কোন লোক ঢুকে পড়তে পারে।

বেডরুমের পাশ দিয়ে সরু একটু প্যাসেজ চলে গেছে। খুব সহজেই বাইরে থেকে ধারালো করাত-ফরাত দিয়ে গ্রিল কাটা যায়। কিন্তু এখানে চোর কেন ঢুকবে? পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'কিছু চুরি-ফুরি গেছে?'

ছোটি সিং বলল, 'নেহী জী। চোরি করার আগেই আমার নিদ ছুটে গেল। আর চোর ঝটাকসে ভেগে গেল। তবু—'

'কী?'

'চোর আপনার বেডরুম, বাথরুম আর ড্রইংরুমে ঢুকে সব কিছু ওলট-পালট করেছে।'

ব্রেনের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রিসিটি খেলে গেল পরমেশ্বরের। বাথরুমের শাওয়ারের মাথায় আর ড্রইংরুমের ডিভানের পায়ার গোপন গর্তে দেয়ালের ভেতরকার সিক্রেট আলমারির দুটো চাবি রয়েছে। চোর সেই খোঁজে আসে নি তো? দৌড়ে প্রথমে বাথরুমে চলে গেল সে। দেখল, শাওয়ারের মাথাটা আগের মতোই রয়েছে। তার মানে এখান থেকে চাবিটা বার করতে পারে নি চোরটা। এবার পরমেশ্বর এল ড্রইংরুমে। একটু আগেও সে এখানে ছিল। তখন লক্ষ্য করে নি, এবার দেখল দুটো সোফা এবং ডিভানের কভার কাটা রয়েছে। চোর ভেবেছিল, ওগুলোর ফোমের গদির ভেতর কিছু আছে এবং খোঁজাখুঁজি করেছে। চোখ কুঁচকে একটু ভাবতেই মনে হল, নিশ্চয়ই চোর সেই চাবি দুটোর জন্য হানা দিয়েছিল।

চাবির কথা ভাবতেই রণজয় হালদারের নামে সুইস ব্যাঙ্কের সেই ডকুমেণ্টগুলোর কথা খেয়াল হলো পরমেশ্বরের। নিশ্চয়ই চোরের উদ্দেশ্য ছিল সেই ডকুমেণ্টগুলো হাতিয়ে নিয়ে যাওয়া। ডকুমেণ্ট এবং চাবি দুটো ঠিকঠাক আছে কিনা সেটা একবার দেখা দরকার। কিন্তু ছোটি সিংয়ের সামনে চাবি বার করে দেওয়ালের গোপন আলমারি খোলা ঠিক হবে না। রাত্রে এক সময় দেখে নিতে হবে।

চোর জোর চান্স নিয়েছে। পরমেশ্বর যখন 'গুডস ট্রেন অপারেশনে টাটানগরে, সেই সময় সে হানা দিয়েছিল।

একটা কথা কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না, রণজয় হালদারের নামে ওই ডকুমেণ্টগুলো চোর কেন হাতাতে চায়? তার উদ্দেশ্যই বা কী? মোটামুটি সে চাবি এবং সিক্রেট আলমারির খবর পেয়েই কাল হানা দিয়েছিল। এই খবরটা সে পেল কী করে? শ্লা, ব্যাপারটা কেমন যেন ঝামেলা পাকিয়ে যাচ্ছে। পরে এ নিয়ে চিন্তা-ফিন্তা করে দেখতে হবে। এখন সোমেশ্বরকে একবার ফোন করা দরকার। মাকড়া নিশ্চয়ই তার জন্য দম আটকে বসে আছে।

ছোটি সিংকে কিচেনে পাঠিয়ে ড্রইংরুম থেকে স্ট্রেট বেডরুমে চলে এল পরমেশ্বর। তাদের কথাবার্তা আর কেউ শুনুক এটা সে চায় না।

একবার অ্যাটেমপ্টেই সোমেশ্বরকে পাওয়া গেল। পরমেশ্বর বলল, 'স্যার, আপনার গুডস ট্রেন অপারেশন সাকসেসফুল।'

সোমেশ্বর টেরিফিক উচ্ছ্বাসের গলায় বললেন, 'ওয়ান লাখ কনগ্র্যাচুলেশনস। রিয়ালি তোমার মতো জিনিয়াস ওয়ার্ল্ডে জন্মায় নি।' একটু থেমে বললেন, 'দুপুরেই খবর পেয়েছিলাম, ওষুধের বগি তিনটে নিয়ে কে যেন ইঞ্জিন চালিয়ে উধাও হয়ে গেছে। তখনই বুঝেছিলাম, এই সূক্ষ্ম হাতের কাজ ডেফিনিটলি আমাদের পরমেশ্বরের ছাড়া আর কারো হতে পারে না।'

পরমেশ্বরের ভুরু কুঁচকে গেল, 'স্যার, আমার পেছনে স্পাই ফিট করে দিয়েছিলেন নাকি?'

সোমেশ্বর যেন চমকে উঠলেন, 'আরে না না, প্লীজ, অন্যভাবে ভেবো না। একটা লোক ঠিকই লাগিয়েছিলাম, স্পাইগিরি করার জন্যে না।'

রুক্ষ কর্কশ গলায় পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে কিসের জন্যে?'

'তুমি যে কাজে গিয়েছিলে তাতে দারুণ রিস্ক ছিল। যদি কোন বিপদ-টিপদ ঘটে যায়, তা হলে লোকটা তোমাকে হেল্প করত। তেমন বুঝলে আমাকে খবর দেবার ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিলাম। তুমি ভুল বুঝো না কিন্তু।'

সোমেশ্বর নামে এই মালখানাকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মাকড়া তার পেছনে লোক ফিট করার যা কৈফিয়ত দিল, তাতে কিছু বলাও যায় না, আবার তার সম্বন্ধে পুরোপুরি সন্দেহটাও কাটে না।

সোমেশ্বর আবার বললেন, 'কী, হল, কথা বলছ না যে? রাগ করেছ?'

পরমেশ্বর আস্তে করে বলল, 'না।'

একটু চুপ করে থেকে কী ভেবে সোমেশ্বর একবার বললেন, 'একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারি নি।'

'কী ?'

'যে লোকটাকে তোমার হেল্পের জন্যে লাগিয়েছিলাম, সে তিনটে বগি নিয়ে তোমার উধাও হবার খবর পর্যন্ত পেয়েছে। তারপর তোমার অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে কিছু বলতে পারে নি। কী করলে বগি তিনটে নিয়ে ?'

'ওয়াল্ড থেকে হাপিস করে দিয়েছি।'

'কোথায় কী করলে একটু বল না। দারুণ কিউরিওসিটি হচ্ছে।'

'ওটা বলা যাবে না স্যার ; ওটা আমার ট্রেড সিক্রেট। তবে—'

'কী ?'

'একটা কথা আপনাকে বলতে পারি। বগি তিনটেকে এমন জায়গায় হাপিস করে দিয়েছি, যেখান থেকে হোল ইণ্ডিয়ার যত ডিটেকটিভ-ফিটেকটিভ আছে, তাদের সেগুলো খুঁজে বার করতে দুশো বছর লেগে যাবে। তদ্দিনে আপনি আমি কেউ এই ওয়াল্ডে থাকব না।'

সোমেশ্বর বললেন, 'বিজনেস সিক্রেট যখন ভাঙবে না তখন জোর করব না। তবে ওষুধের বগিগুলো ভ্যানিশ করে দিয়ে আমার যা উপকার করেছ, তার জন্যে আরো এক লাখ কনগ্র্যাচুলেশনস।'

'স্যার, শুকনো কনগ্র্যাচুলেশনে কাজ হবে না।'

'আরে না না ; কী করতে হবে আমি জানি। যদিও তোমার জিনিয়াসের দাম দেওয়া যায় না, তবু কালই একখানা ব্ল্যাঙ্ক চেক পাঠিয়ে দেব ; দশ লাখ টাকার মধ্যে যে ফিগার ইচ্ছা বসিয়ে নিও।'

'আমি স্যার নকল দু' নম্বর মাল হিসেবে আপনার কনট্রাক্ট নিয়েছি। এক নম্বর হোয়াইট টাকা নিয়ে আমার কারবার নেই। ব্যাগ বোঝাই করে নাম্বার টুতে দশ লাখ পরে পাঠিয়ে দেবেন।'

'অলরাইট।' বলে একটু থামলেন সোমেশ্বর। দু চার সেকেণ্ড পর ফের বললেন, 'এ কাজটা হল। এবার আসল ব্যাপারটা স্টার্ট করে দাও। অমিতাভর অপারেশনটা কবে শুরু করছ ?'

'নেক্সট মানডে থেকে।'

'ফাইন। তোমার সামনাসামনি বসে অন্য একটা ব্যাপারে কথা হওয়া দরকার। কবে দেখা হচ্ছে ?'

'আপনি যেদিন বলবেন। তবে স্যার অন্য ফালতু কনট্রাক্ট-ফনট্রাক্ট এখন দেবেন না। তা হলে আসল কাজ লেট হয়ে যাবে। তা ছাড়া আরো একটা ব্যাপার আছে—'

'কী ?'

'অমিতাভ সেনের কাজটা কমপ্লীট হয়ে যাবার পর আমাকে

রিলিজ করে দিতে হবে। অন্য ক্লায়েন্টরা লাইন দিয়ে আমার জন্যে ওয়েট করছে।'

'রিলিজ-টিলিজের কথা মাথা থেকে বার করে দাও। কাল সকালের দিকে, ধরো অ্যাট অ্যাবাউট ইলেভেন, আমার অফিসে একবার এসো। আচ্ছা, গুড নাইট।'

'গুড নাইট' বলতে গিয়ে আচমকা সেই কথাটা মনে পড়ে গেল পরমেশ্বরের। দারুণ ব্যস্তভাবে সে বলল, 'স্যার, একটা ব্যাড নিউজ আছে।'

'কিসের ব্যাড নিউজ?' সোমেশ্বর দস্তুরমতো অবাকই হলেন।

'আমাদের পেছনে কোন খচড়া লেগেছে।'

'কি রকম?'

ফ্ল্যাটে ঢোকার ব্যাপারটা বলল পরমেশ্বর।

শুনতে শুনতে চমকে উঠলেন সোমেশ্বর, 'রণজয় হালদারের নামে ডকুমেণ্টগুলো খোয়া গেছে নাকি?'

'আমার মনে হচ্ছে, যায় নি। তবে রাত্তিরে আপনার সিক্রেট আলমারি খুলে একবার দেখব।'

সোমেশ্বর বললেন, 'এ তো খুব চিন্তার ব্যাপার হলো। সুইস ব্যাঙ্কের ডকুমেণ্ট আর দেয়ালের সিক্রেট আলমারির খবর চোর জানল কী করে? তুমি, আমি আর পীরভয় ছাড়া এ ব্যাপার তো অন্য কেউ জানে না।'

পরমেশ্বর বলল, 'আমারও তো সেই একই কথা। আমার ডাউট, আপনার-আমার মধ্যে ফোনে যে কথাবার্তা হয় তা যেভাবেই হোক বাইরে লীক হচ্ছে।'

'তুমি আমাকে এ কথা আগেও দু-একবার বলেছ। কিন্তু আমার দিক থেকে লীক হবার কোন উপায়ই নেই। তোমার সঙ্গে যখন কথা বলি, তখন আশেপাশে কাউকে থাকতে দিই না। তোমার ওদিক থেকে কোন গোলমাল হচ্ছে কিনা একটু মার্ক করো।'

'স্যার, এটা আমার প্রোফেসান। আপনাকে গ্যারাণ্টি দিতে পারি আমার দিক থেকে লীক হবে না।'

'আমি জানি, আমি জানি। তবু আমাদের আরো কেয়ারফুল হতে হবে। কোথা দিয়ে আমাদের কথাবার্তা বাইরের লোক জানছে, সেটা খুঁজে বার করতেই হবে।'

'ঘাবড়াবেন না স্যার। আমার ওপর ছেড়ে দিন; খুঁজে আমি বার করবই।'

'কী করে? কিছু ভেবেছ?'

'এখনও ভেবে উঠতে পারি নি। তবে ব্রেনে একটা কিছু ঠিক এসে যাবে। চোর শলা একবার যখন এসেছে তখন ডকুমেণ্টগুলোর জন্যে ডেফিনিটলি আবার হানা দেবে। ওকে ক্যাঁচাকলে ফেলে দিতে হবে।'

সোমেশ্বর চাপা ভীত গলায় এবার বললেন, 'সুইস ব্যাঙ্কের ঐ পেপারগুলো কোনরকমে যদি সি-বি-আই-এর হাতে যায়, আমি ফিনিশড হয়ে যাব পরমেশ্বর। ওগুলো তুমি অন্য কোন জায়গায় সরিয়ে ফেল।'

পরমেশ্বর বলল, 'ও ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। প্রমিজ করছি, আপনার ডকুমেণ্ট কোন শলা সরাতে পারবে না; আর চোরকে আমি ফাঁদে ফেলবই। মাকড়া কার সঙ্গে রংবাজি করতে এসেছে জানে না।'

'তোমার ওপর ভরসা করে তা হলে রইলাম ভাই। গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

টেলিফোন নামিয়ে রেখে জুতোসুদ্ধু টানটান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল পরমেশ্বর। শুয়ে শুয়ে ভাবল, এখন পর পর দু'জনের খবর নিতে হবে। হেমা সারিন এবং অমিতাভ সেন। হেমা যে কলকাতায় নেই সেটা সে ভালো করেই জানে। কবে সে ফিরে আসবে সেটা তার ফ্ল্যাটে ফোন করে জেনে নিতে হবে। ভাবতে ভাবতেই হাত বাড়িয়ে ডায়াল করতে লাগল পরমেশ্বর। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তিরিশ ফুট ওপরে হেমার ফ্ল্যাটে টেলিফোন বেজে উঠল। হেমার বেয়ারা ফোন ধরে 'হ্যালো' বলতেই পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'মিস সারিন আছেন?'

বেয়ারাটা জানালো, 'নেহী জী, মেমসাব কলকাত্তাকা বাহার গিয়া।'

'কবে ফিরবেন?'

'কাল সুবে।'

'ঠিক আছে।'

'আপ কৌন সাব? মেমসাবকো আপকো শুভনাম ক্যা বাতাউঙ্গা?'

'কিচ্ছু বলতে হবে না। আমি মেমসাবের দোস্ত। পরে ওঁকে ফোন করব।' বলেই লাইন কেটে দিল পরমেশ্বর। হেমা ফিরে এলে তাকে একটু টোকা মেরে দেখতে হবে।

এই সময় দরজার বাইরে থেকে ছোটি সিংয়ের গলা শোনা গেল, 'সাহাব—'

দরজা বন্ধ করে টেলিফোনে কথা বলছিল পরমেশ্বর। এভাবে কথা বললে বাইরে থেকে শোনা যায় না। তবু ভেতরে ভেতরে কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়ল সে। ছোটি সিং কি দরজায় কান চেপে তার কথা শুনছিল? একমুহূর্ত চিন্তা করল পরমেশ্বর। পিকিনীজ কুকুরটা বুকের ওপর তুলোর

বলের মতো পড়েছিল। সেটাকে একধারে সরিয়ে আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে দরজা খুলল। দেখল, ছোটি সিং বিউটিফুল জাপানী ট্রের ওপর দামী স্ক্যান্ডিনেভিয়ান প্লেটে দশটা মাটির খোরায় সোনার বাংলা আর চাট হিসেবে কাজু বাদাম, পাঁপড় আর মাংসের গুলি কাবাব সাজিয়ে নিয়ে এসেছে।

বলার কিছু নেই। কেননা পরমেশ্বর আগে থেকেই অর্ডার দিয়ে রেখেছে, এই সময়টা সে যদি ফ্ল্যাটে থাকে, তাকে যেন ধান্যেশ্বরী সার্ভ করা হয়। ছোটি সিংয়ের পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত পুরোটা একবার সার্ভে করে নিল পরমেশ্বর। সত্যিই এই শিখ বেয়ারাটা লুকিয়ে-চুরিয়ে তার কথা শুনেছে কিনা, মুখচোখ দেখে তা টের পাবার উপায় নেই। সে বলল, 'অন্দর আও।'

বাংলা মাল টেবিলে রেখে ছোটি সিং চলে গেল। ছোকরাকে একেবারে সন্দেহের বাইরে রাখা যাচ্ছে না। খজড়াটা একেবারে নিষ্কাম ব্রহ্মার মতো মুখ করে থাকলে কী হবে, পেটের ভেতর তার স্ক্রুর মতো প্যাঁচ রয়েছে কিনা কে জানে। অবশ্য সে চোরের খবরটা দিয়েছে। সেটা ক্যামোফ্লাজ কিনা কে বলবে। নিজের ঘাড়ে যাতে ঝামেলাটা না চাপে, যাতে পরমেশ্বরের সন্দেহ অন্যদিকে ঘুরে যায়, সেজন্য এর মাঝখানে একটা চোর ঢুকিয়েও দিতে পারে ছোটি সিং। মাকড়ার ওপর এখন থেকে নজর রাখতে হবে।

ছোটি সিং চলে যাবার পর চাট দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে সোনার বাংলা খেতে লাগল পরমেশ্বর। পাঁচ খোরা 'ফিনিশ' হয়ে যাবার পর আবার ডায়াল করল পরমেশ্বর। এবার তার উদ্দেশ্য অমিতাভকে ধরা।

'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজে' ফোন করে অমিতাভকে পাওয়া গেল না। সে বেরিয়ে গেছে।

ভুরু কুঁচকে একটু ভাবল পরমেশ্বর। অফিস থেকে বেরুলে তিনটে জায়গায় অমিতাভকে পাওয়া যেতে পারে। দুটো 'পশ' ক্লাবে, নইলে সাউথ ক্যালকাটায় সুনেত্রাদের বাড়িতে। অবশ্য সুনেত্রাকে নিয়ে সে যদি কোথাও বেড়াতে বেরোয়, তা হলে ধরা যাবে না।

পরমেশ্বর এবার 'ডে অ্যাণ্ড নাইট ক্লাবে' ফোন করল। অমিতাভ সেখানে যায় নি। লাইন কেটে দিয়ে 'ওরিয়েণ্টাল ক্লাবে' ডায়াল করতেই রিসেপশান থেকে খবর নিয়ে জানলো অমিতাভ ওখানে আছে।

পরমেশ্বর বলল, 'দয়া করে মিস্টার সেনকে একবার ডেকে দেবেন? বলুন রণজয় হালদার কথা বলতে চায়।'

একটু পর অমিতাভ এসে ফোন ধরল। বলল, 'আ রে, আপনি ফিরে এসেছেন! বলে গিয়েছিলেন শুক্রবার ফিরবেন?'

'বলেছিলাম বেস্পতিবার কাজ না চুকলে শুক্রবার ফিরব। আজই কাজটা হয়ে গেল, আর থেকে কী করব?'

'ফাইন। কোথেকে কথা বলছেন?'

'আমার ফ্ল্যাট থেকে।'

'চলে আসুন, চলে আসুন। এখন ঘরে বসে থাকার কোনো মানে হয়!'

'প্লীজ, আজ ক্ষমা করে দিন। এক্সট্রিমলি টায়ার্ড। এখন বিছানায় বডি ফেলতে না পারলে স্রেফ মরে যাব।'

'কিন্তু আপনার সঙ্গে অনেক জরুরী কথা রয়েছে যে।'

'কী কথা?'

'দিল্লী থেকে সেই কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিটার ব্যাপারে আরো ডিটেলে জানতে চেয়েছে। ওদের চিঠির ধরন দেখে মনে হচ্ছে, এ-রকম একটা ফ্যাক্টরি বসাতে দিতে ওদের আপত্তি নেই। আপত্তি কি বলছি, রীতিমতো উৎসাহই আছে। ডিটেলটা পেলেই ওরা লেটার অফ ইনটেণ্ট দিয়ে দেবে।'

'ঠিক আছে, ডিটেল দেব।'

'এক উইকের ভেতর ওটা দিতে হবে।'

'এক উইকের ভেতরই দেব।'

'থ্যাঙ্কস। আরেকটা কথা, ইলেকট্রনিকস ডিভিসনে ক্লাস ফোর স্টাফের জন্য দু হাজার অ্যাপ্লিকেশন এসেছে। ওদের ইণ্টারভিউর অ্যারেঞ্জমেণ্ট করতে হবে। লোকের অভাবে ওখানে খুব অসুবিধে হচ্ছে।'

'সোমবারে ইণ্টারভিউ আর রিক্রুটমেণ্ট কমপ্লীট করে ফেলব।'

'তা কী করে সম্ভব? স্ক্রিনিং করে ইণ্টারভিউর জন্য লোক ডাকতে হবে। তারপর ইণ্টারভিউ, ইণ্টারভিউর পর তবে তো রিক্রুটমেণ্টের প্রশ্ন।'

লাইফে কোনদিন কি অফিস-টফিস চালিয়েছে যে ইণ্টারভিউ বা রিক্রুটমেণ্ট-ফিক্রুটমেণ্টের ফ্যাঁকড়ার ব্যাপার জানবে? সত্যিই তো, দু হাজার অ্যাপ্লিকেশন ঝাড়াই বাছাই করে জন পঞ্চাশেককে ইণ্টারভিউতে ডাকতে হবে। তাদের মধ্যে থেকে ফিফটি পারসেণ্ট ছাঁটাই করে পঁচিশ জনকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিতে হবে। পঞ্চাশ জনকে চিঠি পাঠিয়ে ডাকতেও তিন-চার দিন লেগে যাবে। কাজেই এখন পুরো একটা উইক না পেলে সব কাজ গুটিয়ে তোলা যাবে না। পরমেশ্বর বলল, 'কাল থেকে সাত দিনের ভেতর আপনার সব কাজ ফিনিশ করে দেব। ওনলি সাতটা দিন আমাকে দিন।'

'ঠিক আছে। ও ভালো কথা, সুনেত্রা আপনার কথা খুব বলছিল।'

'কেমন আছেন মিসেস সেন?'

'এখনও উনি মিসেস বা সেন কোনটাই হন নি!'

'এক মাসের ভেতরেই তো হতে যাচ্ছেন। আমি একটু অ্যাডভান্সই বলে ফেললাম।'

'ঠিক আছে, থ্যাঙ্ক ইউ। সুনেত্রা আপনাকে ওদের বাড়ি যেতে বলেছে।'

সুনেত্রার কথা উঠলেই ব্যাকগ্রাউণ্ডে তার পুলিস অফিসার ফাদার মণিমোহনের মুখটা ধাঁ করে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মণিমোহনকে মাইনাস করে সুনেত্রার কোম্পানি ভালই লাগে। চিরতা খাওয়া গলায় পরমেশ্বর বলল, 'আচ্ছা যাব।'

একটু চুপ করে থেকে অমিতাভ বলল, 'কাল দুপুরের দিকে কী করছেন?'

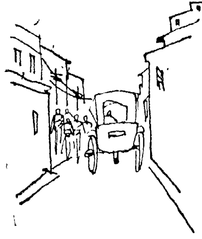
'কেন বলুন তো? কিছু দরকার আছে?'

'হ্যাঁ। দয়া করে যদি একবার আমাদের অফিসে আসেন ভালো হয়। দিল্লী থেকে যে চিঠিটা এসেছে সেটা দেখতাম। আর ইণ্টারভিউর জন্য যে সব অ্যাপ্লিকেশন এসেছে, সেগুলো স্ক্রিন করে কালই যদি ক্যাণ্ডিডেটদের কাছে পাঠানো যায়, খুব ভালো হয়। নইলে বিকেলে রোজ যেমন আসেন তেমন এলে কালকের ডাক ধরা যাবে না। পোস্ট করতে করতে পরশু হয়ে যাবে।'

পরমেশ্বর বলল, 'রাইট। কাল দুপুরে বারোটা নাগাদ আমি আপনার ওখানে যাচ্ছি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর দেয়ালের গোপন আলমারি খুলে পরমেশ্বর দেখল, সুইস ব্যাঙ্কের সিক্রেট ডকুমেণ্টগুলো চুরি হয় নি।



পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙল টেলিফোনের আওয়াজে। ঝনঝন করে সেটা বেজে যাচ্ছিল।

চোখমুখ কুঁচকে দারুণ বিরক্তভাবে ফোনটার দিকে তাকালো পরমেশ্বর। তারপর চাপা গলায় একটা দুর্ধর্ষ খিস্তি দিয়ে ফোনটা তুলে কর্কশ গলায় বলল, 'হ্যালো'—

ওধার থেকে হেমার গলা ভেসে এলো, 'গুড মর্নিং মিস্টার হালদার।'

নার্ভগুলো এক সেকেণ্ডে টানটান হয়ে গেল পরমেশ্বরের। মেয়েটা তা হলে টাটানগরের দিক থেকে ফিরে এসেছে। সে বলল, 'গুড মর্নিং।'

'আমি বোধ হয় আপনার ঘুমটা ভাঙিয়ে বিরক্ত করলাম।'

এই সকালবেলায় নিশ্চয়ই চুলকে গল্প করার জন্য তার ঘুম ভাঙায় নি হেমা। নিশ্চয়ই তার অন্য কোন ধান্দা রয়েছে। হেমাকে টোকা মেরে দেখার কথা কালই ভেবে রেখেছিল পরমেশ্বর। ভালোই হল, ছুকরী ফোন করেছে। নইলে খানিকক্ষণ বাদে সে নিজেই ডায়াল করে তার খবর নিত।

পরমেশ্বর গলায় মাখন লাগিয়ে বলল, 'আরে না-না, সক্কালবেলা আপনার মতো হেলেন অফ ট্রয়দের মুখ দেখলে কি গলা শুনলে পুণ্যি হয়। বলুন, কেমন আছেন মেমসাহাব?'

'ফাইন। আপনি?'

'একসেলেণ্ট।'

'কলকাতার বাইরে থেকে কবে ফিরলেন?'

পরমেশ্বর ভাবল, তার বাইরে যাবার খবর নিশ্চয়ই জানে হেমা। সে বলল, 'কাল বিকেলের দিকে।'

হেমা জিজ্ঞেস করল, 'কত দূর গিয়েছিলেন?'

হেমাকে একটু খেলাতে চাইল পরমেশ্বর। খেলাতে খেলাতে যদি তার

কাছ থেকে হুট করে কিছু বেরিয়ে পড়ে। সে বলল, 'কাছাকাছিই, এই কালিম্পং-এ।'

'কালিম্পং!'

হেমা কি কোন রকম সন্দেহ করল? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পরমেশ্বর বলল, 'হ্যাঁ।'

'ওখানকার ওয়েদার কেমন?'

'ফেয়ারলি গুড।'

'যে কাজে ওখানে গিয়েছিলেন তা সাকসেসফুল হল?'

'সিওর। কোন কাজে হাত দিলে সাকসেসফুল না হয়ে আমি ফিরি না।'

'নিজের ওপর আপনার দুর্দান্ত কনফিডেন্স দেখছি।'

'তা বলতে পারেন। এখন বলুন আপনি কলকাতায় কবে ফিরলেন?'

'আমি কলকাতার বাইরে গিয়েছিলাম, আপনাকে কে বলল?'

'আপনার বেয়ারা।'

'ও, ফোন করেছিলেন? হঠাৎ একটা দরকারে বাইরে যেতে হয়েছিল। কাল অনেক রাত্তিরে ফিরেছি।'

'কতদূর গিয়েছিলেন?'

'ওড়িশায়; ভুবনেশ্বর—'

মনে মনে পরমেশ্বর ভাবল, আচ্ছা, তুমিও তা হলে খেল কা ময়দানে নেমে পড়েছ! তুমি কত বড় খলিফা মাল, একবার দেখতে হবে। কাল দুপুর এগারোটায় আমি আর আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট লোলে দু'জনে চার-চারটে চোখ দিয়ে তোমাকে টাটানগরের কাছে দেখলাম। আর কয়েক ঘণ্টা বাদে আজ শলা তুমি টাটানগরকে ভুবনেশ্বর বানিয়ে দিচ্ছ? ঠিক আছে বাবা, তাই বানিয়ে যাও। টাটানগরকে ভুবনেশ্বর বানিয়েছ, কলকাতাকে বুয়েনস য়ার্স বানাও বোম্বাইকে সিঙ্গাপুর, দিল্লীকে কায়রো। লড়ে যাও চাঁদ, দেখব, কত ভেলকি দেখাতে পারো।

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'ভুবনেশ্বরে কোন কাজে গিয়েছিলেন?'

হেমা বলল, 'হ্যাঁ।'

'সাকসেসফুল?'

'খানিকটা। তবে পুরোপুরি সাকসেসফুল আমি হবোই।'

'আমার মতোই নিজের ওপর আপনার দেখছি টেরিফিক কনফিডেন্স।'

হেমার হাসির আওয়াজ টেলিফোনের ভেতর দিয়ে ভেসে এল, 'তা বলতে পারেন।'

পরমেশ্বর বলল, 'আপনার কোন কাজের ব্যাপারে আমাকে যদি দরকার

হয়, বলবেন। আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যাট ইওর সারভিস।'

হেমার গলার স্বর ঝপ করে অনেকখানি নেমে গেল, তার কথা চাপা ফিসফিসানির মতো শোনাতে লাগল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ। একটা ব্যাপারে আপনাকে আমার খুবই দরকার হবে।'

'আমি সেই দরকারের জন্য ওয়েট করব।' বলেই গলার স্বরটা কমপ্লীটলি অন্য রকম করে পরমেশ্বর বলল, 'জানেন, আমি একটা ঝামেলায় পড়ে গেছি।'

'কী?'

'আমি যখন ছিলাম না তখন আমার ফ্ল্যাটে চোর ঢুকেছিল।'

উদ্বেগের গলায় হেমা জানতে চাইল, 'কিছু চুরি-টুরি হয় নি তো?'

পরমেশ্বর বলল, 'বোধহয় না।'

'পুলিসে একটা ডায়েরি-টায়েরি করে রাখুন।'

থানা-পুলিস ইত্যাদি ব্যাপারে পরমেশ্বরের দারুণ অ্যালার্জি। কিন্তু তা তো হেমাকে বলা যায় না। সে বলল, 'তাই করব ভাবছি।'

হেমা বলল, 'সেই কুকুরটার দিক থেকে কমপ্লেন নেই তো?'

'একেবারেই না। আমার টেরিফিক পেট হয়ে গেছে।'

'ওর স্নানের টাইম হয়ে এসেছে। পরশু দিন ওকে ওয়াশ করে আবার দিয়ে আসব।'

পরমেশ্বর জানে, আপত্তি করে কোন লাভ নেই। বলল, 'আচ্ছা।'

'এখন ছাড়ছি। আমাকে একটু তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে।'

'ও-কে।'

ক্রেডেলে ফোনটা রাখার পর আবার শুয়ে পড়ল পরমেশ্বর। পিকিনীজ কুকুরটা তার গায়ের চামড়ার সঙ্গে লেপটে পড়ে রইল।

শুয়ে শুয়ে চোখের ওপর আড়াআড়ি হাত রেখে হেমার কথাই ভাবতে লাগল পরমেশ্বর। এই ভলাপচুয়াস ইয়াং গার্লটিকে একেবারেই বোঝা যাচ্ছে না। গারমেণ্ট একপোর্টের একটা বিজনেস তার ঠিকই; চটকদার একটা অফিসও সে খুলেছে। কিন্তু এসব তার নিজের 'ওভারসীজ ইমপোর্ট অ্যাণ্ড এক্সপোর্টের' মতো নকল ফোর টোয়েণ্টি ব্যাপার কিনা কে জানে।

পরমেশ্বরের ভাবনাটা হেমার দিক থেকে চুরির ব্যাপারে ঘুরে গেল। চোর যখন একবার সুইস ব্যাঙ্কের ডকুমেণ্টগুলোর খোঁজে হানা দিয়েছে, তখন নিশ্চয়ই আবার আসবে! যে চোর টাকাপয়সা বা অন্য দামী জিনিস ছোঁয় না, যার টার্গেট হলো সিক্রেট পেপারগুলো, সে খুব সোজা মাল না। তাকে ফাঁদে ফেলতে হলে আগে থেকে দুর্দান্ত একটা প্ল্যান করে নিতে হবে।

প্ল্যানটা ঠিক করে নিতে নিতে দশটা বেজে গেল। তখন বিছানা থেকে উঠে বাথরুমে চলে গেল সে।

চান-খাওয়া ইত্যাদি চুকিয়ে কাঁটায় কাঁটায় এগারোটায় সোমেশ্বরের অফিসে পেঁছে গেল পরমেশ্বর। সোমেশ্বর তার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। বললেন, 'এসো, এসো।' সে বসবার পর বললেন, 'আজকের নিউজপেপার দেখেছ?'

সারা সকাল হেমার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে পরমেশ্বর। তারপর চোরের ব্যাপারে প্ল্যান করতে করতে দশটা বাজিয়ে ফেলেছে। কাজেই খবরের কাগজ দেখার সময় পায় নি। পরমেশ্বর বলল, 'না। কী আছে নিউজপেপারে?'

'দেখ, দেখ, তুমি একেবারে কামাল করে দিয়েছ।' বলতে বলতে লেট সিটি এডিশনের একটা ইংলিশ ডেইলি টেবলের ওপর মেলে ধরলেন সোমেশ্বর।

পরমেশ্বর দ্রুত একবার দেখে নিল। তিনটে ওয়াগন বোঝাই ওষুধসুদ্ধ একটা ইঞ্জিন উধাও হয়ে যাবার রিপোর্ট প্রায় দু কলম জুড়ে বেরিয়েছে। দশ-বিশ বছরের মধ্যে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে এই রকম দুর্ধর্ষ হাইজ্যাকিংয়ের ঘটনা নাকি ঘটে নি। বেঙ্গল আর বিহারের পুলিস হেড কোয়ার্টার এই কেসটা নিয়ে চারদিক তোলপাড় করে দিতে শুরু করেছে।

ফিলজফারের মতো দারুণ নির্বিকার ভঙ্গিতে খবরের কাগজটা একধারে সরিয়ে দিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'বেঙ্গল আর বিহার কেন হোল ইন্ডিয়ার সব ডিটেকটিভ ট্রাই করে যান। দশ বছরের ভেতর যদি ওগুলো বার করতে পারে, জামাকাপড় খুলে স্রেফ নাগা সন্ন্যাসী হয়ে চৌরঙ্গীর মুখে সাত দিন দাঁড়িয়ে থাকব। যাক গে, আমাকে একটা ভালো ফ্ল্যাশ গানওলা ক্যামেরা দেবেন। আজই চাই।'

'ক্যামেরা দিয়ে কী হবে?'

'যে খজড়া পরশু রাত্তিরে সুইস ব্যাঙ্কের ডকুমেণ্ট হাপিস করতে এসেছিল তাকে ধরার জন্য ওটা দরকার।'

'ক্যামেরা দিয়ে কী করে চোর ধরবে?'

'আপনার সঙ্গে আমার কন্ডিশন আছে, কোন ব্যাপারে কিউরিওসিটি দেখাবেন না।'

ঠিক আছে, ঠিক আছে। আজ সন্ধের ভেতর তোমার ফ্ল্যাটে ক্যামেরা পেঁছে যাবে। এবার একটা আর্জেণ্ট কাজের কথা বলি।'

'বলুন।'

পকেট থেকে একটা ইণ্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট বার করে টেবলের ওপর রাখলেন সোমেশ্বর। বললেন, 'এটা খুলে দেখ।'

পাসপোর্টটা খুলে উলটে-পালটে দেখল পরমেশ্বর। তারপর বলল 'এটা দেখছি রণজয় হালদারের।'

'তার মানে এটা তোমার।'

'আমার কেন ?'

'কেন আবার, তুমি তো রণজয় হালদার হয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছ।'

'সে আর ক'দিন। আপনার সঙ্গে যে কনট্রাক্ট করেছি, সেটা হয়ে গেলেই আমি কেটে যাব।'

'যখন কাটবে তখন দেখা যাবে। এখন আমার কথাটা ভালো করে শোন। পাসপোর্টে রণজয় হালদারের যে ফোটো রয়েছে, দেখ তার সঙ্গে তোমার চেহারার কিছুটা মিল রয়েছে। আমি যতদূর জানি, তোমাদের দু'জনের হাইটও প্রায় একই রকম। তুমি ঐ রকম মেক-আপ নিতে পারবে ? না নিজের ফোটো রণজয় হালদারের ফোটোর জায়গায় সেট করে পাসপোর্ট অফিসের 'সীল' ভাল করে ওটার ওপর মারবে ? কোনটা তোমার পক্ষে সুবিধা ?'

'আমার কাছে অসুবিধা বলে কোন কারবার নেই। কিন্তু আপনার ধান্দাটা কী বলুন তো স্যার ? আমাকে সত্যি সত্যি পার্মানেণ্ট রণজয় হালদার বানিয়ে ফেলতে চাইছেন নাকি ?'

'দূর, তাই কখনো হয়। তোমার মতো জিনিয়াস রণজয় হালদার হতে যাবে কোন দুঃখে ? তোমার ট্যালেণ্টের এক পারসেণ্ট পেলে রণজয়ের ফোরটীন জেনারেশন উদ্ধার হয়ে যেত। আসল ব্যাপারটা কী জানো, তোমার একটা ইণ্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট করিয়ে রাখা দরকার। বাইরে আমাদের নানা রকম অ্যাক্টিভিটি রয়েছে। কখন সেখানে তোমাকে দরকার হয়ে যাবে, আগে থেকে তো বলা যায় না।'

'আপনি স্যার আমার ঘাড়ে নতুন কনট্রাক্ট গছাতে চাইছেন নাকি ?'

'আরে বাবা, এখন কিছুই গছাবো না। তবে আমরা বিজনেসম্যান, ফিউচারের কথা ভেবে পাসপোর্টটা করিয়ে রাখতে চাইছি।'

'ঠিক আছে, দেখা যাক কী করা যায়—' অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাসপোর্টটা পকেটে পুরল পরমেশ্বর আর তখনই তার চোখ পড়ল সামনের ওয়াল ক্লকটায়। এখন এগারোটা চল্লিশ। বারোটায় 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজে' অমিতাভর সঙ্গে দেখা করার কথা। ঘড়ি দেখতে দেখতে উঠে পড়ল সে।

সোমেশ্বর বললেন, 'একি, এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়লে ?'

পরমেশ্বর বলল, 'আপনার কাজে এক্ষুনি "ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজে" যেতে হবে।'

'ও, আচ্ছা।'

পরমেশ্বর দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল।

সোমেশ্বরের অফিস থেকে বেরিয়ে ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজে আসতে মিনিট কুড়ি লাগল। গাড়িটা পার্কিং জোনে রেখে পরমেশ্বর সোজা অমিতাভর চেম্বারে চলে এল। অমিতাভ তার জন্যই অপেক্ষা করছিল।

অমিতাভ বলল, 'এখানে বসবেন, না আপনার চেম্বারে যাবেন?'

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাপ্লিকেশনগুলো আর দিল্লির চিঠিটা কোথায়?'

'আপনার চেম্বারে রয়েছে।'

'তা হলে ওখানেই চলুন।'

দু'জনে ওই অফিস-কাম-ফ্যাক্টরি কমপ্লেক্সে পরমেশ্বরের জন্য নির্দিষ্ট কামরাটিতে চলে এল। ঘরে ঢুকতেই প্রকাণ্ড গ্লাস-টপ সেমি-সার্কুলার টেবলের ওপর অনেকগুলো ঢাউস ঢাউস ফিতে বাঁধা ফাইল দেখতে পেল পরমেশ্বর। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে, 'এগুলো অ্যাপ্লিকেশনের ফাইল নাকি?'

অমিতাভ বলল, 'হ্যাঁ।'

'আরি ফাদার, দেশে এত বেকার জমা হয়ে আছে নাকি?'

অমিতাভ উত্তর দিল না। একটু হেসে ফাইলের পাহাড় ঘেঁটে একটা চমৎকার এনভেলাপ বার করল। সেটা পরমেশ্বরের দিকে বাড়িয়ে বলল, 'দেখুন।'

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'কী এটা?'

'দিল্লীর চিঠি। কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির ব্যাপারে।'

এনভেলাপ থেকে চিঠি বার করে ফোর্ড কি রকফেলারের মতো স্টাইল করে একবার দেখল পরমেশ্বর। তারপর বলল, 'এটা দারুণ সিরিয়াস ব্যাপার। পরে কুল ব্রেনে ভালো করে দেখতে হবে।' বলতে বলতে চিঠিটা আবার খামের ভেতর পুরে ফেলল সে।

অমিতাভ বলল, 'আপনি ওটা নিয়ে যান। রাত্তিরে ভালো করে দেখে রাখবেন।'

'ঠিক আছে।' চিঠিটা এবার বুক পকেটে রাখল পরমেশ্বর।

'তা হলে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আপনি দেখুন। আমি আর ডিসটার্ব করব না।' কবজি উলটে ঘড়ি দেখে বলল, 'এখন বারোটা দশ। একটায় লাঞ্চ ব্রেক। আপনি আর আমি আজ একসঙ্গে এখানে লাঞ্চ করছি।'

'আমি খেয়ে এসেছি।'

'সিওর ?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সিওর।'

'তাহলে আমি উঠি।' উঠতে গিয়ে আচমকা কী মনে পড়ে গেল অমিতাভর। সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে বলল, 'আপনার নিশ্চয়ই ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট আছে ?'

এ রকম একটা প্রশ্নের জন্য তৈরি ছিল না পরমেশ্বর। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কেন বলুন তো ?'

'আমাদের যে ইলেকট্রনিকস ইউনিটটা রয়েছে, সেটার এক্সপ্যানসনের জন্য পারমিসান পেয়েছি বছরখানেক আগে। একটা বিগ ব্রিটিশ মালটি-ন্যাশনাল-এর কোলাবরেশানে এক্সপ্যানসান প্রোগ্রামটা ইমপ্লিমেণ্ট করব ঠিক করেছি। এই নিয়ে ওদের সঙ্গে এক বছরে প্রচুর করেসপণ্ডেন্স হয়েছে। ওদের এক্সপার্টরা এসে আমার প্ল্যাণ্ট দেখে গেছে। এখন ব্যাপারটা ফাইন্যাল স্টেজে। নেক্সট মান্থের পনের তারিখে ওরা আমাকে ওদের সিঙ্গাপুর হেড-কোয়ার্টারে ডেকেছে। আমি তো যাবই, আমার ইচ্ছে আপনিও আমার সঙ্গে চলুন।'

'আমি গিয়ে কী করব ? ফর নাথিং অনেকগুলো টাকাকড়ি নষ্ট হবে।'

'না-না। আপনার মতো একজন ওয়েল-উইশার ফ্রেণ্ড সঙ্গে থাকলে আমি যথেষ্ট সাহস পাব। প্লীজ, না বলবেন না।'

ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজের বারোটা না বাজানো পর্যন্ত অমিতাভর সব কথায় সায় দিয়ে যেতেই হবে। এটা একটা স্ট্র্যাটেজি। অমিতাভ যেন সব সময় ভাবে, সে তারই লোক, উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে ডে অ্যাণ্ড নাইট তার শুভকামনা করে যাচ্ছে। তারপর নিজের কাজটি হয়ে গেলে তখন পরমেশ্বরই বা কোথায়, আর সিঙ্গাপুরই বা কোথায় ? তার আগে পর্যন্ত অমিতাভ যদি বলে, সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে, সে তক্ষুণি ঘাড় কাত করে তিন বার স্যালুট হাঁকিয়ে সায় দেবে, 'ইয়েস স্যার।' যাই হোক, পরমেশ্বর বলল, 'ও-কে, আপনি যখন বলছেন, তখন যাব।'

'আপনার যখন ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের বিজনেস তখন নিশ্চয়ই পাসপোর্ট থাকার কথা। যদি না থাকে বলুন, সাত দিনের ভেতর করিয়ে নিচ্ছি।'

দুম করে পরমেশ্বরের মনে পড়ে গেল, রণজয় হালদারের ইণ্টারন্যাশনাল পাসপোর্টটা তার পকেটে রয়েছে। কিছুক্ষণ আগে সোমেশ্বর তাকে দিয়েছেন।

আশ্চর্য ! একই দিনে কয়েক মিনিট আগে-পরে সোমেশ্বর আর অমিতাভ তাকে পাসপোর্টের কথা বলল। দু'জনেই তাকে ফরেনে নিয়ে যেতে চায়। তবে দু'জনের ধান্দা দু রকম। একজন ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ডে যে র‍্যাকেট বানিয়েছে সেখানে তাকে কাজে লাগাতে চায়। আরেকজনের ব্যাপারটা

একেবারে ক্লীন। পরিষ্কার বিজনেস 'ডিল' করার জন্য সে সিঙ্গাপুর যাবে।

একটা কথা ভেবে দারুণ মজা লাগল পরমেশ্বরের। সোমেশ্বর আর অমিতাভ—দুই 'এনিমি' পার্টির মাঝখানে ক্যারমের গুটির মতো সে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনেই শ্লা তাকে ফরেন দেখাতে চায়। ও-কে! দেখা যাক, কে তাকে শেষ পর্যন্ত ফরেনে নিয়ে যেতে পারে?

পরমেশ্বর পকেটে হাত ঢুকিয়ে একবার রণজয় হালদারের পাসপোর্টটা ছুঁয়ে দেখল। তারপর বলল, 'নতুন করে করতে হবে না। আমার পাসপোর্ট আছে।'

'ভেরি গুড। আর একটা কথা—'

'কী?'

'আমার মা আপনাকে দেখতে চেয়েছেন।'

'মা তো আমাকে চেনেন না। আমাকে কি তিনি দেখেছেন?'

'না। সুনেত্রা আর আমার কাছে আপনার কথা শুনেছেন।'

'দারুণ পাম্প-টাম্প করে আমাকে হীরো-ফীরো বানিয়ে মাকে বলেছেন নিশ্চয়ই।'

'আরে না-না। আপনি যা, ঠিক তা-ই বলেছি। কবে আমাদের বাড়ি যাবেন বলুন?'

'মাকে বলবেন, শীগগিরই একদিন যাচ্ছি।'

'আচ্ছা, তা হলে উঠলাম।'

অমিতাভ চলে যাবার পর হাজার দুয়েকের মতো অ্যাপ্লিকেশন ঘেঁটে প্রথমে হরিপদ গড়াইএর দরখাস্তটা বার করল পরমেশ্বর। তারপর এলোপাথাড়ি এখান-ওখান থেকে আরো ঊনপঞ্চাশটা অ্যাপ্লিকেশন টেনে টেবলের ওপর রাখলো। ইন্টারভিউর জন্য মোট পঞ্চাশ জনকে ডাকা হবে। তার ভেতর থেকে বেছে পঁচিশ জনকে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া হবে।

ভোলোর অ্যাপ্লিকেশনটা বার করতে যা ঘণ্টাখানেক লেগেছে। বাকী উনপঞ্চাশটার বেলায় সে সময় নিয়েছে গুনে গুনে দু মিনিট। অর্থাৎ একটা দু মিনিটের ভেতর তার কাজ শেষ।

কিন্তু এত শর্ট টাইমের ভেতর দু হাজার অ্যাপ্লিকেশন স্ক্রীন করা অসম্ভব। এতে কারো সন্দেহ হতে পারে এবং সেটাই স্বাভাবিক। কাজেই আরো ঘণ্টা দুয়েক এটা সেটা নাড়াচাড়া করে, ঘুমিয়ে এবং কফি খেয়ে সময় দিল পরমেশ্বর। সাড়ে-তিনটে নাগাদ দু'জন টাইপিস্ট-কাম-স্টেনোকে ইন্টারভিউতে ক্যাণ্ডিডেটদের ডাকার জন্য তিন-চার লাইনের একটা

ডিকটেশন দিল। তারপর বলল, 'ফর্টি-ফাইভ মিনিটস সময় দিলাম। ভেতর কোম্পানির প্যাডে টাইপ করে, কোম্পানির এনভেলাপে ক্যান্ডিডেটে নাম বসিয়ে দিয়ে নিয়ে আসুন।'

অমিতাভ তার অফিসের স্টেনো-টাইপিস্ট-ক্লার্ক সবাইকে ডেকে বলে দিয়ে পরমেশ্বর যখন যা বলবে, তক্ষুণি তাই করে দিতে। পরমেশ্বরের স তাদের পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছে সে।

স্টেনো-কাম-টাইপিস্টরা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই সব টাইপ-ফাইপ ক এনে দিল। পরমেশ্বর সবগুলো টাইপ-করা কাগজে সই করে ডেসপ ক্লার্ককে ডাকিয়ে এনে বলল, 'আজই এগুলো পাঠিয়ে দেবেন।'

অল্পবয়সী স্মার্ট ডেসপ্যাচ ক্লার্কটি বলল, 'নিশ্চয়ই স্যার।'

সে চলে যাবার পর ঘড়ি দেখল পরমেশ্বর। চারটে বেজে দশ। অনেক পরের অফিসে ডিউটি দেওয়া গেল। এখন একবার নিজের অফিসে যাও দরকার। ইণ্টারন্যাল লাইনে অমিতাভকে ধরে সে বলল, 'আমার ক ফিনিশড। ইণ্টারভিউ লেটার রেডি করে ডেসপ্যাচ ক্লার্ককে হ্যাণ্ড-ওভ করেছি। আজই পাঠিয়ে দেবে।'

অমিতাভ বলল, 'অশেষ ধন্যবাদ। আমার ঘরে আসবেন, না অ আপনার ওখানে যাব? একসঙ্গে একটু কফি খাওয়া যাক।'

'আজ ক্ষমা করে দিন। এখন আমাকে একবার আমার সেই ে ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট অফিসে যেতে হবে। ছুটির আগে সেখানে যা দরকার।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ছুটির পর কি ক্লাবে আসবেন?'

'আজ আর আসছি না। কাল দেখা হবে। ভীষণ টায়ার্ড লাগে ফ্ল্যাটে গিয়ে ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে থাকব।'

'টায়ার্ড লাগলে ভালো করে রেস্ট নেওয়া দরকার। আচ্ছা, ছাড়লাম।

আসলে ফ্ল্যাটে ফিরে যাবার ধান্দাটা অন্য কারণে। তার মাথার ভে চোরের চিন্তাটা জোঁকের মতো আটকে আছে। মালটাকে ক্যাঁচাকলে ফেলা পর্যন্ত সে কোন ব্যাপারেই আরাম পাচ্ছে না। পরমেশ্বর নি একটা ফার্স্ট ক্লাস জোচ্চোর জালিয়াত। নানা ফেরেববাজি প্ল্যান তার গিজগিজ করছে। তার মতো মালের সঙ্গে যে টক্কর চালাতে চায়, সে কম খলিফা নয়। খচড়াটিকে একবার না দেখলেই নয়। যদি বোঝা জিনিসটি তার চাইতে অনেক বড় টাইপের ফেরেববাজ, তা হলে সে দ বার স্যালুট হাঁকাবে।

ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজ থেকে বেরিয়ে পরমেশ্বর স্ট্রেট চলে এল তার অফিসে। সেখানে নিজের চেম্বারে ঢুকে ফোমে মোড়া চেয়ারে বাটকখানা পাঁচ মিনিটের জন্য ঠেকিয়েই ফ্ল্যাটে চলে এল।

কলিং বেল টিপতেই ছোটি সিং দরজা খুলে তাকে দেখামাত্র বলে উঠল, 'সাব, বড়া সাব এক ক্যামেরা ভেজা।' ছোটি সিংয়ের কাছে সাব হলো পরমেশ্বর, আর সোমেশ্বর হলেন বড়া সাব।

সোমেশ্বর মাকড়ার সঙ্গে কারবার করে সুখ আছে। কাজের ব্যাপারে কোন রকম লুজ গড়িমসি-টড়িমসি নেই। যা করবার খজড়াটা একেবারে ওয়ার-টাইম এমার্জেন্সির স্টাইলে করে থাকে। বেলা সাড়ে-দশটায় ক্যামেরার কথা তাকে জানানো হয়েছে। এখন বিকেল সাড়ে-পাঁচটা। সাত ঘণ্টার ভেতর মাল পাঠিয়ে দিয়েছে সে।

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'ক্যামেরাটা কোথায় রেখেছ?'

'ড্রইং রুমমে, সাব।'

পরমেশ্বরের গায়ের গন্ধ পেলেই পিকিনীজ কুকুরটা দৌড়ে আসে। আজও এসেছে। সেটা দু পায়ে ভর দিয়ে দু হাতে গা বেয়ে ওপরে উঠতে াইছিল। সেটাকে কোলে তুলে ড্রইংরুমে চলে এল পরমেশ্বর।

ড্রইংরুমের সেণ্টার টেবিলে ফ্ল্যাশগান আর ফিল্মের স্পুলসুদ্ধ একটা ারুণ দামী ক্যামেরা রয়েছে। পরমেশ্বর একটা সোফায় বসে ক্যামেরাটা ুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে ঝট করে একটা প্ল্যান ের ফেলল।

ক্যামেরাটা সেট করা, সুইস ব্যাঙ্কের সিক্রেট ডকুমেণ্টগুলো সরানো ত্যাদি কাজের সময় ছোটি সিংকে ফ্ল্যাটে রাখা ঠিক হবে না। যা মনে ল তেমনি একটা নাম আর ঠিকানা কাগজে লিখে টেলিগ্রাম করতে পয়সা-সা দিয়ে সি-টি-ও-তে পাঠিয়ে দিল পরমেশ্বর। টেলিগ্রামের বয়ানটাও াশ্য নাম-ঠিকানার তলায় লিখে দিয়েছে সে।

বাসে বা ট্রামে সি-টি-ও-তে যেতে এবং আসতে ঘণ্টাখানেক লাগবে টি সিংয়ের। তার মধ্যে বাথরুম আর ড্রইংরুম থেকে চাবি বার করে ালের গায়ে সিক্রেট আলমারিটা খুলে ফেলল পরমেশ্বর। সেখান থেকে পন কাগজপত্র সরিয়ে ক্যামেরাটা ফ্ল্যাশগানসুদ্ধ শাটারে সরু একটা তার ধে এমনভাবে রাখল যাতে বাইরে থেকে ওটা দেখা না যায়। কিন্তু উ যদি বন্ধ আলমারিটা খুলতে চায়, তা হলে ক্যামেরার শাটারটা পড়ে ে এবং সঙ্গে সঙ্গে যে আলমারি খুলতে চাইবে তার ফোটো উঠে যাবে। যানে ডকুমেণ্টগুলো ছিল সেখানে একটা এনভেলপে কয়েকটা সাদা কাগজ

রাখল সে। একটা কাগজে লিখে রাখল, 'মাকড়া, যতই ট্রাই করো, ডকুমেণ্টগুলো এই লাইফে খুঁজে বার করতে পারবে না। ট্রাই, ট্রাই, ট্রাই এগেইন।'

ক্যামেরাটা সেট করে আলমারি আটকে দিল পরমেশ্বর। তারপর নিজের খাটের একটা পায়ায় করাত দিয়ে বিরাট ফোকর করে ডকুমেণ্ট আর চাবি দুটো রেখে অ্যাডহেসিভ দিয়ে বুজিয়ে দিল। তারও পর পরনের ট্রাউজার্স ফাউজার্স ছেড়ে সিল্কের লুঙ্গি পরে খাটে বডি ফেলে দিল। আর ফেলতেই চোখে পড়ল, তার বেডরুমের জানলার গ্রিলটা তখনও কাটা রয়েছে। ছোটি সিং গ্রিলটা বদলে অন্য মজবুত গ্রিল বসাবার কথা অনেকবার বলেছে পরমেশ্বর বদলায় নি। মুখে অবশ্য বলেছে, শীগগিরই বদলে ফেলবে আসলে এই কাটা গ্রিলটা তার ব্রেনে একটা দুর্ধর্ষ প্ল্যান এনে দিয়েছে।

আরো আধঘণ্টা বাদে ছোটি সিং ফলস নাম-ঠিকানায় টেলিগ্রাম করে ফিরে এলে দরজা খুলে পরমেশ্বর দারুণ খুশির গলায় বলল, 'সোনার বাংলা লাগাও।' আনন্দের কারণটা হলো, সুইস ব্যাঙ্কের ডকুমেণ্টগুলো সরিয়ে সে অচেনা চোরকে ধরার জন্য ক্যামেরা দিয়ে ফাঁদ পাততে পেরেছে।

পরমেশ্বরের কাছে কয়েক দিন থাকার ফলে 'সোনার বাংলা' কাকে বলে, সেটা জেনে গেছে ছোটি সিং। খুব ব্যস্তভাবে সে বলল, 'আভি লাতা হুঁ সাব।'



আরো দশ বারোটা দিন কেটে গেল। এর ভেতর ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজের ইলেকট্রনিকস ডিভিসনে ক্লাস ফোর স্টাফের সেই ইণ্টারভিউটা হয়ে গেছে। শুধু ইণ্টারভিউই নয়, অ্যাপয়েণ্টমেণ্টও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে পঁচিশ জন চাকরি পেয়েছে, তাদের একজন হল হরিপদ গড়াই অর্থাৎ লোলে।

লোলে এক উইকের মতো ফ্যাক্টরিতে ডিউটি দিচ্ছে। হরিপদ গড়াই-এর সেই মেক-আপ নিয়ে সে এখানে 'ইন' করেছিল। সেই মেক-আপেই চালিয়ে যাচ্ছে। পরমেশ্বর তাকে আগে থেকেই বলে রেখেছিল, ডিউটির ফাঁকে ফাঁকে সে যেন ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজের অন্য সব ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের এমপ্লয়ীজ-দের সঙ্গে জমিয়ে নেয়।

লোলে পরমেশ্বরের প্রাইভেট সেক্রেটারি-কাম-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। ক' বছর তার কাছে অ্যাপ্রেণ্টিস থেকে ম্যাজিক, হাতের লেখা জাল থেকে শুরু করে যে কোন মেক-আপ নেওয়া—এই সব নানা ইমপর্টাণ্ট ব্যাপারে এক্সপার্ট হয়ে উঠেছে। ইটার্নাল ইন্ডাস্ট্রিজে ঢোকবার পর তার স্টক থেকে দু-একটা মাল ছেড়ে যাচ্ছে লোলে। অর্থাৎ ম্যাজিক আর ক্যারিকেচার-ফ্যারিকেচার দেখিয়ে ক'দিনেই এখানে দুর্দান্ত পপুলার হয়ে উঠেছে সে। ইলেকট্রনিকস ইউনিটে তো বটেই, মেডিসিন, ফ্যান এবং অন্য ইউনিটের ওয়ার্কাররা তাকে টিফিনের সময় ডেকে নিয়ে ম্যাজিক-ফ্যাজিক দেখছে। মোট কথা, সব ইউনিটেই লোলের গতিবিধি অবাধ। 'ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডে'র লোকেরা পর্যন্ত তাকে চিনে ফেলেছে। শুধু চেনেই নি, তারা তার দুর্দান্ত ফ্যানও। লোলের এই পপুলারিটিটাই চাইছিল পরমেশ্বর। লোলে যত পপুলার হবে, তার অপারেশনের পক্ষে ততই সুবিধা।

লোলে প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করছে কিনা সেটা মার্ক করার জন্য রোজ দু-তিন ঘণ্টা করে এখানে কাটিয়ে যাচ্ছে পরমেশ্বর।

ফ্যাক্টরি এরিয়াতে পরমেশ্বর আর লোলে, কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না। মুখচোখের চেহারা দু'জনে এমন করে রাখে, যেম ওরা আলাদা প্ল্যানেটের মানুষ।

ফ্যাক্টরিতে কথাবার্তা না হলেও এর মধ্যে ছুটির পর দু-তিন বার শহরতলীর সেই বস্তিতে গিয়ে লোলের সঙ্গে দেখা করেছে পরমেশ্বর। তার কোমরে আদরের ভঙ্গিতে গোটাকয়েক লাথি হাঁকিয়ে বলেছে, 'শ্লা, তুই একটা টেরিফিক খজড়া হয়ে উঠেছিস।'

লোলে বলেছে, 'গুরু, তুমি আমার কাছে যা চেয়েছ ঠিক ঠিক তা পাচ্ছো তো?'

পরমেশ্বর বলেছে, 'হানড্রেড পারসেণ্ট।'

পরমেশ্বরের সার্টিফিকেট পেয়ে লোলের চোখে ফ্ল্যাশ বাল্ব জ্বলে উঠল যেন। সে বলল, 'আমি তোমার উপযুক্ত চেলা হয়ে উঠতে পেরেছি গুরু?'

'চেলা কিরে! যা চালাচ্ছিস, আর ক'দিন বাদে আমার নাকে ঝামা ঘষে দিতে পারবি। তখন তোকেই আমার গুরু বলতে হবে।'

জিভ কেটে নিজের কান মুলতে মুলতে লোলে বলেছে, 'এসব কথা বলে আমাকে হেল-এ পাঠিও না মাইরি। হাজার বছর ট্রাই করলেও আমি তোমার বাঁ পায়ের কোড়ে আঙুলের নখ হতে পারব না। ওয়ার্ল্ডে তোমার মতো মাল আর জন্মায় নি গুরু।'

বলছিস?'

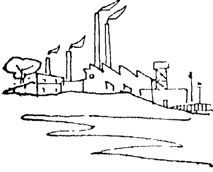
'ইয়েস গুরু। হাজার বার বলছি। লেকেন—'

'লেকেন কী?'

'তুমি আমাকে ফ্যাক্টরিতে সেট করে দিয়ে বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছ। আমরা হলাম চিটিংবাজ, ফোরটোয়েণ্টি। বেশীদিন চাকরি করলে মাইরি ক্যারেক্টার খারাপ হয়ে যাবে।'

'মাথা খারাপ! আমাদের এমন ক্যারেক্টার কখনও খারাপ হতে দিতে পারি? আর ক'টা দিন। ওনলি ফিউ ডেজ। তার মধ্যেই সব কমপ্লীট করে ফেলব—সমঝা?'

'সমঝা, গুরু।'



অন্য দিন নিজের অফিসে দু-তিন ঘণ্টা কাটিয়ে তবে ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজ-এ আসে পরমেশ্বর। আজ কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের অফিসে গেল না সে। স্ট্রেট অমিতাভর ফ্যাক্টরি-কাম-অফিস কমপ্লেক্সে চলে এল।

প্ল্যান অনুযায়ী এখানকার অপারেশনের কাজ ঠিক রাস্তা ধরেই এগিয়ে যাচ্ছে। জিরো আওয়ারের আর বেশী দেরি নেই। কয়েকটা দিন মাত্র। তার মধ্যেই এখানকার অপারেশন কমপ্লীট হয়ে যাবে। একটা কনট্রাক্ট নিয়ে এত টাইম নষ্ট করলে অন্য ক্লায়েণ্ট রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

কম্পাউণ্ডের একধারে লিমুজিনটা পার্ক করে সোজা অমিতাভর চেম্বারে এসে ঢুকল পরমেশ্বর। এ সময়ে তাকে আশা করে নি অমিতাভ। সে অবাক হল, আবার খুশীও। ব্যস্তভাবে বলল, 'আরে বসুন বসুন। হঠাৎ এ সময়ে?'

মুখোমুখি বসতে বসতে পরমেশ্বর পকেট থেকে একটা টাইপ করা কাগজ বার করে অমিতাভর দিকে বাড়িয়ে দিল।

কাগজটা নিতে নিতে অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, 'কী এটা?'

'দিল্লী থেকে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির ব্যাপারে যে চিঠি এসেছে এটা তার জবাব। ড্রাফট করে এনেছি। একবার দেখে দিন।' পরমেশ্বর বলল। আসলে ড্রাফট সে সোমেশ্বরের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাফেয়ার্সের এক ঝানু লিগ্যাল অ্যাডভাইসারকে দিয়ে করিয়ে এনেছে।

ড্রাফটা পড়তে পড়তে অমিতাভ বলল, 'একসেলেণ্ট!'

পরমেশ্বর বলল, 'ওটা পাঠাবার আগে ফ্যাক্টরি সাইটটা আর একবার দেখা দরকার। সেই জন্যেই এখন চলে এলাম। চলুন দেখে আসি।'

অমিতাভর টেবলে এই মুহূর্তে ফাইলের পাহাড়। সে বলল, 'এখন কী করে যাব? অনেকগুলো আর্জেণ্ট ফাইল ক্লিয়ার করতে হবে। আপনি বরং নিজেই দেখে-টেখে নিন।'

অমিতাভ যে এই উত্তরটাই দেবে, সেটা জানতো পরমেশ্বর। এই আর্লি আওয়ার্সে তার পক্ষে জরুরী ফাইল-টাইল ছেড়ে ওঠা অসম্ভব। সে যাতে সঙ্গে না যায়, সেই জন্য পরমেশ্বর এই টাইমটা বেছে নিয়েছে। একা একা সে ইলেকট্রনিকস, ড্রাগস এবং অন্যান্য ইউনিটগুলোতে ঘুরতে চায়। কিন্তু লাঞ্চের পর হলে একা একা ঘোরা সম্ভব না। তখন কাজ হালকা হয়ে যায় অমিতাভর। ফ্যাক্টরির ভেতর কোথাও বেরুলে সে তখন সঙ্গে থাকে। কিন্তু একা একা না ঘুরলে প্ল্যানমাফিক কাজ করা যাবে না। পরমেশ্বর খানিকটা নকশাবাজি করে বলল, 'আপনি গেলে ভাল হতো, এটা আপনার প্রোজেক্ট—'

অমিতাভ একটু যেন দুঃখ পেল। বলল, 'কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির আইডিয়াটা আপনার। ওটা আপনার ব্রেন-চাইল্ড। আমার চাইতে ও ব্যাপারটায় আপনার প্যাসানও ঢের বেশী। আপনি ফ্যাক্টরি সাইটটা দেখে এলে অনেক বেশী কাজ হবে।'

যেন একা যেতে ইচ্ছে নেই, এমন ভঙ্গি করে উঠে দাঁড়াল পরমেশ্বর। বলল, 'ঠিক আছে, তা হলে আমিই যাই।'

একটু পরে দেখা গেল লিমুজিন নিয়ে প্রোপোজড্ কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির সাইটে এসে পড়েছে পরমেশ্বর। তিরিশ একর ফাঁকা জমিতে এক চক্কর পাক খেয়ে এক সময় ইলেকট্রনিকস ইউনিটে এসে পড়ল পরমেশ্বর।

এই ইউনিটটাতে টাইট সিকিউরিটি গার্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ডের লোকেদের চোখে ধুলো ছিটিয়ে সেখানে একটা মাছি গলারও উপায় নেই।

কিন্তু গার্ডরা সবাই পরমেশ্বরকে চেনে। অমিতাভই এই ফ্যাক্টরি-কাম-অফিস কমপ্লেক্সের কেরানী থেকে গার্ড পর্যন্ত প্রত্যেকটা এমপ্লয়ীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। অমিতাভর অর্ডার আছে, যখন যেখানে ইচ্ছা পরমেশ্বর যেতে পারবে।

গার্ডরা কেউ তাকে আটকালো না। উলটে লম্বা স্যালুট হাঁকালো। পরমেশ্বর ঘাড়টা একটু নোয়ালো; তারপর ইলেকট্রনিকস ইউনিটের ভেতর ঢুকে পড়ল।

এই ইউনিটটা দারুণ মডার্ন। এখানকার বেশীর ভাগ মেশিনই কমপিউটারে চলে। মাথার ওপর ফ্লুরোসেণ্ট আলোর লম্বা লম্বা অসংখ্য বাল্ব জ্বলছে। ওয়ার্কাররা মেশিনের মতোই কাজ করে চলেছে।

এর মধ্যে হরিপদ গড়াই অর্থাৎ লোলেকে দেখা গেল। দু'জনের একবার মাত্র চোখাচোখি হল, কিন্তু কেউ কাউকে চেনে বলে মনে হয় না।

বাইরের চাইতেও ওয়ার্কশপের ভেতরে সিকিউরিটির ব্যবস্থা আরো বেশী টাইট। প্রায় প্রতিটি মেশিনের গায়েই একজন করে গার্ড হাতে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিক থেকে কয়েক শো জোড়া চোখ গোটা ওয়ার্কশপটার ওপর লক্ষ্য রাখছে।

একেকটা মেশিনের সামনে একবার করে এসে দাঁড়ায় পরমেশ্বর। অপারেটরদের সঙ্গে প্রোডাকশান-ট্রোডাকশান নিয়ে দু-একটা কথা বলে। তারপর অন্য একটা মেশিনের দিকে এগিয়ে যায়।

প্রায় বিশ হাজার স্কোয়ার ফুটের এই বিশাল ইউনিটে এমন একট জায়গা নেই যেখানে গার্ডদের চোখে ধুলো ছিটিয়ে কিছু রাখা যায় ব করা যায়।

এ-মেশিন থেকে ও-মেশিনে গেলে কী হবে, পরমেশ্বরের চোখ চারদিকে চরকির মতো ছোটাছুটি করছে। ঘণ্টা দুয়েক ঘোরাঘুরির পর তিনটে ঘোঁজমতো জায়গা খুঁজে বার করতে পারল সে। এই ঘোঁজগুলোতে এব ফুট লম্বা দু ইঞ্চি চওড়া কোন জিনিস পুরে রাখা যায়।

পকেটে করে একটা লাল 'চক' নিয়ে এসেছিল পরমেশ্বর। জুতোর ফিতে ঠিক করা কি ট্রাউজার্সের ক্রিজ দেখার নামে সামান্য ঝুঁকে 'চক দিয়ে তিনটে ঘোঁজের কাছে তিনটে 'ক্রস' মার্কা লাগাল সে। তারপর ওয়ার্কশপের বাইরে বেরুবার সময় লোলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার দিকে একবারও না তাকিয়ে চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'ছুটির পর জি-পি-ও-র উলটো দিকে লালদীঘির ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকবি।'

ইলেকট্রনিকস ইউনিট থেকে বেরিয়ে পরমেশ্বর চলে এলো ড্রাগস ইউনিটে এখানে সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেণ্ট অত কড়া নয়।

ড্রাগ ইউনিটে ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করে দেয়ালের গায়ে গোটাচারেক ফোকর পাওয়া গেল যেখানে এক ফুট লম্বা এবং ছ' ইঞ্চি চওড়া কো জিনিস লুকিয়ে রাখা যায়।

ড্রাগ ইউনিটের কাজ চুকিয়ে দুটো নাগাদ অমিতাভর চেম্বারে ফিরে এ পরমেশ্বর। অমিতাভ কফি আনালো।

খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, 'সাইটটা দেখা হল?'

পরমেশ্বর বলল, 'হ্যাঁ, ভালো করে অনেকটা সময় নিয়ে দেখলাম এবার কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির ব্যাপারে প্রসিড করতে সুবিধে হবে।'

একটু চুপচাপ। তারপর অমিতাভ বলল, 'মা কিন্তু আপনাকে আমাদে বাড়ি যাবার কথাটা আরেক বার মনে করিয়ে দিতে বলেছেন।'

পরমেশ্বর মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'মাকে বলবেন, নেক্সট উইকে আমি নিশ্চয়ই তাঁকে প্রণাম করতে যাব।' মনে মনে ভাবল, নেক্সট উইকের ভেতর এখানকার অপারেশন ফিনিশড হয়ে যাবে। তখন কোথায় থাকবে এই মাকড়া পরমেশ্বর।

আরো কিছুক্ষণ গল্প-টল্প করে উঠে পড়ল পরমেশ্বর। অমিতাভর অফিস থেকে স্ট্রেট নিজের অফিসে এসে দু ঘণ্টার মতো সে অফিসে থাকল। তারপর পাঁচটা বাজতেই ছুটি হয়ে গেল। ছুটির পর লিফটে করে নেমে ধীরে সুস্থে ড্রাইভ করে জি-পি-ও-র উলটো দিকের ফুটপাথের কাছে আসতেই দেখতে পেল, হরিপদ গড়াই-এর মেক-আপ নিয়ে লোলে দাঁড়িয়ে আছে।

তার গা ঘেঁষে লিমুজিনটা দাঁড় করিয়ে দরজা খুলে দিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'ঝটপট উঠে পড়। এখানে গাড়ি পার্ক করতে দেখলে পুলিস নম্বর নেবে।'

প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল লোলে। এভাবে পরমেশ্বর তার চামড়া ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাবে, সে ভাবতে পারে নি। ঘাড় ঝুঁকিয়ে এক রকম লাফ দিয়েই উঠে এলো লোলে এবং পরমেশ্বরের পাশের সীটে বসে পড়ল।

গাড়িতে স্টার্ট দেওয়াই ছিল। পরমেশ্বর স্পীড তুলে রাইটার্স বিল্ডিং-এর পাশ দিয়ে বউবাজার স্ট্রীট ধরে সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউতে এসে পড়ল।

ছুটির পর এখন হাজার হাজার গাড়ি স্রোতের মতো ছুটে চলেছে। সেই স্রোতে ভাসতে ভাসতে পরমেশ্বররা বিবেকানন্দ রোডে এসে পড়ল। সেখান থেকে মানিকতলা পেরিয়ে গেল ভি. আই. পি. রোডে।

এখানে ভিড়-টিড় কম। মোটামুটি ফাঁকা রাস্তায় স্পীড কমিয়ে দিল পরমেশ্বর।

লোলে জিজ্ঞেস করল, 'গুরু, সিটি থেকে হড়কে এদিকে এলে কেন?'

পরমেশ্বর বলল, 'তোর কাছে ক'টা কথা জানতে হবে।'

'কী?'

'তোদের ওখানে দু শিফটে কাজ হয় তো?'

'ইয়েস গুরু।'

'ফার্স্ট শিফট ক'টা থেকে ক'টা পর্যন্ত?'

'সকাল ছ'টা থেকে দুপুর দুটো।'

'সেকেন্ড শিফট?'

'দুটো থেকে রাত দশটা।'

'তোর এখন কোন্ শিফট চলছে?'

'সেকেণ্ড।'

'দশটা পর্যন্ত ডিউটি তো কেটে বেরিয়ে এলি কী করে?'

'হাফ ডে ছুটি মেরে দিলাম।'

একটু চুপ করে থেকে পরমেশ্বর বলল, 'দশটার পর ফ্যাক্টরির ভেতর কেউ থাকে?'

লোলে বলল, 'না।'

'ভালো করে ভেবে দ্যাখ।'

'না গুরু, কেউ থাকে না।'

'ফাইন। লোকজন তা হলে মরবে না। বেফায়দা কেউ মার্ডার হোক, এটা আমি চাই না। বুঝলি মাকড়া, আমি হানড্রেড পারসেণ্ট অহিম্‌স।'

পরমেশ্বরের কথা ঠিকমতো বুঝতে পারছিল না লোলে। সে বলল, 'তুমি কী বলছ, ব্রেনে ঢুকছে না গুরু।'

পরমেশ্বর বলল, 'ঢুকিয়ে দিচ্ছি। তোদের ইলেকট্রনিকস আর ওষুধ তৈরির ফ্যাক্টরিতে পুব আর দক্ষিণ দিকের ওয়ালে লাল চকের সাতটা দাগ দেখতে পাবি।'

'দেখলাম।'

'যেখানে যেখানে দাগগুলো রয়েছে সেখানে ফোকর আছে।'

'বেশ, থাকল ফোকর। আগে বাঢ়ো—'

'ওই ফোকরগুলোতে টাইম বোম ঢুকিয়ে রাখতে হবে।'

'এই জন্যেই তুমি গুরু আমাকে অমিতাভ সেনের ফ্যাক্টরিতে 'ইন' করিয়েছ?'

'ইয়েস গুরু।'

একটু ভেবে লোলে বলল, 'বোমাগুলোর সাইজ কী রকম?'

পরমেশ্বর বলল, 'বারো ইঞ্চির মতো লম্বা হবে।' একটু থেমে ফের বলল, 'ফ্যাক্টরিতে ঢুকবার কি বেরুবার সময় তোদের চেক করে?'

'করে। একেবারে নাগা সন্ন্যাসী বানিয়ে যেখানে সেখানে খচ্চর খচ্চর জায়গায় হাত ঢুকিয়ে দ্যাখে।'

'শলা, ঝামেলায় ফেলে দিলি দেখছি। বম্ব নিয়ে ঢুকলে যদি 'চেক' করে, গড়বড় হয়ে যাবে।'

'কোই ঝামেলা নেহী গুরু।'

'মানে!'

'ক'দিন ধরে আমাকে গার্ড মাকড়ারা এমনিই ছেড়ে দিচ্ছে। ন্যাংটো-

ট্যাংটো করে দেখছে না। ম্যাজিক-ফ্যাজিক দেখিয়ে শালাদের কবজা করে ফেলেছি। তবে—'

'তবে কী?'

'দুম করে এখন বম্ব-টম্ব নিয়ে ঢুকব না। গার্ডগুলোর সঙ্গে আরেকটু জমিয়ে নিই আগে।'

'কারেক্ট বলেছিস। তোর সিগন্যাল পেলে বম্বের অ্যারেঞ্জমেণ্ট করব। তবে বেশী টাইম খাওয়াস না। একটা কনট্রাক্ট নিয়ে এতদিন রগড়ানো ভালো লাগে না।'

'ও-কে গুরু, ফিকর মাত্ কর।'

'কাল ফ্যাক্টরিতে ঢুকেই লাল চকের দাগগুলো দেখে নিস।'

'ঠিক হ্যায়।'

লিমুজিন ঘুরিয়ে ভি-আই-পি রোড থেকে উলটোডাঙায় চলে এলো পরমেশ্বর। তারপর নতুন ব্রিজ দিয়ে শ্যামবাজারে এসে লোলেকে নামিয়ে দিল। হরিপদ গড়াই-এর মেক-আপে বেশীক্ষণ নিজের সঙ্গে লোলেকে রাখা ঠিক হবে না। ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজের এমপ্লয়ীরা ক্যালকাটা মেট্রোপলিসের নানা দিকে ছড়িয়ে-টড়িয়ে রয়েছে। কারো চোখে যে পড়ে যাবে না, এমন কোন গ্যারাণ্টি নেই। ম্যানেজিং ডিরেক্টর অমিতাভ সেনের ফ্রেণ্ডের সঙ্গে একজন ক্লাস ফোর এমপ্লয়ী লিমুজিনে করে পাশাপাশি বসে ঘুরে বেড়াচ্ছে দৃশ্যটা খুবই সন্দেহজনক। কেউ গিয়ে হয়ত অমিতাভকে লাগিয়ে দিতে পারে। তাতে অপারেশনের ব্যাপারে ঝামেলা পাকিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

লোলেকে নামিয়ে দিয়ে পরমেশ্বর যখন তার ফ্লাটে ফিরে এল, অনেক রাত হয়ে গেছে।

অন্য দিনের মতো আজও দরজা খুলে দিল ছোটি সিং। দৌড়ে এসে ... উলের বলের মতো লাফাতে লাগল সেই পিকিনীজ কুকুরটা।

কুকুরটাকে কোলে তুলে ড্রইংরুমে চলে গেল পরমেশ্বর। জুতো-ফুতো খুলে সোফায় বডি এলিয়ে দিল। ছোটি সিং নক্সা-করা ফ্রেঞ্চ ট্রের ওপর জাপানী কাট গ্লাসের প্লেটে মাটির খোরায় সোনার বাংলা বোঝাই করে, সঙ্গে চাট হিসেবে ফিশ ফিঙ্গার আর পাঁঠার মেটে ভাজা দিয়ে গেল।

পরমেশ্বর নিজে তো খেতে লাগলই, একটা ছোট প্লেটে খানিকটা সোনার বাংলা ঢেলে মেটে ভাজাসুদ্ধু পিকিনীজ কুকুরটাকেও দিল। আজকাল কুকুরটাকে ড্রিঙ্ক ধরিয়ে দিয়েছে সে। প্রায়ই ওটাকে আদর করতে করতে বলে, 'আমার কাছে দু মাস থাক। তোকে ইণ্ডিয়ার বেস্ট ড্রাঙ্কার্ড বানিয়ে দেবো।'

দু-তিন খোরা ধান্যেশ্বরী স্টমাকে চালান করার পর আচমকা কুকুরটার কুঁই কুঁই আওয়াজ কানে এলো। ঘাড় কাত করে পরমেশ্বর দেখল, কুকুরটা সানার বাংলা বা চাটফাট ছোঁয় নি, হাত-পা দিয়ে গলার চওড়া বকলসটা টানাটানি করে খোলার চেষ্টা করছে আর তার গলার ভেতর থেকে কাতর কুঁই কুঁই আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

পরমেশ্বর ভালো করে লক্ষ্য করল, বকলসটা দারুণ টাইট হয়ে গলায় চেপে বসেছে। সেই কারণে খুব সম্ভব নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কুকুরটার।

কুকুরটাকে কোলে তুলে নিয়ে চামড়ার চওড়া বকলসটা খুলে আলগা করে দিতে গিয়ে চমকে উঠল পরমেশ্বর। বকলসটার চামড়ার খাঁজে চ্যাপ্টা বোতামের মতো একটা মেশিন রয়েছে। ঝটপট মেশিনটা বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল সে। ওটা একটা ট্রান্সমিটার।

বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা কথা মনে হল পরমেশ্বরের। এ ঘরে বসে কী কথাবার্তা বলে তা শুনবার জন্যই কি কুকুরের গলার বকলসে এই ট্রান্সমিটার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে?

পরমেশ্বরের ব্রেনটা কমপিউটারের মতো কাজ করে। এর পর তাকে কী করতে হবে সেটা দ্রুত প্ল্যান করে ফেলল সে। আর প্ল্যানের প্রথম স্টেপ হিসেবে ট্রান্সমিটারের কলকব্জা নষ্ট করে আবার বকলসের ভেতর পুরে কুকুরটার গলায় আলগা করে আটকে দিল। তারপর ভাবতে লাগল, এবার চান্সের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।



পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙার পর পরমেশ্বর এইমাত্র বিছানায় বসে হাই তুলে আর আড়মোড়া ভেঙে সোনার বাংলার হ্যাং-ওভার কাটাচ্ছে। পিকিনীজ কুকুরটা গায়ের সঙ্গে জুড়ে বসে আছে। আচমকা কলিং-বেল বেজে উঠল।

বিছানায় বসে বসেই পরমেশ্বর টের পেল ছোটি সিং দরজা খোলার জন্য প্যাসেজের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে।

একটু পর হেমার গলা কানে ভেসে এল, 'সাব হ্যায়?' অর্থাৎ পরমেশ্বর আছে কিনা সেটা জানতে চাইছে।

এক সেকেণ্ডও লাগল না, ঘুমভাঙা আলস্যের ভাবটা কেটে গেল পরমেশ্বরের। নার্ভগুলো টান টান হয়ে গেল যেন। কুকুরটাকে কোলে তুলে ঝট করে বিছানা থেকে নেমে বেডরুমের বাইরে যেতে যেতে ছোটি সিং উত্তর দেবার আগেই বলল, 'হ্যায় মেমসাব—'

ততক্ষণে হেমা কাছে এসে গেছে। চোখাচোখি হতেই দারুণ মিষ্টি করে হাসল সে, 'গুড মর্নিং হালদার সাহেব।'

হেমার পরনে ঢোলা নাইটি। ভেতরে ব্রা আর প্যান্টি থাকলেও থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। পায়ে ফোমের চটি। চরকির মতো চোখ দুটো ঘুরিয়ে হেমার পায়ের তলা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত দ্রুত একবার দেখে নিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'গুড মর্নিং ম্যাডাম। আসুন, আসুন—'

পরমেশ্বরের সঙ্গে ড্রইংরুমে গিয়ে বসতে বসতে হেমা বলল, 'সকালবেলা আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম হালদার সাহেব—'

'এ সব বলে আমাকে কষ্ট দেবেন না ম্যাডাম। আপনার মতো একজন বিউটিফুল ইয়াং গার্লকে সকালবেলা দেখলে সারাদিন চোখ নাক কিডনি হার্ট আর লাংস ভালো থাকে।'

হেমা বলল, 'আপনি একটা—'

তার কথা শেষ হবার আগেই পরমেশ্বর বাকীটা বলল, 'ওয়াল্ড' ক্লাসের হারামী।'

দুই হাতের তালু উলটে পুরুষদের মতো কাঁধ ঝাঁকাল হেমা। বলল, 'আপনাকে নিয়ে আর পারা যায় না।'

পরমেশ্বর বলল, 'এখন বলুন কী খাবেন—টী অর কফি? মানে সবে সানরাইজটা হয়েছে কিনা। এখন হুইস্কি-টুইস্কি অফার করতে লজ্জা করছে।'

'হুইস্কি চা-ফার দরকার নেই।'

'তাই কখনো হয়!'

'তাহলে চা-ই আনতে বলুন। লেমন টী হলে ভালো হয়।'

চিৎকার করে ছোটি সিংকে লেমন টী দিতে বলল পরমেশ্বর। চা এলে কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে সে জানতে চাইল, 'এবার বলুন আমার কাছে কোন দরকারে এসেছেন, না স্রেফ আড্ডার মেজাজ নিয়ে—'

হেমা বলল, 'একটু দরকার আছে। কুকুরটার আজ স্নানের ডেট। আমাকে আবার একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে হবে। তাই ভাবছি ওটাকে স্নান করিয়ে আপনার কাছে দিয়ে যাব।'

অন্যদিন এই স্নান-ফানের ব্যাপারে প্রচুর ধানাই-পানাই করে পরমেশ্বর। আজ তীক্ষ্ণ চোখে হেমাকে দেখতে দেখতে সে বলল, 'ওকে নিয়ে যান ম্যাডাম—'

'আপনি কতক্ষণ ফ্ল্যাটে থাকছেন?'

'যতক্ষণ না আপনি কুকুরটাকে দিয়ে যাচ্ছেন।' বলে হাসল পরমেশ্বর।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। হেমা আর বসল না, কুকুরটাকে নিয়ে চলে গেল।

পরমেশ্বর তাকে বাইরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফের ড্রইংরুমে ফিরে সোফায় বসল। তারপর পা দুটো আড়াআড়ি সেন্টার টেবলের ওপর তুলে দিল। ক্রমশঃ তার কপালের চামড়া কুঁচকে যেতে লাগল। সে আন্দাজ করল, কুকুরটাকে নিয়ে খুব তাড়াতাড়িই আবার এই ফ্ল্যাটে আসবে হেমা। কুকুরি যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ এখানেই বসে থাকবে পরমেশ্বর। কুকুরটা ফেরত দিয়ে যাবার পর পরের স্টেপের কথা চিন্তা করা যাবে।

পরমেশ্বর যা ভেবেছিল তা-ই। এক ঘণ্টার ভেতর কুকুরটাকে নিয়ে ফিরে এল হেমা। ড্রইংরুমের ভেতর ঢুকল না সে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে

বলল, 'আপনাকে আর ডিসটার্ব করব না। আপনার কুকুর রইল। চলি। আবার দেখা হবে।' কুকুরটাকে বুকের কাছ থেকে নামিয়ে দিল সে।

সাদা উলের বলের মতো ড্রপ খেতে খেতে আদুরে পিকিনীজ লাফ দিয়ে পরমেশ্বরের গা ঘেঁষে এসে বসল।

পরমেশ্বর এবার আর হেমাকে ভেতরে ডাকল না। কুকুরটাকে আদরের ভঙ্গিতে টুসকি মারতে মারতে বলল, 'ও-কে ম্যাডাম।'

হেমা চলে যাবার পর এক সেকেণ্ডও ওয়েট করল না পরমেশ্বর। খাড়া উঠে বসে কুকুরটার গলার বকলস আলগা করে খুলে ফেলল। বকলসের চামড়ার ভাঁজের ভেতর দেখা গেল সেই ট্রান্সমিটারটা রয়েছে। উলটে-পালটে নাড়াচাড়া করতে করতে টের পাওয়া গেল আগেরটা নয়, এটা আলাদা।

আগের ট্রান্সমিটারটার কলকব্জা ভেঙেচুরে নষ্ট করে দিয়েছিল পরমেশ্বর, কিন্তু এটা আনকোরা নতুন এবং আরো জোরালো। মনে হয় এই ট্রান্স-মিটারটা অনেকদূর পর্যন্ত খবর পাঠাতে পারে।

ট্রান্সমিটারটা এখন আর অকেজো করে দিল না পরমেশ্বর। বকলসের চামড়ার ভাঁজে রেখে কুকুরের গলায় সেটা পরিয়ে দিয়ে মনে মনে বলল, 'ভেরি গুড। তুমি মাকড়া মেয়েছেলে হয়ে টেরিফিক খেল লাগিয়ে দিয়েছ। খেলে যাও শালী, খেলে যাও। তবে মনে রেখো, আমার সঙ্গে খেলতে নেমেছ!'

এতক্ষণে পরমেশ্বরের জানা হয়ে গেছে, তার সিক্রেট প্ল্যান আর মুভমেণ্টের খবর কীভাবে বাইরে পাচার হয়েছে। কেনই বা নানা অপারেশনের জায়গায় হেমা হানা দিতে পেরেছে, সেটাও টের পাওয়া গেল।

যাই হোক, বকলসটা পরাবার পর ধীরে সুস্থে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল পরমেশ্বর। আধঘণ্টা পর বেরিয়ে ছোটি সিংকে ব্রেকফাস্ট দিতে বলল। টোস্ট-ডিম ইত্যাদি এলে খেতে খেতে কুকুরটাকে কোলে নিয়ে মনে মনে বলল, 'শালা তোকে এত ভালবাসি, তবু তুই স্পাইয়ের কাজ করলি! খচ্চর বিট্রেয়ার।' একটু থেমে ফিসফিসিয়ে ফের বলল, 'তবে মাইরি এটা মানতেই হবে, তোর জন্যেই আমার এনিমি পার্টির পাত্তা লাগাতে পারলাম। জিতা রহো বেটা।' পিকিনীজটার গালে মিনিট দুয়েক ধরে লম্বা 'কিস' ঝেড়ে টেলিফোন তুলে ঘোরাতে লাগল। এটা তার প্ল্যানের সেকেণ্ড স্টেপ।

একটু পরেই এধার থেকে সোমেশ্বরের গলা ভেসে এল, 'হ্যালো—কে?'

পরমেশ্বর বলল, 'আমি স্যার।'

সোমেশ্বর আগ্রহের গলায় বলল, 'আরে বল কী ব্যাপার।'

'আমি চার দিনের জন্যে কলকাতার বাইরে যাচ্ছি। ভাবছি ছোটি সিংকেও ছুটি দিয়ে যাব।'

'হঠাৎ !'

'একটা আর্জেণ্ট কাজ আছে।'

'কী কাজ ?'

'আমার পার্সোনাল ব্যাপার।' বলেই ঝট করে লাইনটা কেটে দিল পরমেশ্বর। তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, 'ছোটি সিং—'

'জী—' কিচেনের দিক থেকে ছোটি সিং দৌড়ে এল।

'বড়া সাবের কাছে কদ্দিন কাজ করছ ?'

'জী, দো সাল।'

'এর মধ্যে ক'দ্দিন ছুটি পেয়েছ ?'

'এক দফে দো রোজকে লিয়ে।'

'কলকাতায় তোমার কে কে আছে ?'

'বড়ে ভাই, ভাবী, উনকো লেড়কা লেড়কী—'

'আজ দুফারে খানা খাবার পর পুরো চারদিন তোমার ছুটি। এ ক'দিন ভাই-ভাবীর কাছে থেকে এসো।' পকেট থেকে তিনটে দশ টাকার নোট বার করে ছোটি সিংকে দিতে দিতে বলতে লাগল, 'তোমার বখশিশ। সিনেমা-টিনেমা দেখো। কী, খুশী তো ?'

আচমকা ছুটি এবং বখশিশ পাওয়াতে ছোটি সিংয়ের মুখ ফ্ল্যাশ লাইটের মতো আলো হয়ে উঠল যেন। নোটগুলো পকেটে পুরতে পুরতে ঘাড় হেলিয়ে সে বলল, 'জী। আপকো বহোত মেহেরবানি।'

'আচ্ছা, তুমি যাও।'

ছোটি সিং হাওয়ায় উড়তে উড়তে কিচেনের দিকে চলে গেল।

পরমেশ্বর ভাবল, চারদিনের জন্য ছোটি সিংয়ের একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল। এবার কুকুরটার প্রবলেম মেটাতে হবে।

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করে কুকুরটাকে নিয়ে স্ট্রেট হেমার ফ্ল্যাটে চলে এল পরমেশ্বর। কলিং বেল টিপতে হেমাই দরজা খুলে দিয়ে অবাক হয়ে বলল, 'এ কি, আপনি !'

পরমেশ্বর বলল, 'একটা আর্জেণ্ট কাজে আমাকে চার দিনের জন্যে কলকাতার বাইরে যেতে হচ্ছে। আমার কাজের লোকটাও ছুটি নিয়েছে। এখন এই কুকুরটাকে নিয়ে প্রবলেমে পড়েছি। ফাঁকা ফ্ল্যাটে ওকে তো রেখে যাওয়া যায় না।'

হেমা বলল, 'ওকে আমার কাছে রেখে যান।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। এই জন্যেই আপনার কাছে এসেছিলাম। এই নিন—'

হাত বাড়িয়ে কুকুরটাকে ধরতে ধরতে হেমা বলল, 'খানিকটা আগে আপনার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। তখন তো কলকাতার বাইরে যাবার কথা বলেন নি!'

পরমেশ্বর বলল, 'আপনি চলে আসার পর আমার এক ফ্রেণ্ড লোক দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল। আমাকে আজই বাইরে যেতে হবে।' কথাগুলো হানড্রেড পারসেণ্ট মিথ্যে। কিন্তু মিথ্যেগুলো গলা দিয়ে বার করতে মুখের একটা ভাঁজও এদিক ওদিক হল না পরমেশ্বরের, একটা ঢোঁকও গিলল না সে।

হেমা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সে মুখ খোলার আগেই পরমেশ্বর বলল, 'ফিরে এসে এটাকে নিয়ে যাব।'

এতক্ষণে হেমার যেন খেয়াল হল, ফ্ল্যাটের বাইরের প্যাসেজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে পরমেশ্বর। তাকে ভেতরে আসার কথা বলা হয় নি। বিব্রতভাবে হেমা বলল, 'ঐ দেখুন, আপনাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আসুন আসুন—'

পরমেশ্বর বলল, 'প্লীজ এখন আর ভেতরে যেতে বলবেন না। একেবারে সময় নেই। আচ্ছা চলি।'

আরো ঘণ্টা দুয়েক বাদে দেখা গেল নিজের ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে পরমেশ্বর ছোটি সিংকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

লিফটে করে নিচে নেমে ছোটি সিং হাঁটতে হাঁটতে সামনের রাস্তার দিকে চলে গেল। সে এখন সোজা ভবানীপুরে তার দাদা ভাবীর কাছে যাবে। এদিকে পরমেশ্বর তার লিমুজিনে উঠে স্টার্ট দিল। আপাততঃ তার ডেস্টিনেসন সোমেশ্বরের অফিস-কাম-ফ্যাক্টরি।

চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ভেতর সোমেশ্বরের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সে পেঁৗছে গেল পরমেশ্বর। তারপর গাড়িটা বিশাল কমপাউণ্ডের একধারে পার্ক করে ধীরেসুস্থে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংএ চলে এল।

সোমেশ্বর তাঁর চেম্বারেই ছিলেন। পরমেশ্বরকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার? তুমি যে আর্জেণ্ট কাজ নিয়ে বাইরে যাবে, আগে জানাও নি তো! তা ছাড়া কথা বলতে বলতে লাইন কেটে দিলে!'

মজাদার ভঙ্গিতে হাত নাড়তে নাড়তে পরমেশ্বর বলল, 'একসঙ্গে এত কোশ্চেন ঝাড়লে ঘাবড়ে যাব। আগে বসতে দিন।'

পরমেশ্বর মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসলে সোমেশ্বর বললেন, 'এবার বল, হঠাৎ বাইরে যাবার দরকার হল কেন?'

পরমেশ্বর দামী সিগারেটের প্যাকেট থেকে বিড়ি বার করে ধরাতে ধরাতে বলল, 'আমি বাইরে যাচ্ছি না।'

বিমূঢ়ের মতো সোমেশ্বর বললেন, 'তখন বললে যে যাবে!'

'ফলস্ দিয়েছিলাম।'

'মানে!'

'এক মাকড়াকে ক্যাঁচাকলে ফেলতে চাইছি।'

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সোমেশ্বর বলল, 'তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

পরমেশ্বর এবার বুঝিয়ে দিল, 'রণজয় হালদারের সেই ডেঞ্জারাস ডকুমেণ্টগুলো হাতাবার জন্যে আমার ফ্ল্যাটে একটা চোর ইন করেছিল। মনে আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে।'

'সেই খচ্চরটাকে ধরবার জন্যে একটা ফাঁদ পেতেছি। চার দিন আমি কলকাতায় থাকব না বলে অ্যানাউন্স করেছি। আসলে আমি কলকাতা ছাড়ছি না। এই ক'দিন আপনি আমার ফ্ল্যাটে ফোন করবেন না; যাবেনও না।'

একটু ভেবে সোমেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, 'চোরটাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে কী প্ল্যান করেছ, বলবে নাকি?'

পরমেশ্বর বলল, 'না স্যার, আমার প্রফেসানের টেকনিক্যাল নো-হাউ কাউকে জানাই না।' বলতে বলতে টেবলের ওপর যে আধ ডজন ফোন সাজানো ছিল তার একটার ডায়াল ঘুরিয়ে 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজে' অমিতাভকে ধরল এবং তাকে জানিয়ে দিল চার দিন সে কলকাতায় থাকবে না। ফলে তার সঙ্গে চার দিন দেখা হবে না। এই ক'দিন যেন অমিতাভ তাকে ফোন-টোন না করে।

অমিতাভর সঙ্গে কথা শেষ করে লাইন কেটে দিল পরমেশ্বর। কেটে দিয়েই পরমুহূর্তে আবার 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজে'ই ফোন করল। এবার আর অমিতাভকে না; গলার স্বর পুরোপুরি পাল্টে অপারেটরকে ইলেকট্রনিকস ডিভিসনে লাইনটা দিতে বলল। ভয়েস পাল্টাবার কারণ আছে; ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজের অপারেটরটা তার গলা চেনে।

ইলেকট্রনিকস ডিভিসনের ওয়ার্কশপে সুপারভাইজারের ঘরে টেলিফোন রয়েছে। অপারেটর সেখানে কানেকশন দিল। পরমেশ্বর সুপারভাইজারকে বলল, 'কাইণ্ডলি, হরিপদ গড়াইকে একটু ডেকে দেবেন?'

একটু পরেই হরিপদ গড়াই অর্থাৎ লোলের গলা ভেসে এল, 'কে?'

পরমেশ্বর বলল, 'আমি রে—তোর ফোরটীন জেনারেসনের গুরু।'

'তোমার গলাটা এরকম শোনাচ্ছে কেন?'

'গলায় ক্যানসার হয়েছে। এখন যা বলছি শুনে যা। খালি 'হুঁ' 'হাঁ' করে যাবি। যা জিজ্ঞেস করব তার জবাব দিবি। বাজে বাকোয়াস একদম করবি না।'

'ঠিক আছে।'

'এখন তো তোর মর্নিং শিফট্ চলছে?'

'হ্যাঁ।'

'দুটোয় ছুটি তো?'

'হ্যাঁ।

পরমেশ্বর বলল, 'ছুটির পর স্ট্রেট বাড়ি চলে যাবি। সেখান থেকে মেক-আপ বক্সটা নিয়ে প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে চলে আসবি।'

'ঠিক আছে।'

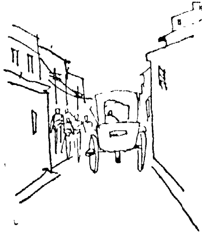
লাইন কাটার পর উঠে দাঁড়াল পরমেশ্বর। সোমেশ্বরকে বলল, 'উঠলাম স্যার। বাই—'

সোমেশ্বর বললেন, 'টেকনিক্যাল নো-হাউ তো জানাবে না। জানতেও চাইছি না। অন্য একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কী?'

'চোরটাকে যদি ধরতে পারো, তার নাম আমাকে জানাবে? কেন না যে সুইশ ব্যাঙ্কের ডকুমেন্ট চুরি করতে আসে সে ফিউচারে অনেক বড় ঝামেলায় ফেলে দিতে পারে।'

এক পলক ভেবে পরমেশ্বর বলল, 'আগে মাকড়াকে ফাঁদে তো ফেলি।'



সোমেশ্বরের অফিস থেকে বেরিয়ে ইলিয়ট রোডে চলে এল পরমেশ্বর। পুরনো এই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পাড়ায় নানাদিকে জিলিপির প্যাঁচের মতো নানা গলি ভাঙাচোরা লঝঝড় টাইপের অগুনতি বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে চোরা বানের মতো ঢুকে আছে।

একটা গলির ভেতর ঢুকে দেড়-দুশো বছর আগেকার ট্যারা-বাঁকা পলেস্তারা-খসা হতচ্ছাড়া চেহারার পুরনো তেতলা বাড়ির সামনে এনে গাড়ি থামালো পরমেশ্বর। এই দুপুরবেলায় গলিটা খুবই নির্জন। দু-চারটে অ্যাংলো বুড়োবুড়ী এধারে ওধারে নিজেদের বাড়ির জানলার পাশে বা বারান্দায় বসে ঝিমুচ্ছিল। ঘোলাটে চোখের কোঁচকানো পর্দা তুলে একবার পরমেশ্বরের গাড়িটা দেখে নিল তারা; তারপর ড্রপ সিন ফেলার মতো চোখের পাতা ফেলে আবার ঝিমুতে লাগল।

পরমেশ্বর কোন দিকে তাকালো না। গাড়ি থেকে নেমে দরজায় 'লক' করে টুই টুই করে শিস দিতে দিতে তেতলা বাড়িটায় ঢুকে পড়ল। ভেতরের নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি। দু ধারে কোথাও রেলিং আছে, কোথাও নেই। এপাশে-ওপাশে দেয়ালের গায়ে আগাছা গজিয়েছে, তা ছাড়া জমে আছে প্রচুর ঝুল। দেয়ালের গায়ে চামচিকে আর আরশোলারা পার্মানেণ্ট কলোনি বসিয়ে দিয়েছে। তেঁতুলে এবং কাঁকড়া বিছেরাও এখানে কয়েক জেনারেশন ধরে আছে।

চেনা জায়গা! আগেও অনেক বার এ বাড়িতে এসেছে পরমেশ্বর। এক সঙ্গে দুটো তিনটে করে সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠতে লাগল সে। পায়ের আওয়াজে দেড় শো বছরের পুরনো সিঁড়িগুলো যেন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। দেয়াল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে চামচিকে আর আরশোলা উড়তে লাগল।

পরমেশ্বর বলল, 'থাম মাকড়ারা, থাম। খজড়াগুলো আমাকে যেন আগে কখনো দ্যাখে নি!'

আরশোলা আর চামচিকে তাড়িয়ে কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর তেতলায় একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল পরমেশ্বর। দরজাটার গায়ে প্ল্যাস্টিকের নেমপ্লেটে লেখা রয়েছে, স্টিফেন মেণ্ডেজ।

দরজার মাথায় একটা কলিং বেলও রয়েছে। সেটা টিপতেই দরজা খুলে একটা মিডল-এজেড অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটার ব্রাউন রঙের চামড়া যেন ট্যান করা। মুখ লম্বাটে, কটা চোখ, ভুরু এবং চুল তামাটে। কপালে আর গালে ছুরির লম্বা দাগ।

মাসকুলার চেহারা লোকটার। চওড়া বুক, সরু কোমর, হাতে পায়ের হাড় মোটা। হাতে এবং কপালে উল্কিতে পরী আঁকা রয়েছে। ডান হাতের কব্জিতে রয়েছে চওড়া রুপোর চেন। তার পরনে টাইট ট্রাউজার আর স্পোর্টসম্যানদের মতো গেঞ্জি, কোমরে চওড়া 007 বেল্ট।

এই দুপুর বেলাতেই চোখের ক'টা মণির চারধারের সাদা জমিটা বেশ লাল হয়ে রয়েছে। মাথাটা অল্প অল্প টলছে। দেখেই টের পাওয়া যায়, লোকটার স্টমাকে এই মুহূর্তে কম করে আধ বোতল হুইস্কি ঢুকে গেছে।

শক্ত শক্ত হাড়ের ফ্রেমে মজবুত চেহারা, হাত এবং বুকের উল্কি, গালের কাটা দাগ, কটা চোখ—সব মিলিয়ে এক সেকেণ্ডে হদিস মেলে লোকটা মারাত্মক ডেঞ্জারাস টাইপের। হাসতে হাসতে এই মালটা পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দিতে পারে।

ঢুলু ঢুলু চোখে কয়েক সেকেণ্ড পরমেশ্বরকে দেখল লোকটা। তারপর দারুণ খুশিতে জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'হাই—' চিৎকারের পর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ককনিতে বাছা বাছা গোটা কয়েক দুর্ধর্ষ খিস্তি ঝেড়ে দু হাতে পরমেশ্বরকে জড়িয়ে ধরল, 'ব্লাডি বাগার, সান অফ এ বীচ, অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি?'

টের পাওয়া যাচ্ছে ওরা পরস্পরের চেনা এবং একজন আরেকজনের জিগরি দোস্ত। পরমেশ্বরও দু-চারটে টেরিফিক খিস্তি ঝেড়ে বলল, 'নানা ঝামেলায় ফেঁসে ছিলাম রে মেণ্ডেজ; তাই তোর কাছে আসতে পারি নি।'

জড়িয়ে ধরেই পরমেশ্বরকে ভেতরে টেনে নিয়ে গেল মেণ্ডেজ।

বাড়ির বাইরেটা লঝঝড় হলে কী হবে, মেণ্ডেজের তেতলার ফ্ল্যাটের ভেতরটা দারুণ 'পশ'। পরমেশ্বর জানে এখানে পাঁচটা বেডরুম, একটা ড্রইংরুম, গোটা চারেক বাথরুম, কিচেন, ব্যালকনি ইত্যাদি ইত্যাদি রয়েছে। কাঠের প্যানেল করা দরজায় জানলায় দামী পর্দা ঝুলছে। ঘরে ঘরে

ফ্যাশনেবল খাট, ওয়ার্ডরোব, ডাইনিং রুমে কাচ-বসানো টেবল, ফোমের গদি-মোড়া চেয়ার, ফ্রিজ, বসার ঘরে সোফা, টিভি সেট, রেকর্ড প্লেয়ার চমৎকার করে সাজানো। দেয়ালগুলো ডিসটেম্পার করা।

মেন্ডেজের সঙ্গে অনেক দিনের বন্ধুত্ব পরমেশ্বরের। যদিও দু'জন দুই প্রফেসানে আছে তবু নানা ব্যাপারে একজনের ওপর আরেকজনকে নির্ভর করতে হয়। নিজেদের মধ্যে ওদের দুর্দান্ত বোঝাপড়া রয়েছে। দরকার হলে একজন আরেকজনকে কো-অপারেট করে থাকে।

মেন্ডেজের পায়ের তলা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত তো বটেই; হাড়ের ভেতর পর্যন্ত তাকে চেনে পরমেশ্বর। মেন্ডেজের বয়েস যখন উনিশ-কুড়ি তখন সে ছিল ক্যালকাটা রেসের নামকরা জকী। তেজী অস্ট্রেলিয়ান ঘোড়াদের ক্যালকাটার মাঠে গ্যালপ করিয়ে আর রেসের বাজি ধরিয়েদের হার্টে প্যালপিটিসন বাড়িয়ে বছর পাঁচ-ছয়েক কাটিয়ে দিয়েছে মেন্ডেজ। তারপর দুম করে টার্ফ ক্লাবের চাকরি ছেড়ে স্মাগলার হয়েছিল সে। কিছুকাল বম্বের সী কোস্টে বেস অফ অপারেশন করেছিল। তখন দুবাই, মাস্কট আর আবু ধাবি থেকে স্পীড বোটে গোল্ড বিস্কুট, ইলেকট্রনিকস গুডস, ফরেন গারমেন্টস এনে ইন্ডিয়ার বড় বড় মেট্রোপলিসে বেচত। কয়েক বছর বাদে হোম সিটি ক্যালকাটায় ফিরে এসেছিল মেন্ডেজ। এখানে এসেও স্মাগলিংটা ছাড়ে নি। ব্যাংকক আর টোকিও থেকে ফরেন রিস্ট ওয়াচ এনে হোল ইন্ডিয়ায় ছড়িয়ে দিত।

এ সব কারবার তো আর সাধু মহাত্মা কিংবা চার্চের পাদ্রীবাবারা করে না। এ সব হচ্ছে অন্ধকার আন্ডার ওয়ার্ল্ডের গেম। কথায় কথায় এসব ব্যাপারে ড্যাগার আর পিস্তল ছোটে। মেন্ডেজের গালে এবং কপালে যে ট্যারা-বাঁকা কাটা দাগ রয়েছে, ওগুলো হলো ধারালো ছোরার স্ট্যাম্প।

নিজেও কথায় কথায় ড্যাগার আর বুলেট চালিয়েছে মেন্ডেজ। কত মাকড়া যে তার গুলি বা ছোরায় জখম হয়েছে, তার হিসেব সে জানে না। তবে বম্বে আর কলকাতা মিলিয়ে গোটা চারেক মার্ডার যে হয়ে গেছে, সেটা পরিষ্কার মনে আছে।

এইভাবেই চলছিল। স্মাগলিং বলে যে একটা টেরিফিক কারবার হোল কান্ট্রি জুড়ে ক্যানসারের মতো ঢুকে পড়েছে গভর্নমেন্ট যেন তার খবর পর্যন্ত রাখত না। আচমকা কী হয়ে গেল সি-বি-আই আর ল্যান্ড সী এবং এয়ার কাস্টমসের লোকেরা ঝাঁক বেঁধে কোমরে বেল্ট কষে স্মাগলারদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। 'রেইড' চলতে লাগল দিন রাত। এয়ারপোর্ট, সী পোর্ট, সব দিকে পুলিসের লোক লাখ লাখ চোখ মেলে তাকিয়ে রইল।

পুরো হিন্দুস্থানের ক'জন স্টার স্মাগলার ঝটাঝট পুলিসের জালে পড়ে গেল। সেই জাল থেকে জেলে ঢুকে কয়েদীদের স্ট্রাইপ-করা ইউনিফর্ম পরে অন্য ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে সিলভারের থালায় লাপসি খেতে লাগল।

এদিকে ব্যাঙ্কক থেকে আসা মেন্ডেজের তিন পেটি ঘড়ি চলে গেল কাস্টমসের হাতে। ঘরে যে লাখ দুই টাকার মাল ছিল তাও যেত। কিন্তু তার আগেই পরমেশ্বরকে ওগুলো বাঁচাবার কনট্রাক্ট দিয়েছিল মেণ্ডেজ। পরমেশ্বর মালটা বাঁচিয়ে দেয়।

স্মাগলিংয়ের ব্যাপারে, বার আট দশেক ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে মেণ্ডেজ। একবার অবশ্য ধরা পড়েছিল। পুলিসভ্যানে করে যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই সময় দুটো আর্মড গার্ডকে জখম করে লাফ দিয়ে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। পরে একটা গার্ড মারা যায়। মোট কথা, জেলের ইউনিফর্ম পরে লাপসি খাওয়ার ইচ্ছা তার কোনকালেই নেই।

আর্মড গার্ড খুন করে পালাবার জন্য পুলিস তাকে শিকারী বুলডগের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

মেণ্ডেজের বায়ো-ডাটা আর ফোটো থানায় থানায় লটকে দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে অ্যানাউন্স করা হয়েছিল, মেণ্ডেজকে ধরে দিতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা রিওয়ার্ড দেওয়া হবে। সেই দারুণ ঝামেলার সময় আবার পরমেশ্বরের কাছে ছুটে এসেছিল মেণ্ডেজ এবং তাকে পুলিস আর ফাঁসির হাত থেকে বাঁচবার কনট্রাক্ট দিয়েছিল। পরমেশ্বর বেশ্ কয়েকটা বছর নানা মেক-আপে তার আসল চেহারাটা ঢেকে রেখে দিয়েছিল। কখনও তাকে সাজানো হতো পাঞ্জাবী শিখ, কখনো চীনা, কখনও গুজরাটী বেনিয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর পুলিসের রোখ খানিকটা কমলে বেশ কয়েক হাজার টাকা ক্যাশ খরচা করে প্ল্যাস্টিক সার্জারি করিয়ে মেণ্ডেজের মুখের চেহারা একেবারে বদলে দিয়েছে পরমেশ্বর। আগে কপালেই একটা ছুরির দাগ ছিল. সার্জিক্যাল অপারেশনের সময় গালে আরেকটা দাগ করে দেওয়া হয়েছে। নাক, ভুরু, থুতনির গঠনও অন্যরকম করা হয়েছে। এখন ওয়ার্ল্ডের টপমোস্ট ক্রিমিনোলজিস্টও একমাস ওয়াচ না করলে তার চেহারার এই চেঞ্জ ধরতে পারবে না। শুধু চেহারাই পাল্টে দ্যায় নি পরমেশ্বর, তার হাঁটার স্টাইল এবং কথা বলার ভঙ্গি পর্যন্ত বদলে দিয়েছে। আগে সামনের দিকে ঝুঁকে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটত, কথা বলত দাঁত খিঁচিয়ে খেঁকিয়ে খেঁকিয়ে। গলার স্বর ছিল সরু এবং চেরা চেরা। এখন সে হাঁটে মেরুদণ্ড টান টান করে, আস্তে আস্তে পা ফেলে পারফেক্ট জেণ্টলম্যানদের মতো, কথাও বলে ধীর অ্যাকসেণ্টে। আজকাল আর খেঁকায় না সে, দাঁতও

খিঁচোয় না। গলার স্বরও অনেকটা মোটা হয়ে গেছে। তার নামও চেঞ্জ করা হয়েছে। আগে সে ছিল স্ট্যানলি, এখন মেন্ডেজ। আগে সে থাকত পার্ক সার্কাসে, এখন উঠে এসেছে ইলিয়ট রোডের এই পাড়ায়। এ সব বদলানোর কারণ একটাই—পুলিস বা অন্য কেউ যাতে মেন্ডেজকে চিনতে না পারে। পরমেশ্বরই তাকে এভাবে আগাগোড়া বদলে দিয়েছে। গলার স্বর, চলাফেরা ইত্যাদি পাল্টে ফেলতে টেরিফিক প্র্যাকটিশ করতে হয়েছে মেন্ডেজকে। তার ফল হয়েছে এই, তার লাইফ সেভড। এ জন্য পরমেশ্বরের কাছে হোল লাইফ সে কৃতজ্ঞ থাকবে।

স্মাগলিংয়ে অনেক ঝঞ্ঝাট, অনেক ট্রাবল। তা ছাড়া সে দাগী হয়ে গেছে! পুলিস রেকর্ডে এবং এখানকার ক্রিমিনোলজির হিস্ট্রিতে তার নামে বোধ হয় আলাদা একটা চ্যাপ্টারই লেখা হয়ে গেছে। তা ছাড়া বয়সও বাড়ছে, রক্তে এবং মাসলে এখন আর আগেকার স্ট্রেংথ নেই। তাই লাইন একেবারে বদলে ফেলেছে মেন্ডেজ। যখন পুলিসের তাড়ায় নানা মেক-আপ নিয়ে ছদ্মবেশে সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে সময় পরমেশ্বরই তাকে এই প্ল্যানটা দেয়।

খুব কম বয়স থেকেই নানা টাইপের আর্মস আর অ্যামুনিসানের দিকে দারুণ ঝোঁক ছিল মেন্ডেজের! যে কোন মডেলের পিস্তল, স্টেনগান, রিভলবার রাইফেল বা লাইট মেশিন গান বার কয়েক নাড়াচাড়া করেই অবিকল সেই মডেলের ঐ রকম রিভলবার-টিভলবার বানিয়ে ফেলতে পারে। তা ছাড়া নানা ধরনের গ্রেনেড আর টাইম বম্বও সে তৈরি করতে পারে। এতে রিস্ক অনেক কম। সারা কাণ্ট্রি জুড়ে এত বিরাট একটা আণ্ডারওয়ার্ল্ড তৈরি হয়েছে যে আর্মস অ্যামুনিসানের দারুণ ডিম্যাণ্ড। ব্ল্যাকমার্কেটীয়ার, স্মাগলার, মাস্তান, কোন কোন লীডারের গুণ্ডাবাহিনী—সবার দরকার রিভলবার বা স্টেনগান, গ্রেনেড বা পিস্তল। ঘরে বসে এসব বানাও আর সাপ্লাই দিয়ে যাও। ব্যাঙ্কক কি টোকিও থেকে মাল এলে এয়ারপোর্টে ধরা পড়বে কি পড়বে না, এই নিয়ে সারাক্ষণ হার্টের প্যালপিটিসন বন্ধ করে রাখার কোন দরকার নেই।

পরমেশ্বরই মেন্ডেজকে বে-আইনি আর্মস তৈরির লাইনে নিয়ে এসেছে। রেসের জকী থেকে ঘাগী স্মাগলার, তারপর আর্মস ম্যানুফ্যাকচারার। পুরোপুরি এ লাইনে আসার পর নিজের সবটুকু সময় আর এনার্জি এতে ঢেলে দিয়েছে মেন্ডেজ। শুধু কাণ্ট্রিমেড মালই না, জাপানী ইটালিয়ান ব্রিটিশ ফ্রেঞ্চ, নানা দেশের মাল গোপনে আনিয়ে সেগুলোর মডেলে তৈরি করে রেগুলার সাপ্লাই দিয়ে যাচ্ছে সে। ক্যাশ বেশ ভালোই আমদানি হচ্ছে এতে। পরমেশ্বরের প্ল্যান এবং পরামর্শ অনুযায়ী লাইফের এই থার্ড স্টেজ

অর্থাৎ আর্মস তৈরির ব্যাপারে এসে সুখেই আছে মেন্ডেজ। ভেরি ভেরি হ্যাপি পার্সন সে। এজন্য পরমেশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই তার। পরমেশ্বর সব দিক থেকে তার ফ্রেন্ড ফিলজফার অ্যান্ড গাইড।

যাই হোক, পরমেশ্বরকে ড্রইং রুমে নিয়ে এসে গাঁক গাঁক করে চেঁচাতে লাগল মেন্ডেজ, 'লিসি—লিসি—'। অন্য সবার সামনে পুরোপুরি বদলে গেলেও পরমেশ্বরের কাছে আগেকার মতো স্ট্যানলি হয়ে যায় সে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লিসি এসে ঘরে ঢুকল। লিসি মেন্ডেজের স্ত্রী। হ্যাঁ, স্ত্রী ছাড়া এখন আর তাকে কী-ই বা বলা যায়। অবশ্য চার্চ-ফার্চ কি ম্যারেজ রেজিস্ট্রেসন অফিসে নিয়ে উইটনেস জুটিয়ে তাকে বিয়ে করে নি মেন্ডেজ। বম্বে কোস্টে যখন স্মাগলিং করে বেড়াচ্ছে সেই সময় তার পার্টনার ছিল একটা গোয়ান পিদ্রু। লিসি ছিল তার বউ—চার্চ সাক্ষী রেখে বিয়ে-করা ধর্মপত্নী।

এলিজাবেথ টেলরের সঙ্গে রিজিড বার্দোটকে পাঞ্চ করলে যা দাঁড়ায় তা হল লিসি। এখন চল্লিশের কাছাকাছি বয়েস। ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস এই বয়সেও ছত্রিশ-চব্বিশ-ছত্রিশ। ইচ্ছা করলে লিসি ওয়ার্ল্ডের সব চাইতে টাফ শুকদেব এবং ব্রহ্মচারীদের ব্যারেক্টারের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে।

লাইফে এখন পর্যন্ত যে ছ'টা মার্ডার মেন্ডেজ করেছে তার একটা হল বম্বেতে তার বিজনেস পার্টনার সেই গোয়ান পিদ্রুটা। পেটে বারো ইঞ্চি ড্যাগার ঢুকিয়ে তার টাকাকেই লোপাট করে কলকাতায় পালিয়ে এসেছিল সে। আশ্চর্য, যে হারামী তার হাজব্যান্ডকে গোরস্থানে পাঠিয়েছে, তার সঙ্গে এখন সতী সাবিত্রীটি হয়ে দিব্যি ঘর করে যাচ্ছে লিসি। দেখেশুনে মনে হয় মেয়েমানুষটা দুর্দান্ত সুখী। ভেরি হ্যাপি।

মেয়েমানুষ যে কী খচ্চর জিনিস, লিসির মতো মালেদের দেখে খানিকটা মালুম পেয়েছে পরমেশ্বর। তাই আর ঐ ক্যাঁচাকলে সে পা ঢোকায় নি।

লিসি ঘরে ঢুকেই ষোল বছরের আদুরে নেকী ছুকরীর মতো দারুণ খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'হাই পরমু—' পরমু অর্থাৎ পরমেশ্বর।

পরমেশ্বরও বলল, 'হাই—'

মেন্ডেজ এবার স্ত্রীকে বলল, 'দেখ সান অফ এ বীচ, ব্লাডি বাগারটা কতদিন পর আমাদের খোঁজ নিতে এল। ও আমাদের টোটালি ভুলে গেছে!'

লিসিও কমলার কোয়ার মতো পুরু রসালো ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'রিয়ালি!'

পরমেশ্বর বলল, 'ভুলে গেলে এলাম কী করে?'

খানিকটা প্রেমের ঝগড়া-টগড়া হবার পর সোনার বাংলার বোতল বার করে আনল লিসি। সেই সঙ্গে প্রচুর খাবার-দাবার। মেণ্ডেজ এবং সঙ্গে ন্যাশনাল এবং ইণ্টারন্যাশন্যাল। কালীমার্কা দিশী মাল সে যতটা পছন্দ করে ঠিক তেমনি আগ্রহ নিয়ে ফরেন হুইস্কি খেয়ে থাকে।

পরমেশ্বর হানড্রেড পারসেণ্ট দেশপ্রেমিক। তাই সে এলে কালীমার্কা বার করে মেণ্ডেজরা।

ড্রিঙ্ক সেসানের সঙ্গে নানা রকম এলোমেলো গল্প চলতে লাগল। গল্পের ফাঁকে এক সময় আসল পয়েন্টে চলে এলো পরমেশ্বর। বলল, 'আমার একটা উপকার করতে হবে মেণ্ডি—।' মেণ্ডেজের আদরের নাম মেণ্ডি।

মেণ্ডেজ বলল, 'সান অফ এ বীচ, উপকার কী বলছ! তুমি আমার ফোরটীন জেনারেশনের গড ফাদার। তোমার জন্যে আমি লাইফ দিয়ে দিতে পারি। বল কী করতে হবে।'

'এক মাকড়াকে নিয়ে আমি ঝামেলায় পড়েছি।'

মেণ্ডেজের বাদামী রঙের চোখ দুটো হেড লাইটের মতো জ্বলে উঠল। সে বলল, 'এনি ট্রাবল উইথ দ্যাট সোয়াইন গড ফাদার? অনেক দিন ড্যাগি (ড্যাগার) রিভি (রিভলবার) ইউজ করছি না। তুমি ব্যাস্টার্ডের বাচ্চাটার নাম বলে দাও, বেরিয়াল গ্রাউণ্ডে ওর জন্যে ছ ফুট জায়গার ব্যবস্থা করে ফেলি।'

পরমেশ্বর বলল, 'আরে না না, ওসব কিছু করতে হবে না। আমাকে গোটা পাঁচেক জোরদার টাইম বম্ব বানিয়ে দিতে হবে। দশ ইঞ্চির বেশি লম্বা আর ছ ইঞ্চির বেশি চওড়া যেন না হয়।'

'গড ফাদার এটা কী রকম হলো? তুমি তো গ্রেনেড রিভলবার ড্যাগার নিয়ে কারবার করো না। তুমি তো প্ল্যানার, ক্লায়েণ্টদের শুধু নো-হাউ সাপ্লাই করে যাও। তোমার মতো নন-ভায়োলেণ্ট বাগার টাইম বম্বের ধান্দা করছে কেন?'

'আমি নন-ভায়োলেণ্টই রয়েছি রে মাকড়া। টাইম বম্বগুলো দরকার দুটো ফ্যাক্টরি উড়িয়ে দেবার জন্যে।'

চোখের তারা দুটো ফিক্সড করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল মেণ্ডেজ। তারপর বলল, 'আমি হোল লাইফে ছ'টা মার্ডার করেছি। আর তুমি ফ্যাক্টরি ওড়াবার যে প্ল্যান করেছ তাতে গড ড্যাম ইট, কত লোক ক্লিয়ার হয়ে যাবে হুঁশ আছে!'

পরমেশ্বর জানালো, রাত্রি দশটার পর ঐ ফ্যাক্টরিগুলো বন্ধ হয়ে যায়।

তখন ভেতরে লোকজন থাকে না। টাইম বম্বগুলোর টাইমিং এমনভাবে করতে হবে যাতে রাত দশটার পর থেকে ভোর চারটের মধ্যে যেন এক্স-প্লোসান হয়। তা হলে ফ্যাক্টরিই উড়বে কিন্তু কোন লোকের গায়ে এতটুকু আঁচড় পড়বে না।

দারুণ মন দিয়ে কথাগুলো শুনে মেণ্ডেজ বলল, 'গড ড্যাম ইট, আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইওর পয়েন্ট।'

'আমি তা হলে নন-ভায়োলেণ্টই আছি তো রে মাকড়া?'

'টু হানড্রেড পারসেণ্ট গড ফাদার। এখন বল, টাইম বম্বগুলো কবে দিতে হবে?'

'কাল দিতে পারবে?'

'কাল কী করে দেব গড ফাদার? মেটিরিয়াল এনে বানাতে হবে। মিনিমাম এক উইক টাইম দাও।'

'ইমপসিবল। আমাকে পরশু দিতেই হবে। হাতে বেশি টাইম নেই।'

ভুরু-টুরু কুঁচকে একটু ভেবে নিল মেণ্ডেজ। তারপর বলল, 'ও-কে গড ফাদার, ব্যাপারটা যখন আর্জেণ্ট তখন গড ড্যাম ইট, পরশুই সাপ্লাই পেয়ে যাবে। কিন্তু—'

পরমেশ্বর বলল, 'কী?'

'বোমাগুলোতে কতটা পাওয়ার দেব, সেটা ঠিক করে নিতে হবে। তোমার ফ্যাক্টরিগুলোর সাইজ কত বড়?'

'একেকটা দশ হাজার স্কোয়ার ফুট করে হবে।'

'গড ড্যাম ইট, ভেরি বিগ সাইজ। অনেকখানি করে পাওয়ার ঠাসতে হবে মনে হচ্ছে।'

'দশ হাজার ফুটের পুরোটা না ওড়ালেও চলবে, হাফটা হাপিস করে দেবার চেষ্টা কোরো।'

'ও-কে গড ফাদার। পরশু কখন মাল ডেলিভারি নেবে?'

একটু চিন্তা করে পরমেশ্বর বলল, 'বারোটা থেকে সাড়ে-বারোটার ভেতর।'

'ডান। গড ড্যাম ইট, ঐ টাইমের ভেতর জিনিস রেডি থাকবে।'

কাজের ব্যাপারটা পাক্কা হয়ে যাবার পর নানা টাইপের গল্প হতে লাগল। বেশির ভাগই রগরগে সেক্সের কেচ্ছা। ফাঁকে ফাঁকে হিন্দী এবং অ্যাকসান মার্কা ফরেন ফিল্ম, পুরানো স্মাগলিংয়ের নানা ঘটনাও এসে পড়তে লাগল। এইভাবে দুপুরটা এক সময় বিকেল হয়ে গেল।

ঘড়িতে যখন চারটে সেই সময় উঠে পড়ল পরমেশ্বর। বলল, 'পরশ্ন বারোটায় আবার দেখা হবে।'

মেণ্ডেজ বলল, 'গড ড্যাম ইট, এত কাল পর এলে। আজকের রাতটা আমাদের কাছে থেকে যাও না। অনেকদিন জুয়া-ফুয়া হচ্ছে না; আর ক'জন ফ্রেণ্ডকে ডেকে হোল নাইট গ্যামব্লিংয়ের সেসান বসিয়ে দিই তা হলে! নাইটটা টেরিফিক এনজয় করা যেত।'

মেণ্ডেজের হাত ধরে পরমেশ্বর বলল, 'আমি একটা বিগ কনট্রাক্ট হাতে নিয়েছি। এখন চার-পাঁচটা দিন এক সেকেণ্ডও ওয়েস্ট করতে পারব না। কাজটা শলা ফিনিস করে ফেলি। তারপর পরপর থ্রি নাইটস তোমার হাতে তুলে দেব। ওয়ান নাইট গ্যামব্লিং, ওয়ান নাইট স্রেফ সোনার বাংলা আর ওয়ান নাইট ক্যাবারে-ট্যাবারে।'

'গড ফাদার, পাক্কা বাত তো?'

'জরুর পাক্কা।'

'গড ড্যাম ইট, সান অফ এ বীচ, তুমি শালা আমার গড ফাদার না, রিয়েল ফাদার।' বলে ঝট করে পরমেশ্বরকে কোলে তুলে এক পাক বোঁ করে নেচে নিল মেণ্ডজ।

মেণ্ডেজের খপ্পর থেকে ছাড়া পেয়ে সাড়ে-চারটে পৌনে-পাঁচটায় প্রিন্সেপ ঘাটে চলে এল পরমেশ্বর। লিমুজিনটা একধারে 'লক' করে একেবারে গঙ্গার ধারের বাঁধানো ঢালে গিয়ে বসল। লোলে তার গাড়িটা চেনে; দূর থেকে গাড়ি দেখে তাকে ঠিক খুঁজে বার করে নিতে পারবে।

এ দিকটা বেশ নির্জন। তবে মাঝ নদীতে অনেকগুলো জাহাজ নোঙর ফেলে আছে; খুব সম্ভব পোর্টে কনজেসন থাকায় 'বার্থ' না পেয়ে এখানে ঘাপটি মেরে রয়েছে। কিছু কিছু 'বার্জ', গাধাবোট, বড় বড় ঢাউস চেহারার নৌকো এবং পোর্ট ট্রাস্টের অগুনতি লঞ্চ এধারে-ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। দূরে হাওড়া ব্রিজের জায়েণ্ট ফ্রেমটা ছবির মতো দেখাচ্ছে। সেটার ওপর দিয়ে পোকার মতো হাজার হাজার মানুষ আর গাড়ি এপার-ওপার করছে। পেছনে ফোর্ট উইলিয়ামের ওয়াটার গেট। তার গা ঘেঁষে যে বিরাট অ্যাসফাল্টের রাস্তাটা গেছে সেখানে ঝড় তুলে প্রাইভেট কার, বাস আর ট্যাক্সি ছুটছে। বাঁ দিকে সেকেণ্ড হাওড়া ব্রিজের অ্যাপ্রোচ রোড। শলা ব্রিজটা কোন দিন হবে কিনা কে জানে। তবে ওটার জন্যে কিছু ধান্দা যে করা হয়েছিল তার মনুমেণ্ট হিসেবে ঐ আধ খ্যাঁচড়া অ্যাপ্রোচ রোডটা ক্যালকাটার আশী লাখ মানুষ বছরের পর বছর দেখে যাবে।

যাক গে, বেশিক্ষ ওয়েট করতে হলো না। মিনিট পনের কুড়ির মধ্যে

মেক-আপের ব্যাগ নিয়ে লোলে হাজির হয়ে গেল। হরিপদ গড়াইর মেক-আপেই সে এসে গেছে। গায়ের চামড়ার সঙ্গে সেঁটে বসতে বসতে বলল, 'গুরু, তোমার ধান্দাটা কী বল তো? শলা ফ্যাক্টরি থেকে বি. টি. রোডে রেসের ঘোড়ার মতো ছুটিয়ে আবার এই গঙ্গার ধারে টেনে আনলে!'

পরমেশ্বর বলল, 'মুখে 'লক' করে চুপচাপ স্রেফ দেখে যা। আর হ্যাঁ, চার পাশে নজর রাখ। কোন খচড়া এদিকে এলে সিগন্যাল দিবি।'

'ও-কে গুরু, দেখি তুমি আবার কী ম্যাজিক দেখাও।'

পরমেশ্বর আর কিছু বলল না। মেক-আপের ব্যাগ থেকে নানা রকম সাজ-সরঞ্জাম আর আয়না-টায়না বার করে দশ-বারো মিনিটের ভেতর নিজের চেহারা পুরোপুরি পাল্টে ফেলল। আয়নায় যার মুখ ফুটে উঠল সে একজন মিডল-এজেড অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। মেক-আপ হয়ে যাবার পর ঝটপট পরনের ফ্যাশনেবল ট্রাউজার বদলে একটা ঢোলা ফুলপ্যাণ্ট আর হাফ শার্ট পরে, চোখে রোল্ড-গোল্ডের গোল চশমা লাগিয়ে মাথায় পুরনো ফেল্ট হ্যাট চাপিয়ে দিল। এ সব ট্রাউজার-ফাউজার মেক-আপের ব্যাগটাতেই ছিল।

লোলে ঠোঁট দুটো পাক্কা ছ ইঞ্চি ফাঁক করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। বলল, 'গুরু, তোমাকে যে আর চিনতে পারছি না। তুমি শলা একেবারে ট্যাঁশ হয়ে গেছ!'

পরমেশ্বর বলল, 'নো গুরু বিজনেস। এখন থেকে যে ক'দিন এই মেক-আপে থাকব, 'আঙ্কল জন' বলে ডাকবি।'

'শ্রীকেষ্টর মতো তোমার যে কত লীলে মাইরি! আমার শলা মাথায় বিলকুল চক্কর লেগে যাচ্ছে। তুমি ট্যাঁশ হলে কেন গুরু?'

'ভ্যাজর‌ং ভ্যাজরং না করে আমার সঙ্গে এখন চল।'

'কোথায়?'

'চল না—'

লোলেকে লিমুজিনে তুলে রেসকোর্সের কাছে এসে ডায়মণ্ডহারবার রোডে পড়ল পরমেশ্বর। তারপর খিদিরপুর, মোমিনপুর, বেহালা, ঠাকুরপুকুর পার হয়ে খাড়া দক্ষিণ দিকে আশি মাইল স্পীডে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

লোলে জিজ্ঞেস করল, 'গুরু, আমরা কি ডায়মণ্ডহারবার যাচ্ছি?'

পরমেশ্বর বলল, 'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'চার ঘণ্টা সময় নষ্ট করতে।'

ডায়মণ্ডহারবার পেঁছে নদীর ধারে ঘণ্টা দুয়েক বসে রইল ওরা। রাত ন'টা সাড়ে-ন'টায় কলকাতায় ফিরে একটা চীনা রেস্তোরাঁয় রাতের ডিনার

ফিনিশ করল। তারপর পরমেশ্বর লোলেকে সঙ্গে করে ফের তার লিমুজিনে উঠল। মিনিট তিন চারেকের ভেতর হ্যারিংটন স্ট্রীটের নির্জন একটা জায়গায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে 'লক' করল এবং প্রায় পাঁচ শো গজ পায়ে হেঁটে তার ফ্ল্যাটে ফিরে এল। গেটকীপার একজন আধবুড়ো অচেনা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান আর তার সঙ্গীর দিকে একবার চোখ তুলেই অন্যমনস্কর মতো অন্য দিকে তাকালো।

ভেতরে ঢুকে পরমেশ্বররা সোজা লিফটের দিকে চলে গেল। একটা লিফট বক্সে ঢুকে ফোরটীনথ ফ্লোরে উঠে পরমেশ্বর বলল, 'তুই এক কাজ করবি, আমি তালা খুলে আমার ফ্ল্যাটে ঢুকে যাবার পর তুই বাইরে থেকে আবার তালা দিয়ে স্ট্রেট লিফটে করে চলে যাবি। আবার কাল দুপুরে ফ্যাক্টরিতে যাবার আগে তালা খুলে দিবি। তালা লাগাবার আর খোলার সময় দেখবি কেউ যেন দেখতে না পায়। এই সব মাল্টিস্টোরিড বাড়িতে একটা সুবিধা আছে—কেউ সিঁড়ি ভেঙে ওঠানামা করে না। সব শালাই লিফটে করে 'হেভেনে' চড়ে, 'হেলে' নামে।' একটু থেমে বলল, 'যা এখন ঐ নিচের দিকের সিঁড়িটার মুখে গিয়ে দাঁড়া। কোন মাকড়া যদি বাই চান্স উঠে আসে সিগন্যাল দিবি। আমি ওপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে নজর রাখব। তালা লাগাবার পর এক সেকেণ্ডও দাঁড়াবি না। এই নে গাড়ির চাবি। গাড়িটা আমাদের বস্তির কাছে রেখে দিবি। কাল বাসে-ট্রামে এখানে আসবি; খবরদার গাড়িটা আনবি না। আর এই হরিপদ গড়াইর মেক-আপ চড়িয়েই এখানে আসবি। ঠিক আছে?' বলে গাড়ির চাবির রিংটা লোলেকে দিল পরমেশ্বর।

চাবি নিতে নিতে লোলে বলল, 'ঠিক হ্যায় গুরু।' বলে নিচে নামার সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

আর ওপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে চোখ রেখে এক সেকেণ্ডের ভেতরে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল পরমেশ্বর। লোলে তক্ষুণি দৌড়ে এসে তালার চাবি ঘুরিয়ে লিফটে করে নিচে উধাও হয়ে গেল।



চীনা রেস্তোরাঁয় খাওয়াটা টেরিফিক হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর সারাদিন দারুণ ছোটাছুটি হয়েছে। ভীষণ টায়ার্ড লাগছিল পরমেশ্বরের ; ঘুমে চোখ দুটো জুড়ে আসছে যেন। কিন্তু আজ রাতে কিছুতেই ঘুমনো চলবে না। ক্যাঁচাকল যেভাবে পাতা হয়েছে তাতে চোর মাকড়াকে একবার না একবার পা ঢোকাতে হবেই। অবশ্য চারদিনের জন্য বাইরে যাবার কথা অ্যানাউন্স করেছে পরমেশ্বর। আজ রাতে যদি খজড়াটা ফাঁদে না পড়ে, কাল পড়বে। কাল না হলে পরশু। পরশু না হলে তার পরের রাত্তিরে। মোট কথা যতক্ষণ না তাকে ধরা যাচ্ছে ততক্ষণ রাত জেগে যেতেই হবে। তবে তার ধারণা, চার রাতের বেশি জাগার দরকার হবে না। তার ভেতরেই যা হবার হয়ে যাবে।

পরমেশ্বর একটা আলোও জ্বালল না! যে লোক বাইরে চলে গেছে তার ফ্ল্যাটে আলো জ্বলাটা খুবই সন্দেহজনক।

যদিও অন্ধকার তবু এখানকার সবই পরমেশ্বরের মুখস্থ। হাতড়ে হাতড়ে নিজের বেডরুমে চলে এল সে। তারপর টুপিটা খুলে বিছানা থেকে বেড শীটটা খুলে নিয়ে খাটের তলায় ঢুকে শুয়ে পড়ল। তার ঘুম দারুণ পাতলা ; খুট করে শব্দ হলেই ভেঙে যায়। যদি চোখ বুজেও আসে একটা আস্ত মানুষ ভেতরে ঢুকলে তার ঘুম ছুটে যাবেই।

শুয়ে শুয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে পরমেশ্বর অপেক্ষা করতে লাগল।

হোল নাইট জেগেই কেটে গেল পরমেশ্বরের কিন্তু যার জন্য এত অ্যারেঞ্জমেন্ট ফার্স্ট নাইটে সে এল না।

দিনের বেলায় খুব একটা রিস্ক নেই। যার আসার কথা সে রাতের অন্ধকারে ছাড়া জানলার কাটা গ্রিলের ভেতর দিয়ে ঢুকবে না। কারণ তারও

রিস্ক আছে। দিনের বেলা ওভাবে ঢুকতে হলে কারো-না-কারো চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। তাতে হাজার গণ্ডা ঝামেলা।

কাজেই খাটের তলা থেকে বেরিয়ে ওপরে উঠে ঘণ্টা চারেক ফাইন একটা ঘুম লাগল পরমেশ্বর। লোলে আসবে দুপুর একটায়। ততক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে অসুবিধা নেই।

বারোটার সময় উঠে একবার ভাবল চান-ফান করে নেয়। তক্ষুণি তার খেয়াল হল বডিতে জল পড়লে মেকআপ উঠে যাবে। তাতে যোশেফ ফ্রিসকিনের ভেতর থেকে আবার অরিজিন্যাল পরমেশ্বর বেরিয়ে পড়বে। অবশ্য পরমেশ্বর নামে এই হাই-রাইজ অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে কেউ তাকে চেনে না। কিন্তু রণজয় হালদারকে তো চেনে।

ফ্রিজে ডিম, মাখন এবং রুটি-ফুটি আছে। মুখ-টুখ ধুয়ে ডাবল ডিমের ওমলেট বানিয়ে রুটি-মাখন দিয়ে খেয়ে নিল পরমেশ্বর।

খাওয়া যখন শেষ হয়েছে সেই সময় একবার কলিং বেল বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল পরমেশ্বর। এখন কে কলিং বেল টিপতে পারে? কবজি উলটে একবার ঘড়ি দেখল সে। বারোটা পঁয়তাল্লিশ। লোলের আসার সময় অবশ্য হয়েছে কিন্তু সে কি কলিং বেল টিপবে? নাকি অন্য কেউ খচড়ামো করে টিপছে?

নার্ভগুলো টান টান করে খানিকক্ষণ বসে রইল পরমেশ্বর। কিন্তু না, আর তো কলিং বেল বাজল না। আস্তে আস্তে এক সময় উঠে পড়ল সে। তারপর সোজা বাইরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। আর তখনই চোখে পড়ল দরজার গায়ে একটা গোল কাচ বসানো রয়েছে। এই কাচটা দিয়ে বাইরের করিডরের খানিকটা চোখে পড়ে। কিন্তু বাইরে থেকে ভেতরের কিছু দেখা যায় না।

পরমেশ্বর কাচে চোখ রাখল এবং তক্ষুণি টেনসানটা কেটে গেল। করিডরে হরিপদ গড়াইর মেক-আপে লোলে দাঁড়িয়ে আছে। সট করে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়ল পরমেশ্বর। তারপর চোখের ইশারায় চুপচাপ ফ্ল্যাটের তালা বন্ধ করতে বলে সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। উদ্দেশ্য কেউ নিচের দিক থেকে আচমকা উঠে এলে লোলেকে সিগন্যাল দেবে। অবশ্য এখান থেকে লিফট আর প্যাসেজের ওধারে ওপরে ওঠার সিঁড়ির ওপর নজর রাখা সম্ভব না। দুম করে যদি কেউ ওপাশ থেকে নেমে আসে তখন কিছু একটা বলা বা করা যাবে। অবস্থা যেমন দাঁড়াবে তেমন ব্যবস্থা।

দু-তিন সেকেণ্ডের মধ্যে তালা আটকে ফেলল লোলে। পরমেশ্বর

তাকে কাছে যাবার জন্য চোখ দিয়ে ইশারা করল। লোলে আসতেই চাপা গলায় বলল, 'চল—'

চুপচাপ নিচের ফ্লোরে এসে দু'জনে লিফট বক্সের সামনে দাঁড়াল।

লোলে চাপা গলায় বলল, 'গুরু নিচে এসে লিফটে চড়ছ যে?'

পাশাপাশি দুটো লিফট বক্স। সাইন দেখে বোঝা যায় একটা লিফট নিচে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে রয়েছে, আরেকটা লিফট ওপরে উঠছে। নিচের লিফটটাকে ওপরে আনার জন্য বোতাম টিপতে টিপতে পরমেশ্বর বলল, 'কেউ যাতে ডাউট না করে সেই জন্যে নিচে এসে লিফট ধরছি।'

'সমঝ্ গিয়া।'

একটু ভেবে পরমেশ্বর বলল, 'তুই মাকড়া ওভাবে কলিং বেল টিপতে গেলি কেন? কেউ যদি দেখে ফেলত?'

লোলে বলল, 'আমাকে তেমন মাকড়া পেয়েছ নাকি? শ্লা অ্যাদ্দিন তা হলে তোমার কাছে অ্যাপ্রেন্টিস হয়ে রইলাম কেন? চারদিক ভালো করে দেখে তবে না কলিং বেল টাচ করেছি। তা ছাড়া—'

'কী?'

'তুমি গুরু আগে থেকে কিছু বলে দাও নি। আমি যে এসেছি, সিগন্যালটা তোমাকে দেব কী করে? অনেক প্ল্যান করে তবে কলিং বেল টিপেছি।'

কথাটা ঠিকই বলেছে লোলে। সে যে এসেছে, কলিং বেল না বাজিয়ে সেটা জানান দেবেই বা কী করে? আর তালাবন্ধ ফ্ল্যাটে বসে লোলের আসার খবরটা পরমেশ্বর পাবেই বা কেমন করে? আগেই ওকে এ ব্যাপারে বলে দেওয়া উচিত ছিল।

পরমেশ্বর বলল, 'কাল থেকে এক কাজ করবি, পৌনে একটা থেকে একটার ভেতর এখানে এসে চারদিক ভালো করে দেখে একবার কলিং বাজিয়ে দু সেকেণ্ড থেমে আরেকবার বাজাবি। এভাবে দুবার বাজালে বুঝতে পারব তুই এসেছিস।'

'ঠিক হ্যায় গুরু। লেকেন—'

'আবার কী?'

'তুমি মাইরি নিজের ফ্ল্যাটে এখন থেকে চোরের মতো তালা আটকে বসে থাকবে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কদ্দিন থাকবে?'

'ম্যাক্সিমাম আর তিন দিন।'

'গুরু, একখানা যা কনট্রাক্ট নিয়েছিলে মাইরি !'

পরমেশ্বর উত্তর দিল ন, দাঁত বার করে একটু হাসল।

লোলে আবার কী বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না। গ্রাউণ্ড ফ্লোর থেকে লিফটটা তখনই উঠে এল। দরজা খুলে ওরা ভেতরে ঢুকতে যাবে, সেই সময় চোখে পড়ল পাশের লিফটটা ওপর থেকে নিচে নেমে যাচ্ছে। ওটার ভেতরে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে হেমা—হেমা সারিন।

লোলে পরমেশ্বরের কানের ভেতর মুখটা ঢুকিয়ে গুজগুজিয়ে উঠল, 'তোমার সেই এইট এইট্টি ভোল্ট গুরু।'

পরমেশ্বর একবার ভাবল, ছুকরি তা হলে এতক্ষণ ফ্লাটেই ছিল! এতটা সময় তো সে থাকে না। ওর কী ধান্দা কে জানে। অন্যমনস্কর মতো বলল, 'হুঁ, নিচে নেমে কোন কথা বলবি না। মালের দিকে তাকাবিও না।'

'অল রাইট গুরু।'

খানিকটা পর নিচে নেমে ওরা দেখল হেমা পাশের লিফট বক্সটা থেকে বেরিয়ে পার্কিং জোনের দিকে যাচ্ছে।

কোনদিকে না তাকিয়ে পরমেশ্বর আর লোলে গেটের দিকে হাঁটতে লাগল। এই প্রকাণ্ড হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ে একশোটার ওপর ফ্ল্যাট। বাঙালী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, কেরেলী, কুর্গী—ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সব প্রভিন্সের লোক তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে ব্রিটিশ, আমেরিকান, নেপালী, বাংলাদেশী, চেক, হাঙ্গারিয়ান ইত্যাদি ইত্যাদি। একেবারে পুরোপুরি কসমোপলিটান অ্যাটমসফীয়ার। এখানে নানা দরকারে নানা টাইপের লোক নানা ফ্ল্যাটে দিনরাত আসছে, যাচ্ছে। খুব একটা সন্দেহ না হলে কেউ কারো দিকে নজর রাখে না।

এই দুপুরবেলায় গ্রাউণ্ড ফ্লোরে বেশ কিছু লোকজন রয়েছে, রয়েছে দারোয়ান আর গেটকীপাররা, কিন্তু কেউ পরমেশ্বরদের মার্ক করল না।

ওরা যখন গেটের কাছে চলে এসেছে সেই সময় হেমা তার জাপানী টোয়োটা গাড়িটা নিয়ে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে ঢাউস গো-গো চশমার ভেতর দিয়ে উদাসীনভাবে দেখল একটা মাঝবয়সী অ্যাংলো সামনের দিকে ঝুঁকে তার এক সঙ্গীকে গায়ের সঙ্গে ঝুলিয়ে পা টেনে টেনে বাইরের রাস্তায় যাচ্ছে।

রাস্তায় আসতেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল পরমেশ্বর। সেটা থামিয়ে লোলেকে নিয়ে উঠতে উঠতে বলল, 'সদর স্ট্রীট—'

লোলে বলল, 'ওখানে কী গুরু?'

'হোটেলে।'

'হোটেলে কী হবে?'

'আমি থাকব।'

'নিজের ফ্ল্যাটে না হয় থাকবে না। বি-টি রোডে বাড়ি আছে—সেখানে চল।'

'উঁহু। আমার ক্যালকাটার ভেতর থাকা দরকার।'

'মাইরি তুমি যে শলা দিনরাত কী প্ল্যান করে যাচ্ছ তুমিই জানো। লেকেন—'

'কী?'

'তুমি তো আমাকে হোটেলে নিয়ে যাচ্ছ। এধারে ডিউটি আছে যে; লেট হয়ে যাবে।'

'হোটেলে আমার ঘরটা চিনিয়েই তোকে ছেড়ে দেব। এই ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাবি। আর শোন, হোটেলে আমার নাম হবে যোশেফ ফ্রিসকিন।'

'সমঝ লিয়া গুরু!'

'কী সমঝালি?'

'চেহারাতেই শুধু না, নামেও শলা সেণ্ট পারসেণ্ট ট্যাঁশ হতে চাইছ! তোমার ব্রেনে যে কী চক্কর চলছে যীশুখেষ্ট থেকে মা কালী পর্যন্ত কেউ মাইরি ধরতে পারবে না।'

পরমেশ্বর উত্তর দিল না। সদর স্ট্রীটে একটা ছোটখাটো হোটেলে এসে একটা ঘর নিল পরমেশ্বর। হোটেল রেজিস্টারে লেখানো হল,—যোশেফ ফ্রিসকিন, পেশা বিজনেস, বয়স ফিফটি সেভেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সব লিখে রিসেপশানে জানালো আপাততঃ একটা তোয়ালে এবং সাবান-টাবান দিতে। কেন না তাড়াহুড়োয় সুটকেশ সঙ্গে করে আনতে পারে নি, পরে সে সব আসছে।

রিসেপশনিস্ট-কাম-বিল ক্লার্ক যুবতী অ্যাংলোইণ্ডিয়ানটি তক্ষুনি বলল, 'সিওর স্যার। এক্ষুণি সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

ফর্মালিটি কমপ্লীট হবার পর তিন দিনের টাকাটা পুরো অ্যাডভ্যান্স পেমেণ্ট করে রিসিট নিল পরমেশ্বর। আর দারুণ ব্যস্তভাবে একটা বয়কে ডেকে রিসেপশনের ছুকরিটা দোতলার একটা ঘরের চাবি দিয়ে বলল, 'সাবকো লে যাও।'

দোতলায় যেতে যেতে পরমেশ্বর লোলেকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'বাড়ি থেকে একটা সুটকেশে করে কাল ক'টা লুজ ফুল প্যাণ্ট আর শার্ট দিয়ে যাবি। সেই সঙ্গে মেক-আপের ব্যাগটাও।'

—

'ও-কে। আর?'

'আর আজ ছুটির পর এগারোটার ভেতর এখানে চলে আসবি। আমি ডিনার খেয়ে রেডি হয়ে থাকব। তুই এলেই আমার ফ্ল্যাটে চলে যাব। আমাকে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে তুই ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরবি। আবার কাল দুপুর একটায় এসে আমাকে ওখান থেকে বার করবি। এইভাবে ক'দিন চলবে। মাকড়া তোর একটু কষ্ট হবে কিন্তু কিছু করার নেই।'

'ফিকর মাত করো গুরু, থুড়ি আঙ্কল জন। আমার তখলিফের কথা ভেবো না। তুমি যা অর্ডার দেবে তা-ই হবে। তা হলে আমি এখন হড়কে যাই—'

'যা'।

লোলে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'কালকের দিনটা শুধু বারোটায় এসে ফ্ল্যাটের তালা খুলে দিস।'

লোলে ঘাড় হেলিয়ে চলে গেল।



সেকেণ্ড নাইটেও লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে বেডরুমের খাটের তলায় শুয়ে রইল পরমেশ্বর। কিন্তু না, যার জন্য এই ফাঁদ সে এল না।

কালকের মতোই সকালবেলা খাটের তলা থেকে বেরিয়ে চা-অমলেট এবং টোস্ট বানিয়ে খেল পরমেশ্বর। তারপর কাঁটায় কাঁটায় বারোটায় দু'বার কলিং বেলের সিগন্যাল শুনতেই বাইরে বেরিয়ে দেখল, লোলে এসে গেছে। ফ্ল্যাটে দ্রুত তালা লটকে লোলেকে নিয়ে লিফটে করে নেমে গেল। যেতে যেতে বলল, 'রোজ রোজ দুপুর বেলা এভাবে দু'জনকে বেরুতে দেখলে কোন খজড়ার নজরে পড়ে যাব। কাল ইলেকট্রিক মিস্তিরিদের যন্ত্র-ফন্ত্রের যে ব্যাগটা আছে সেটা হাতে ঝুলিয়ে আসবি।'

লোলে বলল, 'যে মাকড়া দেখবে সে মনে করবে আমরা ইলেকট্রিকের লাইন-টাইন সারাতে এসেছি, তাই না আঙ্কল জন?'

'তা-ই।'

আজ আর হেমার সঙ্গে দেখা হল না। হয়ত সে বেরিয়ে গেছে কিংবা নিজের ফ্ল্যাটেও থাকতে পারে। যেখানেই থাক, তার সঙ্গে দেখা হোক, সেটা চায় না পরমেশ্বর। চেনা লোকজনের চোখে ধুলো ছিটিয়ে এখন চলতে চায় সে।

একটু পর দু'জনে হাইরাইজ বিল্ডিংটার কমপাউণ্ড পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় এসে পড়ল। আজ আর সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাক্সি মিলল না; মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর তবে পাওয়া গেল।

লোলেকে সঙ্গে করে ট্যাক্সিতে উঠে পরমেশ্বর বলল, 'ইলিয়ট রোড চালিয়ে—'

পাঞ্জাবী ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিলে লোলে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল,

'এ কি আঙ্কল, তুমি না সদর স্ট্রীটের হোটেলে তাঁবু ফেলেছ! তা হলে ইলিয়ট রোডে এই দুপুরবেলা রগড়াতে যাচ্ছ যে?'

'চুপ করে বসে থাক।'

'তোমার বডিতে বডি ঠেকিয়ে পাঁচ বছর কাটিয়ে দিলাম লেকেন তোমাকে মাইরি এখনও বুঝতে পারলাম না।'

পরমেশ্বর দাঁত বার করে স্লাইট হাসল শুধু, মুখে কিছু বলল না।

কয়েক মিনিটের ভেতর ট্যাক্সিটা ইলিয়ট রোডে পেঁছে গেল। বড় রাস্তাতেই ভাড়া-ফাড়া চুকিয়ে দিয়ে লোলেকে গায়ের সঙ্গে ঝুলিয়ে সাপের প্যাঁচের মতো গলির-পর-গলি পার হয়ে সেই লঝঝড় তেতলা বাড়িটায় ঢুকল পরমেশ্বর এবং কাঠের ঝরঝরে সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে মেণ্ডেজের ফ্ল্যাটের সামনে এসে কলিং বেল টিপল।

দশ সেকেণ্ডের মধ্যে দরজা খুলে মেণ্ডেজ মুখোমুখি দাঁড়াল। যোশেফ ফ্রিসকিনের মেক-আপ থাকার জন্য পরমেশ্বরকে চিনতে পারছিল না সে। সতর্ক ধারাল চোখে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'গড ড্যাম ইট, হু আর ইউ?'

পরমেশ্বর বলল, 'গড ড্যাম ইট, নিজের গডফাদারকে চিনতে পারলে না মাকড়া?'

ফ্ল্যাশ লাইটের মতো মেণ্ডেজের গোটা মুখের ম্যাপটা আলো হয়ে উঠল। দু হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'যা মেক-আপ চড়িয়েছ, আমি কেন, আমার ফোরফাদারও তুমি না বললে চিনতে পারত না। এসো এসো—' বলতে বলতে তার চোখ পড়ল লোলের দিকে। গলার স্বরটা ঝপ করে নামিয়ে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ কে গডফাদার?'

পরমেশ্বর ভেতরে যেতে যেতে বলল, 'আমার অ্যাসিস্টাণ্ট-কাম-কনফিডেন্সিয়াল সেক্রেটারি।'

লোলে সম্পর্কে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না মেণ্ডেজ। ভেতরে নিয়ে গিয়ে ড্রইং রুমে দু'জনকে বসিয়ে বলল, 'কী খাবে বল গডফাদার?'

'নাথিং। আমার মাল রেডি?'

'সিওর। গডফাদার তুমি বলে গেছ। হাতে অনেক অর্ডার আছে। সে সব ফেলে দু রাত জেগে তোমার মাল বানিয়ে রেখেছি। কিন্তু লাঞ্চ না খেলে ডেলিভারি পাবে না।'

মেণ্ডেজ মাকড়াটা পরমেশ্বরকে খুবই ভালোবাসে। যখনই সে এখানে আসে, কিছু না খেয়ে যাবার উপায় নেই। পরমেশ্বর বলল, 'গড ড্যাম ইট,

তোমাকে নিয়ে পারা যায় না। হাতে সময় নেই। যা করার তাড়াতাড়ি কর। কুইক—'

'সিওর "বস"।' বলেই চেঁচিয়ে উঠল মেণ্ডেজ, 'লিসি—'

একটু পর ড্রইংরুমে লিসি ছুটে এল। তারপর এল সোনার বাংলা, পাঁঠার কলজে ভাজা, চিকেন রোস্ট, স্যাণ্ডউইচ, হ্যাম ইত্যাদি ইত্যাদি।

খাওয়া দাওয়া এবং এন্তার খিস্তি খাস্তা আর গল্পের ফাঁকে মেণ্ডেজ বলল, 'গডফাদার তুমি এই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের মেক-আপ নিয়েছ কেন?'

পরমেশ্বর বলল, 'যে অপারেশনটা করতে যাচ্ছি তার জন্যে এটা দরকার।'

মেণ্ডেজ আর কিছু জিজ্ঞেস করল না এ সম্পর্কে।

ড্রিঙ্ক এবং লাঞ্চ শেষ হবার পর মেণ্ডেজ পাঁচটা টাইম-বম্ব নিয়ে এল। প্রত্যেকটা দশ ইঞ্চির মতো লম্বা আর পাঁচ ইঞ্চির মতো চওড়া। এই ডেঞ্জারাস মালগুলোর সঙ্গে ঘড়ির মতো একটা করে জিনিস আটকানো রয়েছে।

পরমেশ্বর বলল, 'মালগুলো কেমন করে অপারেট করতে হবে আমার অ্যাসিস্টাণ্টকে বুঝিয়ে দাও।' লোলের দিকে ফিরে বলল, 'মাকড়া ভালো করে বুঝে নে।'

মেণ্ডেজ বলল, 'গড ড্যাম ইট, বুঝবার কিচ্ছু নেই। ভেরি সিম্পল ব্যাপার। জিনিসগুলোকে শুধু জায়গা মতো বসিয়ে দিতে হবে। তারপর দেখবে অটোমেটিক্যালি ওগুলো ওদের কাজ করে যাবে।'

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'জিনিসগুলো কী রকম কাজ করবে মেণ্ডেজ?'

'গডফাদার, এই এক একটা মাল দু হাজার ফুট করে জায়গা ক্লিয়ার করে দেবে। তোমার দুটো ফ্যাক্টরিতে মালগুলো বসাবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'দুই ফ্যাক্টরির দশ হাজার স্কোয়ার ফুট উড়ে যাবে।'

'টাইমিংটা কী রকম দিয়েছ?'

'রাত দুটোয় এক্সপ্লোসান হবে।'

'ফাইন। তা হলে এবার ওঠা যাক।'

মেণ্ডেজ প্রত্যেকটা টাইম-বম্বে তিনটে করে চুমু খেয়ে বলল, 'ডারলিং, তোমাদের পেটের ভেতর অনেক স্ট্রেনথ পুরে দিয়েছি। ভালো করে কাজ দেখাবি। মনে রাখিস, তোরা আমার রিপ্রেজেণ্টেটিভ। আমার প্রেসটিজ তোদের হাতে।' বলে চমৎকার একটা কাপড়ের প্যাকেটে ওগুলো পুরে পরমেশ্বরের হাতে তুলে দিল।

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'এগুলোর প্রাইস কত দেব?'

মেণ্ডেজ বলল, 'গডফাদার, প্রাইসের কথা বললে আমাকে স্নুইসাইড করতে হবে। একদিন তুমি আমার লাইফ সেভ করেছ। তোমার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। গড ড্যাম ইট, প্রাইসের কথা আর সেকেণ্ড টাইম মুখে আনবে না।'

আগেও মেণ্ডেজকে দিয়ে দু-একটা কাজ করিয়েছে পরমেশ্বর। কিন্তু কোনবারই দাম নেওয়াতে পারে নি। সে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার দোস্তি আছে, ঠিক আছে। কিন্তু এটা তো তোমার প্রফেশান।'

'গডফাদার, আমার প্রফেশান একদিকে, তুমি আরেক দিকে। তুমি আমার জন্যে যা করেছ, গড ড্যাম ইট, যদি আমরা সেম এজের না হতাম স্ট্রেট তোমাকে "ফাদার" বলে ডাকতাম।'

'ঠিক আছে, আমরা এখন চললাম। পরে দেখা যাবে।' পরমেশ্বর হাতে বোমার প্যাকেটটা ঝুলিয়ে লোলেকে নিয়ে উঠে পড়ল।

মেণ্ডেজ ওদের সঙ্গে বাইরে দরজা পর্যন্ত এল। তারপর বলল, 'সেলিব্রেট করার কথাটা মনে আছে তো?'

'সিওর—'

'ওয়ান নাইট ওনলি ড্রিঙ্ক সেসান, ওয়ান নাইট গ্যামব্লিং—'

'অ্যাণ্ড ওয়ান নাইট ক্যাবারে।'

'রাইট গডফাদার। গড ড্যাম ইট, বেস্ট অফ লাক।'

তেতলা থেকে নীচে নেমে নানা প্যাঁচালো গলিঘুঁজি ঘুরে ইলিয়ট রোডে এসে পরমেশ্বররা ট্যাক্সি ধরল। ড্রাইভারকে বলল, 'সদর স্ট্রীট—'

হোটেলে যেতে যেতে টাইম-বম্বের প্যাকেটটা লোলের হাতে দিতে দিতে পরমেশ্বর চাপা নীচু গলায় বলল, 'খুব সাবধান। সবার চোখে ধুলো ছিটিয়ে তিনটে মাল তোর ফ্যাক্টরিতে সেই ফোকরে সেট করে দিবি। বাকী দুটো সেট করবি ওষুধের ফ্যাক্টরিতে। কেউ যেন টের না পায়।'

লোলে একটা হাত তুলে পরমেশ্বরকে থামিয়ে দিল, 'ফিকর্ মাত করো আঙ্কল। তোমার বডিতে ফাইভ ইয়ার্স বডি ঠেকিয়ে আছি। লোককে বুদ্ধু বানিয়ে কোন্ মাল কোথায় গুঁজে দিতে হয় তা আমি শিখে ফেলেছি।'

এক সময় ট্যাক্সিটা সদর স্ট্রীটে পেঁৗছে গেল। পরমেশ্বর নেমে গিয়ে বলল, 'তোকে আর নামতে হবে না। ট্যাক্সিটা নিয়ে ফ্যাক্টরিতে চলে যা। রাত্তিরে এখানে এসে আমাকে আবার আমার ফ্ল্যাটে ঢুকিয়ে দিয়ে যাস। আরেকটা কথা—'

'বলো—'

'মালগুলো জায়গা মতো সেট করে যদি পারিস আমার হোটেলে একটা ফোন করে দিস। বুঝতেই পারছিস, ওগুলোর জন্যে আমার শলা ব্লাডপ্রেসার এখন থেকে চড়তে থাকবে।'

'ফোন করে দেবো আঙ্কল। ব্লাড থেকে প্রেসার আর ব্রেন থেকে ভাবনা চিন্তাটা আউট করে দুপুরে টেনে একটা ঘুম ঝেড়ে দাও।'

পরমেশ্বর বলল, 'জিনিসগুলো বসানো হলে ফোনে বলবি, পিসেমশাইর জ্বর ছেড়ে গেছে।'

'ও-কে।'

লোলে চলে গেল। আর পরমেশ্বর সামনের দিকে ঝুঁকে পা টেনে টেনে হোটেলে ঢুকে পড়ল।

লোলে ঘুম লাগাতে বলেছিল কিন্তু ঘুমোতে পারে নি পরমেশ্বর। এয়ারকুলার লাগানো হোটেলের আরামদায়ক ঘরে ফোমের বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুধু এপাশ-ওপাশ করেছে। লোলে দারুণ খলিফা মাল; তার ওপর যে-কোন কাজের দায়িত্ব দিয়ে ভরসা রাখা যায়। তবু খুব একটা নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না পরমেশ্বর। এত বড় অপারেশনের ভার তাকে আগে আর কখনও দেওয়া হয় নি। মাকড়া টাইম বম্বগুলো বসাতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে তা হলে ওর জান বিলকুল কিচাইন হয়ে যাবে। শুধু তাই না, এত বড় অপারেশনটার বারোটা বাজবে। তার চাইতে নিজের হাতে কাজটা করলেই ভালো হতো।

ভাবতে ভাবতে পরমেশ্বরের ব্লাড প্রেসার এবং সুগার হুড়হুড় করে যখন ওঠানামা করছে সেই সময় লোলের ফোন এল। মাউথপীসে মুখ ঢুকিয়ে চাপা উত্তেজিত গলায় সে বলল, 'পিসেমশাইর জ্বর ছেড়ে গেছে।'

টেনশানটা সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেল পরমেশ্বরের। লাইন ছেড়ে দিয়ে এবার সে টানা চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারবে।



রাত্তিরের শিফটে ডিউটির পর কালকের মতো আজও পরমেশ্বরের হোটেলে চলে এল লোলে। আসামাত্র একটা বেয়ারাকে ডেকে ডিনার দিতে বলল। খেতে খেতে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'মালগুলো রাখার সময় কেউ দ্যাখে নি তো?'

লোলে বলল, 'তোমার মতো ওয়ার্ল্ডের বেস্ট জিনিয়াস এটা কী বলছে আঙ্কল জন?'

'কেউ যদি দেখেই ফেলত, তোমার পাশে বসে কি এখন মুরগির ঠ্যাং চিবুতে পারতাম। হয় পুলিস নইলে জনগণ আমার ছাল ছাড়িয়ে বঙ্গো বানিয়ে বাজাতো না?'

'রাইট। কাল থেকে আর ফ্যাক্টরিতে যাস না। তোর চাকরি 'নট' হয়ে গেল।'

'মাথা খারাপ! আজ রাত দুটোয় যে ফ্যাক্টরি সাফ হয়ে যাচ্ছে কাল সেখানে যাব কি চা-চা-চা ড্যান্স করতে!'

'এখন থেকে তুই বি. টি. রোডে আমাদের বাড়িতেই থাকবি আর জগদীশের মালের দোকানে অফিস করবি। শলা, কত ক্লায়েন্ট যে হড়কে গেল এর মধ্যে! এদিককার ঝামেলা চুকিয়ে দু-একদিনের ভেতরে ঘরে "ইন" করে যাব।'

ডিনার-টিনার খাওয়া হলে একটা ট্যাক্সি করে রুটিনমাফিক পরমেশ্বরের ফ্ল্যাটে এসে তাকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা আটকে লোলে চলে গেল। আর পরমেশ্বর তার বেডরুমের খাটের তলায় গিয়ে আগের দু'রাতের মতো শুয়ে পড়ল।

রাত দেড়টা-দুটোর সময় যখন চোখ জুড়ে এসেছে, সেই সময় পরমেশ্বরের কানে খুট করে একটা আবছা আওয়াজ এল। নার্ভগুলো দারুণ সজাগ

ছিল। অন্ধকারে দ্রুত তাকিয়ে পরমেশ্বর দেখল, মাথার দিকের সেই জানলাটা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে।

ইচ্ছা করেই জানালাটায় ছিটকিনি আটকায় নি পরমেশ্বর, এমনি ভেজিয়ে রেখেছিল। সে দেখল কাটা গ্রিলের ফাঁক গলে একটা বডি ঘরের ভেতরে ঢুকছে। পরমেশ্বরের বুকের প্যালপিটিশন কয়েক সেকেণ্ডের জন্য থমকে গেল যেন।

যে মালটি ঘরের ভেতর ঢুকেছে সে এবার স্ট্রেট হয়ে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অন্ধকারেই চারদিক সার্ভে করে নিল। তারপর দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে ওয়াল-আলমারির কাছে চলে গেল।

এর পর মাকড়া কী করবে, হুড়হুড় করে মুখস্থ বলে দিতে পারে পরমেশ্বর। এতক্ষণ খাটের তলায় উপুড় হয়ে শুয়ে চোখের তারা ফিক্সড করে সব দেখে যাচ্ছিল সে। এবার খুব আস্তে আস্তে এতটুকু আওয়াজ না করে বডিটা ঘষটাতে ঘষটাতে খাটের পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে এল সে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দেয়াল ঘেঁষে যে মালটি ওয়াল আলমারির কাছে দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে পাঁচ ফুট পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এ ঘরের সুইচ বোর্ডটা এখানেই। পরমেশ্বর বাঁ হাতটা তুলে লাইটের সুইচটার ওপর আঙুল রাখল।

খুট করে একটা শব্দ হল। অন্ধকার পাতলা আলকাতরার মতো হলেও টের পাওয়া যাচ্ছে, ওয়াল-আলমারিটা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। পরমেশ্বর মনে মনে দুর্ধর্ষ খিস্তি ঝেড়ে বলল, 'খোল মাকড়া, খোল— বলেই সুইচ টিপে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের পাতলা আলকাতরা হাওয়া; ফ্লুরোসেণ্ট আলোয় চারদিক ভরে গেল।

আর দেয়াল-আলমারির কাছ থেকে চমকে যে ঘুরে দাঁড়াল তার চোখের দিকে তাকিয়ে দুর্দান্ত খুশির গলায় পরমেশ্বর বলল, 'গুড ইভনিং বলব, না গুড মর্ণিং?' দ্রুত কবজি উল্টে হাত-ঘড়িটা দেখে নিয়ে ফের বলল, 'একটা পঁয়তাল্লিশ। বারোটার পরই তো নতুন দিন স্টার্ট হয়। তাহলে গুড মর্ণিংই বলা যাক। অনেকদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা হল মিস সারিন।'

হেমা প্রথমটা দারুণ নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র, তারপরই খুব ন্যাচারাল গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

'আপনি বোধহয় জানতেন না, আমি ফ্ল্যাটে আছি।'

'জানতাম না।'

'তাই জানলা দিয়ে ঘরে "ইন" করেছেন !'

হেমা উত্তর দিল না !

পরমেশ্বর জিভের ডগায় চুক চুক শব্দ করে এবার বলল, 'দেখুন তো, জানলা দিয়ে বডি গলিয়ে ভেতরে 'ইন' করতে আপনার কষ্ট হল। আগে জানলে দরজা খুলে রাখতে পারতাম।' খোলা আলমারিটার পাল্লায় হেমার একটা হাত রয়েছে। সেটা মার্ক করতে করতে ফের বলল, 'ঐ আলমারিটায় আপনার কিছু দরকার আছে ?'

হেমা হাতটা নামাতে নামাতে বলল, 'না, তেমন কিছু না—'

'তা হলে চলুন, ড্রইং রুমে গিয়ে বসা যাক।'

'উইথ প্লেজার, চলুন—'

হেমাকে সঙ্গে করে ড্রইং রুমে চলে এল পরমেশ্বর। মুখোমুখি বসে জিজ্ঞেস করল, 'কী আনব বলুন—হুইস্কি, বীয়ার, রাম, জীন—না কফি, চা, সফট্ কিছু ?'

'সান ডাউনের পর সফট্ টফট্ চলে না আমার। তখন আমার কাছে ড্রিঙ্ক একটাই—হুইস্কি।'

পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে ফট করে উঠে দাঁড়াল পরমেশ্বর। দারুণ খুশির গলায় বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার টেরিফিক মিল। সান সেট থেকে সান রাইজ পর্যন্ত আমার কাছেও মাল ছাড়া অন্য ড্রিঙ্ক নেই। প্লীজ একটু বসুন—'

হাত তুলে পরমেশ্বরকে দাঁড়াবার জন্য সিগন্যাল দিল হেমা। বলল, 'পর পর ছ পেগ চাই—'

'নো প্রবলেম। আমার এই ফ্ল্যাটে যা হুইস্কি স্টোর করা আছে সেগুলো ঢেলে দিলে কলকাতায় ফ্লাড হয়ে যাবে।'

'আমার ড্রিংকে কিচ্ছু মেশাবেন না—নো আইস, নো লাইম, নো সোডা।'

'একেবারে 'র' খাবেন ম্যাডাম ? আপনাদের বডির মেশিনারি পুরুষদের চাইতে অনেক উইক। 'র' হুইস্কিতে লিভারে ফোস্কা পড়ে যাবে যে।'

'কিচ্ছু হবে না।'

চোখ টিপে পরমেশ্বর বলল, 'আপনি একখানা টেরিফিক মাল মাইরি—' বলেই এগার ইঞ্চি জিভ কেটে হাতজোড় করে আবার বলে, 'ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা। জিভ দিয়ে স্লিপ কেটে খজড়া কথাটা বেরিয়ে এসেছে।'

এ ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাল না হেমা। বলল, 'ঠিক আছে। মিড নাইটে এতটা হুইস্কি আমি কনজিউম করি না। কিন্তু

দরজা দিয়ে না ঢুকে জানলা দিয়ে ঢুকেছি। আপনি আমাকে ফায়ার না করে কি ছাড়বেন? তাই হুইস্কি দিয়ে নার্ভগুলোকে স্ট্রং করে নিচ্ছি।'

চোখ কুঁচকে এবং দাঁত বার করে একটু হাসল পরমেশ্বর। তারপর কিছু না বলে চলে গেল। মিনিট তিন-চারেক বাদে কাট গ্লাসের লম্বা ছুঁচলো পানপাত্রে হুইস্কি এবং দামী জাপানী প্লেটে মাটির খোরা ভর্তি সোনার বাংলা নিয়ে ফিরে এল। হুইস্কির গেলাসটা হেমার সামনে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী দেব—বরফ না সোডা?'

হেমা বলল, 'নো আইস, নো লাইম, নো ওয়াটার—'

'একেবারে 'র' খাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আপনার লিভারটা—'

'আমার লিভার খুব উইক না। দুশ্চিন্তা করবেন না।'

'ফাস কেলাস—' তারিফের ভঙ্গিতে একটু হেসে খোরা-ভর্তি সোনার বাংলা নিয়ে মুখোমুখি বসল পরমেশ্বর।

দু জনের হাতের কাট গ্লাসের পানপাত্র আর মাটির ভাঁড় শেষ হবার পর পরমেশ্বর বলল, 'এবার বলুন তো ম্যাডাম, আপনি মালটি রীয়েলি কে?'

হুইস্কিটা স্টমাকে ঢোকার পর নার্ভগুলো বেশ স্টেডি হয়ে গিয়েছিল হেমার। স্ট্রেট পরমেশ্বরের চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আপনার কী মনে হয়?'

উত্তর না দিয়ে পরমেশ্বর ফের জিজ্ঞেস করল, 'মার্ক করছি, অনেক দিন ধরে আপনি আমার পেছনে সেঁটে আছেন। কারণটা কী? মিড নাইটে জানলা দিয়ে আমার ফ্ল্যাটে 'ইন' করেছেনই বা কেন?'

'কারেক্ট অ্যানসারটা জানতে চান?'

'নিশ্চয়ই।'

হেমা সারিনের মুখচোখ স্টীলের মতো শক্ত হয়ে উঠল। সে বলল, 'একজনের কোমরে দড়ি আর হাতে হ্যান্ডকাফ পরানোটা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। তাই—'

পরমেশ্বরের মতো টেরিফিক হারামীর কোমরের নার্ভগুলি কিছুক্ষণের জন্য ঢিলে হয়ে গেল যেন। তারপরেই নার্ভাসনেসটা এক ঝটকায় কাটিয়ে উঠে বলল, 'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। কেমন যেন গড়বড় লাগছে।'

'অলরাইট, বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমি একজন সি-বি-আই অফিসার।'

পরমেশ্বর টের পেল, তার শিরদাঁড়া বেয়ে গল গল করে ঘাম নামছে। লাইফের অনেকগুলো বছর জনগণকে নানাভাবে সারভিস দিয়ে গেছে সে। তার হাতের কাজ এত ক্লীন যে পুলিস, সি-আই-ডি, আই-বি, সি-বি-আই কেউ তার চামড়া পর্যন্ত ছুঁতে পারে নি। পাক্কা ম্যাজিসিয়ানের মতো বছরের-পর-বছর সবাইকে তারাবাজি দেখিয়ে সে নিজের কাজ করে গেছে। এই ফার্স্ট সে ফেঁসে গেল। কিন্তু এখন নার্ভাস হলে বহুত ঝামেলা হয়ে যাবে। মনে মনে সে ভাবল, যেমন করে হোক হেমার ক্যাঁচাকল থেকে তাকে বেরুতেই হবে। তা ছাড়া সি-বি-আই অফিসার বলে হেমাই যে তাকে ফলস দিচ্ছে না, তাই বা কে জানে। বিহার, ইউ-পিতে একটা কথা চালু আছে—'নহলে পে দহেলা'। অর্থাৎ নয়ের ওপর দশ। হেমা যখন নিজেকে সেণ্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেসনের অফিসার বলেছে তখন আরেক পর্দা চড়িয়ে ফেলতে হবে। পরমেশ্বর করল কি, হেমাকে আবার হুইস্কি দিয়ে নিজে সোনার বাংলা নিল। তারপর বলল, 'আপনি সি-বি-আই অফিসারই হোন আর গভর্নমেণ্টের হোম মিনিস্টারই হোন, মিড নাইটে আমার ফ্ল্যাটে ট্রেসপাস করেছেন। আমি আপনার ব্রেনে এমন চক্কর লাগিয়ে দিতে পারি যে স্রেফ তিরিশবার লাট খেয়ে পড়বেন।'

'কীরকম—' হুইস্কির গেলাসে আস্তে করে 'সিপ' মেরে জিজ্ঞেস করল হেমা।

'পুলিসকে ডেকে আপনাকে ট্রেস-পাসিংয়ের জন্যে হ্যাণ্ডওভার করে দিতে পারি।'

হেমার মুখের একটা রেখাও এদিক ওদিক হল না। দারুণ আরামের ভঙ্গিতে সোফায় হেলান দিয়ে সে বলল, 'ঐ তো টেলিফোনটা রয়েছে। এক্ষুনি পুলিস স্টেশনে ফোন করে দিন।'

পরমেশ্বরের মনে হল, হেমা ফলস দ্যায় নি। সে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঠিক করে ফেলল, সোমেশ্বর মল্লিকের এই ফ্ল্যাট থেকে হড়কে বেড়িয়ে যেতে হবে। যে কনট্রাক্ট নিয়ে সে এখানে ঢুকেছে তা আজ রাত দুটোয় কমপ্লীট হয়ে যাবে। লোলে 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজে'র দুটো ডিভিসনে গোটা পাঁচেক পাওয়ারফুল টাইম বোম 'সেট' করে দিয়েছে। আজ রাত দুটোর ভেতরেই ইলেকট্রনিকস আর ড্রাগ ইউনিটের আধাআধি সাফ হয়ে যাবে। ফলে তার কাজও শেষ। 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজে'র বারোটা বাজাবার জন্য তার এখানে আসা। কনট্রাক্টের বাইরেও সোমেশ্বরের অনেক এক্সট্রা কাজ করে দিয়েছে সে। কিন্তু আর ঝুলে থাকার মানে হয় না। কারণ জনগণ তার সারভিস নেবার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বঞ্চিত করার

রাইট তার নেই। তা ছাড়া হেমা সারিন যদি সত্যি সত্যিই সি-বি-আই অফিসার হয় তা হলে ঝামেলার কারণ আছে। মালটি তার চেহারা চিনে ফেলেছে। *ফিউচারে অ্যাক্টিভিটি চালাতে হলে নার্ভগুলোকে টান টান করে* খুবই কেয়ারফুল থাকতে হবে। কাল সকালেই অমিতাভ সেনের ফ্যাক্টরি ওড়ানো, মেডিসিন বোঝাই তিনটে বগি ইঞ্জিনসুদ্ধু হাপিস করা, পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে রণজয় হালদারের ব্যাঙ্ক ডকুমেণ্ট পাচার করা—এই ব্যাপারগুলোর জন্য সোমেশ্বরের কাছ থেকে মোটা ফী আদায় করে সটকে পড়তে হবে।

হেমা আচমকা বলে উঠল, 'আমি কে সেটা তো শুনলেন। এবার চটপট বলে ফেলুন আপনি কে?' বলে সোজা পরমেশ্বরের চোখের দিকে তাকাল।

পরমেশ্বর চমকে উঠেছিল। তবে হেমাকে সেটা বুঝতে দিল না। চুক চুক করে মেটে ভাঁড়ে তিন চারটে চুমুক দিয়ে বলল, 'ম্যাডাম, আমার নামটা ভুলে গেছেন! ও-কে, আপনার মেমোরিকে একটু হেল্প করা যাক। আমি রণজয় হালদার—ইমপোর্ট এক্সপোর্টের বিজনেস করি, আমার—'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল হেমা। বলল, 'এ সব আমি জানি। কিন্তু আমি জানতে চাইছি আসলে আপনি কে?'

'তার মানে?'

'মানে—' বলে একটু থামল হেমা। চোখ কুঁচকে ঝটপট কিছু ভেবে নিল। তারপর ফের বলল, 'আমার খুবই জানার ইচ্ছে আপনি সত্যি সত্যিই রণজয় হালদার, না ঐ নামটার ভেতর "ইন" করে গেছেন—'

পরমেশ্বর ভাবল, এরকম টেরিফিক খচড়া মেয়েমানুষের পাল্লায় লাইফে পড়ে নি সে। হেমা তার সম্পর্কে নিশ্চয়ই কিছু একটা সন্দেহ করে বসে আছে। এখন নার্ভাস হয়ে পড়লে হারামী মেয়েছেলেটা ফোরটীন জেনারেশনের নাম ভুলিয়ে ছাড়বে। অবশ্য নিজেকে ছাড়া আর কোন জেনারেশনের নাম-ধাম জানা নেই পরমেশ্বরের। ফাদার, গ্র্যাণ্ড ফাদার, তার ফাদার, তার ফাদার —নিজের পুরো ব্যাকগ্রাউণ্ডটা তার কাছে অন্ধকার, বিলকুল ডার্ক। সে যাক গে, পরমেশ্বর বলল, 'আপনি ম্যাডাম আমাকে হেভি ঝামেলায় ফেলে দিলেন দেখছি।'

'কী রকম?'

'রণজয় হালদারকে বলছেন তার ভেতর অন্য মাল "ইন" করে গেছে! এ কখনও হয়!'

'হয় মিস্টার, হয়। ওয়ার্ল্ডে অনেক কিছুই হয়। কী কী হয়, কার

স্পিরিট কার ভেতর ঢুকে যায়, আপনি আমার চাইতে কম জানেন না ভাল করে ভেবে বলুন আপনার রীয়েল নামটা কী?'

'বিশ্বাস করুন—বীলিভ মী ম্যাডাম, মোটে দু খোরা সোনার বাংল স্টমাকে চালান করেছি। দু খোরায় আমার মেমোরি নষ্ট হয় না। মা কালী, মা দুর্গা, যীশুখেস্ট—যার নামে বলবেন দিব্যি কেটে বলছি, আমি রণজয় হালদার, রণজয় হালদার, রণজয় হালদার।'

'কোনরকম গোলমাল হচ্ছে না তো?'

'এক্কেবারেই না। আমি পিওর আগমার্কা রণজয় হালদারই।'

গেলাসের শেষ ক' ফোঁটা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিয়ে হেমা বাঁ হাত উলটে ঘড়ি দেখল। তারপর বলল, 'মিস্টার হালদার, এখন দুটো বেজে পঁচিশ। সাড়ে-তিন ঘণ্টার মতো এখনও রাত আছে। এবার আমাকে উঠতে হবে। আমার মনে হয়, দু'জনেরই একটু ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার। ওঠার আগে আপনার সঙ্গে একটা এগ্রিমেণ্ট করতে চাই।'

'কীসের এগ্রিমেণ্ট?

'জেণ্টলম্যানস এগ্রিমেণ্ট।'

পরমেশ্বর ভাবল, এই মালটির হাত থেকে হড়কে বেরিয়ে যেতে হবে। কাজেই তর্কাতর্কি এবং ঝুট-ঝামেলার মধ্যে না যাওয়াই ভালো। ও যা বলবে এখন তাতেই রাজী হওয়া দরকার। পরমেশ্বর বলল, 'আমার আপত্তি নেই ম্যাডাম।'

হেমা বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ। এগ্রিমেণ্টটা হল, আমরা এখন যে ডিসকাসান করলাম তা যেন আর কেউ জানতে না পারে। আমাদের দুজনের মধ্যেই এটা থাকবে।'

'তাসা পার্টি বাজিয়ে অন্য লোককে এসব বলার দরকারও আমার নেই, টাইমও নেই। আপনি ম্যাডাম নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ও-কে?'

'ও কে। তাহলে এখন চলি।'

'আসুন—'

হেমা সোফা থেকে উঠে বাইরের দরজার দিকে গেল না। পরমেশ্বরের বেডরুমের দিকে হাঁটতে লাগল।

পরমেশ্বর কিছুটা অবাক হয়ে বলল, 'ওধারে যাচ্ছেন?'

'আপনার ফ্ল্যাটের দরজায় তো বাইরে থেকে তালা মারা। বেডরুমের কাটা গ্রিল ছাড়া বেরুবো কেমন করে?'

আরে তাই তো! লোলে ক'দিন ধরে তাকে এখানে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা দিয়ে যাচ্ছে। সে না খুলে দিলে দরজা দিয়ে ঢোকা বা

বেরুনো একেবারেই সম্ভব না। তাহলে পরমেশ্বর ভেতরে ঢোকার পর লোলে যে বাইরে থেকে তালা লাগায়—এ খবরটা কি জানে হেমা? ভাবতেই তার চোখদুটো গোল্লা পাকিয়ে গেল। পরক্ষণেই ভাবল, হেমা যদি জেনেই থাকে, সে ভেতরে আছে বুঝতে পেরেও এখানে ঢোকার রিস্ক নিল কেন? ব্যাপারটা ঠিক মাথায় ঢুকল না পরমেশ্বরের। যাই হোক, জানলার গ্রিল দিয়ে গলে হেমা চলে গেলে সে বিছানায় এসে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম এল না।

এখন আড়াইটার মতো বাজে। আর আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ভোর হয়ে যাবে। পাঁচটা বাজলেই এই মাল্টিস্টোরিড অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসটাকে বাইশটা স্যালুট লাগিয়ে সে এখান থেকে স্লিপ কেটে বেরিয়ে যাবে। তখন কোথায় থাকবে হেমা সারিন আর কোথায়ই বা সে!

প্রায় আড়াই ঘণ্টার মতো বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে কখনও চোখ বুজে থাকল পরমেশ্বর, আবার কখনও বা সীলিংয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর পাঁচটা বাজতে কয়েক মিনিট যখন বাকী সেই সময় আচমকা একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। লোলে যে টাইম বোমাগুলো অমিতাভর ফ্যাক্টরিতে সেট করেছে সেগুলো সম্পর্কে একটু খবর টবর নেওয়া দরকার। পরমেশ্বর টেলিফোন তুলে ডায়াল করতে শুরু করল। হেমার সেই পিকিনীজ কুকুরটা এখন নেই, ট্রান্সমিটারে তার কথাবার্তা ধরা পড়ার ভয় নেই। সে কী বলছে হেমা জানতেও পারবে না।

একটু পর ওধার থেকে সোমেশ্বরের ঘুমন্ত গলা ভেসে এল, 'হ্যালো। কে বলছেন?'

পরমেশ্বর বলল, 'আমি স্যার—'

এক সেকেণ্ডের মধ্যে ভয়েস থেকে ঘুম ছুটে গেল সোমেশ্বরের। টেরিফিক উল্লাসের গলায় টেলিফোনের রিসিভার ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, আরে পরমেশ্বর—কনগ্র্যাচুলেসনস, কনগ্র্যাচুলেসনস। আরেক বার স্বীকার করছি তোমার মতো জিনিয়াস শুধু ইণ্ডিয়াতেই না, হোল ওয়ার্ল্ডেই জন্মায় নি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। আমি কিন্তু এই ভোরবেলা আপনার ঘুমটা কিচাইন করে একটা খবর জানতে চাইছিলাম—'

'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজের খবর তো?'

'হ্যাঁ স্যার—'

'আরে বাবা, সেই জন্যেই তো তোমাকে কনগ্র্যাচুলেসনস জানাচ্ছি। তুমি

কী প্ল্যান করেছিলে তুমিই জানো, ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজের ইলেকট্রনিকস আর মেডিসিন প্ল্যাণ্টের হাফ হাফ উড়ে গেছে। তোমার মাইরি জবাব নেই। তোমার মতো সুপার ক্লাসের হারামী লাইফে এই প্রথম দেখলাম।'

সোমেশ্বর মল্লিক যে 'মাইরি' এবং 'হারামী'র মতো খচ্চর খচ্চর শব্দগুলো মুডের মাথায় উচ্চারণ করল তার কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। মাকড়া দুর্দান্ত খুশী হয়ে আছে। পরমেশ্বর বলল, 'ফাইন। স্যার এবার একটা কথা বলি।'

'একটা কেন, ছ হাজার কথা বল।'

'এখন পাঁচটা বাজে। ঠিক এক ঘণ্টা পর আপনার বাড়ি গিয়ে দেখা করছি।'

'নিশ্চয়ই। মোস্ট ওয়েলকাম। তুমি কোত্থেকে কথা বলছ?'

'আপনার দেওয়া ফ্ল্যাট থেকে।'

'আরে তুমি ওখানে রিটার্ন করেছ নাকি?'

'হ্যাঁ স্যার। আজই না, যেদিন আপনাকে বাইরে যাবার কথা বলেছি সেদিন থেকেই রোজ রাত্তিরে এখানে ঢুকে শুয়ে থাকছি।' বলতে বলতে আচমকা একটা কথা মনে পড়ে গেল। সে তো মিডল-এজেড এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের মেক-আপে রয়েছে। কিন্তু হেমা তো তার এই ছদ্মবেশের কথা একবারও বলেনি। তবে কি ফ্ল্যাটের দরজার বাইরে তালা লাগানোর মতো তার মেক-আপের ব্যাপারটাও সে জানে! পরমেশ্বর টের পেতে লাগল ছুকরি তার মাথার ভেতর বেশ খানিকটা দুশ্চিন্তা ঢুকিয়ে দিতে শুরু করেছে।

সোমেশ্বর ওধার থেকে দারুণ উৎসাহের গলায় বললেন, 'সেই চোরটার জন্যে ক্যাঁচাকল পেতেছ বুঝি?'

'ইয়েস স্যার।'

'চোরটাকে ট্রেস করতে পারলে?'

বলতে গিয়েও থমকে গেল পরমেশ্বর। হেমার সঙ্গে তার জেণ্টলম্যানস এগ্রিমেণ্ট হয়ে গেছে। অন্যমনস্কর মতো সে বলল, 'না স্যার, এখনও মালটাকে ক্যাঁচাকলে আটকাতে পারি নি।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে পরমেশ্বর আবার বলল, 'স্যার, আপনার সঙ্গে যা কনট্রাক্ট ছিল সবই কমপ্লীট করে দিয়েছি। এবার কিন্তু আমাকে ছুটি দিতে হবে। আমার কাজের ফী-টা রেডি রাখবেন। আপনার বাড়ি থেকেই আমি কিন্তু গুড-বাই করব।'

সোমেশ্বর দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'ছুটি-টুটির কথা একদম ভাবব না।

এখন তুমি এসো তো। সবে তোমার সঙ্গে আমার জমে উঠেছে, আর তুমি গুড-বাইয়ের কথা চিন্তা করছ! কোন মানে হয়!'

'স্যার, আমার অনেক ক্লায়েণ্ট লাইন দিয়ে ওয়েট করছে।'

'কোন কথা আমি শুনব না। তোমার সর্বস্বত্ব আমার কাছে সংরক্ষিত মানে—অল রাইটস রিজার্ভড বাই মী।'

পরমেশ্বর কী বলতে যাচ্ছিল, সোমেশ্বর তার আগেই আবার বলে উঠলেন, 'নট এ ওয়ার্ড মোর।' বলেই লাইনটা ঝট করে কেটে দিল।

পরমেশ্বর গলার ভেতর বিড়বিড় করল, 'শলা খজড়া, আমি তোমার ফোরটীন জেনারেসনের কাছে দাসখত লিখে দিয়েছি! বলে কিনা, আমার অল রাইটস রিজার্ভড!'

ফোনটা নামিয়ে রাখতে-না-রাখতেই আবার বেজে উঠল। এবার লোলের গলা। চিৎকার করে মাকড়া বলতে লাগল, 'আঙ্কল জন, অপারেশন সাকসেসফুল।'

পরমেশ্বর বলল, 'জানি; খবর পেয়ে গেছি।'

লোলের গলা ঝপ করে অনেকখানি নেমে গেল, 'আমার আগে কোন্ হারামী তোমাকে খবর দিলে!'

'এই অপারেশনটার জন্যে যে শালার ব্লাড প্রেসার চড়ে গিয়েছিল।'

'বুঝেছি। গোলি মেরে দাও ও শালাকে। আমি এক্ষুনি এসে তালা খুলে তোমাকে জেলখানা থেকে বার করছি।'

ঝট করে কী ভেবে নিল পরমেশ্বর; তারপর বলল, 'তোকে আজ আর আসতে হবে না। আমি ম্যানেজ করে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারব। অদ্যাই আমার এখানে লাস্ট নাইট কাটল।' একটু থেমে বলল, 'তুই এখন কোত্থেকে ফোন করছিস?'

'যেখানে অপারেশন হয়েছে তার ধার কাছ থেকে। যে মাল ক'টা কাল সেট করে এসেছিলাম সেগুলো কীরকম কাজ করল তা দেখবার জন্যে এসেছিলাম।'

লোলেটার ব্রেনে কিছু ভালো জিনিস আছে। একবারও অমিতাভ, ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজ, টাইম বোমা, ফ্যাক্টরি—এসবের নাম করছে না সে। সব আভাসে ইঙ্গিতে সারছে। কে আবার কোত্থেকে শুনে ফেলবে; তারপর হেভি কিচাইন হয়ে যাক আর কী! পরমেশ্বর বলল, 'তুই বাড়ি চলে যা। আমি দুপুরের আগেই ফিরে যাব।'

'ও-কে 'বস'।'

টেলিফোনটা নামিয়ে বেডরুমের কাটা গ্রিলের ফাঁক দিয়ে গলে বাইরে

বেরুতেই পরমেশ্বর দেখতে পেল, হেমা একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই ছুকরি বলল, 'গুড মর্ণিং মিস্টার হালদার—'

এক সেকেণ্ড থতিয়ে রইল পরমেশ্বর। তারপর দারুণ স্মার্ট ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'গুড মর্ণিং ম্যাডাম। সকালবেলা সুন্দরীদের মুখ দেখলে সারাদিন ব্লাড প্রেসার নর্মাল থাকে। তারপর এখানে—'

হেমা বলল, 'আমার মনে হয়েছিল এখানে দাঁড়ালেই এই মোমেণ্টে আপনার সঙ্গে দেখা হবে। যা ভেবেছিলাম তাই; আমার ক্যালকুলেসন হানড্রেড পারসেণ্ট কারেক্ট।'

পরমেশ্বরের মতো দুর্দান্ত খলিফা মালও ভেতরে ভেতরে খানিকটা নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাইরে তা দেখাল না। একটা ব্যাপার সে কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না। সেই পিকীনিজ কুকুরটা নেই। সেটা না থাকা মানেই ট্রান্সমিটারটা না থাকা। ট্রান্সমিটার নেই তবু হেমা তার মুভমেণ্টের খবর-টবর কী করে পাচ্ছে? হেমার মনে হল এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তার সঙ্গে দেখা হবে, অমনি ভোরবেলা এই গ্রিলকাটা জানলার কাছে ল্যাম্পপোস্ট হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল—এটা শালা কোন মাকড়াই মেনে নেবে না। ছুকরি যে অনবরত তার ওপর নজর রেখে যাচ্ছে, সেটা আগেই টের পাওয়া গিয়েছিল। এয়ারপোর্টে সুইস ব্যাঙ্কের সিক্রেট ডকুমেণ্ট হাপিস করা থেকে মেডিসিন বোঝাই রেল-ওয়াগন লোপাট করা পর্যন্ত যেখানে যা যা সে করেছে সব জায়গায় হেমা হাণ্টিং ডগের মতো হানা দিয়েছে। সিনেমার স্লাইডের মতো সেই সব দৃশ্য-ফৃশ্য চোখের সামনে সট সট ফুটে উঠতে লাগল।

তা হলে কি হেমা যা বলেছে সে তা-ই? একজন সি-বি-আই অফিসারই? একটা কথা পরমেশ্বরের মাথায় কিছুতেই আসছে না, আজ সকালে তার হাওয়া হয়ে যাবার কথাটা হেমা টের পেল কী করে? ও কি থট রীডার, না টেলিপ্যাথি জানে?

হেমা আবার বলল, 'বেরুবার মুখে ডিসটার্ব করলাম; প্লীজ ডোণ্ট মাইণ্ড।'

ছুঁড়িটা কী দুর্ধর্ষ হারামী! পরমেশ্বর তার চোখে ধুলো ছিটিয়ে সটকে পড়বার তাল করেছে জেনেও গলাটা কেমন মাখনে চুবিয়ে কথা বলে যাচ্ছে! গলায় যদি হেমা এক ইঞ্চি পুরু বাটার লাগিয়ে থাকে, পরমেশ্বর তিন ইঞ্চি মাখনের একটা কোটিং চাপাল। বলল, 'কী যে বলেন, আপনার কোন কথায় বা কাজে আমি কখনও মাইন্ড করতে পারি!'

'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।' বলে একটু থেমে হেমা ফের শুরু করল, 'আপনার সঙ্গে আমার খুব আর্জেণ্ট কাজ আছে মিস্টার হালদার।'

'তা তো বুঝতেই পারছি। তা না হলে কোন্ মাকড়া'—বলেই আগের অনেক বারের মতো জিভ কাটল পরমেশ্বর, 'স্যরি ম্যাডাম, জিভ দিয়ে স্লিপ কেটে একটা খচ্চর কথা বেরিয়ে পড়েছে।'

'ঠিক আছে, আপনি বলুন—'

'বলছিলাম আর্জেণ্ট কারবার না থাকলে কেউ ভোর রাত্তিরে কারো জানলার কাছে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। এখন বলুন আপনার জন্যে কী সারভিস দিতে পারি।'

হেমা বলল, 'আপাতত আমার সঙ্গে আমার ফ্ল্যাটে গিয়ে ব্রেকফাস্ট খাবেন—'

পরমেশ্বর দারুণ তারিফ করার ভঙ্গিতে বলল, 'ফাইন, ভেরি ফাইন প্রোপোজাল। চলুন ম্যাডাম—' বলেই পা বাড়িয়ে দিল সে। ভেতরে ভেতরে নার্ভাস হলেও নিজের ওপর দুর্দান্ত বিশ্বাস তার। দেখাই যাক না, ছুকরির দৌড় কতদূর। কতটা সে তাকে খেলাতে পারে! একসময় হেমার ব্রেনে চক্কর লাগিয়ে সে ঠিক কেটে যেতে পারবে। তা ছাড়া আরেকটা কথাও তার মাথায় এল। তার সম্পর্কে হেমার মতলবটা একটু ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার। ঘণ্টাখানেক এক্সক্লুসিভলি ছুকরির মুখের দিকে চোখের তারা ফিক্সড করে রাখতে পারলে ওর পেটের সব কথা ঝটাঝট টেনে বার করে ফেলতে পারবে।

হেমা যদি ভক্কি দিয়ে না থাকে, যদি সে রীয়েল সি-বি-আই অফিসারই হয়, তা হলে ওকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত স্টাডি করা দরকার। হেমা তার সম্বন্ধে কতটা খবর নিয়েছে, ফিউচারে তার সম্পর্কে কী অ্যাকসান নেবে—এ সব আগে ভাগেই জেনে নিতে পারলে অনেক সুবিধা। তা হলে হেমা যে প্ল্যান করবে তার উলটো প্ল্যান করে ছুকরিকে চরকিবাজি দেখিয়ে দেওয়া যাবে। চুপচাপ হাওয়া হয়ে যেতে না পেরে এ এক রকম ভালোই হয়েছে।

হেমা কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল। বলল, 'এক মিনিট হালদারসাহেব—'

পরমেশ্বর দাঁড়িয়ে পড়ল। হেমা আবার বলল, 'আমার ওখানে ব্রেকফাস্ট সেরে দু'জনে এক জায়গায় যাব।'

'কোথায় ?'

'বেশি দূর নয়, ক্যালকাটার আউটস্কার্টে। যেতে-আসতে ঘণ্টা দুয়েক লাগবে।' বলতে বলতে কবজি ওলটাল হেমা। ঘড়িটা এক সেকেণ্ডে দেখে বলল, 'এখন পাঁচটা-পঁচিশ। ব্রেকফাস্ট ফিনিশ করে বেরুব আটটায় অ্যাণ্ড উই শাল রিটার্ন বাই টেন-ফিফটিন, টেন-থার্টি। ম্যাক্সিমাম ইলেভেন। আশা করি, আপনার খুব অসুবিধা হবে না।'

পরমেশ্বর মনে মনে একটা দুর্ধর্ষ খিস্তি ঝেড়ে বলল, 'শলা, খচড়ামোর একটা লিমিট আছে। আমার অসুবিধা হলেও তুমি ছাড়ছ কিনা! মুখে বলল, 'এতটুকু অসুবিধা নেই। আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যাট ইওর সারভিস ম্যাডাম।'

'থ্যাঙ্ক ইউ—আরেকটা কথা হালদারসাহেব—'

'বলুন, বলুন—'

গ্রেভি লাগানো মাটন চপের গায়ে থকথকে ঝোলের মতো সারা মুখে গ্যাদগেদে হাসি মাখিয়ে রাখল পরমেশ্বর।

হেমা একটু হেসে যেন দারুণ সঙ্কোচ হচ্ছে এমন পোজ দিয়ে বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন, আপনার মেক-আপটা চেঞ্জ করে নিলে ভাল হতো—'

পরমেশ্বর চমকে উঠল। ব্যাপারটা একেবারে ভুলে গিয়েছিল সে। মিডল-এজেড অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যোশেফ ফ্রিসকিনের মেক-আপ তার সারা গায়ে চড়ানো রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা কথা মনে হল। মেক-আপের ব্যাপারে তার নিজের একটা দারুণ কনফিডেন্স আছে, সেই সঙ্গে ভেতরে ভেতরে টেরিফিক গর্ব। পরমেশ্বরের ধারণা সে মেক-আপ লাগালে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ঘাঘু ডিটেকটিভরাও ধরতে পারবে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যোশেফ ফ্রিসকিন সেজে হেমার চোখে ধুলো ছিটানো যায় নি। নিজের ওপর প্রায় ক্ষেপেই গেল সে। নাঃ, মেক-আপের ব্যাপারে লেটেস্ট খবর-টবর তাকে নিতে হচ্ছে। এ নিয়ে বেশ কিছুদিন স্টাডি-ফাডি করতে হবে। একটা ছুকরির কাছে 'কট' হয়ে যাওয়ার কোন মানে হয়! যাই হোক, মুখে একটু তেলতেলে হাসি ফুটিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দেবেন ম্যাডাম—'

হেমা বলল, 'মেক-আপ তুলে আসবেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'পাঁচ মিনিট কেন, আধ ঘণ্টা টাইম নিন না। আমি ওয়েট করছি।'

হেমা যে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, তাকে না নিয়ে এই সরু প্যাসেজ থেকে এক সেণ্টিমিটারও নড়বে না, পরমেশ্বর তা জানে। মনে মনে সফট্ টাইপের একটা খিস্তি ঝেড়ে সে কাটা গ্রিলের ফোকর গলে ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণ বাদে যখন আবার বেরিয়ে এল তখন আর সে যোশেফ ফ্রিসকিন না, সেই পুরনো রণজয় হালদার।

হেমা তার দিকে এক সেকেণ্ড তাকিয়ে কমপ্লিমেণ্ট দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'এত হ্যাণ্ডসম আপনি। ঐ রকম কুঁজো মিডল-এজেড সিকলি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সেজে থাকবার কোন মানে হয়!'

চোখের কোণ দিয়ে একবার হেমাকে দেখল পরমেশ্বর, ঠোঁটের ফাঁকে খচড়ামো করে স্লাইট হাসল, তবে মুখে কিছু বলল না।

হেমা ফের বলল, 'চলুন, এবার যাওয়া যাক।'

উপরে গিয়ে মুখোমুখি বসে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'একটা কথা জানার খুব ইচ্ছা হচ্ছে—'

হেমা তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না পরমেশ্বর। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'দেখুন ব্যাপারটা স্ট্রেট বলে ফেলাই ভালো।'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, বলুন না—'

'আমি যে ভোরবেলা জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাব, আপনি জানলেন কী করে?'

হেমা চোখের তারা ফিক্সড করে তাকিয়েই ছিল। তার ঠোঁট থুতনি আর চোখের ওপর দিয়ে মিস্টিরিয়াস একটা হাসি আবছাভাবে ফুটেই মিলিয়ে গেল। খুব আস্তে করে সে বলল, 'পরে বলব। আগে ঘুরে আসি।'

ব্রেকফাস্টের পর পরমেশ্বরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল হেমা। নিচে এসে পরমেশ্বর তার লিমুজিনটা নেবে কিনা জিজ্ঞেস করল। হেমা জানালো—দরকার হবে না। পার্কিং এরিয়ায় গিয়ে একটা ইমপোর্টেড টু-সীটারে পরমেশ্বরকে তুলে নিজেই ড্রাইভ করে গাড়িটাকে বাইরের রাস্তায় নিয়ে এল। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল, ওরা ক্যালকাটা কর্পোরেশনের বাউন্ডারি ছাড়িয়ে ভি-আই-পি রোডে এসে পড়েছে। সেখান থেকে দমদম এয়ারপোর্ট ডাইনে রেখে বারাসাতের দিকে চলতে লাগল। দু'জন পাশাপাশি বসে আছে। দুজনেরই চোখ উইন্ডস্ক্রীনের বাইরে। কথাটথা খুব কমই হচ্ছে। যা হচ্ছে তা খুবই এলোমেলো এবং আজেবাজে। যেমন, আজকের ওয়েদারটা ফাইন, ক্যালকাটার রাস্তায় ড্রাইভ করা দিন দিন ইমপসিবল হয়ে উঠছে, দুধারে যেভাবে হকাররা এনক্রোচ করে বসে আছে তাতে ড্রাইভ করা তো অসম্ভবই, হাঁটাও পসিবল হবে কিনা সন্দেহ, কবে যে টিউব ট্রেন হবে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরমেশ্বর হেমার সব কথায় দুর্দান্ত উৎসাহের সঙ্গে 'হুঁ'-'হাঁ' করে যাচ্ছিল ঠিকই, তবে ভেতরে ভেতরে সেই ব্যাপারটা ঘুরেফিরেই অনবরত ঝামেলা করছিল। ছুকরি তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? আগে দু-একবার এ ব্যাপারে জানতে চেয়েছে সে। একবার ভাবল, আবার জিজ্ঞেস করে কিন্তু নেক্সট মোমেন্টেই ঠিক করে ফেলল—করবে না। সে যে স্লাইট

নার্ভাস হয়ে পড়েছে সেটা হেমাকে জানতে দেওয়ার কোন মানে হয় না। তার নার্ভাসনেসের খবরটা জানতে পারলে ছুকরি ডেফিনেটলি তাকে হাতের ভেতরে পেয়ে যাবে। কারো হাতের চেটোয় সে লাইফে কখনও নাচে নি, এখনও নাচার ইচ্ছা নেই। যেন কিছুই হয় নি, এই রকম একটা কেয়ার-ফ্রী মুখ করে বসে রইল সে।

এয়ারপোর্ট থেকে দু-তিন কিলোমিটার যাবার পর ডান দিকের একটা সরু রাস্তায় টু-সীটারটাকে ঢুকিয়ে দিল হেমা। এ জায়গাটায় নতুন টাউনসিপ গড়ে উঠছে। প্ল্যানড্ টাউনশিপ। সেন্ট্রাল বা নর্থ ক্যালকাটার মতো ঘিঞ্জি নয়, এখানকার বাড়ি-টাড়ি গা ঘেঁযাঘেঁষি করে গজিয়ে ওঠেনি। একটা বাড়ির পর বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তারপর আবার একটা বাড়ি। এখানে গাছপালা প্রচুর। এনভায়রনমেণ্টটা দারুণ নিরিবিলি।

একটা বাড়ির সামনে এসে টু-সীটারটাকে দাঁড় করাল হেমা। বাড়িটা এখনও কমপ্লীট হয় নি, একতলার ওপর দোতলার খানিকটা উঠেই থেমে আছে। বাইরের দিকে প্ল্যাস্টার-ট্যাস্টার লাগানো হয় নি। সামনের রাস্তায় কিছু স্টোনচিপ আর ইঁট-টিট পড়ে আছে।

দরজা খুলে নামতে নামতে হেমা বলল, 'আসুন—'

একটা কথাও না বলে পরমেশ্বর নামল। তারপর হেমার গায়ের সঙ্গে প্রায় ঝুলতে ঝুলতে সিঁড়ি দিয়ে বাইরের দিককার বারান্দায় উঠল। বারান্দার গায়েই ভেতরে যাবার দরজা। দরজাটা বন্ধ রয়েছে। হেমা কড়া নাড়তে নাড়তে ডাকতে লাগল, 'মাসিমা, মাসিমা—'

ভেতর থেকে কোন মহিলার গলা ভেসে এল, 'কে ?'

'আমি হেমা—'

একটু পরে দরজা খুলে গেল। একজন মিডল-এজেড ম্যারেড মহিলাকে দেখা গেল। এক সময় তিনি দস্তুরমতো রূপসী ছিলেন। কিন্তু এখন চোখের কোলে দেড় ইঞ্চি কালি। কাঁচা-পাকা চুল রুক্ষ; সিঁথিতে বাসি সিঁদুর। ঘরোয়া ধরনে পরা শাড়িটা আধময়লা। তাঁর হোল বডি আর ফেসে দুঃখ-টুঃখ মাখানো রয়েছে।

হেমাকে দেখে একটু হাসলেন মহিলা। বললেন, 'এসো, ভেতরে এসো—' একটু সরে তিনি জায়গা করে দিলেন।

হেমা আর পরমেশ্বর ভেতরে ঢুকল। দরজার পরেই ঘর। দেখেই টের পাওয়া গেল এটা ড্রইংরুম। কয়েকটা বেতের সোফা আর একটা গ্লাস-টপ সেণ্টার টেবল পড়ে আছে। টেবলটার কাচ আবার ভাঙা। দেয়াল

ঘেঁষে একটা বইয়ের আলমারি। রঙচটা দেয়ালে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ আর সারদামণির সেই চেনা ছবি।

মহিলা বললেন, 'বোসো তোমরা, বোসো—' হেমারা বসলে ফের বললেন, 'এবার অনেকদিন পর এলে।'

হেমা বলল, 'হ্যাঁ মাসিমা, প্রায় এক মাস—'

'উঁহু, এক মাস না, পুরো দেড় মাস।'

'তাই নাকি!' হেমা একটু হেসে বলল, 'আপনি হিসেব রেখেছেন?'

মহিলা বললেন, 'হিসেব তো রাখতেই হবে মা। গেল মাসের আগের মাসে বারো তারিখে এসেছিলে। মাঝখানে গোটা একটা মাস গেছে। আজ এ মাসের আটাশ। তা হলে দেড় মাস দাঁড়াল না?'

হেমা আস্তে করে মাথা নাড়ল, অর্থাৎ তা-ই।

মহিলা দারুণ বিষণ্ণ গলায় থেমে থেমে এবার বললেন, 'যখনই কেউ বাইরের কড়া নাড়ে তখনই ভাবি তুমি এলে। দৌড়ে এসে দরজা খুলে দেখি অন্য কেউ।'

কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে হেমা বলল, 'কী করব মাসিমা, কাজকর্ম নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে আসতে পারি নি।'

এই সব একঘেয়ে ভ্যানর ভ্যানর ডায়লগ একেবারেই ভাল লাগছিল না পরমেশ্বরের। কিন্তু না লাগলেও শুনতেই হচ্ছিল। এই রকম একটা অবস্থায় তো আর উঠে যাওয়া যায় না।

মহিলা বললেন, 'তুমি আমাদের কথা একেবারেই ভুলে গেছ। সেই ব্যাপারটাও কিছু করলে না।'

হেমা বলল, 'সেই ব্যাপারটা নিয়েই তো এই দেড়মাস চারিদিকে ছোটাছুটি করছি।'

'কিছু হবে কি?'

'নিশ্চয়ই হবে।'

'রণুর খবর পেলে?'

'দু-চার দিনের মধ্যে পেয়ে যাব আশা করছি।'

মহিলার মুখ গভীর বিষাদে ছেয়ে যেতে লাগল। ক্লান্ত ভাঙা ভাঙা গলায় তিনি বললেন, 'আগেও তো তা-ই বলে গিয়েছিলে।'

হেমা বলল, 'এবার দেখবেন—'

'একটা কথা শুধু বল—'

'কী—'

'রণু বেঁচে আছে তো?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না হেমা। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'এখন আপনাকে কিছু বলব না। বলা বারণ। চারদিন পর এসে সব জানিয়ে যাব। অনেক দুঃখ পাচ্ছেন মাসিমা। শুধু আর ক'টা দিন অপেক্ষা করুন।' মহিলার প্রতি তার যে দারুণ সহানুভূতি সেটা গলার স্বরে টের পাওয়া যেতে লাগল।

প্রথম দিকে ঐ অচেনা দুঃখী টাইপের মহিলা আর হেমার কথাবার্তা একেবারেই ভালো লাগছিল না পরমেশ্বরের। কিন্তু শেষ দিকে কিরকম একটা মিস্ট্রির গন্ধ-টন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কৌতূহলে নিজের অজান্তেই নার্ভগুলো টান টান করে রাখল সে।

আচমকা মহিলা তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঐ দেখ, আমি হেমার সঙ্গেই কথা বলে যাচ্ছি। তোমাকে তো চিনতে পারলাম না বাবা—'

পরমেশ্বর কিছুটা চমকে উঠে বলতে যাচ্ছিল, 'আমি র—' কিন্তু কথাটা শেষ করতে পারল না, এর আগেই হেমা দুর্দান্ত ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'এঁর নাম রথীন—রথীন সান্যাল, আমার বন্ধু, বিজনেসম্যান—' বলে চোখের কোণ দিয়ে পরমেশ্বরের দিকে তাকিয়ে দ্রুত একটা ইশারা করল।

ইশারাটা বুঝতে পারল পরমেশ্বর। হেমা মহিলার কাছে যে নামে তাকে ইনট্রোডিউস করে দিয়েছে সেটাই মেনে নিতে বলছে আর কি। তা না হয় মানা গেল কিন্তু আচমকা রণজয় হালদার থেকে ছুকরি তাকে রথীন সান্যাল বানিয়ে দিল কেন? শলা, হেমাটা তাকে কী ঝামেলায় ফেলবার তাল করেছে কে জানে। সোমেশ্বর তাকে পরমেশ্বর থেকে বানিয়েছেন রণজয় হালদার, হেমা তাকে রণজয় হালদার থেকে বানালো রথীন সান্যাল। কী একখানা কনট্রাক্ট এবার নিয়েছে সে! যে পারছে একবার করে তার নাম-টাম পাল্টে দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে শ্রীকৃষ্ণের মতো তার কাঁধে এক শো আটটা নাম ঝুলে গেছে। পরে যা হবার হবে, ভদ্রতার খাতিরে মহিলাকে কিছু বলার জন্য হাঁ করতে যাবে সেই সময় বাড়ির ভেতর থেকে পুরুষ মানুষের দুর্বল গলা শোনা গেল, 'কে, কে এসেছে গো?'

মহিলা ভেতরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'হেমা—'

'আমি আসছি, আমি আসছি।'

ভেতরের পুরুষটিকে না দেখা গেলেও টের পাওয়া যাচ্ছে হেমার নাম শুনেই তিনি দুর্দান্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

মহিলা এবার হেমার দিকে ফিরে বললেন, 'তোমার জন্যে উনি একেবারে অস্থির হয়ে আছেন। দিনে কম করে দশ বার তোমার কথা জিজ্ঞেস করেন—'

মহিলার কথার মধ্যেই ভেতর দিকের দরজা দিয়ে যিনি এসে বাইরের ঘরে ঢুকলেন তাঁকে দেখা মাত্র টেরিফিক চমকে উঠল পরমেশ্বর। কবরের তলায় বছরখানেক কাউকে ঢুকিয়ে মাটি চাপা দিয়ে রাখলে কী হাল হতে পারে পরমেশ্বর জানে না। তবে তার ধারণা, যিনি ঢুকবেন হুবহু এই রকম একখানা মাল হয়ে বেরিয়ে আসবেন। এই ভদ্রলোকের বয়েস ষাট আর সত্তরের মাঝামাঝি। কিন্তু দেখে মনে হয় দেড় শো কি দুশো বছর। গায়ে মাংস-ফাংস নেই, স্রেফ হাড়ের ফ্রেমের ওপর সাদা ফ্যাটফেটে কাগজের মতো স্কিন জড়ানো। চোখ দুটো তিন সেণ্টিমিটার করে ভেতর দিকে ঢোকানো। মাথার চুল সাদাও না, কালোও না—হেজে যাওয়া পাটের ফেঁসোর মতো। অন্ধকারে এই মালটিকে আচমকা দেখলে অনেক শলা বড় বড় হারামির দাঁতে দাঁত লেগে এমন 'লক-জ' হয়ে যাবে যে বাকী লাইফে সেই চোয়াল আর খুলতে হবে না।

ভদ্রলোক যে ঐ মহিলাটির হাজব্যাণ্ড সেটা না বলে দিলেও মালুম করা যাচ্ছিল। স্বামী জিনিসটি কিন্তু ওয়াইফের উলটো। প্রায় ছ ফুটের মতো হাইট একটা টগবগে তাগড়া ইয়াং ম্যান হেমার সঙ্গে ঢোকার পরও অনেকক্ষণ যেন মহিলাটি দেখতে পান নি। কিন্তু মিশরের মমির মতো ঐ বুড়ো মাকড়া ঘরে ঢুকেই প্রথমে পরমেশ্বরের দিকে তাকাল। বলল, 'ইনি?'

মহিলার কাছে হেমা পরমেশ্বরের যা পরিচয় দিয়েছিল, তাঁর স্বামীর কাছেও তাই বলল। তখন এঁদের পরিচয়টা পরমেশ্বরকে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এবার সেই চান্সটা নিল হেমা। বলল, 'ইনি শ্রীতারাদাস হালদার আর উনি সুপ্রীতি হালদার।' একটু থেমে ফের বলল, 'এঁদের একমাত্র ছেলে রণজয় হালদার একজন বিজনেসম্যান ছিলেন। চার মাস ধরে তাঁর খোঁজ নেই। সেই ব্যাপারেই এঁদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল।'

শুনতে শুনতে শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বরফের মতো কী যেন ওঠানামা করতে লাগল পরমেশ্বরের। লাইফে আগে দু-একবার যে সে নার্ভাস হয়ে পড়ে নি তা নয়। কিন্তু এমন ভয় আগে আর কখনও সে পায় নি। হেমা সারিন নামে এই ছুকরি কী টেরিফিক খলিফা! খেলিয়ে খেলিয়ে তাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে এসেছে যার কথা ভাবলে মাথায় চক্কর লেগে যায়। কে ভাবতে পেরেছিল, যে রণজয় হালদারের মেক-আপ নিয়ে সে ঘুরছে, হেমা তাকে স্ট্রেট তার মা-বাপের সামনে এনে বসিয়ে দেবে!

আলাপ-টালাপ করিয়ে দেবার পর হেমা কিন্তু পরমেশ্বরের দিকে আর তাকাল না। রণজয় হালদারের হাপিস হয়ে যাওয়া আর তার খবর দেবার ব্যাপারে সুপ্রীতি আর তারাদাস হালদারের সঙ্গে আরো খানিকক্ষণ কথাবার্তা

বলে এবং চা-ফা খেয়ে একসময় পরমেশ্বরকে নিয়ে উঠে পড়ল। বাইরে এসে টু-সীটারে আগের মতোই পাশাপাশি বসল তারা। ড্রাইভ করতে করতে হেমা বলল, 'এবার বুঝতে পারছেন আপনি আর যা-ই হোন, রণজয় হালদার অন্ততঃ নন।'

আচমকা শীত লাগার মতো কাঁপা গলায় পরমেশ্বর বলল, 'আমি তা হলে কে?'

'সেটা আমার চাইতে আপনি নিশ্চয়ই বেশি ভালো বলতে পারবেন। যদি এক্ষুণি বলতে না চান, আমি ইনসিস্ট করব না। তবে—'

'তবে কী?'

উইণ্ড স্ক্রীনের বাইরে চোখ রেখে হেমা আস্তে করে বলতে লাগল, 'আমি আপনার সঙ্গে একটা নতুন এগ্রিমেন্ট করতে চাই।'

পরমেশ্বর হেমার কথা ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, 'কীসের এগ্রিমেণ্ট?'

হেমা বলল, 'প্রফেসানাল এগ্রিমেণ্ট।'

ছুকরি কি তাকে কোনভাবে ফাঁসাতে চায়? পরমেশ্বর ঠিক বুঝতে পারল না। তবে এটা টের পেল, হেমার কব্জা থেকে এখন হড়কে বেরিয়ে যাবার উপায় নেই। 'দেখাই যাক, ছুঁড়িটা কদ্দুর নাচাতে পারে'—এ রকম একটা ভাব করে পরমেশ্বর বলল, 'আপত্তি নেই—' বলে নার্ভগুলোকে সজাগ করে বসে রইল।

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। রীয়েল রণজয় হালদারদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওরা ভি-আই-পি রোডে এসে পড়েছিল। টু-সীটারের চাকার তলায় আসফাল্টের চকচকে রাস্তা ফিতের মতো গুটিয়ে যাচ্ছে। দু ধারের গাছ-পালা, ডানদিকের বাড়ি-ঘর, বাঁদিকে টানা ক্যানাল এবং সল্ট লেকের ছবির মতো টাউনশিপ সট সট বেরিয়ে যাচ্ছে।

পরমেশ্বর এক সময় বলল, 'এগ্রিমেণ্টের ব্যাপারে আমার কিছু জানতে ইচ্ছা করছে।'

'সবই জানতে পারবেন। একটু ওয়েট করুন। তার আগে দু-একটা কথা বলবার আছে।'

উইণ্ড স্ক্রীনের বাইরে থেকে চোখ সরিয়ে এনে হেমার দিকে তাকাল পরমেশ্বর।

হেমা বলল, 'দেখুন আপনি কে, আপনার আইডেণ্টিটি কী, সবটা না হলেও অনেকটাই আমার জানা। একটা কথা আগেই বলে রাখছি, আপনি

আমার টার্গেট নন। আমার যে টার্গেট তার খোঁজ করতে গিয়ে দেখলাম আপনি মাঝখানে ঢুকে গেছেন।'

পরমেশ্বর দম-আটকানো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনার টার্গেট কে?'

হেমা দারুণ নিস্পৃহ গলায় বলল, 'একটু ধৈর্য ধরুন। আমার কথা শেষ হয় নি এখনও।'

'ঠিক আছে। আমি মুখ বন্ধ করলাম। কিন্তু তার আগে মনে থাকতে থাকতে একটা কথা জিজ্ঞেস করে রাখি। রণজয় হালদারের ব্যাপারটা আমাকে একটু বলবেন?'

'নিশ্চয়ই। সেটা বলার পর এগ্রিমেণ্টের কথাটা বলব।' বলে একটু চুপ করে থাকল হেমা। তারপর গাড়ির স্পীড অনেক কমিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে শুরু করল, 'রণজয় হালদার ছিল একজন ভেরি এণ্টারপ্রাইজিং ইয়াংম্যান'। যাদবপুর ইউনিভার্সিটির দারুণ ব্রাইট স্টুডেণ্ট। মেটালার্জিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। ইউনিভার্সিটি থেকে বেরুবার পরই লেকচারারের একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছিল সে। তা ছাড়া ইচ্ছা করলে কোন বিগ ফার্মে বড় কাজ-টাজ পেয়ে যেতে পারত। কিন্তু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট স্পিরিটের রণজয়ের ইচ্ছা ছিল নিজের হাতে একটা বিজনেস বিল্ড করা। অনেক ছোটাছুটি আর চেষ্টা-টেষ্টা করে একটা ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের লাইসেন্স বার করেছিল রণজয়। কিন্তু নিজের ক্যাপিট্যাল-ট্যাপিটাল ছিল না; তাই আরেক জনের সঙ্গে বিজনেসটা স্টার্ট করে দেয়। কিন্তু কিছুদিন আগে, অ্যাবাউট থ্রি-ফোর মান্থস এগো হঠাৎ খবর পাওয়া গেল রণজয় দিল্লী যাবার পথে মিসিং হয়েছে! ইনভেস্টিগেসনের দায়িত্ব নিয়ে এসে দেখলাম, ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের বিজনেস ফাইন চলছে আর আপনি রণজয় হালদার হয়ে বসে আছেন।'

জোরে শ্বাস টানতে টানতে পরমেশ্বর বলল, 'আপনার কথামত ধরে নিলাম আমি নকলী রণজয় হালদার। আসল রণজয় হালদারের তা হলে কী হলো?'

'আপনার কী মনে হয়?

'আমি কেমন করে বলব? আমি তো আর ইনভেস্টিগেট করছি না।'

'রাইট, রাইট।' হেমা মাথা নাড়ল, 'আপনার ইনফরমেসনের জন্য জানিয়ে রাখছি, রীয়েল রণজয় হালদার ইজ মার্ডারড। মার্ডারের এভিডেন্সও আমরা পেয়ে গেছি। যে লোকটার হাত দিয়ে এই মার্ডার হয়েছে, হী ইজ আণ্ডার কনস্টাণ্ট ওয়াচ। তবে এ-কথা রণজয়ের মা-বাবাকে জানাতে পারিনি এখনও। ওঁদের ধারণা, ছেলে এখনও বেঁচে আছে। কী করে যে খবরটা দেব বুঝতে পারছি না।' বলে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল হেমা। তারপর

আবার শুরু করল, 'যত আনপ্লেজাণ্ট জবই হোক, একদিন-না-একদিন খবরটা ওঁদের দিতেই হবে। দ্যাটস দা মোস্ট স্যরি পার্ট অফ আওয়ার সারভিস।'

পরমেশ্বর এসব কথা প্রায় শুনছিলই না; তার কানের একটা ফুটো দিয়ে এগুলো ঢুকে আরেক ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। অন্যমনস্কর মতো সে জিজ্ঞেস করল, 'মাডারারকে জানতে পেরেও তাকে ক্যাঁচাকলে ফেলছেন না কেন?'

'মাডারারটা একটা হাতের পুতুল মাত্র, এ সিম্পল ইনস্ট্রুমেণ্ট ওনলি। যে তাকে দিয়ে খুনটা করিয়েছে আমার টার্গেট হল সে। তাকে ধরতে পারলে এই সব ছোটখাটো ক্রিমিন্যালদের হাতে দড়ি পরাতে পাঁচ সেকেণ্ডও লাগবে না।'

'কে রণজয় হালদারকে খুন করিয়েছে?'

হেমা টু-সীটারের স্পীড আরো কমিয়ে দিল। পরমেশ্বরের চোখের ওপর নিজের চোখ ফিক্সড করে বলল, 'যে আপনাকে আসল রণজয় হালদারের জায়গায় নকল রণজয় হালদার বানিয়েছে।'

শরীরের সবগুলো নার্ভ একসঙ্গে দারুণ ধাক্কা খেল যেন পরমেশ্বরের। একটা অদ্ভুত ধরনের কাঁপুনি হাড়ের ভেতর দিয়ে গোটা বডিতে ছড়িয়ে যেতে লাগল। সে বলল, 'মানে—'

'মানেটা আপনি ভালোই জানেন। এবার আমাদের এগ্রিমেণ্টের কথা বলি। যে লোকটা আমার টার্গেট তার মতো অ্যাণ্টি-সোসাল অ্যাণ্টি-ন্যাশনাল ক্রিমিন্যাল আমাদের কাণ্ট্রিতে খুব বেশি জন্মায় নি। এই ক্রুকটাকে ধরার ব্যাপারে আপনি আমাকে হেল্প করুন।'

পরমেশ্বর উত্তর দিল না; চোখের তারা ফিক্সড করে তাকিয়ে রইল।

হেমা বলতে লাগল, 'আপনার ব্যাকগ্রাউণ্ড আর অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে আমার কাছে কিছু ইনফরমেশন আছে। ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড বলে একটা বস্তুর কথা নিশ্চয়ই আপনি জানেন?'

'জানি।'

'ঐ ঢাউস বইটা কতগুলো ধারায় আপনি পড়তে পারেন ডেফিনিটলি সে সম্পর্কে আপনার সাফিসিয়েণ্ট আইডিয়া আছে কি?'

পরমেশ্বর বলল, 'আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?'

'নো নো। নিজেদের মধ্যে মিউচুয়াল কো-অপারেশনের কথা বলছি।'

'দেন ইটস ও-কে ম্যাডাম। তবে একটা কথা জানিয়ে রাখি। আমাকে ফাঁসাতে হলে এখনকার পেনাল কোড সাফিসিয়েণ্ট নয়। নতুন করে ওটা লিখতে হবে।'

পর্যন্ত কত কী যে করেছে, সে নিজেই সব জানে না। এসব কারবারের কোন্‌টার কী ডকুমেন্ট পুলিসের হাতে পেঁছে গেছে, তাই বা কে জানে। এতদিন সোসাইটির স্ট্যাম্পমারা খচ্চরদের সে সাহায্য করে এসেছে। এবার না হয় গুড বয় হয়ে গভর্নমেণ্টকে একটু হেল্প করা যাক। তাতে নতুন একটা এক্সপীরিয়েন্সও হবে। তা ছাড়া এই ছুকরিটাকে আরেকটু ভালো করে স্টাডি করা দরকার। সে বলল, 'আমাকে কী করতে হবে বলুন।'

'আপনার সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছে তা সিক্রেট রাখবেন।'

'ঠিক আছে। তারপর—'

'তারপর কী করতে হবে, সেটা আমার চাইতে ভাল আপনি জানেন।'

পরমেশ্বর চুপ করে রইল।

হেমা ফের বলল, 'একটা এত বড় ক্রিমিন্যাল আর মার্ডারারকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। জানেন, কতগুলো মার্ডার এই লোকটা করেছে? কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে। দেশের ক্ষতি করে হিউজ অ্যামাউণ্ট ফরেন এক্সচেঞ্জ বিদেশের ব্যাঙ্কে লুকিয়ে রাখছে। এ ছাড়া আরো কত অফেন্স যে ওর ক্রেডিটে রয়েছে তার কোন হিসেব নেই। এ রকম একটা 'রোগ'কে জেলখানার বাইরে রাখলে কাণ্ট্রির সর্বনাশ হয়ে যাবে।' বলে একটু থামল হেমা। তারপর গলার স্বরে টেরিফিক জোর দিয়ে আবার বলল, 'আই স্যোয়ার, যদি একবার ওকে আমি ধরতে পারি, জেল নয়, স্ট্রেট ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে ছাড়ব। অ্যাণ্ড হী উইল নেভার বী এবল্‌ টু এসকেপ।'

পরমেশ্বর এবারও উত্তর দিল না। দেশ-টেশ নিয়ে আগে কখনও ভাবে নি সে। এখনও যে তার মাথায় হেমার কথাগুলো খুব একটা ধাক্কাফাক্কা দিল তা নয়। তবে একটা কথা ঠিকই বলেছে হেমা। সোমেশ্বরের মতো খচ্চর ওয়ার্ল্ডে খুব বেশি পয়দা হয় নি। লাইফে কম হারামী নিয়ে কারবার করে নি পরমেশ্বর, কিন্তু সোমেশ্বরের মতো মাল এই প্রথম দেখল।

হেমা সোমেশ্বরকে কব্জা করে ফাঁসির দড়িতে লটকাবার জন্য তার সাহায্য চাইছে। ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে পেটের ভেতর হাসি যেন বগবগিয়ে উঠতে লাগল। সোমেশ্বর অমিতাভর বারোটা বাজাবার জন্য তাকে কনট্রাক্ট

দিয়ে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। এখন হেমা সোমেশ্বরের বারোটা বাজাবার জন্য তার হেল্প চাইছে। অবশ্য পয়সা দিলে লোকের বারোটা বাজাবার কনট্রাক্ট সে নিয়ে থাকে। এটাই তার প্রফেসান এবং হোল টাইম জব।

কনট্রাক্ট অনুযায়ী অমিতাভ সেনের ফ্যাক্টরি উড়িয়ে দিয়েছে সে। সোমেশ্বরের কাজ তার ফিনিশড্। বিবেকের দিক থেকে সে কমপ্লিটলি ফ্রি। এখন হেমা যদি তাকে পয়সা দেয় ডেফিনিটলি সোমেশ্বরের গলায় দড়ি লাগাবার সব অ্যারেঞ্জমেণ্ট পাক্কা করে ফেলবে। প্রফেসান ইজ প্রফেসান। কার কাছে যেন ছেলেবেলায় ফেয়ারি টেলসের একটা গল্প শুনেছিল পরমেশ্বর। তাতে এক মাকড়া পাখিকে কে যেন জিজ্ঞেস করেছিল, 'পাখি তুমি কার?' পাখিটা টেরিফিক প্র্যাকটিক্যাল। সে বলেছিল, 'যখন যার খাঁচার চুকি তখন তার।' পরমেশ্বর ভাবল, সে-ও বিলকুল তাই। যে তার সঙ্গে কনট্রাক্ট করে হাতে ক্যাশ ধরিয়ে দেবে সে তার।

অনেকক্ষণ পর পরমেশ্বর এবার মুখ খুলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

হেমা বলল, 'অফ কোর্স।'

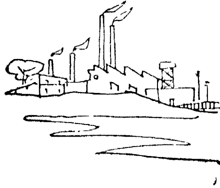
'আপনি যার কথা বলেছেন তার বারোটা বাজাবার ব্যবস্থা না হয় আমি করলাম কিন্তু তাতে আমার ফায়দা কী?'

'কিছু একটা ডেফিনিটলি হবে। ভালো রিওয়ার্ড নিশ্চয়ই পাবেন।'

'ক্যাশ?'

স্লাইট চিন্তা করে হেমা বলল, 'হ্যাঁ, ক্যাশই পাবেন।'

পরমেশ্বর বলল, 'অলরাইট, আপনার কথাটা মনে রইল।'



•• এগারোটার মধ্যে ওরা চৌরঙ্গীতে এসে পড়ল। একটা ট্র্যাফিক আইল্যাণ্ডের কাছে হেমার টু-সীটার দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ঘাড় ফিরিয়ে পরমেশ্বরের দিকে তাকাল। বলল, 'নাউ?' অর্থাৎ পরমেশ্বর এখন কী করবে সেটাই জানতে চাইছে সে।

পরমেশ্বর একবার ভাবল, হেমার সঙ্গে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে যায়। পরক্ষণে ঠিক করে ফেলল, না, স্ট্রেট সোমেশ্বরের অফিসে চলে যাবে। কনট্রাক্ট অনুযায়ী সব কাজ তো সে করেছেই। তার ওপর আরো টেরিফিক ব্যাপার মাকড়া তাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে। সোমেশ্বরের কাছ থেকে মালকড়ি আদায় করে নিয়ে তারপর তার জেল বা ফাঁসির অ্যারেঞ্জমেণ্টের ধান্দা করতে হবে।

অবশ্য সোমেশ্বরের বারোটা বাজাবার ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহ ছিল না পরমেশ্বরের। হেমা কতটা ক্যাশট্যাশ দেবে সে সম্বন্ধে তার ধারণা নেই। তবে সেটা জিজ্ঞেস করে জেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এখন তা থাক। এটা অবশ্য সে জানে, সোমেশ্বরের কাজ করলে যত মালকড়ি পাওয়া যাবে তার সিকির সিকিও হেমা দিতে পারবে কিনা সন্দেহ। সোমেশ্বর তো ওপেন অফারই দিয়ে রেখেছেন। আর কারো কনট্রাক্ট না নিয়ে তাঁর কাজই করে যাক পরমেশ্বর। তাঁর হাতে এত কাজ যে হোল লাইফ করে গেলেও শেষ হবে না।

একজনের কাজ করা পরমেশ্বরের পছন্দ নয়। কারো কাছে মাথা মুড়িয়ে দাসখত দেবার ইচ্ছাও তার নেই। তবে এটা মানতেই হবে সোমেশ্বরের অফারটা খুবই লোভনীয়।

যতই লোভনীয় হোক, যতই ক্যাশকড়ি মিলুক, সোমেশ্বরের সঙ্গে নতুন কনট্রাক্ট সে আর করতে পারবে না। হেমা যত কম টাকাই দিক, সেটাই

তাকে মেনে নিতে হবে। কেননা, তার ব্যাকগ্রাউণ্ডখানা যে রকম সোনা-বাঁধানো তাতে ভয়ের কারণ আছে। তার গায়ে তো একটা-আধটা ছেঁদা নেই। হেমা তার সম্বন্ধে কতটা ইনফরমেশন যোগাড় করছে, কে জানে। ব্যাগোরবাই করলে হয়ত তাকে জেলের লাপসি খাইয়ে ছেড়ে দেবে। অবশ্য বেশিদিন তাকে পুরে রাখার মতো জেলখানা ওয়ার্ল্ডে এখনও পয়দা হয় নি। তবু এক-আধ দিনের জন্যও যদি ঢুকতে হয়, সেটা তার প্রফেসানের পক্ষে খুবই খারাপ। কেরিয়ারে আর প্রফেসানে কোনরকম স্পট রাখতে চায় না পরমেশ্বর। জেল না, জরিমানা না, হাজত না, বিরুদ্ধে কোন কেস না—নিজেকে পুরোপুরি স্পটলেস আর ক্লীন রাখতে চায় সে। এতে তার পসার বাড়বে, বিজনেস বাড়বে। কনট্রাক্টের ফি চড়চড়িয়ে বেড়ে যাবে। ব্যাঙ্ক রবারি, হাইওয়ে রবারি, নোট জাল, দলিল জাল, সিক্রেট ডকুমেণ্ট পাচার ইত্যাদি ইত্যাদির টেকনিক্যাল নো-হাউ বেচে বা নিজের হাতে করে দেবার পরও হোল লাইফে যে জেলে ঢোকে নি, এক পয়সা ফাইন দ্যায় নি তার বিজনেস রোখে কোন্ মাকড়া ?

তা ছাড়া, এতদিন যাদের বারোটা সে বাজিয়েছে তারা ছোটখাটো মাল। সোমেশ্বরের মতো দুর্দান্ত ইণ্টারন্যাশনাল ঘাঘুর সঙ্গে লড়ার মধ্যে মজা আছে।

হেমা বলল, 'কী হল ? কী ভাবছেন ?'

একটু চমকে উঠে পরমেশ্বর বলল, 'কই, কিছু না।'

এই সময় ট্র্যাফিক সিগন্যালে সবুজ আলো জ্বলে উঠতেই গাড়িগুলো স্রোতের মতো ছুটতে লাগল। পরমেশ্বর বলল, 'রাস্তাটা ক্রস করে কাইণ্ডলি একটু নামিয়ে দেবেন।'

হেমা কিছু না বলে ওপারে গিয়ে ফুটপাথের গা ঘেঁষে টু-সীটারটা দাঁড় করিয়ে দিল। পরমেশ্বর গাড়ি থেকে নেমে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

হেমা বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, পালাবার চেষ্টা করবেন না। দু হাজার পেয়ার সিক্রেট চোখ আপনার ওপর নজর রাখছে।'

'দু হাজার কেন, দু লাখ পেয়ার চোখকে নজর রাখতে বলুন। ম্যাডাম, আমি যদি ভক্কি দিয়ে ভাগতে চাই ওয়ার্ল্ডের কোনো মাকড়া আমাকে ধরতে পারবে না। তবে আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি হড়কে যাব না।'

'নিজের ওপর যতই আপনার বিশ্বাস থাক, আমার হাত থেকে আপনি আর হড়কাতে পারবেন না। এনিওয়ে আবার কখন দেখা হচ্ছে ?'

'বিকেলের মধ্যে ফ্ল্যাটে ফিরে আসছি।'

টু-সীটার নিয়ে হেমা চলে গেল। আর পরমেশ্বর কয়েক স্টেপ এগিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে সোমেশ্বরের ফ্যাক্টরি এরিয়ার নামটা বলে ড্রাইভারকে সেখানে যেতে বলল।

সোমেশ্বরের ফ্যাক্টরি কমপ্লেক্সের কাছাকাছি এসে আচমকা মত পালটে ফেলল পরমেশ্বর। সে ঠিক করল, আগে অমিতাভদের 'ইটার্নাল ইন্ডাস্ট্রিজে' যাবে। মেন্ডেজের টাইম বম্বগুলোর তেজ কতখানি সেটা একবার ইনসপেকসান করা দরকার। ভোরবেলাতেই সোমেশ্বর লোলে তাকে সব খবর-টবর দিয়েছে, তবু নিজের চোখে দেখার ব্যাপারই আলাদা। তা ছাড়া এখন ওখানে গেলে তার ওপর কারো সন্দেহই থাকবে না। অমিতাভকে সিমপ্যাথি-টিমপ্যাথি দেখিয়ে একেবারে ক্লীন বডি নিয়ে সে স্লিপ কেটে বেরিয়ে যেতে পারবে। এরকম একটা ব্যাপার ভাবার জন্য নিজেকেই নিজে রীতিমতো তারিফ করল পরমেশ্বর।

যাই হোক, ড্রাইভারকে বলে ট্যাক্সিটাকে ঘুরিয়ে 'ইটার্নাল ইন্ডাস্ট্রিজে'র গেটের সামনে নিয়ে এল সে।

ফ্যাক্টরি কমপ্লেক্সটার বাইরে এখন গাদা গাদা মানুষের ভিড়। দেখেই বোঝা যায় ওরা এখানকার ওয়ার্কার। সবার চোখেমুখে টেরিফিক ভয় আর উদ্বেগ।

গেটের ওপর অগুনতি পুলিস দাঁড়িয়ে আছে; মাকড়ারা একটা মাছিকেও ঢুকতে দিচ্ছে না। বেশ মালুম পাওয়া যাচ্ছে, ভেতরে টেরিফিক একটা কারবার ঘটে গেছে।

ভাড়াটাড়া চুকিয়ে ট্যাক্সিওয়ালাকে ছেড়ে গেটের কাছে চলে এল পরমেশ্বর। কিন্তু পুলিসরা তাকে আটকে দিল, 'অন্দর যানেকো হুকুম নেহী হ্যায়।'

পরমেশ্বর জানালো সে এই কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের বন্ধু। তাতেও কাজ হল না। তখন একটা পুলিসকে দিয়ে অমিতাভর কাছে স্লিপ পাঠালো। একটু পরে পুলিসটা ফিরে এসে জানালো, পরমেশ্বর যেতে পারে।

ভেতরে আসতেই দেখা গেল, চারদিকে পুলিস গিজগিজ করছে। এখানে-ওখানে অনেকগুলো কালো পুলিস ভ্যানও চোখে পড়ল।

এই কমপ্লেক্সের সব কিছুই মুখস্থ পরমেশ্বরের। অফিস বিল্ডিং পেছনে রেখে পায়ে পায়ে সে এরিয়ার ইলেকট্রনিকস ইউনিটের দিকে এগিয়ে গেল। ওয়ার্ল্ডের টপ স্ট্র্যাজেডি কিংদের মতো মুখেচোখে বাইশটা ছেলে হারাবার শোক ফুটিয়ে রেখেছে সে। অমিতাভর সঙ্গে চোখাচুখি হলেই যেন বুঝতে

পারে পরমেশ্বরের মতো ওয়েলউইশার তার আর কেউ নেই। তার এত বড় ক্ষতিতে পরমেশ্বরের বুকের ভেতরকার আটটা রিব যেন একেবারে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে।

ইলেকট্রনিকস ইউনিটের কাছে এসে তার মতো হারামীরও চোখের তারা একেবারে ব্রহ্মতালুতে গিয়ে ঠেকল। মেণ্ডেজ খচ্চরটার টাইম বম্বের যে এতটা জোর ছিল ভাবতে পারা যায় নি। ইউনিটটার শেডের অর্ধেক উড়ে গেছে। সফিস্টিকেটেড মেশিনগুলো গলে ডেলা পাকিয়ে রয়েছে। পুড়ে জ্বলে ভেঙেচুরে চারদিকে টেরিফিক কারবার হয়ে আছে। ওধারের মেডিসিন প্ল্যাণ্টটারও একই হাল। সব শলা সারিয়ে-সুরিয়ে আবার খাড়া করে তুলতে অমিতাভর বাকী লাইফ কেটে যাবে। নাঃ, গড-ড্যাম-ইট, মেণ্ডেজ হারামীটার সত্যি সত্যি এফিসিয়েন্সি আছে।

ইলেকট্রনিকস আর মেডিসিন ইউনিট দুটো দেখা হয়ে গেলে পরমেশ্বর অফিস বিল্ডিংয়ে এসে অমিতাভর চেম্বারে ঢুকল। একজন টপ পুলিস অফিসার আর কোম্পানি সেক্রেটারি বসে বসে খুব সম্ভব এই টেরিফিক অ্যাকসিডেণ্ট সম্পর্কেই কথা বলছিলেন। পরমেশ্বর ঢুকতেই সেক্রেটারি আর পুলিস অফিসার উঠে চলে গেলেন। আপাতত তাঁদের কথা হয়ে গেছে। অমিতাভ পরমেশ্বরের দিকে তাকিয়ে ভাঙা গলায় বলল, বসুন, মিস্টার হালদার।'

পরমেশ্বর মার্ক করল, অমিতাভ মাকড়াটা এক্কেবারে ফিনিশ হয়ে গেছে যেন। বাপ-মা ভাই-বোন বৌ-বাচ্চা সব একসঙ্গে চিতায় উঠলে যে রিঅ্যাকশান হয় অবিকল তার চেহারায় সেই রকম স্ট্যাম্প পড়ে গেছে। পরমেশ্বর চুপচাপ মহাভারতের গান্ধারীর মতো পুত্রশোকের পোজ নিয়ে মুখোমুখি বসল।

অমিতাভ আবার বলল, 'ফ্যাক্টরি দুটোর অবস্থা দেখে এলেন ?'

'হ্যাঁ।' খুব আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল পরমেশ্বর, 'খানিকটা আগে খবর পেলাম আপনার ফ্যাক্টরিতে একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে গেছে। শুনেই দৌড়ে এলাম। কিন্তু অ্যাকসিডেণ্টটা এমন বিরাট, এমন ভয়ঙ্কর—এতটা ইমাজিন করতে পারি নি। হরিবল্‌।'

'আই অ্যাম টোটালি আনডান। আর কি আমি এসব বিল্ড করতে করতে পারব ?'

'নিশ্চয়ই পারবেন।' কনসোলেশন দেবার স্টাইলে পরমেশ্বর বলতে লাগল, 'ভেঙে পড়বেন না প্লীজ।'

অমিতাভ বলল, 'আপনার সিমপ্যাথির জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু নিজের ওপর আমার আর ভরসা নেই মিস্টার হালদার।'

একটু চুপচাপ। তারপর পরমেশ্বর বলল, 'আচ্ছা সেনসাহেব—'

'বলুন—' অমিতাভ মুখ তুলে পরমেশ্বরের দিকে তাকাল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মাকড়ার গলা বসে চোক্‌ড্‌ হয়ে গেছে; চোখ দুটো আড়াই সেণ্টিমিটার ভেতরে ঢুকে গেছে।

পরমেশ্বর বলল, 'আপনার ফ্যাক্টরি নিশ্চয়ই ইনসিওর করা আছে?'

'তা আছে। কমপেনসেসনও পেয়ে যাব। কিন্তু তাতে স্যাটিসফ্যাকসানটা কোথায়?'

অমিতাভর কথা বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল পরমেশ্বর।

অমিতাভ ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল এবার। শুধু টাকাই তো সব কথা নয়। নিজের কোম্পানির প্রোডাকসনের অন্য মজা আছে। ফ্যাক্টরি দুটোর এমন মারাত্মক ড্যামেজ হয়ে গেছে যে তার ফলে প্রোডাকসান বন্ধ। প্রোডাকসান বন্ধ মানে দু-তিন হাজার ওয়ার্কারের টোটালি বসে যাওয়া। কিছু ক্ষতিপূরণ তারা নিশ্চয়ই পাবে কিন্তু তাতে কি বাকি লাইফ চলবে?'

খানিকটা আগে গেটের কাছে গাদা গাদা ওয়ার্কার দেখে এসেছে পরমেশ্বর। ফ্যাক্টরি উড়ে গেলে এত লোকের যে বারোটা বেজে যাবে, আগে ভাবে নি সে। এবার তার চোখে অগুনতি করুণ এবং শুকনো মুখ আর্ট গ্যালারির ছবির মতো ফুটে উঠতে লাগল। দেখতে দেখতে পরমেশ্বরের খুব খারাপ লাগছে। ক'টা টাকার জন্য এত লোকের সর্বনাশ করে বসে আছে—ভাবতেই মনে হল কেউ যেন তার ব্রেনে গুচ্ছের ছুঁচ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। শ্লা, সোমেশ্বরের এই কনট্রাক্টটা নেওয়া ঠিক হয় কি।

অমিতাভ আবার বলল, 'এমপ্লয়মেণ্টের অবস্থা খুব খারাপ। এই ফ্যাক্টরি দুটো বন্ধ হয়ে গেলে এই লোক কোথায় চাকরি-বাকরি পাবে কে জানে।'

পরমেশ্বর বলল, 'আচ্ছা সেনসাহেব, এত বড় দুটো অ্যাকসিডেণ্ট কী করে ঘটল বলে আপনার মনে হয়?' কথাগুলো বলে নার্ভ টানটান করে অমিতাভর দিকে তাকিয়ে থাকল সে। অ্যাকসিডেণ্টের ব্যাপারে অমিতাভর মনোভাবটা তার জানা দরকার।

অমিতাভর বসে-যাওয়া ঘোলাটে চোখ দুটোয় যেন আগুন জ্বলে উঠল; চোয়াল পাথরের চাংড়ার মতো শক্ত হল। চাপা ধারাল গলায় সে চেঁচিয়ে উঠল, 'ইটস স্যাবোটেজ, ইটস কন্সপিরেসি। ডেফিনিটলি আমার ফ্যাক্টরির ভেতর সিক্রেট এজেণ্ট ঢুকিয়ে এই অ্যাকসিডেণ্ট ঘটানো হয়েছে। নইলে এত সিকিউরিটি গার্ডের মধ্যে বাইরে থেকে কারো পক্ষে এসে এটা করা সম্ভব না। অ্যাণ্ড আই নো হু ইজ দ্যা ম্যান বিহাইণ্ড দিস।'

পরমেশ্বর টের পেল তার শিরদাঁড়ার জোড়গুলোতে দারুণ একটা ঝাঁকানি

লাগল। অমিতাভ মাকড়া কি তাকে সন্দেহ-টন্দেহ করছে? কিছু বলার জন্য সে হাঁ করতে যাচ্ছিল, তার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল।

ফোনটা তুলে কার সঙ্গে যেন অ্যাসিডেন্টের ব্যাপারে দু-একটা কথা বলে তাকে চলে আসতে বলল অমিতাভ। তারপর ফোনটা ক্রেডেলে নামিয়ে রাখতে গিয়ে কী ভেবে আবার তুলে নিয়ে শুরু করল, 'মিস্টার হালদার আমার সামনে বসে আছেন। কথা বলবে নাকি?'

লাইনের ওধার থেকে কী উত্তর এল বোঝা গেল না। তবে অমিতাভ ফোনটা পরমেশ্বরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'সুনেত্রা; কথা বলুন—'

ফোনটা কানে লাগিয়ে 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে সুনেত্রার বিষণ্ণ ভারী গলা ভেসে এল, 'অমিতাভর কী দারুণ ক্ষতি হয়ে গেল বলুন তো—'

গলা শুনেই বোঝা যায়, লাভারের ফ্যাক্টরি উড়ে যাওয়াতে ছুকরি খুব 'শক্‌ড্‌' হয়েছে। পরমেশ্বর বলল, 'হ্যাঁ হেভি লস—'

'ও একেবারে ভেঙে পড়েছে। কাইন্ডলি ওর কাছে থেকে একটু সাহস দেবেন।'

'আমি সব সময়ই সেন সাহেবের কাছে আছি আর থাকবও।'

'আমি জানি। অমিতাভ আপনার কথা সব সময় বলে। আপনার মতো ফ্রেন্ড ওর আর নেই।' টেলিফোনের ভেতর দিয়ে সুনেত্রার কৃতজ্ঞ সুর চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল।

পরমেশ্বর ভাবল, আমি যে শ্লা কত বড় ফ্রেন্ড তা যদি জানতো মাকড়ারা! টেরিফিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, 'কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। যদি আগে জানা যেত এত বড় একটা হতে যাচ্ছে—'

'সেই তো! অমিতাভ আগে কিছুই বুঝতে পারে নি। সবই ব্যাড লাক।' বলে একটু থেমে আবার শুরু করল সুনেত্রা, 'আপনি কতক্ষণ থাকবেন?'

'ঘণ্টাখানেক।'

'কাইন্ডলি থেকে যান। আমি তার মধ্যেই এসে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা।' পরমেশ্বর ফোন নামিয়ে রাখল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই কথাটা মনে পড়ে গেল তার। লক্ষ্য করল, কপালের দু'ধারের রগ টিপে ধরে টেবলের ওধারে বসে আছে অমিতাভ। বলবে কি বলবে না, একটুক্ষণ ভেবে নিল পরমেশ্বর। তারপর ঝট করে বলেই ফেলল, 'আপনি বলছিলেন এই অ্যাকসিডেন্টটা স্যাবোটেজের ব্যাপার।'

অমিতাভ কপালের রগ থেকে আঙুল সরিয়ে বলল, 'সিওর।'

'ইলেকট্রিকের শর্ট সারকিট-ফারকিট হয় নি তো?'

'ইমপসিবল্ মিস্টার হালদার।'

চোখ কুঁচকে অমিতাভকে দেখতে দেখতে দারুণ সতর্কভাবে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'কে এই স্যাবোটেজ করতে পারে বলে আপনার মনে হয়?'

আচমকা অমিতাভ ক্ষেপে উঠল, 'একটা সোয়াইনই এ রকম ডার্টি কাজ করতে পারে। হোল লাইফ লোকটা আমাদের পেছনে লেগে আছে। একবার উঠুন, প্লীজ উঠে আসুন—'

অমিতাভর মতো জেণ্টলম্যান, যে কখনও চড়া মেজাজে কথা বলে না, তার কাছে ওয়ার্ল্ডের সবাই ভদ্রতা-ফদ্রতা শিখতে পারে—সে যে এরকম ক্ষেপে উঠে খিস্তিখাস্তা ঝাড়তে পারে, পরমেশ্বর ভাবতে পারে নি। কেনই বা সে তাকে উঠতে বলছে, বোঝা যাচ্ছে না। যাই হোক, অমিতাভ যখন বলেছে তখন উঠতেই হল। অমিতাভ তাকে বিরাট চেম্বারের উত্তর দিকের ওয়ালের কাছে নিয়ে এল। গোটা ওয়ালটা কাচের। তার ওপর দামী কাপড়ের ভারী পর্দা ঝুলছে। এক টানে পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে সে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'লুক, লুক—দেখতে পাচ্ছেন?'

অনেক দূরে সোমেশ্বরের অফিস-কাম-ফ্যাক্টরি কমপ্লেক্সটা দেখা যাচ্ছে। সেদিকেই অমিতাভর আঙুল ফিক্সড হয়ে আছে। মনে পড়ল, সোমেশ্বরও একদিন তার চেম্বারের কাচের জানলা দিয়ে অমিতাভর 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজে'র কমপ্লেক্সটা দেখিয়েছিলেন। পরমেশ্বর আস্তে করে বলল, 'ওগুলো তো ফ্যাক্টরি-ট্যাক্টরি—'

'রাইট। ওই ফ্যাক্টরি কমপ্লেক্সটা কার জানেন?'

ওয়ার্ল্ডের সবটুকু সরলতা সারা মুখে ফুটিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'না।'

'দি সোল ইমপর্টাণ্ট ম্যান অফ দ্যাট কমপ্লেক্স ইজ সোমেশ্বর মল্লিক। লোকটা ওয়ার্ল্ডের টপ ক্রিমিন্যালদের একজন। এই যে কমপ্লেক্সে এত বড় একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে গেল, আই অ্যাম ড্যাম সিওর, হী ইজ রেসপনসিবল ফর ইট।'

'কোন প্রুফ পেয়েছেন?'

'এখনও পাই নি। তবে একদিন-না-একদিন ওকে আমি ফাঁসির দড়িতে ঝোলাবই।' অমিতাভর মুখ স্টীলের মতো শক্ত হয়ে উঠতে লাগল।

পরমেশ্বর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'লোকটা ডেঞ্জারাস তো।'

'ইয়েস, পাঁচ শো শয়তান এক সঙ্গে বসে ওকে তৈরি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। ওর কথা শুনলে বুঝতে পারবেন, ও কত বড় ক্রিমিন্যাল।'

অমিতাভরা আবার ফিরে এসে মুখোমুখি বসল। অমিতাভ বলে চলল, 'ঐ যে

ফ্যাক্টরিটা দেখালাম, সোমেশ্বর মল্লিক যার অল-ইন-অল, ওটা একদিন আমার বাবা নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন। সোমেশ্বর মল্লিক ছিল বাবার বন্ধু—পেনিলেস, পপার। বাবা তাকে নেহাত দয়া করে ঐ ফ্যাক্টরিতে এনেছিলেন।'

অমিতাভ যা বলতে লাগল তা এই রকম। তার বাবা রিসার্চ আর প্রোডাকসন নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত থাকতেন। তা ছাড়া বিজনেসের কমপ্লেক্স ব্যাপারগুলো তাঁর মাথায় একেবারেই ঢুকত না। সোমেশ্বর দেখত ব্যবসা আর মার্কেটিং-এর দিকটা। আস্তে আস্তে এমন হল পুরো কোম্পানিটা কবে যেন নিজের কব্জায় ঢুকিয়ে ফেলল সোমেশ্বর। অমিতাভর বাবা যখন বুঝতে পারলেন, অনেক দেরি হয়ে গেছে। কোন স্টেপ নেবার আগেই দার্জিলিং-এ একটা কনফারেন্সে গিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটল। অমিতাভ, তার মা এবং পুলিসের ধারণা এটা আনন্যাচারাল অর্থাৎ অস্বাভাবিক মৃত্যু! আসলে এটা মার্ডার এবং সেই মার্ডারটা পেছন থেকে যে ঘটিয়েছে সে সোমেশ্বর মল্লিক।

এই মার্ডারের কথাটা আগেই অমিতাভর কাছে শুনেছিল পরমেশ্বর। সুনেত্রার বাবা এ ব্যাপারে ইনভেস্টিগেট করছেন। কিন্তু মার্ডারার যে সোমেশ্বর মল্লিক আগে না সুনেত্রার বাবা, না অমিতাভ, কেউ তাকে জানায় নি। আজ উত্তেজনা আর রাগের মাথায় বলে ফেলেছে অমিতাভ।

আরো অনেক কথাই শুনেছে পরমেশ্বর। ছেলেবেলায় অমিতাভর মা তাকে দিয়ে দুটো প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন; এক হল, বড় হবার পর বাবার খুনের উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া। দুই হল, সোমেশ্বর মল্লিকের ফ্যাক্টরির চাইতেও বড় ফ্যাক্টরি করা এবং সেটা করতে হবে সোমেশ্বরের কমপ্লেক্সের গায়েই। যাই হোক, পরমেশ্বর অবাক হয়ে যাচ্ছিল। সে নিজেও নানা টাইপের ক্রাইম করে বেড়ায়। কলকাতার আন্ডারওয়ার্ল্ডের প্রায় সব ঘাঘু হারামীর মিনিটে ক'বার পালস্ ওঠানামা করে, সমস্ত তার জানা। হাজার ধরনের অ্যান্টিসোসাল এলিমেণ্ট নিয়ে তার কারবার। কিন্তু সোমেশ্বরে মতো এত বড় ক্রিমিন্যাল আগে আর সে দ্যাখে নি। চারদিক থেকে তার সম্বন্ধে যা খবর-টবর পাওয়া যাচ্ছে তা খুবই মারাত্মক। নিজেও তাকে ক'দিন নাড়াচাড়া করে দেখেছে; ফার্স্ট হ্যান্ড কিছু এক্সপীরিয়েন্সও হয়েছে।

এমনিতে কারো সম্বন্ধে খুব একটা ফীলিং-টীলিং নেই পরমেশ্বরের। যে ক্যাশ-ফ্যাশ ফেলে মার্ডার বাদে তারই কাজ করে দেয় সে। কিন্তু এই মুহূর্তে অমিতাভর জন্য স্লাইট দুঃখ হতে লাগল। সোমেশ্বর হারামীটা তার সঙ্গে কনট্রাক্ট করেছে ঠিকই এবং চুক্তি অনুযায়ী টাকা-পয়সাও চুকিয়ে

দেবে নিশ্চয়ই। তবু খচ্চরটা অমিতাভর বাবাকে খুন করিয়েছে, তাকে দিয়ে অমিতাভর ফ্যাক্টরি উড়িয়ে দিয়েছে, ভাবতেই তার ভীষণ খারাপ লাগল। মনে মনে চিন্তা করল, আমি কি মাকড়া অমিতাভকে ভালোবেসে ফেললাম নাকি? খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে জিজ্ঞেস করল, 'সোমেশ্বর মল্লিক যে আপনার বাবাকে মার্ডার করিয়েছেন তার কোন প্রুফ পেয়েছেন?'

অমিতাভ হঠাৎ চমকে উঠল, তারপর বলল, 'দেখুন আমি একটা ভুল করে ফেলেছি। সুনেত্রার বাবা বার বার আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন, ইনভেস্টিগেসনের সময় যেন সাসপেক্টের নাম কাউকে না জানাই। কিন্তু মনটা এত খারাপ ছিল যে রাগের মাথায় বলে ফেলেছি। আপনি আমার রীয়েল ফ্রেন্ড। আমি জানি কাউকেই আপনি এ ব্যাপারটা জানাবেন না।'

পরমেশ্বর ভাবল, অমিতাভ যদি জানতো সে কী টাইপের মাল এবং বিশ্বাস করে কার কাছে কী বলছে তাহলে তার তিনবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেত। কিংবা এতক্ষণে পরমেশ্বরকে পুলিস ভ্যানে উঠে পড়তে হতো। সে বলল, 'আপনি আমাকে বিশ্বাস করে বলেছেন। আমি এ কথা কি ড্রাম পিটিয়ে লোককে জানাতে পারি?'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' বলে অমিতাভ কী ভেবে আবার শুরু করল, 'দ্যাট সোয়াইন আমার বাবাকে খুন তো করিয়েছেই। আমি যখন থেকে ফ্যাক্টরি স্টার্ট করেছি তখন থেকেই পেছনে লেগেছে। এজেন্ট ঢুকিয়ে এখানে কতবার লেবার ট্রাবল করিয়েছে তার ঠিক নেই। আমি যাতে দিল্লী থেকে কোন রকম ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্স বার করতে না পারি তার জন্য সমানে চেষ্টা করে গেছে। যখন দেখল কিছুতেই পারা যাচ্ছে না তখন ভেতরে সিক্রেট লোক ঢুকিয়ে ফ্যাক্টরি ড্যামেজ করিয়ে দিল।'

'একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না।'

'কী?'

'আপনার বাবাকে মার্ডার করার কারণটা না হয় বুঝতে পারি। সোমেশ্বর মল্লিকের আপনার ফ্যাক্টরিতে ট্রাবল ক্রিকেট করে কী লাভ?'

'লাভ নেই!' অনেকক্ষণ অবাক হয়ে রইল অমিতাভ। তারপর বলল, 'ওই ক্রিমিনালটা হানড্রেড পারসেন্ট ডিজঅনেস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। আমার প্রোডাকসান বন্ধ হয়ে গেলে ওর সাবস্ট্যাণ্ডার্ড বাজে মাল বাজারে চলবে। ও লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্য ভালো ওষুধ বানায় ঠিকই, সেই সঙ্গে গোপনে স্পুরিয়াস ড্রাগসও তৈরি করে। ভালো ওষুধের সঙ্গে মিশিয়ে ভেজাল মেডিসিনে ও বাজার ছেয়ে দেবে।'

পরমেশ্বরের মনে পড়ল, তাকে দিয়ে তিন ওয়াগন ওষুধ হাপিস করিয়ে দিয়েছেন সোমেশ্বর। তখন মাকড়ার উদ্দেশ্যটা টের পাওয়া যায় নি ; এবার গেল। সে কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় সুনেত্রা দরজা ঠেলে চেম্বারে ঢুকল।

অমিতাভ বলল, 'এসো।'

টেবলের এধারে পরমেশ্বরের পাশে বসতে বসতে সুনেত্রা বলল, 'ফ্যাক্টরি দুটো দেখে এলাম। হরিবল সাইট।'

এ রকম কথা সকাল থেকে খুব সম্ভব অনেকবার শুনেছে অমিতাভ। উত্তর না দিয়ে সে বলল, 'তুমি একাই এসেছ? মিস্টার চ্যাটার্জিকে দেখছি না!'

'বাবা কাল দার্জিলিং গেছেন।'

'হঠাৎ?'

'তোমার বাবার মার্ডারের ব্যাপারে। যাবার সময় তোমাকে ফোন করেছিলেন ; তুমি অফিসে ছিলে না। তোমাকে জানাতে বলেছেন, দার্জিলিং থেকে ফিরেই খুব সম্ভব মার্ডারারকে ধরতে পারবেন।'

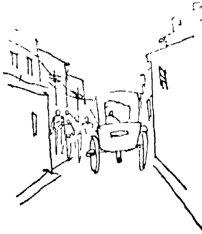
ফ্যাক্টরির সর্বনাশ এবং অমিতাভর বাবার মার্ডার সম্পর্কে সুনেত্রা কথা বলতে লাগল। তার ফাঁকে হুট করে উঠে দাঁড়াল পরমেশ্বর। বলল, 'আজ আমি যাই, কাল আবার আসব।'

সুনেত্রা বলল, 'এখনই যাবেন?'

'হ্যাঁ, একটু কাজ আছে। কাইণ্ডলি যাবার পারমিসান দিন।'

অমিতাভকে দেখিয়ে সুনেত্রা বলল 'প্লীজ, আপনি সবসময় ওর পাশে থাকবেন। কথা দিয়েছেন কিন্তু—'

পরমেশ্বর বলল, 'নিশ্চয়ই থাকব।'



'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজ' থেকে বেরিয়ে ঝকঝকে অ্যাসফাল্টের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একবার কবজি উলটে ঘড়ি দেখল পরমেশ্বর। এখন বারোটা বেজে দশ।

অনেকগুলো চিন্তা তার ব্রেনের ভেতরটা তোলপাড় করে দিচ্ছিল। অমিতাভ টের পেয়েছে পুরোপুরি স্যাবোটেজ করে ফ্যাক্টরি দুটো ওড়ানো হয়েছে। ওর ধারণা সোমেশ্বরই এজেন্ট লাগিয়ে এটা করিয়েছেন। ধারণাটা যে হানড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট তা পরমেশ্বরের চাইতে কেউ ভালো জানে না। তবে এজেন্ট যে সে-ই, সেটা এখনও ধরতে পারেনি অমিতাভ। এই পরমেশ্বর আগে ভেবেছিল সোমেশ্বরের কাছ থেকে তার ফী আদায় করে কেটে যাবে কিন্তু এক্ষুণি হড়কে যাওয়া খুব সম্ভব হয়ে উঠবে না। কারণ স্টেজ থেকে আচমকা যদি সে ভ্যানিশ হয়ে যায়, তাহলে অমিতাভর সন্দেহ তার ওপর এসে পড়বে। তা ছাড়া হেমার সঙ্গে এগ্রিমেণ্ট হয়ে গেছে। সোমেশ্বরকে ক্যাঁচাকলে ঢোকাবার জন্য সে তাকে হেল্প করবে। এটা তার প্রফেশন ; যার সঙ্গে কনট্রাক্ট হবে তার কাজ করবে সে। মাকড়া মেয়েমানুষটা তার ওপর নজরও রাখছে। এখান থেকে এখন না সরাই ভালো। সব দিক দেখে, অবস্থা বুঝে যা করার পরে করা যাবে। ততদিন পর্যন্ত এখানেই টাইট হয়ে বসে সোমেশ্বরের বারোটা বাজাবার প্ল্যান করা যাক। অবশ্য তার আগে একটা দারুন আর্জেণ্ট কাজ আছে। সোমেশ্বর মাকড়ার কাছ থেকে ফ্যাক্টরি ওড়াবার ফী-টা আদায় করে নিতে হবে। মাল যা খলিফা—যদি একবার টের পায় যে পরমেশ্বর তাকে ফাঁসাবার কনট্রাক্ট নিয়েছে, আর দেখতে হবে না। ক্যাশ-ফ্যাশ কিছু তো ঠেকাবেই না উলটে কী ঝামেলা যে পাকিয়ে বসবে তার ঠিক নেই।

সূর্যটা খাড়া মাথার ওপর এসে উঠেছে। সকালে যদিও হেমা হেভি ব্রেকফাস্ট খাইয়েছে, তবু পেটের ভেতর খিদেটা ছুঁচ ফোটাতে শুরু করেছে।

যতই খিদে পাক, পরমেশ্বর ভাবল, আগে গিয়ে সোমেশ্বরের কাছ থেকে ক্যাশটা আদায় করবে। তারপর হয় সার্কুলার রোডের ফ্ল্যাটে ফিরে যাবে, আর যদি খিদেটা টেরিফিক খচড়ামো করতে শুরু করে কোন পবিত্র খালসা হোটেলে ঢুকে তড়কা-রোটি দিয়ে একখানা প্রলেটারিয়েট লাঞ্চ সেরে ফেলবে।

কয়েক স্টেপ যেতে-না-যেতেই একটা খালি ট্যাক্সি যেন রাস্তা ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। পরমেশ্বর উঠে তার ডেস্টিনেসন জানিয়ে দিল।

সাত-আট মিনিটের ভেতর ট্যাক্সিটা সোমেশ্বরের ফ্যাক্টরি-কাম-অফিস কমপ্লেক্সের গেটে তাকে নামিয়ে ভাড়া নিয়ে চলে গেল।

কমপাউণ্ডে ঢুকে স্ট্রেট অফিস ব্লকের ফোর্থ ফ্লোরে সোমেশ্বরের চেম্বারে গিয়ে ঢুকল পরমেশ্বর। সোমেশ্বর আর তাঁর সিক্রেট পোকায়-খাওয়া আখের মতো পাকানো চেহারার নটবর নন্দী ছাড়া আর কেউ নেই।

পরমেশ্বরকে দেখে সোমেশ্বরের প্রকাণ্ড তেলতেলে মাংসল মুখ থেকে হাসি যেন ফিনকি দিয়ে বেরুতে লাগল। দারুণ ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন, 'এসো এসো, মোস্ট ওয়েলকাম। সকালে বাড়ি আসবে বলেছিলে। তোমার জন্যে ওয়েট করে করে শেষ পর্যন্ত অফিসে চলে এলাম।'

পরমেশ্বরের মনে হল, মাকড়া পারলে তাকে একেবারে কোলে নিয়ে বসায়। শালা তো জানে না তার জন্য চারদিকে কতগুলো ফাঁসির দড়ি পাকানো হচ্ছে। একটা দড়ি পাকানোর দায়িত্ব তার ঘাড়েও এসে পড়েছে। যাক গে, ঠোঁটের কোণে কান্নিক-মারা একটু হাসি ফুটিয়ে একটা গদিমোড়া চেয়ারে বসল পরমেশ্বর। তারপর বলল, 'একটা কাজে ফেঁসে গিয়েছিলাম। তাই আসতে দেরি হল। আপনার বাড়ি না গিয়ে স্টেট্রট অফিসেই হাজির হলাম।

সোমেশ্বর ফের তাঁর চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, 'রীয়ালি, তোমার মতো জিনিয়াস আগে আর কখনও আমি দেখি নি।'

এপাশ থেকে বুজগুড়ি কাটার মতো করে নটবর নন্দী বলে উঠল, 'স্যার, আপনাকে আগেই বলেছিলাম না এঁর মতো ফ্যাণ্টাসটিক কাজের লোক আমাদের ইণ্ডিয়ায় আর সেকেণ্ডটি পাবেন না!'

'নিশ্চয়ই বলেছিলে, থাউজেণ্ড টাইমস বলেছিলে। নটবর তুমি আমার অনেক কাজ করেছ কিন্তু পরমেশ্বরকে নিয়ে আসাটা তোমার মনুমেণ্টাল ওয়ার্ক।'

গ্যাদগেদে গলায় সোমেশ্বর আর নটবর প্রায় মিনিট দশেক ধরে পরমেশ্বরের

ফ্ল্যাটারি করে গেল। সকালেও এক রাউণ্ড সোমেশ্বরের এই জাতীয় মাখন-লাগানো কথা শুনতে হয়েছে।

দশ মিনিট বাদে সোমেশ্বর পরমেশ্বরকে বললেন, 'তোমার এই মার্ভেলাস এচিভমেণ্টটা আমরা সেলিব্রেট করব ঠিক করেছি। তোমার অনারে হোটেল স্কাইলার্কে'র ব্যাঙ্কোয়েট হলে আমরা একটা পার্টি দেব।'

পরমেশ্বর বলল, 'পার্টির কোন দরকার নেই। আপনি আমার সঙ্গে কনট্রাক্ট করেছিলেন, আমি সেটা করে দিয়েছি। আই ওয়ার্ক'ড অ্যাণ্ড ইউ উইল পে। এর মধ্যে পার্টি-টার্টি ঢোকাবেন না স্যার।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। এত বড় একটা কাজ করলে। আমার দিক থেকে কিছু একটা না করতে পারলে কী ভালো লাগে।'

ও-কে স্যার, আপনার যা ইচ্ছা হয় করবেন। এবার একটা কাজের কথা বলি—'

'সিওর—'

'আমার সঙ্গে যা কনট্রাক্ট হয়েছিল তা করে দিয়েছি। আপনি স্যাটিসফায়েড হয়েছেন—'

'ড্যাম স্যাটিসফায়েড—'

'এবার কাইণ্ডলি আমার ফী-টা দিয়ে দিন।'

'ডেফিনিটলি। তোমার ফী রেডিই আছে। এয়ারপোর্ট থেকে সিক্রেট ব্যাঙ্ক ডকুমেণ্ট সরানো, মেডিসিনের ওয়াগন ভ্যানিশ করা, 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজে'র ফ্যাক্টরি ওড়ানো—সব কিছুর রেমুনারেসন হিসেব করে রেখেছি। এই নাও।' বলে দেয়াল আলমারি থেকে একটা অ্যাটাচি কেস বার করে এনে আয়নার মতো ঝকঝকে টেবলের ওপর দিয়ে পরমেশ্বরের দিকে ঠেলে দিলেন সোমেশ্বর।

পরমেশ্বর বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।' বলে অ্যাটাচিটা একধারে রেখে দিল।

সোমেশ্বর বললেন, 'খুলে দেখ।'

'খুলতে হবে না। আমি জানি, আমার যা ফী তার চাইতে অনেক বেশিই আছে ওটায়—'

'আমার ওপর তোমার খুব কনফিডেন্স দেখছি।'

'স্যার, আপনার মতো ক্লায়েণ্টদের সার্ভিস দিতে দিতে লাইফ কাটিয়ে দিচ্ছি। দেখেছি, যে সব মালেরা আমার মতো খচড়াকে এনগেজ করে ক্যাশের ব্যাপারে তাদের গড়বড় নেই, দশ হাত খুলে তারা পয়সা দেয়। আণ্ডার-ওয়ার্ল্ডে'র কাজ করাতে হলে তার প্রাইস তো দিতেই হয় স্যার।'

সোমেশ্বর সারা শরীরের অপর্যাপ্ত মাংস কাঁপিয়ে খ্যা-খ্যা করে হাসতে লাগলেন, 'তুমি একটি দুর্ধর্ষ হারামজাদা।'

পরমেশ্বর আগেই ভেবেছিল হেমার কনট্রাক্ট অনুযায়ী সোমেশ্বরকে ফাঁসাতে হলে তার ফ্ল্যাটে কিছু দিন থাকা দরকার। সে বলল, 'স্যার, আপনার সব কাজ করে দিয়েছি, ফীও পেয়ে গেলাম। এখন "গুড বাই" করাই দরকার। কিন্তু আর ক'টা দিন যদি আপনার ঐ ফ্ল্যাটে থাকি—আপত্তি নেই তো?'

'ক'দিন কেন, হোল লাইফ থাকো না। আর 'গুড বাই'র কথা কী বলছ হে? কাল থেকেই তোমাকে অন্য একটা অ্যাসাইনমেণ্ট দেব, ঠিক করেছি—'

'স্যরি স্যার—'

সোমেশ্বরের লোমওলা ভুরু দুটো কুঁকড়ে দুটো শুঁয়োপোকা হয়ে গেল যেন। তিনি বললেন, 'স্যরি মানে?'

পরমেশ্বর বলল, 'আমি স্যার অন্য ক্লায়েণ্টের সঙ্গে কনট্রাক্ট করে ফেলেছি আজ থেকে তার কাজ স্টার্ট করতে হবে।'

'ইমপসিবল। রেস্ট অফ ইওর লাইফ তুমি আর কারো কাজ করতে পারবে না। এক্সক্লুসিভলি আমার কাজ করে যেতে হবে।'

'স্যার, আমি কোন মাকড়ার কাছে মাথা সেল করে দিই না। আমি বণ্ডেড লেবারার নই। বিলকুল ফ্রী ম্যান। যার সঙ্গে ইচ্ছা হবে তার কাজ করব।'

সোমেশ্বর কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বললেন, 'দ্যাটস অল রাইট। কিন্তু একটা কথা ভাবছ না কেন, কতগুলো থার্ড গ্রেড রটন ক্রিমিন্যালের সঙ্গে কাজ করে কোন আনন্দই পাবে না। পয়সা হয়ত পাবে কিন্তু ক'টা পয়সা! আমি তার টেন টাইমস, ফিফটিন টাইমস বেশি দেব। শুধু ইণ্ডিয়ায় নয়, ইণ্টারন্যাশনাল ম্যাপে তোমাকে প্লেস করব। তোমার মতো ট্যালেণ্টকে আমি ওয়েস্টেড হয়ে যেতে দেব না।'

'আপনি স্যার গ্রেট, আমার সম্বন্ধে এত সব ভেবেছেন। কিন্তু আবার বলছি স্যার, আপনার সঙ্গে ফ্রেশ এগ্রিমেণ্টে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না।'

সোমেশ্বরের চোখ দ্রুত কুঁচকে যেতে লাগল, বাদামী মণি দুটোর ভেতর থেকে আগুনের হল্কা বেরিয়ে আসতে লাগল। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বললেন, 'পরমেশ্বর, আমার কাছে একবার যারা আসে তারা লাইফে আর কখনও বেরুতে পারে না।'

সোমেশ্বরের গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যাতে এক সেকেণ্ডের মধ্যে পরমেশ্বরের নার্ভগুলো টান-টান হয়ে গেল। শিরদাঁড়া খাড়া করে সে বলল,

'আপনি বোধহয় জানেন না স্যার, দিস ম্যান—' নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বলতে লাগল, 'দিস মাকড়াকে কারো আস্তাবলে পার্মানেন্টলি ঢোকানো যায় না।'

সোমেশ্বর আগের মতো তীব্রগলায় বললেন, 'তুমি এখনও ভালো করে জানো না, কার সঙ্গে কথা বলছ! তুমি আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে ফেলেছ। যে আমার সর্বনাশ করার সুড়ঙ্গগুলো জেনে ফেলেছে তাকে কিছুতেই ছাড়া যায় না।'

পরমেশ্বর বলল, 'আমি না চাইলে ওয়ার্ল্ডের কোন পাওয়ারফুল খচড়াই আমাকে ধরে রাখতে পারে না।'

টেবলের ওপর দুর্দান্ত একটা ঘুষি মেরে সোমেশ্বর বললেন, 'আমি তোমার সব ব্যাকগ্রাউণ্ড জানি। আমি একটা আঙুল তুললে কোথায় গিয়ে পড়বে, তুমি জানো না।'

'স্যার, আপনি যেমন আমার ব্যাকগ্রাউণ্ড জেনেছেন, আমিও আপনার সোনা-বাঁধানো ব্যাকগ্রাউণ্ডটা জেনেছি। সো, ইউ শুড নট শো মী ইওর টেমপার।'

'শাট আপ—' সোমেশ্বর চিৎকার করে উঠলেন, 'ডোণ্ট ট্রাই টু চ্যালেঞ্জ মী—'

'স্যার, ওয়ার্ল্ডে কেউ আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলে নি। আমি কাউকেই চ্যালেঞ্জ করি না, তবে কেউ যদি করে আমি ডেফিনিটলি অ্যাকসেপ্ট করে ফেলি। একটা কথা খুব সম্ভব আপনার জানা নেই—'

সোমেশ্বর উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে রইলেন।

পরমেশ্বর থামে নি, বলে যেতে লাগল, 'শয়তান যে মেটিরিয়াল দিয়ে আপনাকে তৈরি করেছে ঠিক সেই মেটিরিয়াল দিয়ে আমাকেও বানিয়েছে। চ্যালেঞ্জ করলে দেখা যাবে, কার ভাগে বেশি মেটিরিয়াল পড়েছে—

দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে সোমেশ্বর এবার বললেন, 'তুমি ওষুধের ওয়াগন লোপাট করেছ, সুইস ব্যাঙ্কের ডকুমেণ্ট এয়ারপোর্ট থেকে সরিয়ে এনেছ, ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজের ফ্যাক্টরি উড়িয়ে দিয়েছ—এ সব জানতে পারলে পুলিস তোমার অ্যাচিভমেণ্টে মুগ্ধ হয়ে একটা গালা পার্টি দেবে, কী বল ?'

পরমেশ্বর বলল, 'যেমন আপনি দিতে চাইছিলেন, তাই না ?' দ্রুত বলেই এবং সোমেশ্বরকে কিছু বলার সময় না দিয়ে ফের শুরু করল, 'আমার যদি ঐ সব কারণে কিছু হয়ে যায় আপনিও কি এয়ারকণ্ডিশানড চেম্বারে বসে থাকতে পারবেন ? কিছু হলে দু'জনেই তা শেয়ার করে নেব। যদি জেলে যেতে হয় হাত ধরাধরি করেই যাব—না কী বলেন ?'

আচমকা শরীরটা পেছন দিকে হেলিয়ে জোরে জোরে হেসে উঠলেন সোমেশ্বর। তারপর উঠে এসে পরমেশ্বরের কাঁধে একটা হাত রেখে গলায় তিন কেজি মাখন আর স্নেহ মাখিয়ে বললেন, 'দূর বোকা, আমি তোমার সঙ্গে মজা করছিলাম। এত বিরাট বিরাট ক'টা কাজ করলে। তোমার কিছুদিন রেস্ট দরকার।' বলতে বলতে একটা কথা মনে পড়ল তাঁর। দারুণ ওয়েল-উইশারের মতো এবার বললেন, 'রেস্ট নেবে কি, তুমি তো আবার নতুন কনট্রাক্ট করে বসে আছ। কাজটা হয়ে গেলে বিশ্রাম নিও।'

পরমেশ্বর হাসল। মনে মনে ভাবল, মাকড়া ডেফিনিটলি বুঝে গেছে তাকে টেমপার দেখিয়ে কাজ হবে না। শালা পথে এসো। মুখে দারুণ সফট্ একটু হাসি ফুটিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই রেস্ট নেব স্যার, নিশ্চয়ই নেব। এখন উঠি—'

'ও-কে। আমার কথায় কিছু মাইণ্ড কর নি তো?'

'কী যে বলেন স্যার। আপনার মতো ওয়েল-উইশারের কথায় কিছু মাইণ্ড করতে পারি!' পরমেশ্বর টাকা বোঝাই অ্যাটাচি কেসটা হাতে ঝুলিয়ে কুর্নিশ করার স্টাইলে মাথাটা ঝুঁকিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

দরজার বাইরে কাগজের মতো সাদা ধবধবে ইউনিফর্মপরা যে স্মার্ট ইয়ং বেয়ারাটা সর্বক্ষণ বসে থাকে, সে সট করে অ্যাটেনসনের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম হাঁকাল। পরমেশ্বর তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে স্লাইট মাথা ঝাঁকিয়ে লম্বা করিডর ধরে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে চলল।

ওদিকে চেম্বারের ভেতর তখন অন্য কারবার চলছে। আস্তে আস্তে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লেন সোমেশ্বর। দুটো কনুই টেবলে তুলে দুই হাতের ভেতর মুখটা রেখে পাক্কা পাঁচ মিনিট চোখ বুজে রইলেন। তাঁর কপালের চামড়া ক্রমশঃ কুঁচকে যেতে লাগল। একসময় চোখ মেলে এজেণ্ট নটবর নন্দীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছোকরাটাকে কী রকম মনে হল? আমার সঙ্গে বিট্রে করবে?'

নটবর বলল, 'আমার মনে হয় না স্যার। এটা ওর প্রফেসান। অনেক সিক্রেট ব্যাপার ও জানে। ইচ্ছা করলে ব্ল্যাকমেইল করতে পারে। কিন্তু কোন দিন কারো কাছে ওর এগেনস্টে কাউকে বলতে শুনি নি। তবু স্যার আমার কথা যদি বলেন, আমি এই ওয়ার্ল্ডে কাউকে বিশ্বাস করি না। আমার বাবাকেও না। বেকায়দায় পেলে ফাঁসিতে যে দেবে না, এমন কোন গ্যারাণ্টি নেই।'

সোমেশ্বর ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলেন। দারুণ খুশী হয়ে বললেন,

'একজাক্টলি, একজাক্টলি। আমার কিছু সিক্রেট ডকুমেণ্ট ওর কাছে থেকে গেছে ; আগেই নিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। ওগুলো গভর্নমেণ্টের হাতে গেলে সাত বছর জেল কেউ ঠেকাতে পারবে না। তুমি একটা কাজ কর—'

শিকারী কুকুরের মতো কান খাড়া করে তাকিয়ে রইল নটবর।

সোমেশ্বর বললেন, 'একটা লোক ওর পেছনে লাগিয়ে রাখো। টোয়েণ্টি-ফোর আওয়ার্স নজর রাখবে। পরমেশ্বর কোথায় যায়, কার সঙ্গে মেশে, সব খবর আমার চাই। একটা কথা, ওর ওপর যে ওয়াচ রাখা হচ্ছে তা যেন টের না পায়।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার—' নটবর বলল, 'একটা এক্সপার্ট স্পাই আজই ওর পেছনে সেট করে দিচ্ছি।'



সোমেশ্বরের অফিস-কাম-ফ্যাক্টরি কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে এক পবিত্র খালসা হোটেলে রুটি-মাংস দিয়ে দুপুরের লাঞ্চ সারল পরমেশ্বর। তারপর ট্যাক্সি ধরে স্ট্রেট নর্থ ক্যালকাটার বাউন্ডারি পেরিয়ে তার অরিজিনাল অ্যাড্রেসে সেই বস্তিটায় যখন এসে পেঁছুল তখন তিনটে বেজে গেছে।

বাড়িতে সবাইকেই পাওয়া গেল। এলিজাবেথ, লোলে, লক্ষ্মী, টগর, জোড়া মানকে—খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা জমিয়ে আড্ডা মারছিল। পরমেশ্বরকে দেখে সকলে হুল্লোড় বাধিয়ে দিল, 'দাদা এসেছে, দাদা এসেছে—'

'যা ব্বাবা, এই দুপুরবেলা হঠাৎ কোত্থেকে গুরু?'

'মাই সান, তোর গল্পই করছিলাম, আর তুই এসে পড়লি। অনেকদিন বাঁচবি।'

হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'টেরিফিক ঘুম পেয়েছে। এখন নো টক। সন্ধ্যেবেলা ঘুম ভাঙার পর কথা হবে।' হাতের অ্যাটাচি কেসটা এলিজাবেথের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'এটা রাখো মাদার—'

এলিজাবেথ বলল, 'কী আছে এর ভেতর?'

'খুলে দেখ—'

অ্যাটাচি কেসটা খুলতেই চোখের তারা স্রেফ গোল্লা পাকিয়ে গেল এলিজাবেথের। কেসের ভেতরটা একশো টাকার নোটে বোঝাই। চাপা গলায় সে বলল, 'এত টাকা মাই সন!'

পরমেশ্বর বলল, 'যে কনট্রাক্টটা নিয়েছিলাম সেটা ফিনিশ করেছি। এটা তার ফী। আশা করি বছরখানেক তুমি তোমার চারপাশের হিউজ ফ্যামিলি চালিয়ে নিতে পারবে।' বলতে বলতে ঘরে ঢুকে তার পুরনো বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

ঘণ্টা আড়াই বাদে সন্ধ্যের মুখে মুখে উঠে চা খেল পরমেশ্বর।

লোলে থেকে শুরু করে সবাই এখন তাকে ঘিরে বসে আছে। বীরেনের সঙ্গে কতটা জমাতে পেরেছে, কবে বিয়ের জন্য সানাইওলাকে ডাকতে হবে—এই সব নিয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে ঠাট্টা-ফাট্টা করল। জোড়ামানিক ছর্‌রা আর লাট্টু এর মধ্যে পরমেশ্বরের দুই পা নিজেদের কোলের ওপর তুলে টিপতে শুরু করেছে।

পরমেশ্বর লোলেকে বলল, 'ওখানকার কাজ তো ফিনিশড। আজ থেকে জগার মালের দোকানে আমাদের অফিসটা খুলে ফেলিস।'

লোলে বলল, 'খুলে ফেলব মানে? তুমি যাবে না? কতদিন জগার দোকানে ম্যাজিক-ফ্যাজিক দেখাও নি। আজ শলা সন্ধ্যে থেকে জমিয়ে দিই চলো।'

'না রে, আমি আরেকটা কনট্রাক্ট নিয়ে বসে আছি। একটু পরেই চলে যেতে হবে।'

'যাঃ ব্বাবা, আবার কনট্রাক্ট নিয়েছ?'

এলিজাবেথ বলল, 'কতদিন তুই বাড়িতে নেই সন, আমাদের ভীষণ খারাপ লাগছে।'

পরমেশ্বর এলিজাবেথের একটা হাত ধরে নিজের গালে বুলোতে বুলোতে বলল, 'মাদার, আর মোটে ক'টা দিন। তারপর তোমার হাতের রান্না রোজ খাব।' বলে আর দেরি করল না। লোলের কাছ থেকে ফ্ল্যাটের চাবি চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এখন আর মিডল-এজেড অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের মেক-আপ নিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে ফ্ল্যাটে ঢোকার দরকার নেই তার।

সার্কুলার রোডে নিজের ফ্ল্যাটে পেঁছুতে পেঁছুতে ন'টা বেজে গেল পরমেশ্বরের। ভেতরে ঢুকে ট্রাউজার্স-ফ্রাউজার্স চেঞ্জ করে লুঙ্গি পরে তিন খোরা ধান্যেশ্বরী স্টমাকে চালান করতে-না-করতেই টেলিফোন বেজে উঠল। ফোনটা তুলে সে বলল, 'কে, ম্যাডাম নাকি?'

ওধার থেকে হেমার গলা ভেসে এল, 'রাইট। গলা না শুনেই ধরে ফেলেছেন!'

'তা ফেলেছি। দুপুরে এগারটার সময় নামিয়ে দিয়েছিলেন। এখন রাত ন'টা। এর ভেতর ক'বার ফোন করে আমার খোঁজ নিয়েছেন?'

'আপনি কী করে জানলেন, আগেও ফোন করেছি?'

পরমেশ্বর বলল, 'আমার মাথায় তো স্ক্র্যাপ আয়রন পোরা নেই। নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন, আমি হড়কে বেরিয়ে গেছি।'

হেমা বলল, 'আপনাকে তো তখনই বলেছি আমার চোখের বাইরে যাবার উপায় আপনার সেই। বাজে কথা থাক। কাইণ্ডলি একটু ওপরে আসবেন নাকি?'

'আপনার সঙ্গে যখন এগ্রিমেণ্ট হয়েই গেছে তখন অর্ডার করলেই যেতে হবে। পাঁচ মিনিটের ভেতর হাজির হয়ে যাচ্ছি ম্যাডাম।'

একটু পর একটা কালীমার্কা বাঙলা মালের বোতল আর মাটির খোরা নিয়ে হেমার ফ্ল্যাটে চলে এল পরমেশ্বর। বাইরের ব্যালকনিতে এক পেগ জিন নিয়ে বসে ছিল হেমা। তার মুখোমুখি বসে পড়ল সে।

হেমা বলল, 'একটা খবর পেয়ে ভীষণ ভাল লাগল। আই অ্যাম রিয়ালি ভেরি ভেরি হ্যাপি।'

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'কী খবর?'

'আপনি আপনার লাস্ট গড ফাদারের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছেন। ক্লিয়ারলি জানিয়ে দিয়েছেন তার কাজ আর করবেন না।'

'কারেক্ট। গডফাদারকে ছেড়ে আমি এখন গডমাদারের ক্যাঁচাকলে পড়ে গেছি।' বলে মজাদার ভঙ্গিতে চোখ টিপল। তারপরই হঠাৎ কী খেয়াল হতে চমকে উঠল। চোখের কোণ দিয়ে হেমাকে মার্ক করতে করতে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?'

'আপনাকে তো বলেই দিয়েছি, দু হাজার পেয়ার চোখ আপনাকে ওয়াচ করে যাচ্ছে।'

শুধু ধান্যেশ্বরী এবং জিন খাওয়ার হালকা একটু শব্দ ছাড়া কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর পরমেশ্বর বলল, 'একটা ব্যাপারে আমার স্লাইট খিঁচ লাগছে।'

হেমা তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ ব্যাপারে?'

'সোমেশ্বর মল্লিককে কব্জা করার জন্যে আমাকে লাগালেন কেন?'

'কারণ, আপনার চাইতে বেটার লোক আমার জানা নেই।'

'আপনাদের সি-বি-আই কি সি-আই-ডিতেও নেই?'

'থাকতে পারে। আমি জানি না।'

'বুঝেছি, আপনি কাঁটা দিয়ে কাঁটা ওপড়াতে চান।' পরমেশ্বর হাসল।

হেমাও হাসল। তবে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একসময় বলল, 'আপনার মতো ইনটেলিজেন্ট, ইমাজিনেটিভ আর অ্যাকটিভ পার্সন আমি দেখি নি। আপনার বুদ্ধি আর ক্ষমতা প্রপারলি কাজে লাগাতে পারলে কী হতে পারে আপনার ধারণা নেই।'

পরমেশ্বর বলল, 'ম্যাডাম, আমাকে অয়েল লাগাতে হবে না। আপনার সঙ্গে তো কনট্রাক্ট হয়েই গেছে। যা কথা হয়েছে তা আমি করে দেব।'

হেমা বলল, 'ফ্ল্যাটারির ব্যাপার নয়। সীরিয়াসলি বলছি।'

পরমেশ্বর জবাব দিল না।

খানিকক্ষণ পর হেমা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কে কে আছে?'

'লাইফ হিস্ট্রি জানতে চাইছেন?'

হেমা হাসল, কিছু বলল না।

পরমেশ্বর বলল, 'আমার হিস্ট্রি জানলে কি সোমেশ্বর মল্লিকের বারোটা বাজাতে সুবিধে হবে?'

হেমা বলল, 'কোন পারপাস নিয়ে আপনার কথা জানতে চাই নি। এমনি—সিম্পল কিউরিওসিটি।'

পরমেশ্বর আর নখরাবাজি করল না। বলল, 'মা, ভাইবোন—এভরিবডি।'

'বি-টি রোডের বস্তিতে যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলাটি থাকে সে আপনার নিজের রীয়েল মা? যে মেয়ে দুটোকে শয়তান 'রোগ'দের হাত থেকে রেসকিউ করে শেলটার দিয়েছেন তারা আপনার আপন বোন? কাগজ কুড়াতো যে বাচ্চা দুটো আর যে ছোকরাটা বাসে পকেট মেরে বেড়াত তারা আপনার আপন ভাই?'

শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা স্রোত ওঠানামা করতে লাগল পরমেশ্বরের। এই ছুকরিটা তা হলে তার সব খবরই নিয়েছে? সোমেশ্বরের পেছনে সে তাকে লাগিয়েছে ঠিকই কিন্তু হেমার আসল ধান্দাটা বোঝা যাচ্ছে না। তাকে নিয়ে সে কী করতে চায় কে জানে। পরমেশ্বর যে খানিকটা নার্ভাস হয়ে পড়েছে তা একেবারেই বুঝতে দিল না হেমাকে। ফিলজফারের মতো মুখ করে বলল, 'কে যে আপন আর কে যে পর, কে নকল আর কে আসল, বলা খুবই মুশকিল ম্যাডাম। এ সব কথা স্টপ করে দিন।' একটু থেমে বলল, 'আচ্ছা—'

'বলুন—'

'আপনি তো আমার ব্যাকগ্রাউণ্ড হিস্ট্রি অনেকটা জেনে ফেলেছেন। ইচ্ছা করলে আমাকে ফাঁসাতেও পারেন। তাই না—'

পরমেশ্বরকে মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে হেমা বলল, 'আপনাকে আগেই বলে দিয়েছি, আমার টার্গেট আপনি নন।'

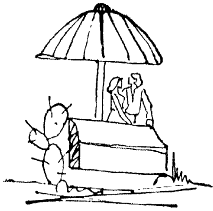
পরমেশ্বর বলল, 'দেখা যাক আপনি আমাকে কতটা খেলান। তবে এখন ছুটি দিন ম্যাডাম। টেরিফিক ঘুম পাচ্ছে।'

'ঠিক আছে। গুড নাইট—'

'গুড নাইট।'

পরমেশ্বরকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে হেমা বলল, 'সোমেশ্বর মল্লিকের ব্যাপারটা প্ল্যান করে ফেলুন।'

পরমেশ্বর বলল, 'চিন্তা করবেন না ম্যাডাম। আপনার সঙ্গে যে মোমেণ্টে এগ্রিমেণ্ট করেছি সেই মোমেণ্ট থেকে ব্রেনের ভেতর প্ল্যানিংটা চলছেই। ও-কে?' বলে স্ট্রেট লিফট বক্সের দিকে চলে গেল।



সেদিনই রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে পরমেশ্বর ভাবল, সোমেশ্বরকে চটিয়ে রেখে তার বারোটা বাজাতে গেলে রীতিমতো অসুবিধে হবে। মাকড়া সাবধান হয়ে গেলে তাকে ক্যাঁচাকলে ফেলা খুব সহজ ব্যাপার নয়। অবশ্য সুইস ব্যাঙ্কের সিক্রেট ডকুমেণ্টগুলো পরমেশ্বরের কাছেই আছে। সেগুলো হেমা সারিনের হাতে তুলে দিয়ে এক্ষুণি ওকে ফাঁসানো যায়। কিন্তু ওকে ফাঁসির দড়ি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে হলে আরো বেশী মালমশলা দরকার। যেমন, অমিতাভর বাবার খুনের প্রুফটা পেতে হবে। যেমন, রণজয় হালদার মানে যার নামের খোলসের ভেতর সে ঢুকে আছে তার মার্ডারের প্রুফও চাই। এ ছাড়া আরো হাজারটা ক্রাইমের ডকুমেণ্টও যোগাড় করতে হবে।

কাজেই পরের দিন সকালে উঠেই ফোন করে সে সোমেশ্বরকে ধরল। বলল, 'স্যার, কাল রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে স্রেফ আপনার কথাই ভেবে গেছি।'

সোমেশ্বর বললেন, 'তাই নাকি! এ তো আমার দারুণ সৌভাগ্য হে। তা কী ভাবলে?'

ভেতরে ভেতরে যতই ছুরিতে সান লাগাক, পরমেশ্বর ঠিকই করে নিয়েছে বাইরে থেকে সোমেশ্বর খচড়াটাকে এন্তার মবিল বা বাটার লাগিয়ে যাবে। সে বলল, 'ভাবলাম, অন্যের আস্তাবলে আর ঢুকব না। এখন থেকে আপনার কাজই করে যাব।'

'কারেক্ট, ভেরি কারেক্ট ডিসিসান।'

'তবে স্যার, ক'টা দিন রেস্ট নিয়ে নিই। তারপর ফ্রেশ এনার্জি নিয়ে আপনার নতুন অ্যাসাইনমেণ্ট নেব।'

'ফাইন। তুমি রেস্ট নাও।'

সোমেশ্বরের সঙ্গে মিটিয়ে নেবার পর ক'টা দিন কেটে গেছে। এর মধ্যে

সে রোজই আগের মতো ইমপোর্ট এক্সপোর্টের অফিসে যাচ্ছে। সেখান থেকে সোজা অমিতাভর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সে।

প্রথম দিকে অমিতাভ একেবারে ভেঙে পড়েছিল। মনে হয়েছিল, মাকড়াটা আর কোন দিনই শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই সে বেশ সামলে উঠেছে। নতুন করে ভাঙাচোরা প্ল্যান্ট দুটো আবার দাঁড় করাবার কথা ভাবতে শুরু করেছে। বার বার সে বলেছে, 'এ ব্যাপারে আপনার মতো ফ্রেণ্ডের সাহায্য চাই।'

পরমেশ্বর বলেছে, 'ডেফিনিটলি। যে হেল্প দরকার তাই পাবেন।'

এই ক'দিনে যার সঙ্গে পরমেশ্বরের সব চাইতে বেশি দেখা বা কথা হয়েছে সে হেমা সারিন। দিনে দশবার টেলিফোন করেছে হেমা। নইলে হুটহাট নিজেই পরমেশ্বরের ফ্ল্যাটে চলে এসেছে বা পরমেশ্বরকে নিজের ফ্ল্যাটে ডেকে এনেছে। সারাক্ষণই সোমেশ্বরকে ক্যাঁচাকলে ফেলার প্ল্যান সম্পর্কে সে জিজ্ঞেস করে। কথাবার্তা ছুকরি যা-ই বলুক, তার মতলবটা বুঝতে অসুবিধা হয় না পরমেশ্বরের। হেমা চায় তাকে চোখে চোখে রাখতে; যাতে এখান থেকে সে কেটে বেরিয়ে যেতে না পারে।

এর ভেতর একদিন দস্তুরমতো অবাক করে দিয়েছে হেমা। রাত ন'টায় সেদিন ফিরে এসেছিল সে। আর ফিরতেই হেমার ফোন পাওয়া গেল, 'কী করছেন?'

পরমেশ্বর বলেছে, 'কিচ্ছু না; এই তো ফিরলাম।'

'স্ট্রেট ওপরে চলে আসুন।'

'কী ব্যাপার?'

'আসুন না—'

'আচ্ছা আসছি'—সোনার বাংলার বোতল আর গোটাকয়েক মাটির খোরা নিয়ে একটু পর হেমার ফ্ল্যাটে চলে এসেছিল পরমেশ্বর। বলেছিল, 'কালপ্রিট হাজির। বলুন আপনার জন্যে কী সারভিস দিতে পারি?'

হেমা বলেছিল, 'আগে বসুন তো—'

পরমেশ্বর বিরাট ব্যালকনিতে বসে গিয়েছিল। হেমা বাংলা মালের চাট হিসেবে কাজুবাদাম আর কড়া করে ভাজা খানকতক ইলিশ মাছের পীস একটা প্লেটে করে এনে তার সামনে রেখে মুখোমুখি বসেছিল।

পরমেশ্বর বলেছিল, 'একি, আমি একাই বাংলা মাল দিয়ে স্টমাকের বারোটা বাজাব নাকি? আপনার ড্রিঙ্ক কোথায়?'

হেমা বলেছে, 'আজ আর ড্রিঙ্ক ভালো লাগছে না।'

'শরীর গড়বড় নাকি ?'

'শরীর ঠিকই আছে।'

পরমেশ্বর আর কিছু জিজ্ঞেস করে নি।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হেমা ফের বলেছে, 'আমার হায়ার অথরিটি কাল আমাকে হেড কোয়ার্টারে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।'

পরমেশ্বর উত্তর না দিয়ে হেমার দিকে তাকিয়েছে।

হেমা বলেছে, 'ও'রা সোমেশ্বর মল্লিকের কেসটা সম্পর্কে খুবই ইমপেশেণ্ট হয়ে পড়েছেন। লোকটা ডেঞ্জারাস ক্রুক আর অসম্ভব চালাক। যদি কোনরকমে টের পায় ওর পেছনে আমরা লেগেছি, সব ডকুমেণ্ট আর প্রুফ নষ্ট করে ফেলবে। তখন ওকে ধরলেও কিছু করা যাবে না। উলটে ডিফামেশান কেস এনে গভর্নমেণ্টকে অসুবিধায় ফেলে দেবে। কীভাবে তাড়াতাড়ি কিছু করা যায় সেটা ভাবুন।'

'সেটাই ভাবছি।'

এর পর অমিতাভ সেনের বাবা আর রণজয় হালদারের মার্ডার সম্পর্কে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। ঠিক হল, এই দুটো খুনের যত রকম প্রমাণ পাওয়া যায় দু'জনে এক সপ্তাহের ভেতর যোগাড় করে ফেলবে।

কথায় কথায় রাত বেড়ে গিয়েছিল। সোনার বাংলার যে বোতলটা সঙ্গে করে পরমেশ্বর নিয়ে এসেছিল সেটা সাবাড় হয়ে গেছে। বোতলটা পুরোপুরি উপুড় করে শেষ ক'ফোঁটা জিভে ঢেলে পরমেশ্বর বলল, 'আজ উঠি, গুড নাইট।'

'উঠবেন মানে! আসল কথাটাই তো বলা হয় নি। আজ আপনি খেয়ে যাবেন।' বলে একটু হেসে আবার শুরু করেছে হেমা, 'জানেন, আজ নিজের হাতে আমি রান্না করেছি।'

পরমেশ্বর চোখের তারা ফ্রিজ করে বলেছে, 'আপনি রান্নাও করতে পারেন ?'

'পুলিসে কাজ করলে রান্না করা বারণ নাকি ?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে দু'হাত উলটে পরমেশ্বর বলেছে, 'রীয়েলি আপনি আমার কাছে টেরিফিক একটা ধাঁধা। ড্রিঙ্ক করতে পারেন, আশি মাইল স্পীডে গাড়ি ছোটাতে পারেন, মাঝ রাতে লোকের জানলার গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকতে পারেন, ক্লাবের সুইমিং পুলে দুর্দান্ত হীট ছড়াতে ছড়াতে সাঁতার কাটতে পারেন, আবার রান্নাও করতে পারেন। ম্যাডাম, আপনার মতো মাল—' বলেই তাড়াতাড়ি জিভ কেটে এবং দু'হাতে দুই কান মুলে শুরু করল, 'আপনার মতো জিনিয়াস আমার হোল লাইফে আর কখনও দেখি নি।'

হেমা মজা করে বলল, 'লজ্জা দেবেন না। আপনার মতো জিনিয়াসের কাছে আমি কিসসু না। আপনার যা সব অ্যাক্টিভিটি দেখলাম—'

'মনে হচ্ছে, আমরা দু'জনেই দুজনকে অয়েল লাগিয়ে যাচ্ছি। এখন আর অয়েল-টয়েল লাগাতে ভালো লাগছে না। টেরিফিক খিদে পেয়ে গেছে।'

'আসুন আসুন—'

একটু পরে ওরা ডাইনিং রুমে গিয়ে মুখোমুখি বসে পড়ল। হেমার বয়টা খাবার-দাবার গরম করে করে এনে টেবলের ওপর রেখে যাচ্ছিল। হেমা প্রথমে পরমেশ্বরের প্লেটে এবং বাটিতে বাটিতে নানা রকম রং, গন্ধ আর চেহারার দারুণ দারুণ খাবার তুলে দিয়ে পরে নিজেও নিয়ে খেতে বসে গেল।

পরমেশ্বর প্রথমে চোখ দুটো পিং-পং বলের মতো রাউন্ড করে খাবার-দাবার দেখে নিল। তারপর বলল, 'সর্ষে ইলিশ, পাবদার ঝাল, রুইয়ের কালিয়া, মাটন, মুড়ো দিয়ে ডাল, তপসে ভাজা, দই, রাবড়ি, পোলাও, সন্দেশ —উরি ফাদার, এত সব কারবার আমার ফোরটীন জেনারেসন একসঙ্গে কখনও দ্যাখে নি।'

পরমেশ্বরের মুখচোখের চেহারা আর কথা বলার 'পোজ' দেখে হেমা হাসতে শুরু করেছিল।

পরমেশ্বর আবার বলেছে, 'এত সব মাল আপনি নিজের হাতে বানিয়েছেন?'

হেমা বলেছে, 'দই, সন্দেশ আর রাবড়িটা বাদে। এখন খান।'

খেতে খেতে পরমেশ্বর বলেছে, 'আপনি তো সারিন মানে পাঞ্জাবের মেয়ে। সর্ষে ইলিশ আর পাবদার ঝাল বানাতে শিখলেন কী করে?'

হেমাও খাওয়া শুরু করেছিল, 'সেটা একটা মিস্ট্রি। এখন বলব না।'

পরমেশ্বর আর কিছু জিজ্ঞেস করে নি। পাক্কী এক বোতল সোনার বাংলা তখন তার স্টমাকে রয়েছে। ব্রেনের ভেতর নেশাটা টুং-টাং অর্কেস্ট্রার মতো বেজে যাচ্ছিল। তবু এরই মধ্যে একটা ব্যাপার তার মনে হয়েছে। হেমার মতো একজন টপ পুলিস অফিসার তার ব্যাকগ্রাউন্ড জেনেও নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াচ্ছে কেন? মনে হলেও এ নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করে নি সে। তবে এটা ভেবেছে—ছুঁড়ী কদ্দূর তাকে নিয়ে খেলতে পারে তা দেখে যাবে।

খেতে খেতে আচমকা এক সময় হেমা জিজ্ঞেস করেছিল, 'আচ্ছা, বি-টি রোডের ঐ ফ্ল্যাটটায় আপনি তো দশ বছর আছেন?'

কথাগুলোর মধ্যে কিসের যেন একটা সিগন্যাল পেয়ে গিয়েছিল পরমেশ্বর। নিজের অজান্তেই তার নার্ভগুলো সজাগ হয়ে গিয়েছিল। দারুণ সতর্কভাবে হেমাকে মার্ক করতে করতে সে বলেছে, 'হ্যাঁ।'

হেমা চামচ আর ফর্ক দিয়ে খাবার নাড়াচাড়া করতে করতে বলেছিল, 'তার আগে আপনি আসানসোলের একটা হোটেলে দু'বছর ছিলেন ?'

পরমেশ্বর চমকে উঠেছে, 'হ্যাঁ।'

'তার আগে শিলিগুড়ির কাছে সর্দারজীদের এক 'ধাবায়' ছিলেন এক বছর।'

'হ্যাঁ।'

'তার আগে ছিলেন বেনারসে, তার আগে বোম্বাইতে, তার আগে দার্জিলিং-এ, তার আগে গ্যাংটকে, তার আগে পাটনায়, তার আগে ভুবনেশ্বরে, তার আগে কলকাতার চিৎপুরে, তারও আগে—' বলে চোখ কুঁচকে কিছু ভাবতে চেষ্টা করেছিল হেমা।

এদিকে শুনতে শুনতে চুল খাড়া আর শিরদাঁড়া স্ট্রেট হয়ে গিয়েছিল পরমেশ্বরের। হেমা যা বলেছে তার প্রত্যেকটা অক্ষর সত্যি। দম-আটকানো গলায় সে বলেছে, 'তার আগে কোথায় ?'

দুম করে হেমার মনে পড়ে গিয়েছিল। সে বলেছে, 'তার আগে পুরুলিয়ার একটা অরফ্যানেজে—তাই না ?'

হেমা তাহলে তার পেছন দিকের এতদূর পর্যন্ত খবর যোগাড় করে ফেলেছে! পরমেশ্বর যে স্ট্রেট 'না' বলে বসবে তারও উপায় নেই। ডেফিনিট প্রুফ হাতে না নিয়ে হেমা নিশ্চয়ই এত সব জায়গার নাম করত না। সে আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছে, 'ধরুন, তাই, তাই—'

হেমা বলেছিল, 'অরফ্যানেজের আগে ?'

পরমেশ্বর বলেছে, 'জানি না।'

'নাকি জেনেও বলবেন না ?'

'না বলার কী আছে ? রীয়েলি জানি না।'

'ভালো করে ভেবে দেখুন।'

পেছন দিকে তিরিশ বত্রিশ বছরের ওধারে তাকালে আবছাভাবে একটা ট্রেন অ্যাকসিডেন্টের কথা মনে পড়ে পরমেশ্বরের। তার আগে সবটাই ডার্ক, বিলকুল অন্ধকার। কপাল কুঁচকে অনেকক্ষণ চিন্তা করে সে বলেছে, 'নাঃ, কিচ্ছু মনে পড়ছে না।'

হেমা উত্তর না দিয়ে অন্যমনস্কর মতো এক টুকরো মাংস তুলে মুখে পুরেছিল।

পরমেশ্বর হঠাৎ বলেছিল, 'অরফ্যানেজের আগে কোথায় ছিলাম, আপনি জানেন নাকি ?'

হেমা এ-কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, 'ফাদার ডিকিনসনের কথা আপনার মনে আছে ?'

সিনেমার স্লাইডের মতো চোখের সামনে ফাদার ডিকিনসনের ছবি

পরমেশ্বরের চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল। হঠাৎ দেখল মনে হবে যেসাস ক্রাইস্ট যেন সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সাদা ধবধবে সারপ্লিস তাঁর পরনে, তিরিশ-বত্রিশ বছর আগে ফাদারের বয়েস ছিল চল্লিশের কাছাকাছি। সোনালী চুল আর দাড়ির দু-একটা রুপোর তারের মতো সাদা হতে শুরু করেছিল। সটান মজবুত শরীর। এমন স্নেহপ্রবণ মানুষ লাইফে আর দ্যাখে নি পরমেশ্বর। সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ফাদার ডিকিনসনকে আপনি চিনলেন কী করে ?' বলেই খেয়াল হয়েছিল, এ প্রশ্নটা হানড্রেড পারসেণ্ট ইডিয়টের মতো করে ফেলেছে। যে পুরুলিয়ার অরফ্যানেজ পর্যন্ত হানা দিয়েছে, তার পক্ষে ফাদার ডিকিনসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা কী এমন ঝামেলার ব্যাপার! হেমা কিছু বলার আগে সে আবার বলে উঠেছিল, 'একটা খবর দিতে পারেন ?'

'কী ?'

'ফাদার ডিকিনসন কি এখনও বেঁচে আছেন ?'

'আছেন।'

এর পর আর কোন কথা হয় নি। চুপচাপ দু'জনে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়েছিল। পরমেশ্বর বলেছিল, তার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে, সে নীচে যেতে চায়।

হেমা তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিল। বাইরের করিডরে বেরিয়ে লিফট বক্সের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাড়িয়ে পড়েছিল পরমেশ্বর। হেমার চোখের দিকে তাকিয়ে আস্তে করে সেই কথাটা আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'অরফ্যানেজের আগে কোথায় ছিলাম, আপনি সত্যি জানেন ?' সেটা জানার জন্য বুকের ভেতর আবছাভাবে একটা কষ্ট টের পাচ্ছিল সে।

হেমা তখন এ কথার জবাব দেয়নি। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে এবার বলেছে, 'হয়ত জানি। তবে এ ব্যাপারে এখন কিচ্ছু জিজ্ঞেস করবেন না প্লীজ। যখন সময় হবে আমি নিজেই বলব।'

'সিওর ?'

'সিওর ?'

পা বাড়াতে গিয়েও আবার থেমে গেছে পরমেশ্বর। বলেছে, 'কাইণ্ডলি একটা কথা শুধু জানিয়ে দিন। না হলে হোল নাইট ঘুমোতে পারব না।'

হেমা বলেছে, 'কী কথা ?'

'আমার কি কোন পরিচয় আছে, না আমি বাস্টার্ড সান—বেজন্মা ?'

'না-না, আপনার পরিচয় নিশ্চয়ই আছে। আপনার মা-বাবা দু'জনেই খুব রেসপেক্টেবল।'

জোরে একটা শ্বাস ফেলেছিল পরমেশ্বর। তার ভেতরে কোথায় যেন টেরিফিক অস্থিরতা ছিল। মুখচোখ দেখে এবার মনে হয়েছিল, সেটা যেন

থেমে গেছে। তাকে খুবই শান্ত আর তৃপ্ত দেখাচ্ছিল। গভীর গলায় সে বলেছিল, 'আপনি আমাকে বাঁচালেন ম্যাডাম। জানেন কতদিন আমি ঘুমোতে পারি নি। সব সময় মনে হয়েছে, আমি একটা ব্যাস্টার্ড—মোস্ট হেটেড বীস্ট অফ দা ওয়ার্ল্ড। মনে হতো সবাই আমার গায়ে থুতু ছিটোচ্ছে। আমি চিরকাল আপনার স্লেভ হয়ে রইলাম ম্যাডাম। যখন ইচ্ছা হবে দয়া করে আমার মা-বাবার পরিচয়টা জানিয়ে দেবেন।'

হেমা বলেছে, 'ফাদার ডিকিনসনের কাছে আপনার মা-বাবার কথা শোনেননি?'

'শুনেছি। কিন্তু বিশ্বাস হয় নি। অরফ্যানেজের কোন ছেলেমেয়েরই তো মা-বাবার পরিচয় নেই। মনে হতো, ফাদার আমাকে কনসোলেসন দিচ্ছেন।'

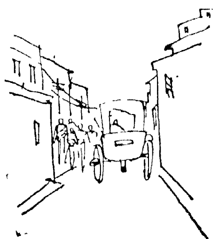
'না, উনি কনসোলেসন দেন নি, আপনার বেলায় ঠিকই বলেছিলেন।'

কৃতজ্ঞ চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে পরমেশ্বর বলেছে, 'আজ চলি, গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

হেমা সেই যে নিজের হাতে রান্না করে খাইয়েছিল, তারপর থেকে পরমেশ্বর সম্পর্কে তার আচরণ দ্রুত বদলে যেতে শুরু করেছিল। যত দিন যাচ্ছিল হেমা ততই তার দিকে বেশী ঝুঁকছিল আর ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল। সোমেশ্বর মল্লিককে ইঁদুরকলে ঢোকানোর জন্য সে পরমেশ্বরের সঙ্গে এগ্রিমেণ্ট করেছে, তার সঙ্গে এ-ব্যাপারে সর্বক্ষণ কথা বলা বা দেখা হওয়ারও দরকার আছে। এ সবই ঠিক, অ্যাবসোলুটলি অল রাইট। কিন্তু সোমেশ্বর মল্লিকের কেসটা ছাড়িয়ে সে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সোমেশ্বরের বিরুদ্ধে ডকুমেণ্ট-টকুমেণ্ট যোগাড় করার নাম করে প্রায়ই তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে হেমা। দু-একদিন সিনেমা দেখতেও গেছে। তার মতো একজন দাগী মালের সঙ্গে একজন সি-আই-ডি অফিসারের এত লদগালদগিতে পরমেশ্বর নিজেই অবাক হয়ে গেছে। ছুকরি তার সঙ্গে প্রেমে-ট্রেমে পড়ে গেল নাকি? পুলিসের সঙ্গে প্রেম! ভাবলেই নার্ভগুলোতে কাঁপুনি ধরে, আবার পেটের ভেতর হাসি বগবগিয়ে উঠতে থাকে।

এত কাল পরমেশ্বর সবার ব্রেনে চক্কর লাগিয়ে এসেছে। এই প্রথম একটা মেয়ে তাকে ম্যাজিক দেখিয়ে ছাড়ছে। জাদু কি খেলই দেখাক আর যাই করুক, হেমা একটা ব্যাপারে তার ভেতরকার অস্থিরতা, দুঃখ, কষ্ট—সব মুছে দিয়েছে। সে জানিয়েছে, পরমেশ্বর আর যাই হোক ব্যাস্টার্ড চাইল্ড নয়। মা-বাবার পরিচয় এখনও অবশ্য খুলে বলে নি। পরমেশ্বর সেই পুরনো ভাবনাটাই আরেক বার ভেবেছে। দেখা যাক, ছুকরি তাকে কোথায় পেঁৗছে দেয়।



দিন কয়েক পর আজ সকালে ঘুম ভাঙতেই হেমার টেলিফোন এল, 'কী করছেন ?'

পরমেশ্বর বলল, 'বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাই তুলছি।'

'কটা তুলেছেন ?' হেমা জানে, রোজ ডজনখানেক হাই তোলে পরমেশ্বর।

'এগারোটা।'

'বাকী একটা তুলে বাথরুমে ঢুকে পড়ুন। হাফ-অ্যান-আওয়ার সময় দিচ্ছি। এর ভেতর সব কাজ সেরে চা খেয়ে রেডি থাকবেন। আমি আপনার ফ্ল্যাটে আসছি।'

পরমেশ্বর করুণ গলায় বলল, 'আরেকটু টাইম দিন ম্যাডাম।'

'নট এ সেকেণ্ড এক্সট্রা।' বলেই ঝড়াং করে লাইন কেটে দিল।

অগত্যা রেডি হয়েই বসে থাকতে হল এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই হেমা এসে পড়ল। পরমেশ্বর তাকে বসে অন্ততঃ এক কাপ চা খেয়ে যেতে বলল, কিন্তু হেমা বসল না। বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ ফর অফারিং টী, কিন্তু এইমাত্র খেয়ে এসেছি। নাউ প্লীজ গেট আপ।'

অগত্যা উঠতেই হল। তারপর মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিংটার তলায় নেমে সেদিনের সেই টু-সীটারটায় পরমেশ্বরকে তুলে হেমা স্টার্ট দিল। চল্লিশ মিনিট বাদে দেখা গেল,—চৌরঙ্গী, এসপ্ল্যানেড, সেণ্ট্রাল এভেনিউ, মানিকতলা ইত্যাদি পেরিয়ে ওরা সল্ট লেক টাউনশিপে ঢুকে পড়েছে।

এখানে কেন এল, কতক্ষণ থাকবে, কখন ফেরা হবে—হেমাকে এ সব জিজ্ঞেস করার মানে হয় না। একটা কথারও সে জবাব দেবে না। কাজেই চুপচাপ বসে থাকাই ভালো।

একটা ব্যাপার পরমেশ্বর লক্ষ্য করেছে, হেমার পরনে আজ 'মড' পোশাক নেই। বাটিকের কাজ-করা একটা সিল্কের শাড়ি আর ব্লাউজ পরেছে সে।

মেয়ের মতো মনে হচ্ছে তাকে।

সল্ট লেকের 'এ' সেক্টরের একেবারে শেষ মাথায় একটা দারুণ ফ্যাশনেবল দোতলা বাড়ির সামনে টু-সীটারটা পার্ক করে দরজা খুলে নেমে পড়ল হেমা। পরমেশ্বরকে বলল, 'নামুন—'

একটা কথাও না বলে নেমে এল পরমেশ্বর। তারপর হেমার পেছন স্টিকিং গামের মতো আটকে গিয়ে বাড়িটার ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে দেখতে পেল, গেটের কাছে নেমপ্লেট লেখা রয়েছে 'দেবকুমার ব্যানার্জী'। দেবকুমার মাকড়াটি যে কে, অলমাইটি গডই একমাত্র বলতে পারবে। এ নিয়ে আর মাথা ঘামালো না পরমেশ্বর।

একতলায় ড্রইং রুম। দরজা খোলাই রয়েছে। ভেতরে ঢুকে হেমা বলল, 'প্লীজ, আপনি একটু বসুন। আমি এক্ষুণি আসছি—' বলে সে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

ঘরটা চমৎকার সাজানো। কার্পেট, সোফা, সেণ্টার টেবল, ডিসটেম্পার করা দেওয়াল—কোথাও এতটুকু খুঁত নেই। এখানে কী উদ্দেশ্যে হেমা এসেছে কে জানে। আসল রণজয় হালদারদের বাড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে সে যে রকম ম্যাজিক দেখিয়েছিল, এখানেও সে রকম কিছু দেখাবে কিনা, কে বলবে। যদি দেখায়ই সে দেখে যাবে, এ রকম একটা মনোভাব নিয়ে একটা সোফায় বসে পড়ল পরমেশ্বর।

হেমা সেই যে ভেতরে হাওয়া হয়েছে তো হয়েছেই। সেণ্টার টেবলের ওপর আজকের খবরের কাগজ এবং ক'টা ম্যাগাজিন সাজানো রয়েছে। সেগুলো তুলে একটু আধটু নাড়াচাড়া করে ফের জায়গামতো গুছিয়ে-টুছিয়ে রেখে দিল পরমেশ্বর। তারপর অলস চোখ এদিকে, সেদিকে তাকাতে লাগল। আর তাকাতে তাকাতে আচমকা সামনের দেওয়ালে তার চোখের তারা একটা গ্রুপ ফোটোগ্রাফের ওপর আটকে গেল। দেখেই মালুম পাওয়া যায় ফোটোটা অনেক দিনের পুরনো, তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগের তোলা। ছবিটার সাদা জায়গা-গুলো হলদে হয়ে গেছে। তবে যাদের ফোটো তাদের মুখ চোখ এবং চেহারা স্পষ্ট বোঝা যায়।

ছবিটাতে মোট জনচারেক পুরুষ, তিনজন মহিলা আর পাঁচটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে দেখা যাচ্ছে। ব্যাকগ্রাউণ্ডটা ঝাপসা হয়ে এলেও বোঝা যায় পাহাড় এবং লেক বা সমুদ্র জাতীয় কিছু রয়েছে। মনে হয়, গ্রুপের পুরুষ, মহিলা এবং তাদের বাচ্চারা কোথাও পিকনিক করতে গিয়েছিল। মেমোরি অফ হ্যাপি পাস্ট।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা পরমেশ্বরের মনে হল, একবার ডান দিকের হাসিমুখ পুরুষটিকে, বাঁদিক থেকে থার্ড গোলগাল আদুরে টাইপের মহিলাটিকে এবং বাচ্চাগুলোর ভেতর বড় বল হাতে পাঁচ-ছ বছরের একটা ছেলেকে আগে কোথায় যেন দেখেছে। কোথায়? কোথায়? কত বছর আগে? পরমেশ্বর ভাবতে চেষ্টা করল, কিন্তু কিছু মনে পড়ার আগেই ভেতর দিকের দরজা দিয়ে ঘরে একজন সুপুরুষ চেহারার বয়স্ক ভদ্রলোক, একজন ধবধবে ফর্সা চেহারার মোটাসোটা পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছরের মহিলা, একটি কুড়ি বাইশ বছরের ইয়াং বয় আর তেইশ চব্বিশ বছরের শ্যামলা রঙের দারুণ সুইট চেহারার এক যুবতীকে নিয়ে হেমা ড্রইং রুমে এসে ঢুকল।

ওদের দেখে ঝটপট উঠে দাঁড়াল পরমেশ্বর। বয়স্ক লোকেদের যে রেসপেক্ট-টেসপেক্ট দেখাতে হয়, এসব কারবার তার জানা।

বয়স্ক ভদ্রলোকটি বললেন, 'বোসো, বোসো।'

পরমেশ্বর বলল, 'আপনারা আগে বসুন।'

ভদ্রলোক তার মুখোমুখি একটা সোফায় বসলেন। বাকীরা অন্য সব সোফায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসল। হেমা একটা শ্রীনিকেতনী মোড়া টেনে এনে পরমেশ্বরের কাছাকাছি বসে সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে লাগল। বয়স্ক ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি আমার বাবা দেবকুমার ব্যানার্জি।'

শোনার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল পরমেশ্বর, যার মেয়ের নাম হেমা সারিন, তার বাবার সারনেম ব্যানার্জি হয় কী করে? আচমকা আরেকটা কথা তার মনে হল। হেমা কি ম্যারেড? সারিন পদবীওলা কোন মাকড়ার সঙ্গে তার বিয়ে-ফিয়ে হয়েছে?

যাই হোক, এক মিনিটের ভেতরেই জানা হয়ে গেল—মোটাসোটা ফরসা মহিলাটি হেমার মা, ইয়াং ছেলেটি তার ছোট ভাই—নাম সুজয়, ইলেকট্রনিকস নিয়ে যাদবপুরে পড়ছে, এটাই ফাইন্যাল ইয়ার। তরুণী মেয়েটি তার ছোট বোন, নাম সীমা। একটা কলেজে ইংরেজীর লেকচারার। দেবকুমার সম্পর্কেও জানা গেল, তিনি কলকাতার একটা কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। দু-বছর হল রিটায়ার করেছেন। হেমা তার মা-বাবা-ভাই-বোনকে পরমেশ্বরের পরিচয় দিল এভাবে, 'ইনি বিনায়ক সেনগুপ্ত, বিগ বিজনেসম্যান।'

ছুকরি নিজের মা-বাবার কাছে যখন তার আসল আইডেনটিটি ফাঁস করে নি তখন চুপ করে থাকাই ভালো। মুখে স্লাইট হাসি ফুটিয়ে পরমেশ্বর হেমার মা-বাবাকে সটাসট দুটো প্রণাম করে বসল।

দেবকুমার বললেন, 'তোমার কথা রুকুর মুখে অনেক শুনেছি।'

কী শুনেছেন দেবকুমার, অলমাইটি ঈশ্বরই একমাত্র সে খবর জানেন। তবে খারাপ কিছু যে নয় সেটা এখানকার রিসেপসন দেখে টের পাওয়া যাচ্ছে। তবু চোখ-কান ভীষণ সতর্ক করে রেখে সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সীমা বলে উঠল, 'দিদির তো আপনার সম্বন্ধে ভেরি হাই ওপিনিয়ন। এখানে এলেই আপনার কথা বলে। যে ইনভেস্টিগেসনের কাজটা নিয়ে দিদি এখন ব্যস্ত, আপনি নাকি তাতে খুব হেল্প করছেন।'

এ সব কথার কোন রকম উত্তর দিতে নেই। হারমোনিয়ামের রীডের মতো বত্রিশটা দাঁত বার করে একটু হাসল শুধু পরমেশ্বর।

এর পর দেবকুমার এবং তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ হেমার মা পরমেশ্বর সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। যেমন, সে কোথায় থাকে, তার মা-বাবা আছেন কিনা, ম্যারেড কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। যা মুখে এল ইনস্ট্যাণ্ট কফির মতো বানিয়ে বানিয়ে বলে গেল পরমেশ্বর। কথাবার্তার ফাঁকে চা এবং প্রচুর খাবারদাবারও এসে গেল।

কথার উত্তর দেওয়া বা চা-ফা খাওয়া, এ সবের মধ্যে বার বার নিজের অজান্তে পরমেশ্বরের চোখ দুটো সামনের দেয়ালের সেই গ্রুফ ফোটোগ্রাফটার দিকে চলে যাচ্ছিল আর বার বার দারুণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল সে।

পরমেশ্বর দ্যাখে নি, ঠিক পাশে বসে হেমা তার ফোটোটার দিকে তাকানো অনবরত লক্ষ্য করে যাচ্ছে। এমন কি একবার দেবকুমারের নজরেও তা পড়ে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী দেখছ?'

পরমেশ্বর আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'ঐ ফোটোটা।'

ঘাড় ফিরিয়ে একবার ছবিটা দেখে নিয়ে দেবকুমার বললেন, 'আরে, ওটা তো ভেতরের বারান্দায় টাঙানো ছিল। এখানে এনে কে রাখল?'

সীমা বলল, 'দিদি। কাল বিকেলে এসে ওটা এখানে টাঙিয়ে দিয়ে গেছে।'

দেবকুমার হেমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেন রে?'

হেমা বলল, 'এমনি। দেয়ালটা একেবারে ফাঁকা লাগছিল। তাই ভাবলাম, ফোটোটা এনে লাগিয়ে দিই।'

পরমেশ্বর এসব কথা শুনতে পাচ্ছিল না। সে বলল, 'ফোটোটা অনেকদিন আগের তোলা, তাই না?'

দেবকুমার বললেন, 'হ্যাঁ। নাইনটীন ফিফটি-ফোর ফিফটি-ফাইভের। ইন্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্সের সাত আট বছর পরের।

পরমেশ্বর আরেকটু পুরনো ভেবেছিল। ওর ধারণা ছিল ওটা অন্তত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগের। সে বলল, 'পাহাড় আর জলটল দেখে মনে হচ্ছে, ব্যাকগ্রাউণ্ডটা ক্যালকাটার না।'

'ঠিক ধরেছ। ঐ জায়গাটা কুয়ালালামপুরের আউটস্কার্টে।' বলে একটু থেমে মজা করে হাসতে হাসতে দেবকুমার আবার শুরু করলেন, 'ফোটোগ্রাফটার ভেতর আমি আছি। দেখ তো, চিনে বার করতে পার কিনা।'

অনেকক্ষণ মার্ক করার পর পরমেশ্বর সত্যি সত্যি দেবকুমারকে খুঁজে বার করতে পারল।

দেবকুমার দস্তুরমতো তারিফ করার গলায় বললেন, 'ফাইন! তোমার অবজারভেসনের ক্ষমতা আছে।'

পরমেশ্বর অল্প হাসল।

দেবকুমারের মধ্যে এক ধরনের ছেলেমানুষী রয়েছে। তিনি বললেন, 'ঐ গ্রুপটার ভেতর আরো দু'জন আছে যারা এখন এই ঘরেই বসে রয়েছেন, দেখ তো চিনতে পার কিনা।' কুইজ কনটেস্টের মতো প্রশ্ন করে চোখ কুঁচকে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে রগড়ের ভঙ্গিতে হাসতে লাগলেন তিনি।

পরমেশ্বর মনে মনে ভাবল, ওল্ড মাকড়াটা এই সকালবেলায় তাকে ঝামেলায় ফেলে দিল তো। নাও, এখন চেহারা মিলিয়ে দেখ এই ঘরের কোন্ দু'জন ঐ ফোটোতে রয়েছে। কী আর করা, সে একবার ফোটোটা আর একবার ঘরের সবাইকে দেখতে লাগল। কমনসেন্স থেকে তার মনে হল, দেবকুমারের স্ত্রী অর্থাৎ হেমার মা নিশ্চয়ই ওতে থাকবে। আর কে থাকতে পারে? নিশ্চয়ই সীমা আর সুজয়ের পক্ষে থাকা সম্ভব না। কেননা, ওদের দেখে যা বয়েস মনে হয় তাতে নাইনটিন ফিফটি-ফোর ফিফটি-ফাইভের আগে জন্মাতে পারে না। বাকী রইল হেমা। হেমার বয়স সাতাশ আটাশের কম নয়। হিসেব করলে দেখা যাবে সেই ফিফটি-ফোর ফিফটি-ফাইভে তার বয়স তিন কি চার। ঐ গ্রুপ ফোটোতে যে বাচ্চাগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটাই মেয়ে—জাঙিয়া আর টেপ ফ্রক পরে দাঁড়িয়ে আছে। ডেফিনিটলি সে হেমাই হবে।

পরমেশ্বর তার পাশে বসে থাকা যুবতী হেমাকে দেখিয়ে বলল, 'ফোটোর ঐ মেয়েটি নিশ্চয়ই ইনি?'

সীমা আর সুজয় কোরাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'ফ্যানটাস্টিক! ঠিক ধরেছেন—'

দেবকুমার আর হেমার মা-ও খুব তারিফ করলেন। তারপর দেবকুমার বললেন, 'একজনকে তো স্পট করলে। এবার দু নম্বরকে বার কর।'

ফোটোর তিনজন মহিলার মধ্যে আদুরে টাইপের যিনি তাঁকে গোড়াতেই বাদ দিল পরমেশ্বর। কেননা, আবছাভাবে তার মনে হচ্ছিল, মহিলাটিকে আগেই যেন কোথায় দেখেছে সে; মুখ তার খুবই চেনা। ইনি ছাড়া বাকী

যে দু'জন মহিলা আছেন তার মধ্যে একজন বেশ মোটাসোটা, আরেকজন পাতলা রোগা ছিপছিপে টাইপের।

হেমার মাকে একবার দেখে, দ্রুত ফোটোর দিকে তাকাল পরমেশ্বর। তারপর মোটা মহিলাটিকে দেখিয়ে বলল, 'উনি ডেফিনিটলি মাসীমা।' হেমার মাকে মাসীমা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়।

সীমা আর সুজয় বলে উঠল, 'সেন্ট পারসেন্ট মার্ক পেতে পেতেও পেলেন না বিনায়কদা। ঐ ফোটো থেকে মাকে খুঁজে বার করতে বললে সবাই এক ভুল করে। মনে করে মা বুঝি আগেও এরকম মোটাই ছিল।' একটু থেমে আবার বলল, 'এটা আমাদের একটা পপুলার কুইজ কনটেস্ট। এই কনটেস্টে সবাই ফেইল করে।'

পরমেশ্বর এবার রোগা পাতলা মহিলাটিকে দেখিয়ে বলল, 'ইনিই তাহলে মাসীমা ?'

সীমা বলল, 'কারেক্ট, কারেক্ট।'

সেন্টার টেবলের ওধার থেকে দেবকুমার বললেন, 'দেখ বিনায়ক, মা কী ছিলেন আর কী হইয়াছেন—' স্ত্রীর বিপুল চেহারার দিকে তাকিয়ে মজা করে হাসতে লাগলেন তিনি।

হেমার মা-ও হাসছিলেন। বললেন, 'জানো বিনয়, আমাকে নিয়ে সবাই ঠাট্টা করে। মোটা হয়ে গেলে কী করতে পারি বল !' স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আরে বাবা, আমি যদি রোগা শুঁটকী হয়ে থাকতাম লোকে বলত তোমরা আমাকে খেতে দাও না। এখন আমার চেহারার বাড়বাড়ন্ত দেখে বলে, কী সুখেই না রেখেছ !'

দেবকুমার বললেন, 'রাইট, রাইট।'

সীমা হেমা আর সুজয় খুব হাসতে লাগল। বোঝা যায়, হেমাদের সংসারটা দারুণ সুখের। হ্যাপি ফ্যামিলি বোধহয় একেই বলে।

পরমেশ্বর ওদের হাসি এবং কথা সবই শুনছিল। কিন্তু মাথায় তেমন-ভাবে ওগুলো ঢুকছিল না। তার চোখের তারা ঘুরে ঘুরে গ্রুপ ফোটোর সেই ঝাপশাভাবে চেনা পুরুষ, আদুরে টাইপের মহিলা আর বল হাতে বাচ্চা ছেলেটার ওপর ফিক্সড হয়ে যাচ্ছে। আচমকা সে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, এই ইনি কে ?'

দেবকুমার বললেন, 'আমার বন্ধু আর কলীগ। নাম সন্দীপন গাঙ্গুলি। সন্দীপন ছিল ম্যাথামেটিকসের প্রফেসর।'

আদুরে টাইপের মহিলাটিকে দেখিয়ে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'ইনি ?'

'সন্দীপনের স্ত্রী মনোবীণা।' বলে উঠে গিয়ে বল হাতে ছেলেটাকে

দেখালেন দেবকুমার, 'আর এই যে বাচ্চাটাকে দেখছ, এ ওদের একমাত্র ছেলে।' এ ছাড়া ফোটোতে আরো একজন পুরুষ, মহিলা এবং যে তিনটে বাচ্চা ছিল তাদেরও পরিচয় দিলেন দেবকুমার। এই তিন নম্বর ভদ্রলোকটিও কুয়ালালামপুর কলেজে তাঁর কলীগ, মোটা মহিলাটি সেই কলীগের স্ত্রী এবং বাকী বাচ্চা তিনটে ওঁদেরই ছেলে।

ফোটোটা দেখানো হলে ফিরে এসে নিজের সোফায় আবার বসলেন দেবকুমার। জানালেন—বন্ধু, বন্ধুদের স্ত্রী আর তাদের বাচ্চাদের নিয়ে পিকনিক করতে গিয়েছিলেন ; তখন এই গ্রুপ ফোটোটা তোলা হয়।

একটু চুপচাপ। পরমেশ্বর টের পাচ্ছিল, সন্দীপন গাঙ্গুলি, তাঁর স্ত্রী মনোবীণা গাঙ্গুলি এবং তাঁদের ছেলেটার ভাবনা তার মাথার ভেতর সেট করে গেছে। যতদূর মনে পড়ছে, গাঙ্গুলি এই সারনেমটা কোথায় কার কাছে যেন শুনেছিল। কার কাছে ? কার কাছে ? ঠিক ধরা গেল না।

সন্দীপন গাঙ্গুলিদের সম্বন্ধে জানার জন্য টেরিফিক কৌতূহল হচ্ছিল পরমেশ্বরের, কিন্তু কীভাবে তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। খানিকক্ষণ কী ভেবে সে বলল, 'আপনারা কুয়ালালামপুর থেকে কলকাতায় কবে চলে এসেছেন ?

'সিক্সটিতে।'

'আর যান নি ?'

'না। রিপ্যাট্রিয়েসান করে পার্মানেন্টলি দেশে ফিরে এসেছি।'

'আর আপনার কলীগরা ?' পরমেশ্বরের এই প্রশ্নটা করার একটাই উদ্দেশ্য, কায়দা করে সন্দীপন গাঙ্গুলিদের কথা জেনে নিতে চায় সে।

দেবকুমার বললেন, 'শঙ্কর দেশে ফেরে নি। ওখানকার সিটিজেনশিপ নিয়ে ওরা কুয়ালালামপুরে থেকে গেছে।' শঙ্কর হলেন ফোটোর তিন নম্বর পুরুষ।

'আর সন্দীপন গাঙ্গুলি ?'

মুখের ওপর কালচে ছায়া পড়ল যেন দেবকুমারের। বিষণ্ণ ভারী গলায় তিনি বললেন, 'হী ওয়াজ মাই ডিয়ারেস্ট ফ্রেণ্ড। ঐ যে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম, তার এক মাসের মধ্যে ও ছেলে আর স্ত্রীকে নিয়ে রিপ্যাট্রিয়েট করে ইণ্ডিয়ায় চলে আসে। কিন্তু—'

দম-আটকানো গলায় পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কী ?'

এর পর দেবকুমার যা বললেন তা এই রকম।

কুয়ালালামপুর থেকে কলকাতায় ডাইরেক্ট এয়ার সারভিস ছিল না তখন। বম্বে হয়ে আসতে হতো। প্লেনে সন্দীপন গাঙ্গুলিরা বম্বে এসেছিলেন ;

সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতায় যাচ্ছিলেন, কিন্তু ট্রেন কলকাতা পর্যন্ত পেঁছুতে পারে নি। তার আগেই অ্যাকসিডেণ্টে পুরো চারটে বগি টোটালি উলটে যায়। এই বগিগুলোর একজন প্যাসেঞ্জারও আর বেঁচে ছিল না। সন্দীপন তার স্ত্রী আর ছেলে ইল-ফেটেড কামরাগুলোর একটাতে ছিলেন।

মারাত্মক ট্রেন অ্যাকসিডেণ্টের কথা বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দেবকুমার। তারপর আস্তে আস্তে শুরু করলেন, 'জানো বিনায়ক, আমাদের এমন ফ্রেণ্ডশিপ ছিল যে দু'জনে ঠিক করেছিলাম, রিলেসানটাকে পার্মানেণ্ট করে নেব। ঐ যে ফোটোতে আমার মেয়ে রুকু আর সন্দীপনের ছেলের ছবি দেখছ—ভেবেছিলাম বড় হলে ওদের বিয়ে দেব। কিন্তু কিছুই করা গেল না। উই প্ল্যানড বাট গড উইশড আদারওয়াইজ।'

পরমেশ্বর আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। একটা কথা তার মাথায় কিছুতেই আসছে না। সে নিজে কোনদিন কুয়ালালামপুরে যায় নি। অথচ যাঁরা সেখানে ছিলেন এবং কলকাতায় পেঁছুবার আগেই মারা গেছেন, কেন বার বার মনে হচ্ছে তাঁরা তার চেনা?

পরমেশ্বর আর কিছু লক্ষ্য করে নি, সন্দীপন গাঙ্গুলিদের কথা সে যখন রুদ্ধশ্বাসে শুনছে সেই সময় হেমা একদৃষ্টে তার মুখচোখের প্রত্যেকটা মুভমেণ্টের ওপর নজর রেখে যাচ্ছিল।

এক সময় হেমা পরমেশ্বরকে নিয়ে উঠে পড়ল। দেবকুমার এবং হেমার মা বার বার ওদের খেয়ে যাবার কথা বললেন। হেমা বলল, 'ভীষণ জরুরী কাজ আছে। এখন খাওয়ার সময় হবে না। আর ক'দিন বাদে তো বাড়িতে চলেই আসছি। তখন যত পার খাইও।'

হেমার মা বললেন, 'কী যে এক চাকরি নিয়েছিস, তুই-ই জানিস। সব সময় চোর-ডাকাত-বদমাশদের পেছন পেছন ঘুরছিস। কখন কী বিপদ ঘটে যাবে, কে জানে। আমার তো দিনরাত ভয়ে বুক কাঁপে।'

দেবকুমার বললেন, 'দিস ইজ ইয়োর লাস্ট অ্যাসাইনমেণ্ট। আমারই ভুল হয়েছে, তোমাকে সারভিসে ঢুকতে দেওয়া উচিত হয় নি। যাই হোক, এবার বাড়ি ফিরে এলে চাকরি ছাড়িয়ে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করছি।'

হেমা হাসতে লাগল, 'বিয়েটা দেবে কী করে? যে বন্ধুর ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবে ঠিক করেছিলে সে তো ট্রেন অ্যাকসিডেণ্টে ভ্যানিশ হয়ে গেছে।'

ভারী গলায় দেবকুমার বললেন, 'সে বেঁচে থাকলে কবেই বিয়ে দিয়ে দিতাম। যাক গে—' বলে পরমেশ্বরের দিকে তাকালেন। 'আবার এসো বিনায়ক—'

পরমেশ্বর বলল, 'আসব।'

হেমার মা বললেন, 'এবার যেদিন আসবে খেয়ে যেতে হবে কিন্তু।'

'নিশ্চয়ই খাব।'

বাড়ির সবাই বাইরের গেট পর্যন্ত পরমেশ্বরদের এগিয়ে দিয়ে গেল।

আগের মতোই টু-সীটারে ওরা পাশাপাশি বসল। স্টার্ট দিয়ে ছোট রাস্তা থেকে গাড়িটাকে বিরাট চওড়া রাস্তায় নিয়ে এল হেমা।

উইণ্ডস্ক্রিনের বাইরে অন্যমনস্কর মতো তাকিয়েছিল পরমেশ্বর। আচমকা সে বলল, 'আচ্ছা—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে হেমা বলল, 'আপনি কী বলবেন আমি জানি। আমার বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই ব্যানার্জি। আর আমার বিয়ে হয় নি, অথচ আমি সারিন কী করে হলাম—এই তো?'

ঠিক এই কথাটা এই মুহূর্তে ভাবছিল না পরমেশ্বর। তবে হেমার মা-বাবার নাম-টাম জানার পর এই ব্যাপারটা তার মাথার ভেতর পিন ফুটিয়ে যাচ্ছিল যেন। সে মুখ খোলার আগে হেমা আবার বলে উঠল, 'আপনি যেমন রণজয় হালদার, আমিও তেমনি হেমা সারিন।'

পরমেশ্বর হেমার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'বুঝেছি।' তারপর আবার উইণ্ডস্ক্রিনের বাইরে মুখ ফিরিয়ে রাস্তার দৃশ্য-ফৃশ্য দেখতে লাগল।

হেমা ড্রাইভ করতে করতে বলল, 'আশা করি এ-কথা আপনি আর আমি ছাড়া অন্য কেউ জানবে না।'

'ব্যাণ্ড পার্টি বাজিয়ে অন্য কাউকে জানাবার কোন দরকার আমার নেই।'

'থ্যাঙ্কস্।'

বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পরমেশ্বরের আচমকা একটা কথা মনে হল। হেমা তাকে তাদের বাড়ি নিয়ে এসেছিল কেন? ঐ ফোটোটা দেখাতেই কী? নাকি সত্যি সত্যি তার মা-বাবা ভাই-বোনের সংগে আলাপ করিয়ে দিতে? যে উদ্দেশ্যই হেমার থাক, একটা ভাবনা তার মাথার ভেতর অনবরত পেরেক ঠুকে যেতে লাগল যেন। কিছুক্ষণ পর ঘাড় ফিরিয়ে সে ডাকল, 'ম্যাডাম—'

হেমা রাস্তার দিকে চোখ রেখেই সাড়া দিল, 'বলুন।'

'একটা ব্যাপার কিছুতেই আমি বুঝে উঠতে পারছি না।'

'কী ব্যাপার?'

'আপনাদের বাড়ির ঐ গ্রুপ ফটোটায় যে সন্দীপন গাঙ্গুলি, মনোবীণা গাঙ্গুলি আর তাঁদের ছেলে রয়েছে, ওদের যেন কোথায় দেখেছি। অথচ

বিলিভ মী, আমি কেন, আমার ফোরটিন জেনারেশনের কেউ কখনও কুয়ালালামপুর যায় নি। অথচ এটা আমার মনে হচ্ছে কেন?'

হেমা হাসল। 'আমি কী করে বলব? আপনি ভালো করে ভেবে দেখুন।'

'অনেক ভেবেছি। কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না।'

হেমা উত্তর দিল না।

পরমেশ্বর আবার বলল, 'আমার মাথাটা স্রেফ খারাপ হয়ে যাবে ম্যাডাম।'

হেমা সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না। অনেকক্ষণ বাদে শুরু করল, 'ফোটোর ঐ তিনজনকে কোথায় দেখেছেন, আমি হয়ত এ ব্যাপারে একটা ক্লু দিতে পারি। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'একটা কণ্ডিশানে ক্লুটা দেব। আগে সোমেশ্বর মল্লিকের কেসটা কমপ্লীট করতে হবে। তারপর ফোটোর ব্যাপারটা—'

খানিকক্ষণ ভেবে পরমেশ্বর বলল, 'ও-কে। আর আমার মা-বাবার খবর?'

'সেটাও ঐ একই সময় পেয়ে যাবেন।'

এসময় টু-সীটারটা সার্কুলার রোডের মালটি-স্টোরিড অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে পৌঁছে গেল।



সেই যে হেমা সল্ট লেকে তাদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল, তার দিন তিনেক বাদে সকালে আচমকা অমিতাভর ফোন পেল পরমেশ্বর। সে বলল, 'দশটার সময় কী করছেন?'

পরমেশ্বর বলল, 'রুটিন ওয়ার্ক। খেয়েদেয়ে অফিসে যাব।'

'কাইণ্ডলি আজ অফিসটা বাদ দিন। একটা দারুণ খবর আছে।' গলার স্বর শুনে অমিতাভকে টেরিফিক উত্তেজিত মনে হতে লাগল।

'কী খবর?'

'আপনি রেডি হয়ে থাকুন। অ্যাট শার্প সেভেন, আমি আপনার ওখানে পৌঁছে যাচ্ছি। আপনাকে নিয়ে এক জায়গায় যাব।'

পরমেশ্বর কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, তার আগেই লাইন কেটে দিল অমিতাভ। হঠাৎ কী এমন ব্যাপার ঘটল এবং কী এমন সেনসেসানাল খবর হতে পারে, সে ভেবে পাচ্ছে না। সোমেশ্বরকে ক্যাঁচাকলে ফেলার জন্য রোজই তো অমিতাভর কাছে যাচ্ছে। পরমেশ্বর চায়, অমিতাভর বাবার মার্ডার কেসে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সোমেশ্বরকে জড়িয়ে ফেলতে। তা হলে বেশ ভালো করেই মাকড়াটাকে ফাঁসিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সে ব্যাপারে তেমন এগুনো যায় নি। সুনেত্রার বাবা এক্স-পুলিস অফিসার মণিমোহন চ্যাটার্জি এই কেসের মালমশলা কালেক্ট করার জন্য সেই যে দার্জিলিং গিয়ে বসে আছেন, এখনও ফেরেন নি। যাক গে, কী দারুণ খবর অমিতাভ দেয় তা দেখার জন্য এখন দশটা পর্যন্ত দম আটকে বসে থাকতে হবে।

দশটা বাজার কুড়ি মিনিট আগেই অমিতাভ এসে হাজির হয়ে গেল।

তাতে অবশ্য খুব একটা অসুবিধা হল না। চান-ফান করে, দাড়ি কামিয়ে, বডিতে দামী ট্রাউজার্স-ফ্রাউজার্স চড়িয়ে পরমেশ্বর তার জন্য বসেই ছিল।

এক সেকেণ্ড ওয়েট করল না অমিতাভ। পরমেশ্বরকে নিয়ে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে এসে ওর ইমপোর্টেড লিমুজিনে তুলল। তারপর গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে চৌরঙ্গীতে এসে পড়ল।

চুপচাপই ওরা বসে ছিল। হঠাৎ অমিতাভ বলল, আমরা যা চাইছিলাম এবার তা পেয়ে গেছি।'

পরমেশ্বর বলল, 'কী?'

'বাবার মার্ডারারের বিরুদ্ধে সব রকম প্রুফ।'

পরমেশ্বর ধাঁ করে ঘুরে বসল, 'সত্যি?'

আস্তে ঘাড় কাত করল অমিতাভ, 'সেই জন্যেই তো আপনাকে নিয়ে চলেছি।' একটু থেমে আবার বলল, 'এবার সোয়াইনটার গলায় ফাঁসির দড়ি পরাতে পারব।' অমিতাভর চোয়াল পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠতে লাগল।

পরমেশ্বর কিছু বলল না। অমিতাভর মুখের দিকে তাকিয়ে তার রিঅ্যাকসান লক্ষ্য করতে লাগল।

আধ ঘণ্টা বাদে ওরা সুনেত্রাদের বাড়ি পৌঁছে গেল। মোটামুটি এ-রকমই একটা আন্দাজ করেছিল পরমেশ্বর। মার্ডারের প্রুফ-ট্রুফ মণিমোহন চ্যাটার্জি ছাড়া আর কে যোগাড় করতে পারেন?

কমপাউণ্ডের ভেতর নুড়ির রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে অমিতাভ আর পরমেশ্বর পোর্টিকো পেরিয়ে বাইরের ড্রইং রুমে আসতেই দেখতে পেল, সুনেত্রা এবং তার বাবা মণিমোহন চ্যাটার্জি বসে আছেন। তা হলে দার্জিলিং থেকে মণিমোহন ফিরে এসেছেন! তিনি বললেন, 'এসো। এসো।'

পুলিস-টুলিস সম্পর্কে দারুণ এলার্জি পরমেশ্বরের, কিন্তু সুনেত্রাদের বাড়িতে বারকয়েক যাতায়াতের নীট রেজাল্ট হয়েছে এই মণিমোহন সম্পর্কে তার অস্বস্তি খানিকটা কেটে গেছে।

পরমেশ্বররা বসে পড়ল। সুনেত্রা চায়ের ব্যবস্থা করার জন্য ভেতরে চলে গেল এবং দু মিনিটের মধ্যে ফিরে এল।

অমিতাভ চারদিকে তাকিয়ে কিছুটা হতাশভাবেই আস্তে করে মণিমোহনকে জিজ্ঞেস করল, 'যাদের আসার কথা ছিল তাদের তো দেখছি না।'

মণিমোহন বললেন, 'এক্ষুণি এসে পড়বে।' তাঁর কথা শেষ হতে-না-হতেই বাইরে একটা জীপ থামার আওয়াজ হল। মণিমোহন দারুণ আগ্রহের গলায় বললেন, 'ওরা এসে গেছে।'

পরমেশ্বর টের পেল, নিজের অজান্তেই তার শিরদাঁড়া টানটান হয়ে

গেছে। এতদিন বাদে বহুকাল আগের একটা মার্ডারের প্রুফ কীভাবে হবে তা জানার জন্য তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করল, অমিতাভর হোল বডি স্টীলের মতো শক্ত হয়ে গেছে, চোখদুটো জ্বলছে।

ড্রইং রুমের দরজার বাইরে থেকে একটা গলা শোনা গেল 'স্যার—'

মণিমোহন বললেন, 'কাম ইন।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনটে লোক ভেতরে ঢুকে পড়ল। তাদের একজনের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, ছ ফুটের মতো হাইট। মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমের ওপর তার দারুণ শক্তিশালী চেহারা। ছোট ছোট গোল চোখ দুটো সার্চ লাইটের মতো চারিদিকে ঘুরে যাচ্ছে। দেখেই মালুম হয় লোকটা শিকারী কুকুরের মতো সব সময় সতর্ক। তার হাতে একটা বড় অ্যাটাচি কেস।

বাকী দুজনের একজন নেপালী, আরেক জন মঙ্গোলিয়ান আর শিখ ছাড়া ইণ্ডিয়ার যে কোন জাতের লোক হতে পারে। দু'জনেরই যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। তাদের মুখের এবং শরীরের চামড়া কোঁচকানো, চুল আধাআধি সাদা হয়ে গেছে। পরনে সস্তা দামের ময়লা ঢলঢলে ফুলপ্যাণ্ট আর খেলো কাপড়ের হাফশার্ট, পায়ে চপ্পল।

জবরদস্ত চেহারায় লোকটা স্যালুট করে একধারে দাঁড়িয়ে রইল। স্যালুটের স্টাইল দেখে বোঝা যায়, সে পুলিসে কাজ করে। রিটায়ার করলেও সীনিয়ার বিগ অফিসারের পারমিসান ছাড়া বোদহয় বসার নিয়ম নেই। কিংবা এটাও হতে পারে, মাকড়া মণিমোহনকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। টের পাওয়া যায়, রিটায়ারমেণ্টের পরও পুলিস ডিপার্টমেণ্টের ওপর মণিমোহনের যথেষ্ট ইনফ্লুয়েন্স আছে।

মণিমোহন ঐ লোকটাকে বসতে বললেন এবং সে খানিকটা দূরে একটা সোফায় বসল।

এদিকে সেই বুড়ো নেপালী আর তার সঙ্গী মাথা অনেকখানি ঝুঁকিয়ে মণিমোহনকে নমস্কার করল। মণিমোহন তাদের বসতে বললেন। ওরা চেয়ার বা সোফায় বসল না, নীচে কার্পেটে জড়সড় হয়ে বসে পড়ল।

মণিমোহন সেই নেপালী আর তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মোতি বাহাদুর, আবদুল—তোমরা যেখানে আছ সেখান থেকে বেরুচ্ছ না তো?'

এই নেপালীটাই তা হলে মোতি বাহাদুর! এর নাম আগেই শুনেছে পরমেশ্বর। তবে আবদুলের কথা জানত না। মোতি বাহাদুর এবং আবদুল দু'জনেই মাথা নাড়ল, 'নেহী বড়ে সাহাব।'

'খুব সাবধান। যদি ওরা জানতে পারে জান চলে যাবে।'

'হামলোগ জানতা হ্যায় বড়ে সাহাব।'

মণিমোহন এবার সেই জবরদস্ত চেহারার লোকটার দিকে তাকালেন, 'চাকলাদার, টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এদের ওপর ওয়াচ রাখবে।'

চাকলাদার বলল, 'চব্বিশ ঘণ্টাই ওদের চারদিকে গার্ড রয়েছে। একটা মাছিও গলে ওদের কাছে যেতে পারবে না। আপনি স্যার, এই ব্যাপারটায় নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। বুঝতেই পারছ, এদের সম্বন্ধে আমার কেন এত অ্যাংজাইটি।'

'জানি স্যার, এরা মারা গেলে উইটনেস পেতে অসুবিধা হবে।'

'রাইট। জলপাইগুড়িতে সর্বেশ্বর সেনের সেই মার্ডারার দুটোর ওপর নজর রেখেছ?'

'রেখেছি স্যার। এক সেকেণ্ডের জন্যও ওরা আমাদের নজরের বাইরে যেতে পারছে না।'

'ওরা টের পায় নি তো ওদের ওপর ওয়াচ আছে?'

'একেবারেই না।'

'গুড। সময় হয়ে এসেছে। যেদিন বলব সেদিনই ওদের অ্যারেস্ট করে কলকাতায় নিয়ে আসতে হবে।'

'আমি রেডি স্যার।'

'বেনামা চিঠিটায় যে আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে সেটা ঠিক করে রেখেছ?'

'রেখেছি স্যার।'

'এবার এক কাজ কর। মোতি বাহাদুর আর আবদুলকে আর দরকার নেই। ওরা বাইরে জীপে গিয়ে বসুক। জীপে আর্মড গার্ড আছে তো?'

'আছে স্যার।'

চাকলাদারের চোখের ইশারায় মোতি বাহাদুর এবং আবদুল উঠে মণিমোহনকে সেলাম ঠুকে বেরিয়ে গেল। চাকলাদার খুবই খলিফা মাল, সে ওদের এমনি ছেড়ে দিল না। নিজেও সঙ্গে গেল এবং এক মিনিটের ভেতর ফিরে এল। টের পাওয়া যাচ্ছে, আর্মড গার্ডদের জিম্মায় আবদুলদের রেখে এল চাকলাদার।

মণিমোহন এবার বললেন. 'টেপ-রেকর্ডারটা এনেছ?'

'এনেছি স্যার।'

'ওটা চালিয়ে এদের শুনিয়ে দাও।'

চাকলাদার যে অ্যাটাচি কেসটা সঙ্গে করে এনেছিল, তার ভেতর থেকে ন' দশ ইঞ্চি লম্বা আর ইঞ্চি ছয়েক চওড়া একটা পুরনো মডেলের আমেরিকান টেপ-রেকর্ডার বার করে বোতাম টিপে চালিয়ে দিল।

প্রথমে কিছুক্ষণ পাখির ডাক-টাক শোনা গেল। তারপর অচেনা দু-তিনটে গলার সঙ্গে একটা অত্যন্ত চেনা গলা টেপ থেকে উঠে আসতে লাগল। 'ডোণ্ট ইউজ বুলেটস। দড়ির ফাঁস গলায় আটকে অপারেশন করবে। তারপর সেনের বডি তার হোটেল-রুমে নিয়ে গিয়ে সীলিং থেকে ঝুলিয়ে দেবে। নো কোয়েশ্চেন অফ মানি। যে অ্যামাউন্ট চাও পাবে।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

শুনতে শুনতে হার্ট যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল পরমেশ্বরের। যদিও এটা সোমেশ্বরের কম বয়সের গলা, তবু তা চিনতে এতটুকু অসুবিধা হয় নি। সে প্রায় বলতেই যাচ্ছিল—'এই টেপ-রেকর্ডারটা কোথায় পাওয়া গেছে,' কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বলল না। খুব বেশী কৌতূহল দেখানো ঠিক হবে না।

মণিমোহন হাত তুলে টেপ থামাতে বললেন। চাকলাদার বোতাম টিপে ওটা বন্ধ করতে করতে বলল, 'স্যার, আমার থাকার আর দরকার আছে?'

মণিমোহন বললেন, 'না। তুমি এখন যেতে পার।'

চাকলাদার টেপ-রেকর্ডারটা অ্যাটাচি কেসে পুরে ফেলল। তারপর গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে স্যালুট হাঁকিয়ে চলে গেল।

মণিমোহন এবার অমিতাভর দিকে ফিরলেন, 'কেন তোমাদের এসব দেখালাম আর শোনালাম নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। তোমার বাবার মার্ডারারের বিরুদ্ধে সব ডকুমেণ্ট আর উইটনেস যোগাড় করে ফেলেছি। শুধু একটা বাদে। সেটা দু-চার দিনের মধ্যেই পেয়ে যাব। আর ওটা পাওয়া গেলেই মার্ডারারকে অ্যারেস্ট করে ফেলব।'

'কী ডকুমেণ্ট আবার বাকী?'

'মোতি বাহাদুরকে যে টাইপ-করা বেনামা চিঠি পাঠানো হয়েছিল তাতে আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। আমাদের সাসপেক্টের ফিঙ্গারপ্রিণ্ট যোগাড় করে দেখতে হবে দুটো মিলে যায় কিনা। আমার ধারণা ডেফিনিটলি মিলবে।'

পরমেশ্বরের মনে পড়ল, রণজয় হালদারের পাসপোর্ট এবং অমিতাভ সেনের ফোটো নিজের হাতে সোমেশ্বর তাকে দিয়েছেন। সে দুটোয় নিশ্চয়ই তাঁর আঙুলের ছাপ রয়েছে। যদি সোমেশ্বরের ফিঙ্গারপ্রিণ্ট মণিমোহনরা

যোগাড় করতে না পারে, সে নিজে ফোটো বা পাসপোর্ট থেকে প্রিণ্ট করিয়ে ডাকে পাঠিয়ে দেবে। ওটার সঙ্গে শুধু টাইপ করে লিখে দেবে। 'ফিঙ্গারপ্রিণ্ট অফ সোমেশ্বর মল্লিক।' এখন সে যদি বলে যে সোমেশ্বরের আঙুলের ছাপ জুটিয়ে দিতে পারে তাহলে মণিমোহন মাকড়া প্রশ্নের-পর-প্রশ্ন করে তার আলজিভ বার করে ছাড়বে। সোমেশ্বর মল্লিককে সে কেমন করে চিনল, কোথায় তার ফিঙ্গারপ্রিণ্ট পেল—ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন শালা গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে কত সাপ যে চারদিক থেকে বেরিয়ে পড়বে কে জানে।

একটু চুপচাপ। তারপর অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এই টেপ-রেকর্ডারটা পেলেন কী করে ?' মুখ-চোখ দেখে মালুম হয়, সে ভীষণ অবাক হয়ে গেছে।

মণিমোহন হাসলেন, 'সেটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। টেপ-রেকর্ডারটা একটা আমেরিকান ট্যুরিস্ট ফ্যামিলির। খুন করে তোমার বাবাকে যে হোটেলে সীলিং থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই হোটেলেই ঐ ট্যুরিস্ট ফ্যামিলিটা উঠেছিল। আর আবদুল ছিল ওখানকারই বেয়ারা।'

মণিমোহন যা বলে যেতে লাগলেন তা এই রকম।

আমেরিকান ট্যুরিস্ট ফ্যামিলিতে ছিল মোট তিন জন মেম্বার—স্বামী, স্ত্রী আর চার পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা। ওরা সানরাইজের আগে আগে উঠে সাইট সীয়িংয়ের জন্য বেরিয়ে পড়ত। ফিরত দুপুরে। খেয়েদেয়েই আবার বেরিয়ে যেত, ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে।

আবদুল হোটেলে এই ট্যুরিস্ট ফ্যামিলিটাকে ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে ডিনার পর্যন্ত সার্ভ করত। সে ছিল দারুণ স্মার্ট, চটপটে, সব সময় হাসিমুখ। ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, উর্দু চমৎকার বলতে পারত। ট্যুরিস্ট ফ্যামিলিটার তাকে ভীষণ পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। হোটেল ম্যানেজারের সঙ্গে অ্যারেঞ্জমেণ্ট করে সাইট সীয়িংয়ের সময় আবদুলকেও ওরা সঙ্গে নিয়ে যেত। কেননা স্বামী-স্ত্রী বেশীর ভাগ দিন 'পনি' ভাড়া করে চড়ত, কিংবা খাড়া পাহাড় বেয়ে ভ্যালির দিকে নেমে যেত। তখন বাচ্চাটাকে সামলাবার জন্য লোকের দরকার।

একদিন জলা পাহাড়ের দিকে গিয়েছিল ওরা। একটা উঁচু পাথরের আড়ালে পাতলা সিনথেটিকসের ম্যাট পেতে আবদুলের জিম্মায় নিজেদের বাচ্চাটাকে রেখে চারদিকে সীনসিনারি দেখতে চলে গিয়েছিল।

হোটেল থেকে সঙ্গে করে টুকিটাকি নানা রকম জিনিস নিয়ে এসেছিল তারা। খাবারের বাস্কেট, ওয়াটার বটল, কফি এবং চা বোঝাই ফ্লাস্ক, ক্যামেরা, ট্রানজিস্টর এবং একটা নতুন টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়া বাচ্চাটার হাতে ছিল লাল রঙের বড় একটা বল।

বাপ-মা চলে যাবার পর বাচ্চাটা বল নিয়ে আবদুলের সঙ্গে খেলতে শুরু করে। খেলতে খেলতে আচমকা সেটা হাত ফসকে অনেক নীচে গড়িয়ে পড়ে যায় আর বাচ্চাটা সঙ্গে সঙ্গে কান্না জুড়ে দেয়। বলটা তাকে এনে দিতেই হবে।

এইটুকু একটা ছেলেকে একা রেখে নীচ থেকে বলটা আনতে যাবার ইচ্ছা ছিল না আবদুলের। সে ভেবেছিল, ওর মা-বাবা ফিরলে এনে দেবে। তাই চকোলেট এবং অন্য খাবার-দাবার দিয়ে তাকে ভোলাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ছেলেটা যেমন জেদী, তেমনি টেঁটিয়া। লাল বল তার চাই-ই।

অগত্যা বাচ্চাটাকে বসিয়ে রেখে নীচে নামতে হয়েছিল আবদুলকে। আধ ঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিট বাদে ফিরে এসে সে দ্যাখে, বলের কথা ভুলে গিয়ে বাচ্চাটা বোতাম টিপে ব্যাটারি সেটের টেপ-রেকর্ডার চালিয়ে বসে আছে। কতক্ষণ চালিয়েছিল কে জানে? আবদুল ওটা বন্ধ করে দেয়।

জলা পাহাড় থেকে বেড়িয়ে আসার পরের দিনই আমেরিকান ফ্যামিলিটা কলকাতায় চলে গিয়েছিল। যাবার আগে খুশী হয়ে আবদুলকে কিছু টাকা আর টেপ-রেকর্ডারটা বকশিশ করে যায়। টেপ-রেকর্ডারটা ওরা একেবারেই ব্যবহার করে নি। ওরা জানত না, তাদের ছেলে ম্যাক এটা কিছুক্ষণের জন্য চালিয়েছিল।

ট্যুরিস্টরা চলে যাবার দু'দিন পর সর্বেশ্বর সেন খুন হন। বেশ কিছুদিন ধরে পুলিসের ঝামেলা চলতে থাকে। এর মধ্যে টেপ-রেকর্ডারটার কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল আবদুল। ঝঞ্ঝাট খানিকটা কমলে টেপ-রেকর্ডারটা নাড়াচাড়া করতে করতে আচমকা বোতাম টিপতেই যে কথাগুলো পরমেশ্বর একটু আগে শুনেছে সেগুলো সে-ও শুনতে পেয়েছিল। আর তখনই তার মনে পড়ে গেছে, যিনি তাদের হোটেলে খুন হয়েছেন তিনিও একজন সেন। আবদুল বুঝতে পেরেছিল, এই মার্ডারের সঙ্গে টেপ-রেকর্ডারের গলাগুলোর যোগাযোগ আছে। গোপনে গোপনে খোঁজ নিয়ে সে জানতে পারে, কার ডিরেকসানে এবং হুকুমে এই খুনটা হয়েছে। লোকটা এত পাওয়ারফুল এবং এত পয়সাওলা যে মার্ডারের এই প্রমাণ কাউকে জানাতে সাহস হয় নি তার। কেন যেন মনে হয়েছিল, তার কাছে এ-রকম একটা বিপজ্জনক টেপ-রেকর্ডার আছে—এ খবর জানাজানি হয়ে গেলে সর্বেশ্বর সেনের হত্যাকারী তাকেও শেষ করে দেবে। অথচ লোকটা খুন করে সোসাইটির মাথায় পা দিয়ে বসে থাকবে, এটাও সহ্য করা যাচ্ছিল না। প্রমাণটা যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, সেজন্য মাঝে মাঝে নতুন টেপ কিনে ওটা আবার রেকর্ড করে রাখত সে। অনেক দিন বাদে আবদুল জানতে পারে, মণিমোহন চ্যাটার্জি নতুন করে সর্বেশ্বর সেনের খুনের ইনভেস্টিগেশন শুরু করেছেন এবং গোপনে বারকয়েক দার্জিলিং-এ হত্যাকাণ্ডের জায়গায় ঘুরে

গেছেন। জানা মাত্র বেনামা চিঠি দিয়ে আবার তাঁকে দার্জিলিং আসতে লেখে।

যথেষ্ট বয়েস হয়েছে আবদুলের। এই পৃথিবীতে খুব বেশীদিন আর নেই সে। নিজের ছেলেদের জীবনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, মেয়েদের ভালো বিয়ে হয়েছে, স্ত্রীও মারা গেছে বেশ কিছুদিন। সংসারে তার আর কোন দায়-দায়িত্ব নেই। এখন যদি সে খুন হয়ে যায় তো খুন হবে। কিন্তু একটা ভালো সৎ মানুষকে হত্যা করে যে খুনী বেপরোয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। আবদুলের বিবেক তাকে জানিয়েছে, খুনীকে প্রাপ্য শাস্তি পেতেই হবে এবং এ ব্যাপারে তারও কিছু করণীয় আছে। হত্যার প্রমাণ জায়গামতো পেঁৗছে দেবে সে।

মণিমোহন এবার দার্জিলিং-এ এলে লুকিয়ে দেখা করে তাঁর হাতে টেপ-রেকর্ডারটা তুলে দেয় আবদুল। মণিমোহন শুধু টেপ-রেকর্ডারটাই না, সঙ্গে করে প্লেন ড্রেসড পুলিসের পাহারায় আবদুলকেও নিয়ে এসেছেন। খুনী যদি কোন রকমে এই টেপ-রেকর্ডারের ব্যাপার জানতে পারে, আবদুলের বেঁচে থাকা খুবই মুশকিল হয়ে পড়বে। নিরাপত্তার জন্যই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে কলকাতায় এনেছেন মণিমোহন এবং টোয়েন্টি-ফোর আওয়ার্স পুলিস পাহারায় রেখেছেন।

আবদুল সম্পর্কে সব কথা বলে মণিমোহন হাসলেন। অমিতাভর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আশা করি এবার বুঝতে পেরেছ জাল প্রায় গুটিয়ে এনেছি।'

অমিতাভও হাসল।

এক সময় মণিমোহনদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অমিতাভ পরমেশ্বরকে তার অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে পেঁৗছে দিয়ে চলে গেল। আর লিমুজিন থেকে নেমেই ছুটতে ছুটতে লিফট্ বক্সের ভেতর ঢুকে পড়ল পরমেশ্বর। হেমাকে আবদুল, মোতি বাহাদুর, টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদি সম্বন্ধে জানিয়ে বলবে, সোমেশ্বরের চারপাশে ফাঁদের দড়ি দ্রুত ছোট হয়ে আসছে। এই মেয়েটা তার মা-বাবা এবং তার ঝাপসা ছেলেবেলা সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। চুক্তি অনুযায়ী সোমেশ্বরকে ইঁদুরকলে ঢোকাতে পারলে হেমা তার আসল পরিচয়টা জানিয়ে দেবে। পরমেশ্বর যে বেজন্মা নয়, তারও যে নির্দিষ্ট মা-বাবা আছে, পৃথিবীতে মোটামুটি একটা ভদ্র পরিচয় আছে, এটুকু জানতে পারলে আর কিছুই সে চায় না।

নিজের জন্ম-পরিচয় জানার জন্য কেঁদে কেঁদে কত রাত যে সে কাবার করে দিয়েছে, ওয়ার্ল্ডের কেউ সে খবর রাখে না।



পরমেশ্বরের মনে হয়েছিল সোমেশ্বরের সঙ্গে সে মিটিয়ে নিতে পেরেছে। মাকড়া যাতে তার ওপর কোন রকম সন্দেহ করতে না পারে তাই সকালে আর রাতে রোজ দু'বার ফোন করে জানিয়ে যাচ্ছে আর ক'টা দিন রেস্ট নিয়েই ফ্রেশ এনার্জিতে সোমেশ্বরের কাজ শুরু করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সোমেশ্বর কী মেটিরিয়ালে তৈরি, তাঁর ব্রেনে কী চক্কর চলছে সেটা পুরোপুরি বুঝতে পারে নি পরমেশ্বর। এটাও সে টের পায় নি, সোমেশ্বরের সিক্রেট এজেন্ট চব্বিশ ঘণ্টা তার ওপর একটানা নজর রেখে যাচ্ছে এবং রোজ রাত্রে তার মুভমেণ্টের সমস্ত খবর সোমেশ্বর পেয়ে যাচ্ছেন।

এই সিক্রেট এজেণ্ট লাগাবার দায়িত্ব সোমেশ্বর দিয়েছিলেন নটবর নন্দীকে। এজেণ্টটা রোজ রাত্তিরে এসে নটবরকে পরমেশ্বর সম্পর্কে সব খবর দেয় আর সেই খবর একটা কাগজে টুকে নিয়ে নটবর ছোটে সোমেশ্বরের কাছে।

যেদিন নটবর এসে বলে, আজ হেমা সারিনের সঙ্গে প্রায় সারাদিনই পরমেশ্বরকে দেখা গেছে, সেদিন আরামদায়ক চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে সোমেশ্বর দারুণ নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে বলেন, 'লেট হিম······। ঐ ছুকরির সঙ্গে যত পারে ঘুরুক। এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কিচ্ছু নেই।'

কিন্তু নটবর তারপরই যখন জানায় পরমেশ্বর অমিতাভ সেনের 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজে'ও গেছে তখন সোমেশ্বরের চোখ কুঁচকে যায়, কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে, চোয়াল পাথরের মতো শক্ত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'ব্লাড়ি বাস্টার্ডটা রোজই তো অমিতাভর ওখানে যাচ্ছে?'

নটবর বলে, 'ইয়েস স্যার।'

'ফ্যাক্টরি ওড়াবার কাজ তো ওখানে শেষ হয়েছে। তবু ওখানে কী করতে যায় সোয়াইনটা?'

'স্যার, বলতে পারব না।'

'ইটার্নাল ইন্ডাস্ট্রিজে লোক ঢুকিয়ে যেমন করে পার খোঁজ নাও।'

'আচ্ছা স্যার।'

একটু চুপ করে থেকে সোমেশ্বর বলেন, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, অমিতাভর কোন কাজ ও নিয়েছে। আই অ্যাম ভেরি ভেরি অ্যাঙ্কসাস। যদি কোন রকমে জানাজানি হয়ে যায় ফ্যাক্টরি ডেসট্রাকসানের ব্যাপারে আমি আছি—'

নটবর বলে, 'এ নিয়ে চিন্তা করবেন না স্যার, ফ্যাক্টরির ব্যাপারে কিছু ফাঁস করতে গেলে ও নিজেই ফেঁসে যাবে। যা কিছু করার ও-ই তো নিজের হাতে করেছে।'

'ও যে কত বড় হারামী তুমি তো জানো, ওয়াল্ডের্ এমন কোন কাজ নেই যা ও পারে না। দেখবে ফ্যাক্টরির কেসে আমাকে ডুবিয়ে দিয়ে বাস্টার্ডটা স্মুদলি বেরিয়ে এসেছে।'

নটবর বলে, 'অমিতাভর কাছে ওর ধান্দাটা কী, শীগ্‌গিরই বার করে ফেলছি স্যার।'

আজ দারুণ উত্তেজিত ভঙ্গিতে সোমেশ্বরের সাদার্ন অ্যাভিনিউর ফ্ল্যাটে এল নটবর। এখানে সোমেশ্বরের ফ্যামিলি-ট্যামিলি থাকে না। কোন কোন দিন রেস্ট নেবার ইচ্ছা হলে কিংবা বিজনেস বা অন্যান্য ব্যাপারে কোন রকম প্ল্যান করতে হলে বা মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি-টুর্তির খচড়ামো চাগিয়ে উঠলে এই নিরিবিলি ফ্ল্যাটটায় চলে আসেন তিনি। নটবর জানতো, আজ রাত্তিরে সোমেশ্বর এখানে আসবেন। কখন কোথায় তিনি থাকবেন, আর কেউ না জানুক, নটবর জানবেই।

সোমেশ্বর ড্রইং রুমের একটা ডিভানে কাত হয়ে আধশোয়ার মতো করে পড়ে আছেন। ডিভানটার কাছেই একটা সেণ্টার টেবলের ওপর কাট-গ্লাসের দারুণ একটা পানপাত্রে হুইস্কি রয়েছে। মাঝে মাঝে সেটা তুলে এনে অল্প অল্প 'সিপ' করছেন তিনি। নটবরের চোখমুখের চেহারা দেখে তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। বুঝতে পারলেন, খারাপ কিছু একটা ঘটেছে। আস্তে করে বললেন, 'কী খবর নটবর?'

নটবর নন্দী উত্তেজিত কাঁপা গলায় বলল, 'ভেরি ব্যাড নিউজ স্যার—' উত্তেজনাই শুধু নয়, তার খ্যাসখেসে গলার স্বরে রীতিমতো ভয়ও মিশে আছে।

সোমেশ্বর ওয়াল্ডের্র অনেক কিছু দেখেছেন। নিজের হাতেও কম ম্যাজিক দেখান নি! সাদাকে কালো, কালোকে সাদা, রাতকে দিন, দিনকে রাত বানিয়ে ছেড়েছেন। কাজেই খুব সহজে তিনি নার্ভাস হয়ে পড়েন না।

একটা বেয়ারাকে ডেকে হুইস্কি আনালেন। তারপর সামনের একটা সোফা দেখিয়ে নটবরকে বললেন, 'ওখানে বসে দুটো পেগ আগে মেরে দাও। ফার্স্ট ইউ শুড স্টেডি ইওর নার্ভস। তারপর তোমার ব্যাড নিউজ শুনব।'

সট সট দু পেগ হুইস্কি পাকস্থলীতে চালান করে নটবর খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল যেন। বলল 'স্যার একটা না, একজোড়া ব্যাড নিউজ রয়েছে।'

'এক এক করে বলে যাও।'

'মনে হচ্ছে পরমেশ্বর অমিতাভর হাতে হাত মিলিয়ে আপনার পেছনে লেগেছে।'

'নাম্বার টু-টা বলো।'

'সেটা আরো ডেঞ্জারাস। আজ অমিতাভ সেন পরমেশ্বরের ফ্লাটে এসেছিল।'

'ইণ্টারেস্টিং। বলে যাও।'

'ফ্ল্যাট থেকে তাকে তুলে অমিতাভ যেখানে গেল, সেটা একজন রিটায়ার্ড টপ পুলিস অফিসারের বাড়ি।'

সোমেশ্বর ডিভানের ওপর সোজা হয়ে বসলেন। টের পাওয়া যাচ্ছে, তাঁর মধ্যে কী একটা দুর্দান্ত রিঅ্যাকসান চলছে। আস্তে করে বললেন, 'ঠিক বলছ?'

নটবর বলল, 'আমার এজেণ্ট ভুল খবর আনবে না।'

খানিকক্ষণ অন্যমনস্কর মতো বসে রইলেন সোমেশ্বর। তারপর বললেন, 'আর কিছু খবর আছে?'

'অনেক খবর।'

'তা হলে চুপ করে আছ কেন? বলে যাও।'

'স্যার, ঐ পুলিস অফিসার অমিতাভ সেনের বাবা সর্বেশ্বর সেনের মার্ডার কেসটা নতুন করে ইনভেস্টিগেসন শুরু করেছে। আর ওখানে প্লেন-ড্রেস পুলিসের পাহারায় একটা দুটো বুড়ো লোককে দেখলাম। তাদের একজন নেপালী, আরেকজনের কী জাত বলতে পারব না। নেপালীটার নাম মোতি বাহাদুর—'

সোমেশ্বর চমকে উঠলেন, 'কী বললে!' তাঁর হাতের গেলাস থেকে অনেকটা হুইস্কি চলকে পড়ে গেল।

নটবর বলল, 'হ্যাঁ স্যার।'

'তোমার লোক মোতি বাহাদুরের নামটা ঠিক শুনেছে তো?'

'আমার এজেণ্ট বল্টু হারামীর একেবারে কুকুরের কান। যত আস্তেই আওয়াজ হোক, ট্রান্সমিটারে হয়ত ধরা পড়বে না, কিন্তু ও শালার কান ঠিক রিসিভ করে নেবে।'

একটু চুপ করে থেকে সোমেশ্বর বললেন, 'মোতি বাহাদুর কোথায় আছে, খবর পেয়েছ?'

নটবর তার মাথাটা ঘাড়ের দু ধারে বার কতক দোল খাইয়ে বলল, 'না স্যার, মোতি বাহাদুরের মুভমেণ্ট ওয়াচ করার তো কথা ছিল না।'

'যেভাবে হোক, মোতি বাহাদুর আর তার সঙ্গের সেই বুড়োটার খবর নাও।'

'ঠিক আছে স্যার।' বলে একটু থেমে আবার নটবর বলল, 'একটা কথা বলব?'

সোমেশ্বর ভুরু তুলে তার দিকে তাকালেন, 'কী?'

'আমার মনে হচ্ছে, এ সবের পেছনে ঐ হারামী পরমেশ্বরটা রয়েছে। সর্বেশ্বর সেনের ব্যাপারটায় কোন রকম গোলমাল নেই তো?'

'থাকার কথা নয়। এমনভাবে সবদিক আটকে প্ল্যানটা করা হয়েছিল, যাতে কোথাও এতটুকু প্রমাণ-ট্রমাণ না থাকে। তারপরও কিছু থেকে গেছে কিনা, মনে করতে পারছি না।'

নটবর কপালের চামড়ায় অনেকগুলো ঢেউ ফেলে বলল, 'স্যার, আমার মনে হচ্ছে, পরমেশ্বরটা যা খলিফা, কিছু একটা ডেফিনিটলি বার করে ফেলেছে। আর এটা তো পরিষ্কার, অমিতাভর সঙ্গে ভিড়ে ও কিছু একটা নিশ্চয়ই পেয়েছে যা দিয়ে ফাঁসানো যায়।'

সোমেশ্বরকে এবার রীতিমতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাল। তিনি বললেন, 'তোমার ঠিকই মনে হচ্ছে। ওরা আমাকে ফাঁসাবার আগেই একটা কাজ করতে হবে নটবর।' বলতে বলতেই তার লালচে চোখ দুটো ক্রমশঃ ধূসর হয়ে উঠতে লাগল।

নটবর নন্দী অনেক কাল সোমেশ্বর মল্লিকের বিশ্বাসী সিক্রেট এজেণ্ট হিসেবে কাজ করে আসছে। সোমেশ্বরের পায়ের তলা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত সব তার চেনা। চোখের এই রং বদলের মধ্যে একটা সিগন্যাল পেয়ে গেল সে। তবু জিজ্ঞেস করল, 'কী কাজ স্যার?'

'অমিতাভ আর পরমেশ্বরকে ওয়ার্ল্ড থেকে কমপ্লীট লিকুইডেসন।'

'লিকুইডেসন!'

'ইয়েস নটবর। ব্যাপারটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তা ছাড়া তুমি তো জানোই অকারণ রক্তপাত আমার একেবারেই পছন্দ নয়। কিন্তু এখানে আমি

নিরুপায়। যে সাপ দাঁতের গোড়ায় বিষ জমিয়ে ফেলেছে, তাকে বাঁচিয়ে রাখাটা কাজের কথা নয়। আশা করি, এ ব্যাপারে তুমি আমার সঙ্গে একমত হবে।'

নটবর উত্তর দিল না, পরবর্তী নির্দেশের জন্য কান খাড়া করে রইল।

সোমেশ্বর ফের বললেন, 'তোমার হাতে তো অনেক রকম লোক আছে। আগেও দু'একজনকে ওয়াল্ড' থেকে সরাবার ব্যাপারে প্রফেসানাল লোক দিয়েছ।'

নটবর বলল, 'এবারও পাবেন স্যার।'

'আগে যে রকম দিয়েছিলে, এবার তেমন দিলে চলবে না। মনে রেখো পরমেশ্বরের মতো এমন একটা হারামীকে ভ্যানিশ করতে হবে যার দুশো'টা চোখ, পাঁচশো'টা হাত, সাতশো'টা পা। ইচ্ছা করলে ও বোধহয় একসঙ্গে চোদ্দ জায়গায় থাকতে পারে। কাজেই যে লোক দেবে তার কী ধরনের প্রফেসানাল এফিসিয়েন্সি থাকা দরকার, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।'

'পারছি স্যার। কিন্তু ওয়াল্ডে' পরমেশ্বরই একমাত্র জিনিয়াস জন্মায় নি। ওর চাইতে অনেক ভালো মালও পৃথিবীর বহু গর্ভধারিণী তাঁদের পেটে ধরেছেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার। দেখবেন, এ লাইনের একজন সেরা আর্টিস্টকে আপনার কাছে হাজির করে দেব।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। তুমি আমাকে বাঁচালে নটবর।'

'এ কী বলছেন স্যার!' নটবর পাক্কা ন' ইঞ্চি জিভ কেটে বলল, 'আপনি হুকুম করলে না পারি কী? আকাশ থেকে তারা খসিয়েও আনতে পারি। আর এ তো একটা লোক যোগাড় করে দেওয়া! কত বচ্ছর আপনার নুন খাচ্ছি! শুধু বলুন, কখন কবে লোকটাকে দরকার?'

সোমেশ্বর বললেন, 'এক সেকেণ্ড দেরি করাও আমার পক্ষে ডেঞ্জারাস। আজ রাত্তিরে তোমার লোকটাকে নিয়ে আসতে পারবে?'

নটবর বলল, 'না স্যার, মিনিমাম দিন তিনেক সময় লাগবে।'

'কেন?'

'লোকটা কোথায় আছে বা থাকে, জানি না। শুধু আমিই না, কেউই জানে না।'

'তবে তাকে আনবে কী করে?' সোমেশ্বর একই সঙ্গে বিরক্ত এবং অবাক্ হলেন।

নটবর বলল, 'ইংলিশ ডেইলির পার্সোনাল কলামে একটা অ্যাডভার্টাইজমেণ্ট দিতে হবে, 'একজন সত্যিকার বন্ধু দরকার।' যেদিন বিজ্ঞাপনটা বেরুবে, তার একদিন বা দু'দিনের ভেতর ঐ পার্সোনাল কলামেই উত্তর পাওয়া যাবে।'

'দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।'

'হ্যাঁ স্যার। লোকটা তার হোয়ারঅ্যাবাউটস কাউকে জানায় না।'

'একে দিয়ে কাজ হবে তো?'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'আজ তো হবে না, অনেক রাত হয়ে গেছে। কালই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা দিয়ে দাও।'

অদ্ভুত টাইপের অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা বেরুবার পরদিনই ইংলিশ নিউজপেপারে পার্সোনাল কলামে উত্তর পাওয়া গেল। সেখানে এক জায়গায় লেখা রয়েছে —'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নর্থ গেটে আজ রাত সাতটা থেকে আটটার মধ্যে কালো ড্রেসে দাঁড়িয়ে থাকবেন। সত্যিকার বন্ধু আপনাকে খুঁজে নেবে।'

বিজ্ঞাপনটা পড়েই চীফ এজেন্ট নটবর নন্দীকে ফোন করলেন সোমেশ্বর 'বন্ধুর উত্তরটা দেখেছ?'

নটবর বলল, 'দেখেছি স্যার।'

'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নর্থ গেটে সন্ধ্যেবেলা যাবে?'

'নিশ্চয়ই যাব।'

'একে দিয়ে কাজ হবে তো?' সোমেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন। আগেও তিনি এই প্রশ্নই করেছিলেন।

আগের মতোই নটবর উত্তর দিল, 'নিশ্চয়ই হবে স্যার।'

সন্ধ্যেবেলা কাঁটায় কাঁটায় সাতটা বাজলে নটবর নন্দীকে সঙ্গে করে সোমেশ্বর ভিক্টোরিয়া মোমোরিয়ালের একধারে পার্কিং এরিয়ায় গাড়ি রেখে নর্থ গেটের কাছে এসে দাঁড়ালেন। দু'জনেরই পরনে কালো স্যুট।

রাস্তায় কর্পোরেশনের আলোগুলো এর মধ্যে জ্বলে উঠেছে। চারদিকে প্রচুর ভিড়। বাঙালী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠী, সিন্ধী—ন্যাশনাল অ্যানথেমে যতগুলো প্রভিন্সের নাম আছে, সে সব জায়গার অগুনতি মানুষ এখন এখানে ময়দানের ফ্রেশ হাওয়া খেতে এসেছে। ভিক্টোরিয়ার সামনের রাস্তা এবং ভেতরের প্রকাণ্ড বাগানটা এখন যেন মিনি ইণ্ডিয়া। এধারে-ওধারে ফুচকাওলা, ভেলপুরীওলা, মশলা-মুড়িওলা, আইসক্রিমওলা, দিল্লী কি বেনারসী চাটওলারা কার্বাইডের আলো জ্বালিয়ে দোকান সাজিয়ে বসে আছে। এই সব দোকানের সামনে থিকথিকে ভিড়।

সোমেশ্বর নটবরের কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে চাপাগলায় ফিসফিসিয়ে বললেন, 'এই ক্রাউডের ভেতর থেকে আননোন ফ্রেণ্ড আমাদের খুঁজে বার করতে পারবে তো?'

নটবর বলল, 'নিশ্চয়ই পারবে।'

এর পর সোমেশ্বর আর কোন প্রশ্ন করলেন না। নটবর নন্দীও মুখ বুজে রইল। সোমেশ্বরের অদ্ভুত লাগছিল। এভাবে কারো জন্য কখনও তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়নি। টের পেলেন নার্ভের ভেতর কী এক উত্তেজনা আর টেনসান যেন চলছে। সেইসঙ্গে খানিকটা উদ্বেগও।

মিনিট পনেরর বেশী দাঁড়াতে হল না। আচমকা ভিড়ের ভেতর থেকে একজন পাশে এসে দাঁড়াল। নীচু গলায় বলল, 'ফ্রেণ্ডের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন?'

সোমেশ্বরের নার্ভগুলোতে দারুণ ঝাঁকুনি লাগল যেন। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ।'

'প্লীজ ফলো মী।'

সোমেশ্বর কিছু বলার আগেই লোকটা সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। 'দেখাই যাক কী হয়—' এ রকম একটা অ্যাটিচুড নিয়ে সোমেশ্বর এবং নটবর তার পেছনে হাঁটতে লাগল।

লোকটা ওঁদের দু জনকে নিয়ে মেমোরিয়ালের পুব দিকে অ্যার্টিফিসিয়াল লেকের ধারে একটা ঝোপের আড়ালে বসল। এ জায়গাটা মোটামুটি ফাঁকা; দূরে ভিক্টোরিয়ান এজের একটা মিটমিটে আলো জ্বলছে।

সোমেশ্বর এতক্ষণে লোকটাকে ভালো করে দেখার সুযোগ পেলেন। চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মতো বয়স। মাঝারি হাইট। টান টান মেদহীন চেহারা। গালে পাতলা দাড়ি। চুল লালচে এবং অল্প অল্প কোঁচকানো। তবে চোখের তারা দুটো নীলচে। এই চোখ ছাড়া তার মধ্যে চোখে পড়ার মতো তেমন কিছু নেই।

লোকটার পরনে জিনের আধময়লা টাউজার্স আর বুশ শার্ট। এক গাদা লোকের ভেতর দাঁড় করিয়ে দিলে তাকে আলাদাভাবে খুঁজে বার করা রীতিমতো দুরূহ ব্যাপার।

সোমেশ্বরের একবার মনে হল, এরকম অত্যন্ত সাধারণ টাইপের একটা লোকের ওপর পরমেশ্বর এবং অমিতাভর দায়িত্ব দেওয়া ঠিক হবে কিনা। পরমুহূর্তেই খেয়াল হল, এটাই কারেক্ট চেহারা। দেখামাত্রই যদি টের পাওয়া যায় লোকটা প্রফেসনাল মার্ডারার, তা হলে বিরুদ্ধ পক্ষ হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। আর এই লোকটার যা চেহারা, তাতে আসল কাজ সেরে ইণ্ডিয়ার সেভেন হানড্রেড মিলিয়ন মানুষের ভেতর মিশে গেলে কারো বাপের ক্ষমতা নেই তাকে খুঁজে বার করে। নটবরের সিলেকসন এদিক থেকে সেণ্ট পারসেণ্ট রাইট।

সোমেশ্বরই প্রথমে শুরু করলেন, 'ওয়েল, কথাবার্তা আরম্ভ করার আগে আমাদের পরিচয়টা হওয়া দরকার। আমার নাম সোমেশ্বর মল্লিক, আর এ হল নটবর নন্দী, আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি। আমার কিছু ফ্যাক্টরি-ট্যাক্টরি আছে; সবাই বলে আমি একজন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট।' এই পর্যন্ত

বলে থামলেন সোমেশ্বর। স্বাভাবিকভাবেই লোকটার পরিচয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

লোকটা স্ট্রেট সোমেশ্বরের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাদের মতো আমার কোন পরিচয় নেই। আমার একমাত্র পরিচয় হল, আমি একজন প্রফেসানাল মার্ডারার। আমার কোন ন্যাশানালিটি নেই। ধরুন আমার নাম মিস্টার এক্স। নাউ অন টু বিজনেস। নষ্ট করার মতো আমার সময় একেবারেই নেই। কী সাহায্য দরকার বলুন?'

সোমেশ্বর পরমেশ্বর এবং অমিতাভর ব্যাপারটা বললেন।

এক্সের মুখের চামড়া এতটুকু কোঁচকালো না। দারুণ নিস্পৃহভাবে সে বলল, 'নো প্রবলেম। আপনি যা চাইছেন তাই হবে।' লোকে যেভাবে 'একটা সিগারেট খান' বা 'চলুন একটু বেরিয়ে আসি' গোছের ভঙ্গি করে সে কথা ক'টা সেইভাবে উচ্চারণ করল।

সোমেশ্বর বললেন, 'থ্যাঙ্কস।'

এক্স বলল, 'ধন্যবাদের দরকার নেই। দিস ইজ প্রফেসান। আমি আপনার কাজ করে দেব, আপনি আমাকে পে করবেন। আশা করি, এবার আমরা টার্মস এ্যাণ্ড কণ্ডিসানস সম্পর্কে ডিসকাস করতে পারি!'

সোমেশ্বর বুঝতে পারছিলেন, লোকটা সেণ্ট পারসেণ্ট প্রফেসানাল, এর কাছে আজেবাজে ধানাই-পানাই চলবে না। মনে হচ্ছে কাজের লোকই হবে। মেরুদণ্ড টান টান করে তিনি বললেন, 'আমার আপত্তি নেই।'

এক্স এক সেকেন্ডও না ভেবেই বলল, 'ফার্স্ট অফ অল, আমার টার্গেট, মানে পরমেশ্বর আর অমিতাভ সেনকে আমার চেনা দরকার। তার অ্যারেঞ্জমেণ্ট আপনাকে করে দিতে হবে!'

চোখ কুঁচকে খানিকক্ষণ ভেবে নিলেন সোমেশ্বর। তারপর বললেন, 'ওয়েল, পরমেশ্বরের সঙ্গে আশা করি আলাপ করিয়ে দিতে পারব। অমিতাভর সঙ্গে পারব না, তবে তার একটা ফোটোগ্রাফ দিতে পারব, আর অ্যাড্রেসও।'

'আরেকটা কথা, এই দু'জনের ওপর অপারেশনটা ইণ্ডিয়ায় করতে পারব না; ফরেন কোন কাণ্ট্রিতে করব।'

সোমেশ্বরের কপালের চামড়ায় ডজন দুয়েক ভাঁজ পড়ল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ইণ্ডিয়ায় হবে না কেন?'

এক্স বলল, 'এ দেশের সব প্রভিন্সের পুলিস আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। টু মাই ক্রেডিট দেয়ার আর টোয়েণ্টি-ফাইভ মার্ডারস। এখানে আরেকটা অপারেশন চালালে অনেক ট্রাবল হয়ে যাবে। এখান থেকে পার্মানেণ্টলি আমি চলেও যেতে চাইছি, অন্য কাণ্ট্রিতে আবার অ্যাক্টিভিটি শুরু করব।'

'কিন্তু ফরেনে অপারেশন কী করে সম্ভব? দু'জনেই তো এখানে থাকে।'

'আপনিই তো বললেন, অমিতাভ সেন একজন বিগ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। ইন ফ্যাক্ট লোকটার নাম আমিও শুনেছি।'

এক্স ঠিক কোন্ দিকে যাচ্ছে বুঝতে না পেরে সোমেশ্বর বললেন, 'হ্যাঁ, অমিতাভ সেন একজন বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। কিন্তু তাতে কী?'

'বিগ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা তো আজকাল সকালে বিকেলে ফরেন যাচ্ছে। অমিতাভ সেনকেও নিশ্চয়ই যেতে হয়।'

'হ্যাঁ, তা ও যায়। তবে এর মধ্যে কবে যাবে তার কিছু ঠিক নেই। কালই যেতে পারে, আবার মাসখানেক মাস দুয়েক দেরিও হতে পারে।'

'আমাকে দায়িত্ব দিলে অমিতাভ সেনের ফরেন যাওয়া পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে। এদেশে নতুন করে আমি ঝামেলা পাকাতে চাই না।'

অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায়ই বা কী? অবশ্য সর্বেশ্বর সেনের মার্ডার কেসের ইনভেস্টিগেসন, মোতি বাহাদুর, অমিতাভর সঙ্গে পরমেশ্বরের হাত মেলানো ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারগুলো দ্রুত সোমেশ্বরের মনে পড়ে গেল। দ্বিধান্বিতের মতো তিনি বললেন, 'ওয়েট না হয় করা গেল। কিন্তু ফরেনে কোন্ কাণ্ট্রিতে অমিতাভ সেন যাবে তার তো কোন ঠিক নেই।'

'এনি ড্যাম কাণ্ট্রি। ইণ্ডিয়ার বাইরে যে কোন জায়গায় হোক, আমার অসুবিধা নেই।'

'এর পরও আরেকটা কথা রয়েছে।'

'বলুন।'

'অমিতাভ না হয় ফরেনে গেল কিন্তু পরমেশ্বর?'

'আপনি তো বললেন, পরমেশ্বর অমিতাভ সেনের সঙ্গে খুব জমিয়ে নিয়েছে। অমিতাভ বাইরে গেলে, আমার মনে হয়, সে-ও সঙ্গে যাবে।'

কথাটা মোটামুটি ঠিকই বলেছে এক্স। সোমেশ্বর নিয়মিত খবর পাচ্ছেন, পরমেশ্বর হারামীটা আজকাল প্রায় সারাদিনই অমিতাভর সঙ্গে অ্যাডহেসিভের মতো জুড়ে থাকে। ওদের যা ইণ্টিমেসি, তাতে একসঙ্গে ফরেনে যাওয়া অসম্ভব কিছু না। তা ছাড়া অপারেশনটা এক হিসেবে ফরেনে হওয়াই ভালো। সোমেশ্বর জানেন, নানা ব্যাপারে তাঁর ওপর পুলিসের নজর আছে। সর্বেশ্বর সেনের কেসটা নতুন করে পুলিস টেক-আপ করেছে। এর মধ্যে যদি অমিতাভ এবং তার নতুন ফ্রেণ্ড পরমেশ্বর এ দেশেই মার্ডার হয়ে যায়, সোমেশ্বরের ওপর সন্দেহ এসে পড়তে পারে। মার্ডারটা যদি বিদেশে ঘটে, তাঁকে ফাঁসানো সহজ হবে না।

সোমেশ্বর বললেন, 'ধরা যাক, ওরা একসঙ্গে বাইরে যাবে আর অপারেশনটাও সেখানেই হবে। কিন্তু তার আগে আরেকটা কাজ করতে হবে।'

'কী ?'

সুইস ব্যাঙ্কের সেই ডকুমেণ্টগুলোর কথা ডিটেলে জানিয়ে সোমেশ্বর বললেন 'ওগুলো পরমেশ্বরের ফ্ল্যাট থেকে বার করে এনে দিতে হবে।'

'মিস্টার মল্লিক, আমি মার্ডারার কিন্তু চোর নই।'

'আমার এই রিকোয়েস্টটা রাখতেই হবে। প্লীজ—'

একটু চুপ করে থেকে এক্স বলল, 'ঠিক আছে। এবার আমার প্রফেসানাল ফী'র ব্যাপারটা ঠিক করে ফেলুন।'

সোমেশ্বর বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলুন কী দিতে হবে ?'

'আপনি তো জানালেনই সুইস ব্যাঙ্কে আপনার কিছু টাকা আছে।'

'এই সামান্য।'

'আর কোথায় কোথায় আছে ?'

'এ প্রশ্নটার উত্তর দেব না। আমাকে কী দিতে হবে সেটাই শুধু বলুন।'

'লণ্ডনের পিকাডিলি সার্কাসে মিডল ইস্ট ব্যাঙ্কের যে ব্রাঞ্চটা রয়েছে তার লকারে মিস সিরিল ব্যারিংটনের নামে দশ হাজার পাউণ্ড জমা দিয়ে লকারের চাবিটা তাঁকে দেবার ব্যবস্থা করবেন। দিস ইজ মাই ফী।'

'টেন থাউজেণ্ড পাউণ্ডস ! ফী'টা বেশী হয়ে যাচ্ছে না মিস্টার এক্স ?'

'ওয়েল মিস্টার মল্লিক, আমি বারগেন পছন্দ করি না। আমাকে দিয়ে কাজ করাতে হলে ঐ ফিগারটাই দিতে হবে।' বলে একটু চুপ করল এক্স। তারপর ফী হিসেবে এই বিরাট অঙ্ক হাঁকবার কৈফিয়ত দেবার জন্যই যেন ফের বলে উঠল, 'আমার রিস্কটা ভাবতে পারছেন ? যদি অপারেশন দুটো সাকসেসফুল হয়—ভেরি ফাইন। আর যদি কোন কারণে ধরা পড়ে যাই, ইউ ক্যান ওয়েল ইমাজিন দি কনসিকোয়েন্সেস।'

টাকাপয়সা নিয়ে আর দড়ি টানাটানি করলেন না সোমেশ্বর। শুধু বললেন, 'মিস ব্যারিংটনকে কেমন করে লকারের চাবি দেওয়া হবে ?'

'তার ঠিকানা হল, বারো নম্বর প্যাডিংটন স্কোয়ার। ব্যাঙ্ককে ইনস্ট্রাকসান দিলে ওরা মিস ব্যারিংটনকে চাবি পাঠিয়ে দেবে।'

'অতগুলো পাউণ্ড অ্যাডভান্স দেবার পর যে কাজটা হবেই এমন গ্যারাণ্টি কোথায় ?'

'আগেও বহু ক্লায়েণ্ট আমাকে অ্যাডভান্স দিয়েছে ; তাদের কাজও হয়েছে। শয়তানেরা যখন নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে, তখন যে কোন মোমেণ্টে বিশ্বাস-ঘাতকতা ঘটতে পারে। তবু আমাকে আপনার বিশ্বাস করতেই হবে। না হলে লেট আস পার্ট অ্যাজ গুড ফ্রেণ্ডস্। নষ্ট করার মতো সাফিসিয়েণ্ট সময় আমার নেই।'

এক্স উঠে পড়ছিল। তাকে বসিয়ে সোমেশ্বর বললেন, 'ঠিক আছে। ঐ দশ হাজার পাউণ্ডই আমি জমা দিয়ে দিচ্ছি।'

'আপনি যেদিন দেবেন, তার পরদিন থেকেই কাজ শুরু করে দেব।'

'কালই আমি লণ্ডনে আমার ব্যাঙ্ককে মিডল ইস্ট ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চের লকারে মিস সিরিল ব্যারিংটনের নামে ঐ অ্যামাউণ্টটা রাখার ইনস্ট্রাকসন দেব।'

'পরশু থেকেই আমার অ্যাক্টিভিটি স্টার্ট হবে।'

'আমি পাউণ্ডগুলো জমা দিলাম কি দিলাম না, আপনি জানবেন কী করে?'

এক্স একটু হাসল। বলল, 'এ নিয়ে কষ্ট করে আপনাকে ভাবতে হবে না। পাউণ্ডগুলো জমা পড়লেই আমি জেনে যাব। তবে স্যার, একটা কথা। আমাকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করবেন না। আই অ্যাম এ স্ট্রেট প্রফেসানাল। আই ডু সামথিং ফর মাই অনার্ড ক্লায়েণ্টস; ইন রিটার্ন দে ডু সামথিং ফর মী। ধোঁকাবাজি আমি পছন্দ করি না।' বলতে বলতে তার চোখের নীলাভ মণিতে নিষ্ঠুর ছায়া পড়ল।

সোমেশ্বর বললেন, 'আমিও বিজনেসম্যান। ধোঁকাবাজিতে আমিও বিশ্বাস করি না। কাজ করালে তার দাম আমি দিই।'

'গুড।'

সোমেশ্বর একটু ভেবে এবার বললেন, 'ধরুন, অমিতাভদের বাইরে যেতে খুব বেশী দেরি হল, তখন কী হবে? আই মীন, তাড়াতাড়ি ওদের অপারেশন না হলে আমার বিপদ হয়ে যাবে।'

'ইন দ্যাট কেস, অপারেশনটা ইণ্ডিয়ায় শুরু করে দিতে হবে। পরমেশ্বরের সঙ্গে কবে আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কিন্তু কীভাবে আলাপটা করাবো, সেটা একটু চিন্তা করতে হবে।'

'ও-কে, চিন্তা করুন। তারপর আমাকে জানাবেন।'

'কীভাবে আপনার সঙ্গে কনট্যাক্ট করব?'

'আপনি কনট্যাক্ট করতে পারবেন না। আমাকে একটা ফোন নাম্বার দিয়ে দিন। রোজ রাত্রে সাতটা থেকে সাড়ে-সাতটার মধ্যে আমি আপনাকে রিং করব। আরেকটা কথা জানিয়ে দিই, অপারেশন আনসাকসেসফুল হলে আপনার দশ হাজার পাউণ্ড ইনট্যাক্ট ফেরত দিয়ে দেব। সো লং টু-ডে, গুড নাইট।' বলে আর বসল না এক্স। সোমেশ্বরের কাছ থেকে একটা ফোন নাম্বার টুকে নিয়ে ঝট করে উঠে দাঁড়াল। তারপর মেমোরিয়ালের

পূর্বদিকের রাস্তার দিকে চলে গেল। তারও পর অগুনতি মানুষের ভিড়ে অদৃশ্য হল। ভিক্টোরিয়ান এজের টিমটিমে আলোয় তাকে আর দেখা গেল না।

এক্স চলে যাবার পর অনেকটা সময় কেটে গেছে। সোমেশ্বর এক সময় বললেন, 'এ রকম লোক আমি লাইফে দেখি নি। রীয়েলি মিস্টেরিয়াস! তোমার কী মনে হয় নটবর—ডিপেনডেবল্ তো?'

নটবর বলল, 'স্যার, অনেক লোকের কাজ ও করেছে। সবাই তো ডিপেণ্ডেবল্ বলে।'

একটু চুপচাপ। তারপর সোমেশ্বর বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে। চল এবার ওঠা যাক।'

মেমোরিয়ালের নুড়ি বিছানো রাস্তা মাড়িয়ে নর্থ গেটের দিকে যেতে যেতে সোমেশ্বর ফের বললেন, 'আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।'

নটবর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, 'কী?'

'অমিতাভর সঙ্গে পরমেশ্বরের একটা মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং ঘটিয়ে দিতে হবে। আমি গ্রীন সিগন্যাল দিলেই এজেণ্ট পাঠিয়ে পরমেশ্বরের রীয়েল অ্যাড্রেস আর আসল কাজ-কারবারের ব্যাপারটা অমিতাভকে জানিয়ে দেবে। পারবে তো?'

'নো প্রবলেম স্যার। কিন্তু আমি অন্য একটা কথা ভাবছি।'

'কী?'

'ওদের মধ্যে মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হলে দু'জনে একসঙ্গে ফরেনে যাবে না। তাহলে এক্সের অপারেশনটা—'

'ভুলে যাচ্ছ কেন, সর্বেশ্বর সেন মার্ডার কেসের ব্যাপারে ওরা হাত মিলিয়েছে। ওরা কতদূর এগিয়েছে কিছু জানি না। মারাত্মক কোন ড্যামেজ করবার আগেই ওদের আলাদা করে দিতে হবে। অমিতাভ যদি পরমেশ্বরের রীয়েল পরিচয়টা জানতে পারে, এক সেকেণ্ডও তাকে টলারেট করবে না। নিজেদের ভেতর গোলমাল বাধলে সর্বেশ্বর সেনের মার্ডার কেসটা তখন ব্যাকগ্রাউণ্ডে চলে যাবে। দু'জনের ইণ্টিমেসি ভাঙার পর কী করা যায় তখন সেটা ভেবে ঠিক করব।'

'স্যার, ব্যাপারটা ভালোই ভেবেছেন।'

ওঁরা কিছুক্ষণের মধ্যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নর্থ গেট পেছনে ফেলে বাইরের রাস্তায় চলে এল।



পরমেশ্বরের সঙ্গে হেমার ঘনিষ্ঠতা দ্রুত বেড়েই যাচ্ছিল। এ ব্যাপারে হেমার রোলটাই অনেক বেশী অ্যাগ্রেসিভ। সল্ট লেকে নিজেদের বাড়িতে তাকে নিয়ে যাবার পর থেকেই হেমার চেঞ্জটা মার্ক করে যাচ্ছে পরমেশ্বর। দিনে এখন দশবার করে তাকে ফোন করে হেমা। যখন-তখন হুট-হাট তার ফ্ল্যাটে চলে আসে।

ছুকরির এইসব অ্যাক্টিভিটি কেমন যেন সন্দেহজনক মনে হয় পরমেশ্বরের। ওয়ার্ল্ডের কোন পুলিস বা সি-বি-আই অফিসার তার মতো একখানা মালের দিকে আচমকা এরকম ঢলে পড়তে শুরু করবে, এ যেন ভাবা যায় না। নিশ্চয়ই ছুঁড়িটার অন্য কোন ধান্দা-ফান্দা আছে। তাকে ভালো করে ফাঁসাবার জন্য হেমা কী প্ল্যান করছে কে জানে। তবে সন্দেহ-টন্দেহ তার ভেতরে যা-ই থাক, ছুঁড়িটাকে তা বুঝতে দিচ্ছে না পরমেশ্বর। নার্ভগুলোকে সজাগ রেখে তার সঙ্গে সমানে সে তাল দিয়ে যাচ্ছে।

কখনও এসে হেমা বলে, 'আচ্ছা একটা কথা আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে।'

পরমেশ্বর তার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী কথা ?'

'ফাদার ডিকিনসনের পুরুলিয়ার অরফ্যানেজ থেকে কাউকে কিছু না বলে ছেলেবেলায় পালিয়ে গিয়েছিলেন কেন ?'

'মা-বাবার খোঁজে। ব্যাস্টার্ড হয়ে অনাথ আশ্রমে থাকতে আমার ভালো লাগছিল না। ওয়ার্ল্ডে আমার কোন পরিচয় নেই, এটা ভাবতে দম আটকে আসছিল।'

'তারপর ?'

পরমেশ্বর লক্ষ্য করেছে, পুলিস-টুলিসরা যেভাবে খুঁচিয়ে জেরা করে করে ক্রিমিনালের স্টমাকের ভেতর থেকে রীয়েল খবর বার করে, হেমার

অ্যাটিচুড অন্তত সে রকম নয়। তার চোখেমুখে অদ্ভুত ধরনের এক সিমপ্যাথি। পরমেশ্বর বলছে, 'তারপর আর কী। মানুষ নামে এক টাইপের অ্যানিমালের ওয়ার্ল্ডে ঘুরে ঘুরে মা-বাবাকে বার করতে পারি নি। তবে দুনিয়ার বেস্ট হারামীদের খোঁজ পেয়ে গেছি। তাদের কেউ নোট-জাল দলিল-জাল পাসপোর্ট-জালে এক্সপার্ট, কেউ ব্যাঙ্ক রবারি-হাইওয়ে রবারিতে মাস্টার। কেউ মেক-আপের ব্যাপারে, কেউ ম্যাজিকে, কেউ হাত সাফাইয়ে, কেউ বা যে-কোন লকার বা তালা খোলায় ওস্তাদ। এই শাহানশা মালেদের কাছে অ্যাপ্রেন্টিস খেটে খেটে ছোটবেলাটা কেটে গেছে।'

'তারপর?'

'তারপর আমি কী হয়ে দাঁড়িয়েছি সেটা আমার চাইতে আপনি ঢের ভালো জানেন। তাই না?'

কখনও হেমা এসে বলে, 'আচ্ছা, যেদিন নিজের পরিচয় জানতে পারবেন সেদিন কী করবেন?'

পরমেশ্বর বলে, 'বাংলা মালের বদলে সেদিন হোলডে হুইস্কি খাব আর পর পর ক'রাত রীয়েল ঘুম ঘুমবো। কতকাল যে আমি ঘুমোতে পারি নি।'

কোনদিন হেমা বলে, 'আচ্ছা, নিজের আইডেন্টিটি জানার পর হঠাৎ যদি ছেলেবেলার কোন বন্ধু-টন্ধুকে পেয়ে যান কীরকম লাগবে?'

পরমেশ্বর বলে, 'ভালোই লাগবে। তবে বয়ফ্রেন্ডের চাইতে ছেলেবেলার গার্ল ফ্রেন্ডদের কাউকে পেলে আরো বেশি ভালো লাগবে। সেটা একটা টেরিফিক এক্সপীরিয়েন্স হয়, না কি বলেন?'

হেমা কিছু না বলে হাসতে থাকে।

অবশ্য পার্সোনাল ব্যাপার নিয়েই তাদের কথাবার্তা হয় না, সোমেশ্বরের টপিকটা বার বার ঘুরে ঘুরে আসে।

আজ দুপুরে হেমা বা পরমেশ্বর কেউ তাদের অফিসে যায় নি। পরমেশ্বরের ফ্ল্যাটে মুখোমুখি বসে তারা চুটিয়ে আড্ডা দিয়ে যাচ্ছিল। খানিকক্ষণ এলোমেলো গল্পের পর হেমা বলল, 'সোমেশ্বর মল্লিকের ব্যাপারটা আর দেরি করা যাবে না।'

পরমেশ্বর বলল, 'মিস্টার চ্যাটার্জি মানে সর্বেশ্বর সেনের মার্ডারকেসটা যিনি ইনভেস্টিগেট করছেন তিনিও সেই একই কথা বলছেন। যাদের হাত দিয়ে সর্বেশ্বর সেনকে খুন করানো হয়েছিল সেই মার্ডারার দুটোকে জলপাইগুড়ি থেকে ধরে আনা হয়েছে। এবার তাঁর ইচ্ছা সোমেশ্বর মল্লিককে অ্যারেস্ট করবেন। কিন্তু—'

'কিন্তু কী ?' হেমা স্ট্রেট পরমেশ্বরের দিকে তাকাল।

পরমেশ্বর বলল, 'স্রেফ একটা মামুলি খুনে সোমেশ্বর মল্লিককে ফাঁসানো ঠিক হবে না। ও একটা ইণ্টারন্যাশনাল ক্লাসের হারামী ; সুপার ক্রিমিন্যাল। ওকে চারদিক থেকে আরো বড় বড় কেসে ফাঁসাতে হবে।' একটু থেমে আবার শুরু করল, 'সর্বেশ্বর সেনের ব্যাপারটা ঠিক আছে। কিন্তু মার্ডার কেস চালাতে কয়েক বছর কেটে যাবে। ডেফিনিটলি ঐ মাকড়া বেস্ট ব্যারিস্টার লাগিয়ে জামিনে ফ্রী হয়ে ঘুরে বেড়াবে। মার্ডার কেসের কী কম ফ্যাকড়া ? লোয়ার কোর্ট থেকে হায়ার কোর্ট, সেখান থেকে হাই কোর্ট, হাই কোর্ট থেকে সুপ্রীম কোর্ট—এভাবে গাড়ি শলা চলতেই থাকবে, চলতেই থাকবে। তার চাইতে খজড়াটাকে বিগ কিছুতে ঝুলিয়ে দেওয়া দরকার।'

হেমা খানিকক্ষণ ভেবে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন।'

'তা হলে একটা কাজ করুন—'

'কী ?'

'আমার ওপর যদি আপনার ভরসা থাকে পুলিসের হাই লেভেলে একটু ইনফ্লুয়েন্স খাটান।'

'নিশ্চয়ই বিশ্বাস আছে। কিন্তু কী ব্যাপারে ইনফ্লুয়েন্স খাটাব ?'

'মণিমোহন চ্যাটার্জি যাতে সোমেশ্বর মল্লিককে এক্ষুণি অ্যারেস্ট না করেন সে ব্যবস্থাটা কাইণ্ডলি করুন। ডকুমেণ্ট আর উইটনেস সবই তো হাতের কাছে রয়েছে। যখন ইচ্ছা ওকে কব্জা করা যাবে। তার আগে আমি একটু দেখতে চাই।'

'অল রাইট ; আপনি যা বললেন তাই হবে।'

মজাদার একটু হেসে পরমেশ্বর বলল, 'মল্লিকের ব্যাপারে আমার খারাপ কোন মতলব নেই ম্যাডাম। টোয়েণ্টি ফোর আওয়ার্স আপনি তো আমার ওপর ওয়াচ রাখছেন। খারাপ কিছু সিগন্যাল পেলে সোমেশ্বর মল্লিকের সঙ্গে আমাকেও অ্যারেস্ট করে গারদে পুরতে পারবেন।'

হেমা কিছু বলল না ; স্লাইট হাসল শুধু।

পরমেশ্বর আবার কী বলতে যাচ্ছিল সেইসময় ফোন বেজে উঠল। টেলিফোনটা তুলে 'হ্যালো' বলতেই সোমেশ্বর মল্লিকের গলা ভেসে এল, 'আরে তুমি ফ্ল্যাটেই রয়েছ ! অফিসে ফোন করে শুনলাম তুমি আসো নি ; তাই ফ্ল্যাটে করলাম। এনিওয়ে তোমাকে ধরতে পেরেছি তাতেই আমি খুশী।'

এই মুহূর্তে সোমেশ্বরের ফোন আশা করে নি পরমেশ্বর। মাকড়ার কী ধান্দা কে জানে ! নিজের নার্ভগুলোকে দারুণ সতর্ক রেখে সে বলল, 'স্যার, শরীরটা আজ ভালো লাগছে না, তাই অফিসে যাই নি।'

'এনিথিং সীরিয়াস ?'

পরমেশ্বর ভাবল, তার শরীরের জন্য খজড়াটার যেন ঘুম আসছে না। সে বলল, 'না স্যার, তেমন কিছু না।'

'যাক, বাঁচালে।' সোমেশ্বর বলতে লাগলেন, 'এবার একটা কাজের কথা শোন। তোমার অনারে একটা পার্টি দেব ঠিক করেছি—'

'হঠাৎ স্যার ?'

'হঠাৎ কোথায়। সেদিন তোমাকে বললাম না! তুমি অত বড় একটা সাকসেসফুল অপারেশন করলে। আমার দিক থেকে কিছু একটা না করলে কি ভালো দেখায়, না আমারই ভালো লাগে। একটা বিরাট ফাইভ স্টার হোটেলের নাম করে সোমেশ্বর বললেন, 'কাল ওখানে ব্যাঙ্কোয়েট হল নাম্বার ফাইভে পার্টি। অ্যাট শার্প সেভেন পি-এম। নিশ্চয়ই চলে আসবে।'

পরমেশ্বর বলল, 'কিন্তু স্যার—'

'কোন কিন্তু নয়।' বলেই ঝড়াং করে লাইন কেটে দিলেন সোমেশ্বর।

ফোনটা আস্তে আস্তে ক্রেডেলে নামিয়ে রাখতে রাখতে পরমেশ্বর হেমার দিকে তাকাল, 'খচ্চরটা আমার জন্য দুম করে একটা পার্টি দিতে যাচ্ছে কেন বলুন তো ?'

ফোনে পরমেশ্বরের কথাবার্তা শুনে হেমা বুঝতে পারছিল সে কার সঙ্গে কী ব্যাপারে কথা বলছে। হেমা বলল, 'পার্টিতে গিয়ে দেখুন লোকটার কী মতলব ?'

পরমেশ্বর ঘাড় কাত করল। কাল পার্টিতে যাওয়া ঠিক করে ফেলেছে সে।

পরমেশ্বরের সঙ্গে কথা হওয়ার কয়েক ঘণ্টা বাদে সোমেশ্বরের সঙ্গে টেলিফোনে এক্সের কথা হল। সোমেশ্বর যে ফোন নাম্বারটা সেদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গার্ডেনে বসে এক্সকে দিয়েছিলেন সেই নাম্বারে রোজ রাত সাতটা থেকে আটটার ভেতর একবার করে ফোন করে সে। যদি জরুরী কিছু জানার থাকে, সেই জন্যই এই ফোন।

সোমেশ্বর যে ফাইভ স্টার হোটেলটার কথা পরমেশ্বরকে বলেছিলেন সেটার নাম করেই এক্সকে বললেন, 'কাল সাতটায় ব্যাঙ্কোয়েট হল নাম্বার ফাইভে পার্টি আছে। সেখানে আপনার একজন টার্গেট মিস্টার পরমেশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। কিন্তু—'

এক্সের গলা ভেসে এল, 'বলুন—'

'আপনার চেহারা পরমেশ্বরের পক্ষে চিনে রাখা ঠিক হবে না।'

'ডোণ্ট ওরি। কাল আমি হবো এমিরিটাস অফ আরবের একজন শেখ, নাম আল আহাদ সিরাজি। নামটা মনে রাখবেন।'

'একসেলেণ্ট!' খুশিতে প্রায় তিন ফুট লাফিয়ে উঠলেন সোমেশ্বর। টের পাওয়া যাচ্ছে এক্স লোকটা দুর্দান্ত হুঁশিয়ার এবং পাক্কা প্রফেসানাল। তার টার্গেটের সঙ্গে দেখা করার সময় যে অন্য মেক-আপে আসা দরকার সেটা সে জানে। সোমেশ্বর বললেন, 'নাম নিশ্চয়ই মনে থাকবে—আল আহাদ সিরাজি।'

আর কোন কথা হবার আগেই লাইন কেটে গেল।



পরের দিন রাত সাতটায় সেণ্ট্রাল ক্যালকাটার এক ফাইভ-স্টার হোটেলের পাঁচ নম্বর ব্যাঙ্কোয়েট হলে কাঁটায় কাঁটায় সাতটাতেই পরমেশ্বর এসে ঢুকল।

টেরিফিক টেরিফিক চেহারার সব মেয়েমানুষ নানা টাইপের ম্যাক্সি, মিনি স্কার্ট, শাড়ি, বেলবট্স পরে হুইস্কির বোতল নিয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ব্রিটিশ, স্কচ, জাপানী, আমেরিকান, চেক, পোলিশ, রাশিয়ান এবং রিপাবলিক অফ দি ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সবগুলো প্রভিন্সের চুস্ত-পরা, স্যুট-পরা, সাউথ ইণ্ডিয়ান লুঙ্গি-পরা, গোঁফওলা, দাড়িওলা, দাড়িহীন, গোঁফহীন মোটা রোগা বেঁটে ঘাড়ে-গর্দানে-ঠাসা, ঢ্যাঙা, নানা সাইজের নানা হাইটের অজস্র মাল এখানে জমা হয়েছে। তাদের সবার হাতে এর মধ্যেই হুইস্কির গেলাস চড়ে গেছে।

পার্টিতে একটা নতুন কারবার করে বসে আছেন সোমেশ্বর। একধারে কাওয়ালীর আসর বসিয়ে দিয়েছেন। দুই কাওয়ালী পার্টি মুখোমুখি বসেছে। একটা পার্টি পুরুষদের, তাদের বিরুদ্ধ পার্টি হলো মেয়েমানুষের। দুই কাওয়ালী দলের লিডার দেখবার মতো। পুরুষটা যেন একখানা হরিয়ানা ব্রীডের দুর্ধর্ষ ষাঁড়, শালার গায়ে কম করে দেড়শো কেজি চর্বি আর দুশো কেজি মাংস রয়েছে। মেহেদি মাখানো লালচে দাড়ি, চোখ দুটো যেন বিগ সাইজের পান্তুয়া, দশ নম্বর কড়াইয়ের মতো মাথা, কম করে গোটা বারো দাঁত সোনা বাঁধানো। পরনে চুস্ত আর লক্ষ্ণৌয়ের কাজ করা পাঞ্জাবি, গলায় সোনার মফচেন। পাশে রুপোর ঢাউস পানের ডিবে, জর্দার কৌটো, আতরের শিশি আর পিকদানি।

হরিয়ানা ষাঁড়টার পেছনে তার গণ্ডা গণ্ডা শাগরেদ, দোহার আর নানা টাইপের মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেণ্ট বাজাবার পার্টি।

অপনেণ্ট পার্টির মেয়েমানুষটিও টেরিফিক। গায়ে তারও চর্বি আর মাংস প্রচুর কোয়ান্টিটিতে রয়েছে। গায়ের রং ময়দার মতো সাদা। গোল মুখ, সুর্মা টানা বড় বড় চোখ বেশ লালচে। টের পাওয়া যায়, মেয়েমানুষটি বিলিতি মাল অর্থাৎ হুইস্কি-ফুইস্কি ভালোই টেনে থাকে। রেজাল্ট হিসেবে তার চোখের তলায় এবং গলায় চর্বির থাক জমেছে। তার মেক-আপের বেশ রেলা আছে। পরনে ডগডগে লাল সিল্কের গারারা, হাতে হীরের ব্রেসলেট, গলায় হীরের নেকলেশ, কানে হীরের কানপাশা এবং নাকে হীরের নাকফুল। পায়ের আঙুলে সোনার চুটকী। মেয়েমানুষটির সারা গায়ে শালা হীরে আর সোনার একজিবিসন। তার পাশেও ফিলিগ্রির কাজ করা রুপোর ঢাউস পানের কৌটো আর পিকদানি।

হরিয়ানা ষাঁড়ের মতো গাইয়েটার পেছনে যেমন গণ্ডা গণ্ডা শাগরেদ আর মিউজিক্যাল হ্যাণ্ড, মেয়েমানুষটার পেছনেও তেমনি শাগরেদ আর মিউজিক্যাল হ্যাণ্ডরা বসে আছে। মেয়েমানুষটার শাগরেদ গাইয়েরা সবাই মেয়েমানুষ, তবে মিউজিক্যাল হ্যাণ্ডরা সকলে পুরুষ।

গান এখনও স্টার্ট করে নি। টেরিফিক মাতাদোররা যেভাবে চোখের কোণে কান্নিক মেরে মেরে দুর্ধর্ষ ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের দিকে তাকায় তেমনি পান চিবুতে চিবুতে মেয়েমানুষ আর পুরুষ কাওয়ালী গাইয়ে দুটো একজন আরেকজনকে সার্ভে করে চলেছে।

যাই হোক, সোমেশ্বর মল্লিক আর তার পোকায় খাওয়া চেহারার সিক্রেট এজেণ্ট নটবর নন্দীকেও এই হিউজ ইণ্টারন্যাশনাল গ্যাদারিং-এ দেখা গেল। সোমেশ্বরও তাকে দেখতে পেয়েছিলেন। ভিড়ের ভেতর দিয়ে টর্পেডোর মতো রাস্তা করে করে তিনি এক রকম দৌড়ে কাছে চলে এলেন। পরমেশ্বরের হাত ধরে ব্যাঙ্কোয়েট হলের মাঝখানে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'এসো এসো এসো। তোমার জন্যে সবাই ওয়েট করছেন।' বলেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গেস্টদের উদ্দেশে বললেন, 'ইনি মিস্টার পরমেশ্বর—এঁরই অনারে আজ এই পার্টি। ইনি আমার ফ্রেণ্ড, ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড। আমার ইণ্ডাস্ট্রির ডেভলপমেণ্টে এঁর কনট্রিবিউসানের তুলনা নেই। ফিউচারের সব বাধাও ইনি দূর করে দিয়েছেন। আমি এঁর কাছে হোল লাইফ গ্রেটফুল হয়ে থাকবো।'

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে চড়বড় করে হাততালির আওয়াজ উঠল।

পরমেশ্বর মনে মনে বলল, 'শলা পাম্প করে আমাকে ফুলিয়ে যাচ্ছে। ফোলাও মাকড়া, ফুলিয়ে যাও।' তবে সারা মুখে বিনয়ের মাখন লাগিয়ে বলল, 'কোথায় স্যার সোমেশ্বর মল্লিক আর কোথায় আমি। স্যারের পায়ের জুতোর ফিতে বাঁধার এফিসিয়েন্সি আমার নেই।'

সোমেশ্বর বললেন, 'ও'র কথা শুনবেন না। পরমেশ্বরের মতো জিনিয়াস ওয়ার্ল্ডে খুব বেশি জন্মায় নি।'

এর পর খানিকক্ষণ দু'জনে দু'জনকে প্রচুর মোবিল লাগাবার পর সোমেশ্বর বললেন, 'এবার পরমেশ্বরের হেলথ ড্রিঙ্ক করা যাক—'

ব্যাঙ্কোয়েট হলের চারদিক থেকে কোরাসে চিৎকার উঠল, 'সিওর সিওর—'

সোমেশ্বর একটা বেয়ারাকে ডেকে বললেন, 'পরমেশ্বর সাবকো লিয়ে স্পেশাল ড্রিঙ্ক লাও—'

আগেই অ্যারেঞ্জমেণ্ট করে রাখা হয়েছিল। বেয়ারাটা দৌড়ে গিয়ে নকশা-করা একটা চমৎকার মাটির গেলাসে বাংলা মাল নিয়ে এল।

সবাই চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কী! এ কী! আমরা হুইস্কি খাব আর উনি—'

সোমেশ্বর হাত তুলে সবাইকে থামাতে থামাতে বললেন, 'মিস্টার পরমেশ্বর একজন পারফেক্ট প্যাট্রিয়ট ; উনি ফরেন জিনিস টাচ করেন না।'

ইণ্ডিয়ানরা চিৎকার করে উঠল, 'যাঁর অনারে এই পার্টি তিনিই যখন কাণ্ট্রি-লিকার খাচ্ছেন, আমরাও তাই খাব। এক দিনের জন্যে আমরাও দেশপ্রেমিক হব।'

যারা নন-ইণ্ডিয়ান তারাও চেঁচিয়ে জানালেন, ভারতীয়দের এ জাতীয় দেশপ্রেমে তাঁরা মুগ্ধ। ইণ্ডিয়ানদের অনারে তাঁরা আজ হুইস্কির বদলে সোনার বাংলা খাবেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল, বাঙালী, বিহারী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, ইংরেজ, আমেরিকান, রুশী, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান—সবার হাতে হাতে মাটির ভাঁড়ে আগমার্কা বিশুদ্ধ ধান্যেশ্বরী।

সবাই ভাঁড়গুলো ওপরে তুলে পরমেশ্বরের স্বাস্থ্যের উদ্দেশে বলল, 'চীয়ার্স।'

তারপর ড্রিঙ্ক সেসান চলতে লাগল। কারো হাতের ভাঁড় ফাঁকা হলেই বেয়ারারা সোনার বাংলা দিয়ে বোঝাই করে দিচ্ছে। তাছাড়া ট্রে-তে ফিশ ফিঙ্গার, চীজ-চিকেন, কাবাব, ফ্রায়েড প্রন, পটেটো চিপস ইত্যাদি চাট নিয়েও তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এই ড্রিঙ্ক সেসানের মধ্যেই পরমেশ্বরকে নিয়ে সবার কাছে গিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন সোমেশ্বর, 'ইনি মিস্টার সিং, ইনি মিসেস রঙ্গনেকার, ইনি মিস্টার মার্চেণ্ট, ইনি মিস্টার নভোস্কি, ইনি মিসেস দস্তুর, ইনি মিস্টার টপলিন—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘুরতে ঘুরতে বিরাট জোব্বাজুব্বাপরা এক আরবের সামনে এসে

দাঁড়ালেন সোমেশ্বর। বললেন, 'পরমেশ্বর—মীট মাই ফ্রেন্ড মিস্টার আল আহাদ সিরাজী। হী ইজ এ শেখ ফ্রম আরব এমিরিটাস।'

সিরাজী হাত বাড়িয়ে বলল, 'হ্যাল্লো—'

তার শরীরের নাইনটি এইট পারসেণ্টই বিরাট আলখাল্লায় ঢাকা। শুধু মুখের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। সেই মুখেও ঘন দাড়ি। তবে চোখ দুটো তার নীলচে আর অদ্ভুত ধারালো। পরমেশ্বর তার হাতটা ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'হ্যাল্লো—'

'গ্ল্যাড টু মীট ইউ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

'আপনার কথা মিস্টার মল্লিকের কাছে অনেক শুনেছি। আপনার মতো জিনিয়াস তিনি নাকি আগে আর কখনও দ্যাখেন নি।'

হাতটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে পরমেশ্বর বলল, 'উনি আমাকে টেরিফিক ভালোবাসেন। তাই ওরকম বলেন।'

'তাই বুঝি!' আরবের মাকড়াটি হাসল। তারপর বলল, 'আশা করি, আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।'

'সিওর। কবে দেখা করব বলুন—'

'আপনার দেখা করতে হবে না, আমিই দেখা করব। এবং খুব শীগগিরই। আপত্তি নেই তো?'

'আপত্তি! ইটস এ প্লেজার।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

সোমেশ্বর সিরাজীকে পেছনে রেখে পরমেশ্বরকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। এখনও অনেক গেস্টের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করানো বাকী রয়েছে।

আলাপ-টালাপের মধ্যেই কাওয়ালী শুরু হয়ে গেল। সবার সঙ্গে ইনট্রোডিউসড হতে হতে কিংবা কাওয়ালী শুনতে শুনতে যতবারই ঘাড় ফেরাচ্ছে ততবারই পরমেশ্বর দেখতে পাচ্ছে ব্যাঙ্কোয়েট হলের এ কোণ বা সে কোণ থেকে আরবী মাকড়াটা নীলচে চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

পরমেশ্বর মনে মনে দু-চারটে বাছা বাছা খিস্তি দিয়ে বলল 'শলা, আমি কি মেয়েমানুষ যে চোখের ওপর ড্রপ সীন না ফেলে তাকিয়ে আছিস! এই হলে কত টেরিফিক চেহারার সব ছুকরী বডির সেভেণ্টি পারসেণ্ট ফাঁকা রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাকড়া তাদের দ্যাখ না।'

কাওয়ালীর পর ডিনার শেষ হতে হতে রাত একটা বেজে গেল। ব্যাঙ্কোয়েট হল থেকে আরো অনেকের সঙ্গে বেরুবার সময় দেখা গেল সিরাজী পরমেশ্বরের সঙ্গে লিফটে করে গ্রাউণ্ড ফ্লোর পর্যন্ত এল।

পরমেশ্বর তার লিমুজিন নিয়ে এসেছিল। সিরাজীর একটা ইমপোর্টেড কারও পার্কিং বে'তে সামনের দিকে ছিল। সিরাজীকে দেখামাত্র তার ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে সামনে চলে এল। সিরাজী পরমেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'লিফট দেবার দরকার আছে ?'

পরমেশ্বর বলল, 'নো, থ্যাঙ্কস। আমিও গাড়ি নিয়ে এসেছি।'

লিমুজিনে উঠে দরজা বন্ধ করতে করতে সিরাজী বলল, 'ইটস নাইস মীটিং—'

পরমেশ্বর বলল, 'সেম টু মী।'

'শীগগিরই দেখা হচ্ছে কিন্তু—'

'নিশ্চয়ই।'

সিরাজীর গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চলে গেল।



আরো দুটো দিন কেটে গেছে। এর মধ্যে পুলিসের হায়ার অথরিটিকে ধরে সর্বেশ্বর সেনের মার্ডারের ব্যাপারে সোমেশ্বর মল্লিকের অ্যারেস্টটা কিছু-দিনের জন্য পিছিয়ে দিয়েছে হেমা। পুলিস অথরিটি মণিমোহন চ্যাটার্জিকে আপাতত চুপচাপ থাকতে বলেছেন।

কিন্তু সোমেশ্বর মল্লিককে কীভাবে চারদিক থেকে ফাঁসানো যায় সেটা এখনও প্ল্যান করে উঠতে পারে নি পরমেশ্বর। এই ব্যাপারটা নিয়ে উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, ড্রিঙ্ক করতে কি বাথরুমে যেতে—অটোমেটিক অ্যাকসানের মতো তার মাথায় অনবরত ভাবনা চলছে।

আজ দুপুরে নিজের অফিস থেকে দুম করে বেরিয়ে পড়েছিল পরমেশ্বর। সোমেশ্বরের ব্যাপারটা বেশিদিন আর ঝুলিয়ে রাখা ঠিক হবে না। কোন দিক থেকে এগুলে সোমেশ্বরকে ফিনিশ করে দেওয়া যায়—চিন্তা করতে করতে অন্যমনস্কর মতো রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল সে।

কতক্ষণ হেঁটেছিল হুঁশ নেই। আচমকা একসময় পরমেশ্বরের খেয়াল হল, বিকেল হয়ে গেছে আর সে ইলিয়ট রোডের কাছাকাছি এসে পড়েছে। ফিরতে গিয়ে আচমকা তার মনে পড়ে গেল, আরে এখানেই তো মেণ্ডেজের ফ্ল্যাট। অমিতাভর প্ল্যাণ্ট ওড়াবার পর মেণ্ডেজকে জানিয়ে যাওয়া উচিত ছিল তার হাতে রীয়েল ম্যাজিক রয়েছে। শলা এমন টাইম বম্ব পয়দা করে দিয়েছিল যা 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজে'র দু দুটো ফ্যাক্টরির হাফ হাফ একেবারে ভ্যানিশ করে দিয়েছে। শুধু এ খবরটা জানানোই না, তাকে থ্যাঙ্কস আর বম্বের দামটা দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হাজার ঝামেলায় তার সঙ্গে দেখা করার কথা মনেই হয়নি। ভাবল, আজ যখন ইলিয়ট রোড পর্যন্ত এসেই পড়েছে তখন মেণ্ডেজের সঙ্গে দেখাটা করেই যাবে।

জিলিপির প্যাঁচের মতো গলির-পর-গলি পেরিয়ে মেণ্ডেজদের পুরনো লঝঝড় মার্কা বাড়িতে এসে ঢুকল পরমেশ্বর। তারপর কাঠের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল। দোতলা পর্যন্ত ওঠার পর সে দেখতে পেল ওপর থেকে একটা চৌত্রিশ বছরের শক্ত মজবুত চেহারার লোক, পরনে টাইট ট্রাউজার্স আর জ্যাকেট, নেমে আসছে। তার হাতে এস্রাজের খাপের মতো একটা বাক্স ঝোলানো রয়েছে।

মুখোমুখি এসে লোকটা তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ড তার দিকে তাকিয়ে থেকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে নেমে গেল।

লোকটা যখন তাকিয়ে ছিল তখন পরমেশ্বর মার্ক করেছে তার চোখদুটো নীলচে। এইরকম একজোড়া চোখ কোথায় যেন আগেই সে দেখেছিল, এই মোমেণ্টে কিছুতেই তা মনে করতে পারল না। তবু নিজের অজান্তেই যেন পায়ে পায়ে সিঁড়ি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে নিচে নেমে এল পরমেশ্বর। কিন্তু না, প্যাঁচানো গলির ডাইনে বা বাঁয়ে কোথাও লোকটাকে দেখা গেল না। দু-তিন মিনিটের ভেতর লোকটা স্রেফ হাওয়ায় ভ্যানিশ হয়ে গেছে।

পরমেশ্বর আবার বাড়ির ভেতর ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। থার্ড ফ্লোরে এসে কলিং বেল টিপতেই মেণ্ডেজ দরজা খুলে তাকে দেখেই খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'হাই গডফাদার, এসো এসো—' বলে দু হাতে পরমেশ্বরকে জড়িয়ে ধরে ভেতরে নিয়ে গেল।

সাজানো গোছানো ড্রইংরুমে মুখোমুখি পরমেশ্বরকে বসিয়ে মেণ্ডেজ ফের বলল, 'ব্ল্যাডি হেল, তুমি সেদিন বলে গিয়েছিলে খুব তাড়াতাড়ি একদিন আসবে। গড ড্যাম ইট, তাড়াতাড়ির নাম করে পনের দিন কাটিয়ে দিলে।'

পরমেশ্বর বলল, 'শলা হাজারটা ঝামেলায় ফেঁসে ছিলাম। তাই আসতে পারি নি।'

'সান অফ এ বীচ, সব সময়ই তোমার ঝামেলা। তারপর বল, দুখানা টাইম বম্ব যে বানিয়ে দিলাম তাতে কাজ হয়েছে?'

'কাজ হয়েছে মানে! দু দুটো ফ্যাক্টরি ভ্যানিশ হয়ে গেছে। তোমার হাতদুটো শলা গোল্ড-ফোল্ড দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে হবে।'

'গড ড্যাম ইট, এ খবরটা আমাকে দাও নি! আর আমি ব্লাডি হেল রোজ ভাবছি, যা মাল বানিয়ে দিলাম তাতে গডফাদারের কাজ হলো কিনা!'

মুখটা কাচুমাচু করে পরমেশ্বর বলল, 'রীয়েলি, খুব খারাপ হয়ে গেছে। তোমাকে খবরটা দেওয়া উচিত ছিল। স্যরি, ভেরি স্যরি—'

তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার মতো করে মেণ্ডেজ বলল, 'ফরগেট ইট গড-ফাদার।' তারপরেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, লিসি লিসি, কাম অন ডার্লিং—ফাদার এসেছে।'

একটু পর শুধু লিসিই এল না, ট্রেতে করে পরমেশ্বরের জন্য ধান্যেশ্বরী আর মেণ্ডেজের জন্য হুইস্কি এবং অজস্র মাংসের প্রিপারেসন নিয়ে এল সে। ড্রিংক আর খাবার-দাবার সার্ভ করতে করতে দেরি করে আসার জন্য লিসিও মেণ্ডেজের মতো মজা করে পরমেশ্বরকে চার্জ করল।

পরমেশ্বর দাঁত বার করে হাসতে হাসতে ঘাড় চুলকোতে লাগল। বলল, 'এবার থেকে রেগুলার দু দিন পর পর তোমাদের এখানে আসব। ও-কে?' সে জানে মেণ্ডেজ আর লিসি যে টাইপেরই মাল হোক, তাকে খুব পছন্দ করে।

লিসি বলল, 'তুমি আগেও অনেক বার প্রমিস করেছ।'

'এবার প্রমিসটা ঠিক রাখব।'

'দেখা যাবে।'

খানিকটা পর খেতে খেতে পরমেশ্বর মেণ্ডেজকে বলল, 'এবার প্রাইসটা বল—'

পরমেশ্বরের কথা ঠিক বুঝতে না পেরে মেণ্ডেজ জিজ্ঞেস করল, 'কিসের প্রাইস গডফাদার?'

'তোমার টাইম বম্ব দুটোর।'

'ড্যাম ইট! ব্লাডি হেল, তোমার কাছ থেকে আমি দাম নেব!'

'আফটার অল, এটা তোমার প্রফেসান।'

'সান অফ এ বীচ, সেদিন তোমাকে বলে দিয়েছিলাম প্রাইসের কথা বলবে না। তুমি আমার জন্যে কী করেছ, আমি ভুলে গেছি! আমার ফাদার আমাকে জন্ম দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তুমি আমার রীয়েল ফাদার। তুমি আমাকে না বাঁচালে এতদিনে কবে ফাঁসিতে চড়তে হতো।'

'অল রাইট, অল রাইট, প্রাইসের কথা আর বলছি না।'

পরমেশ্বর মেণ্ডেজদের সঙ্গে কথা বলছিল ঠিকই কিন্তু ভেতরে ভেতরে নীল চোখওলা লোকটার কথা অনবরত ভেবে যাচ্ছিল। আচমকা সে জিজ্ঞেস করে বসল, 'আচ্ছা মেণ্ডেজ, আমি তোমার এখানে ঢোকার আগে সিঁড়িতে একটা ব্লু-আইড লোকের সঙ্গে দেখা হল। তার হাতে এস্রাজের খাপের মতো একটা বাক্স। এই বাড়িটায় তুমি ছাড়া আর তো কেউ থাকে না। মাকড়াটা কি তোমার কাছেই এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কে ও?'

'নাম-ফাম জানি না। দিন তিনেক আগে আমার জানাশোনা একটা লোকের নাম করে এসেছিল। সান অফ বীচটা আমাকে পীকুলিয়ার একটা 'গান' (gun) বানাবার অর্ডার দিয়ে গেল। আজই মালটা ডেলিভারি দিলাম। 'গান'টার জন্যে আন-এক্সপেক্টেড প্রাইস দিয়েছে। মনে হচ্ছে সান অফ এ বীচটা একটা টাফ গায়—'

পরমেশ্বরের কৌতূহল হচ্ছিল। সে জিজ্ঞেস করল, 'কী টাইপের বন্দুক ওটা ?'

'ওটাকে তিনটে পার্টে ভাগ করা যায়। ব্যারেলটাকে এস্রাজ কি ম্যাণ্ডোলনের একটা অংশ করতে পার, ট্রিগারটা খুলে নিয়ে কোন ছোট স্যুটকেশ বা অ্যাটাচি কেসের হ্যাণ্ডেল বানাতে পার, কুঁদোটাকে জুতোর হীল হিসেবে ইউজ করা যায়। এইভাবে আলাদা আলাদা ভাগ করে নিয়ে গেলে পুলিসের ফোরটীন জেনারেশনের সাধ্য নেই টের পায়। নিজে একজন এক্সপীরিয়েন্সড ক্রিমিনাল ; তা ছাড়া হোল লাইফ ক্রাইমের ওয়ার্ল্ডেই পড়ে আছি। আমার এক্সপীরিয়েন্স বলে, ঐ সান অফ বীচটা কান্ট্রির বাইরে 'গান'টা নিয়ে কিছু করতে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই কোন রিলিজিয়াস অ্যাকটিভিটি নয়।'

পরমেশ্বর আর কিছু জিজ্ঞেস করল না, সন্ধ্যে পর্যন্ত মেণ্ডেজ আর লিসির সঙ্গে আড্ডা-ফাড্ডা মেরে এবং আরো একবার তাড়াতাড়ি আসার প্রমিস করে উঠে পড়ল।



দিন তিনেক পর নিজের ক্যামাক স্ট্রীটের অফিস থেকে অমিতাভর ফ্যাক্টরি -কাম-অফিস কমপ্লেক্স ঘুরে রাত্রিবেলা ফ্ল্যাটে ফিরে পরমেশ্বর দেখল, হেমা বসে আছে। তাকে দেখেই হেমা উঠে দাঁড়াল। কবজি উলটে ঘড়ি দেখতে দেখতে চোখ গোল করে বলল, 'ও গড, আটটা পঁয়তাল্লিশ। আধ ঘণ্টা আপনার জন্যে বসে আছি। আরেকটুকু হলে প্রোগ্রামটার বারোটা বেজে যেত!'

'কী ব্যাপার?' পরমেশ্বর বসতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে সেই চান্স দেওয়া হল না।

হেমা ব্যস্তভাবে বলল, 'নো নো, চলুন আমার সঙ্গে—'

'এক্সট্রীমলি টায়ার্ড, সোফায় বডিটা কয়েক মিনিটের জন্যেও ফেলতে পারব না?'

'নো, আসুন—'

নিচে নেমে দু'জনে হেমার টু'সীটারে উঠতেই হেমা গাড়িতে স্টার্ট দিল। তারপর দারুণ স্পীড তুলে পার্ক স্ট্রীটের দিকে চলল।

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

'সিনেমা দেখতে।' সামনের দিকে চোখ রেখে হেমা বলতে লাগল, 'অনেক দিন ফিল্ম-টিল্ম দেখি না। বিকেল-বেলা দুম করে আপনার আর আমার জন্যে নাইট শোয়ের দুটো টিকিট কেটে ফেললাম। নামকরা ফরেন ছবি—সাত-আটটা অসকার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে।'

পরমেশ্বর খানিকক্ষণ থ হয়ে রইল। তারপর বলল, 'কোন টপ সি-বি-আই অফিসার আমার মতো মালকে সিনেমা দেখায়, আগে আর কখনও শুনিনি।'

হেমা হাসল, উত্তর দিল না।

পরমেশ্বর কী ভেবে আবার বলল, 'একটা কথা শুনবেন ম্যাডাম?'

হেমা বলল, 'গ্ল্যাডলি।'

'আপনার মতো আর কয়েকজন অফিসার থাকলে গভর্নমেণ্ট নীলামে চড়ে যাবে।'

'তাই নাকি!' হেমা রাস্তার দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই বলল।

আরো কয়েক মিনিট পর কার্জন পার্কের ট্রাম টার্মিনাসের গায়ে টু-সীটারটা পার্ক করে পরমেশ্বরকে নিয়ে উলটো দিকের নামকরা একটা সিনেমা হলে যখন ঢুকল, নাইট-শো শুরু হয়ে গেছে।

ছবিটা দেখতে দেখতে দম আটকে যেতে থাকে যেন। পাক্কা সাসপেন্স স্টোরি। দুর্দান্ত সব সিকোয়েন্স একের পর এক পর্দায় ফুটে উঠছে।

চোখের তারা ফিক্সড করে ছবিটা দেখে যাচ্ছিল পরমেশ্বর। তার ডান পাশে হেমা; হেমার চোখ দুটোও পর্দায় আটকে আছে।

আচমকা একটা ব্যাপার ঘটে গেল। ছবি বন্ধ হয়ে পর্দায় স্লাইড ফুটে উঠল। তাতে একটা চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের লোকের ছবি দেখা যাচ্ছে। ছবিটার তলায় ইংরেজিতে লেখা—

'এই লোকটি মারাত্মক ধরনের খুনী। মোট পঁচিশটি হত্যাকাণ্ডের নায়ক। একে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরিয়ে দিতে পারলে কুড়ি হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। কিংবা এর সঠিক সন্ধান দিতে পারলেও ভালোভাবে পুরস্কৃত করা হবে।'

ভালো করে মার্ক করতেই চমকে উঠল পরমেশ্বর। মেণ্ডেজের বাড়ির সিঁড়িতে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেই নীল চোখওলা লোকটার সঙ্গে এর দারুণ মিল। মিল না, নির্ঘাত সেই লোকটা আর পর্দার এই খচ্চরটা, দু'জনেই এক।

দুম করে আরো একটা ব্যাপার ঘটল। পরমেশ্বরদের সামনের 'রো'য়ের এক কোণ থেকে একটা লোক মুখের সেভেনটি পারসেণ্ট রুমালে ঢেকে উঠে দাঁড়াল। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে 'একজিট' সাইন লাগানো একটা দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

পলকের জন্য পরমেশ্বরের মনে হল, লোকটার চোখের তারা দুটো যেন নীলচে। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর লোকটা যে 'একজিটে'র দিকে গেছে ঝড়ের গতিতে সেদিকে ছুটল।

পেছন থেকে হেমা ডাকল, 'কী হল? কোথায় যাচ্ছেন?'

পরমেশ্বর পেছন না ফিরেই বলল, 'এক্ষুণি আসছি।'

এত করেও কিন্তু লোকটাকে ধরা গেল না। দরজা খুলে ততক্ষণে সে বেরিয়ে পড়েছে।

সিনেমা হলের রাস্তার দিকের আর্কেডের সামনে এসে পরমেশ্বর দেখল লোকটা দৌড়ে রাস্তা পেরিয়ে ওপারে গিয়ে একটা মোটর-বাইকে উঠে পড়েছে। খুব সম্ভব বাইকটা ওধারে পার্ক করেই সে সিনেমায় ঢুকেছিল।

রাস্তা পেরুতে গিয়ে থমকে যেতে হল পরমেশ্বরকে। ওধারের ট্র্যাফিক সিগন্যালে গ্রীন সিগনাল জ্বলে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে গাঁক গাঁক করতে করতে ক্ষ্যাপা শুয়োরের মতো গাদা গাদা গাড়ি ছুটে আসতে লাগল। আর সেই গাড়ির স্রোতের মধ্যে পরমেশ্বরের চোখের সামনে সেই মোটর বাইক আর তার নীল চোখওলা সওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

টেরিফিক হতাশ চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার হলের ভেতর যাবার জন্য যখন পরমেশ্বর ঘুরল, দেখতে পেল হেমা পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

হেমা আগের কথাটাই আরেক বার জিজ্ঞেস করল, 'কী হল, ওভাবে উঠে এলেন কেন?' তাকে রীতিমতো উদ্বিগ্ন দেখাল।

পরমেশ্বর বলল, 'জানেন পঁচিশ হাজার টাকা এক্ষুণি হাত থেকে ফস্কে গেল।'

'মানে!'

'সিনেমার স্লাইডে যে মার্ডারারটাকে দেখেছেন সে আমাদের সঙ্গে বসে বসে সিনেমা দেখছিল।'

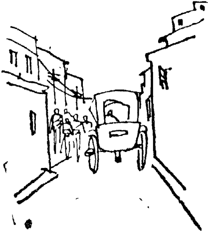
'বলেন কী!' হেমাকে দারুণ উত্তেজিত দেখাল।

'ইয়েস ম্যাডাম।' আস্তে ঘাড় কাত করল পরমেশ্বর, 'স্লাইডটা স্ক্রীনে ফুটে উঠতেই লোকটা মুখে রুমাল চেপে বেরিয়ে আসে। আমি দৌড়ে তাকে ফলো করেছিলাম। কিন্তু মালকে ক্যাচ করা গেল না। শলা হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছে।'

হেমা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এখন আর আপসোস করে কী হবে? চলুন ছবির বাকী পোরসানটা দেখি গিয়ে—'

'নাঃ, এখন আর সিনেমা দেখার মুড নেই। আপনি দেখুন, আমি একটা ট্যাক্সি-ফ্যাক্সি নিয়ে ফ্ল্যাটে চলে যাই।'

হেমা বলল, 'দূর, আপনি চলে গেলে একা একা সিনেমা দেখতে আমারই কি ভাল লাগবে। চলুন, দু'জনেই ফিরে যাই।'



সিনেমা হলের সেই ঘটনাটার পর হেমা আর পরমেশ্বর সোমেশ্বরের ব্যাপারে একদিন কথাবার্তা বলতে বসল।

আপাতত তাদের হাতে সোমেশ্বরের বিরুদ্ধে সর্বেশ্বর সেন আর রণজয় হালদারের মার্ডার কেস দুটোর প্রচুর ডকুমেণ্ট-টকুমেণ্ট রয়েছে। এবং সাক্ষীও। তা ছাড়া আছে সুইশ ব্যাঙ্কের সেই কাগজপত্তরগুলো। এই নিয়েই সোমেশ্বর হারামীকে গেঁথে ফেলা যায়। কিন্তু শুধু এই ক'টা ব্যাপারে ফাঁসাতে হলে সোমেশ্বরকে ঢের আগেই ফাঁসানো যেত।

পরমেশ্বর জানালো, ওষুধের ওয়াগন হাপিস করা আর অমিতাভ সেনের ফ্যাক্টরি ওড়ানোর ব্যাপারেও সোমেশ্বরকে জড়ানো যায়।

হেমা হাসল। বলল, 'তা ডেফিনিটলি যায়। কিন্তু তাতে আপনিও জড়িয়ে যাবেন। ট্রান্সমিটারে আপনার আর সোমেশ্বর মল্লিকের কথাবার্তা ধরে টেপ করে রেখেছি যে।'

পরমেশ্বর বলল, 'ম্যাডাম, এমনিতেই তো ক'দিন পর আপনি আমাকে ফাঁসাবেন। ক'দিন আগেই না হয় সোমেশ্বর মাকড়ার সঙ্গে ফেঁসে যাই।'

'এত তাড়াতাড়ি আপনাকে ফাঁসাবার ইচ্ছা আমার নেই। সোমেশ্বর মল্লিকের ব্যাপারে আর ক'টা দিন দেখা যাক।'

'বেশি দেরি করবেন না ম্যাডাম।'

'না-না, আর এক উইকের ভেতর দ্যাট রাসকেল মাস্ট বী পুট বিহাইণ্ড দা বারস।'

কাজেই সোমেশ্বরের ব্যাপারে কোন ডিসিসান এখন পর্যন্ত নেওয়া সম্ভব হল না।

সোমেশ্বর সম্পর্কে হেমার সঙ্গে ডিসকাসানের পরের দিন সকালে বি. টি.

রোডে তার সেই অরিজিন্যাল অ্যাড্রেসে গেল পরমেশ্বর। টানা মাসখানেক ক্যামাক স্ট্রীটের ক্যামুফ্লেজের অফিস, সার্কুলার রোডের ফ্ল্যাট, অমিতাভ সেন হেমা সারিন, সোমেশ্বর মল্লিক ইত্যাদি ডজন ডজন ঝামেলার ভেতর ভী একঘেয়ে লাগছিল।

সারাটা দিন লোলে, এলিজাবেথ, জোড়া মানকে, টগর, লক্ষ্মী অর্থাৎ তার ইন্টারন্যাশনাল ফ্যামিলি মেম্বারদের সঙ্গে হৈ হৈ করল পরমেশ্বর, একসঙ্গে বসে খেল, এর-তার পেছনে লাগল। তারপর হোল দুপুরে টানা একটা ঘুম দিয়ে সন্ধ্যের আগে আগে উঠে চা খেয়েই চলে আসছিল কিন্তু এলিজাবেথরা কিছুতেই তাকে ছাড়ল না। অগত্যা একেবারে ডিনার সেরে রাত এগারটায় সে সার্কুলার রোডের ফ্ল্যাটে ফিরে এল। আর এসেই একেবারে থ।

ছোটি সিং তাকে দেখামাত্র একেবারে হাউ হাউ করে কান্না জুড়ে দিল। বাড়িতে একসঙ্গে ডজনখানেক লোক মরলেও কেউ এভাবে মড়াকান্না বাধায় না। ছোটি সিংটা হিক্কা তোলার শব্দ করে কাঁদছে আর জড়ানো গলায় সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'মেরা কসুর হো গিয়া সাব, বহোত ভারী কসুর হো গিয়া—'

অনেকক্ষণ ক্রস-একজামিনেসনের পর পরমেশ্বর জানতে পারল, সে বি. টি. রোডে চলে যাবার পরই ছোটি সিং ফ্ল্যাটে তালা ঝুলিয়ে তার ভাই আর ভাবীর কাছে চলে যায়। পরমেশ্বর আসার খানিকক্ষণ আগে সে ফ্ল্যাটে ফিরে দ্যাখে, চারদিকে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। অর্থাৎ চোর ঢুকেছিল ফ্ল্যাটে। কী চুরি হয়েছে সে বলতে পারবে না। তবে সে ফ্ল্যাটে থাকলে চোর জরুর ঢুকতে পারত না। সাহাবকে না জানিয়ে ভাই-ভাবীর কাছে গিয়ে সে ভারী কসুর করে ফেলেছে। সাব যেন মাপ করে দেন। হুজৌর মা-বাপ!

ফ্ল্যাটের বাইরের দিকের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। পরমেশ্বর ভাবল, যদি, চুরি-ফুরি হয়েই থাকে, তাতে তার কী! কিছু গেলে সোমেশ্বর মাকড়ারই যাবে। সে এখানে নিজের বডিটা নিয়েই ঢুকেছিল। এখানকার বাদবাকী সব কিছু সোমেশ্বর মল্লিকের। চোর যদি কিছু হাপিস করে নিয়ে যায় তার কোন লস নেই। কিন্তু এসব কথা ছোটি সিংকে বলা যায় না। পরমেশ্বর তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'অন্দর চল। দেখি চোর কী হাতিয়ে নিয়ে গেছে।'

ভেতরে গিয়ে পরমেশ্বরকে প্রথমে বাথরুমগুলোতে নিয়ে গেল ছোটি সিং, তারপর ড্রইংরুমে, তারও পর বেডরুমগুলোতে।

একটা সাইক্লোন হয়ে যাবার পর যা দাঁড়ায় গোটা ফ্ল্যাটটার অবস্থা

দাঁড়িয়েছে তাই। সোফাগুলো উল্টে পড়ে আছে, ফ্লোরের কার্পেট উপড়ে ফেলা হয়েছে, ওয়ার্ডরোবের ট্রাউজার্স শার্ট টাই-ফাই বার করে চারদিকে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। পর্দাগুলো ছেঁড়া-খোঁড়া। খাটের ফোমের গদি, বালিশ, বেড-কভার, ব্ল্যাঙ্কেট—সব ছড়ানো-ছিটানো।

শেষ পর্যন্ত নিজের বেডরুমে চলে এসেছিল পরমেশ্বর। এখানকার হালও একই। চারদিক দেখতে দেখতে সে জিজ্ঞেস করল, 'চোর কি তালা ভেঙে ঢুকেছিল?'

ছোটি সিং বলল, 'নেহী সাব, দরোয়াজাকা লক বিলকুল ঠিক থা—'

'তবু—' কিছু বলতে গিয়ে আচমকা পরমেশ্বরের চোখের তারা ডান দিকের জানালার কাটা গ্রিলের ওপর আটকে গেল। চোর কোথা দিয়ে 'ইন' করেছিল, এবার তা মালুম পাওয়া গেল। পরের মোমেণ্টে অটোমেটিক কোন মেশিনের মতো তার ঘাড়টা দেওয়ালের আলমারিটার দিকে ঘুরে গেল। আলমারির পাল্লা দুটো হাট করে খোলা; সেটার 'লক' ভেঙে ফেলা হয়েছে।

কম্পিউটারে সেকেণ্ডের মধ্যে যে রকম অ্যাক্টিভিটি দেখা যায় পরমেশ্বরের ব্রেনে অবিকল সেরকম কিছু একটা ঘটে গেল। এই ঘরের জানালার গ্রিল কাটা আছে, এ খবরটা তিন জন ছাড়া আর কেউ জানে না। হেমা সারিন, ছোটি সিং আর সোমেশ্বর মল্লিক। হেমা আর ছোটি সিংকে সন্দেহের বাইরে রাখা যায়। বাকী থাকেন সোমেশ্বর। ডেফিনিটলি ঐ মাকড়াটা লোক সেট করে সুইশ ব্যাঙ্কের সেই সিক্রেট ডকুমেণ্টগুলো হাতিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে।

পরমেশ্বর চোখের কোণ দিয়ে ঝট করে তার খাটের পায়াটার দিকে তাকাল। পায়াটা ঠিকই আছে, মনে হচ্ছে! সোমেশ্বর জানে না, দেয়ালের গোপন সুড়ঙ্গ থেকে বার করে সেই ডকুমেণ্টগুলো খাটের পায়ার ভেতর গর্ত করে পুরে রেখেছিল পরমেশ্বর।

ছোটি সিং তখনও ঘ্যানর ঘ্যানর করে কেঁদে যাচ্ছিল। পরমেশ্বর তার কাঁধে আস্তে আস্তে দু-চারটে চাপড় মেরে বলল, 'কিচ্ছু হয় নি; তুই এখন যা—' আসলে তার উদ্দেশ্য হল, এ ঘর থেকে ছোটি সিংকে ভাগিয়ে খাটের পায়া আর দেয়ালের আলমারিটা একবার দেখে নেওয়া। সোমেশ্বরকে ফ্ল্যাট করে ফেলতে হলে সুইশ ব্যাঙ্কের ঐ ডকুমেণ্টগুলো খুবই দরকার। ঐ অস্ত্রটা কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না।

ছোটি সিং বেরিয়ে গেলে পরমেশ্বর তার বেডরুমের দরজায় ছিটকিনি আটকে প্রথমে আলমারির ভেতরে সেই সিক্রেট দেয়াল আলমারিটার দিকে

তাকাল। ঘরের দেয়াল সরে সিক্রেট আলমারিটা ফাঁক হয়ে আছে। তার মানে যে চোরটা এখানে ঢুকেছিল সে এই আলমারিটার খবর জানে। আলমারিটা দেখতে দেখতে আচমকা সেই পাওয়ারফুল ক্যামেরাটার কথা মনে পড়ে গেল পরমেশ্বরের। সোমেশ্বর মল্লিকের কাছ থেকে ওটা চেয়ে দেয়ালের ভেতর এমনভাবে সেট করে রেখেছিল যাতে কেউ দেয়াল সরালেই তার ছবি উঠে যাবে। ডেফিনিটলি যে মালটি এ ঘরে ঢুকেছিল তার ছবি ক্যামেরায় উঠে গেছে। খুশিতে এবং উত্তেজনায় তার হৃদ্‌পিণ্ড টেরিফিক লাফাতে লাগলো যেন।

এক সেকেণ্ডও আর দেরি করল না পরমেশ্বর; দেয়ালের গোপন খাঁজ থেকে ক্যামেরাটা বার করে এনে দেখল সেটার বোতাম নিচের দিকে নামানো।' এবার ফিল্মটা ডেভলাপ করিয়ে নিলেই হয়; আজ রাত হয়ে গেছে। পরমেশ্বর ভাবল, কাল সকালেই কোন ফোটো ডেভলপারকে স্পেশাল চার্জ দিয়ে আধ ঘণ্টার ভেতর ওটা ডেভলাপ করিয়ে নেবে। আরো একটা ব্যাপার পরমেশ্বর লক্ষ্য করেছে, একটা প্যাকেটে আজেবাজে কিছু কাগজপত্র পুরে সে দেয়ালের ভেতর রেখে দিয়েছিল। চোর প্যাকেটটা নিয়ে চলে গেছে। মনে মনে চুটিয়ে খানিকক্ষণ হেসে নিল সে। এই কাগজগুলো দেখার পর সোমেশ্বরের মুখের চেহারা কেমন হবে তাই ভেবে এই হাসি।

একটু পর ক্যামেরাটা একধারে ডিভানের ওপর রেখে খাটের পায়ার স্ক্রু খুলে পরমেশ্বর দেখল, গর্তের ভেতর সুইশ ব্যাঙ্কের ডকুমেণ্টগুলো ঠিকই রয়েছে। চটপট সেগুলো জায়গামতো রেখে আবাব স্ক্রু আটকে দিল। তারপর মেঝে থেকে ফোমের গদিটা খাটে তুলে চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

শোওয়ামাত্র কিন্তু ঘুম এল না। প্রথমত ক্যামেরা কার ছবি তুলে রেখেছে—সে চেনা না অচেনা, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এই ব্যাপারটা নিয়ে দারুণ এক্সাইটমেন্ট তো রয়েছেই, তার ওপর আরেকটা দুশ্চিন্তাও তার ব্রেনে ঝট করে ঢুকে গেল। সোমেশ্বর যা মাল তাতে বাজে কাগজপত্তর দেখে নিশ্চয়ই বোকা বনে স্ট্যাচুর মতো বসে থাকবেন না। নিশ্চয়ই আবার তাঁর এজেণ্ট পাঠাবেন। একবার খুঁজে পায় নি বলে যে বারবার সোমেশ্বরের এজেণ্টরা ধোঁকা খেয়ে চলে যাবে এমন কোন গ্যারাণ্টি নেই। কাজেই সিক্রেট ডকুমেণ্টগুলো এখান থেকে সরিয়ে ফেলা দরকার। কালই এগুলোর ব্যবস্থা করে ফেলবে সে। ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল পরমেশ্বর।

সকালে ঘুম ভাঙতে ভাঙতে আটটার মতো বেজে গেল। তারপর মিনিট পনেরোর ভেতর মুখ-টুখ ধুয়ে এক কাপ চা খেয়ে সেই ক্যামেরাটা কাঁধে

ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল পরমেশ্বর। প্রথমে সে গেল পার্ক স্ট্রীট চৌরঙ্গীর ফটোগ্রাফারদের দোকানগুলোতে। কিন্তু একটা দোকানও খোলা নেই। আশে-পাশের লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল দশটার আগে ওগুলো খুলবে না। মনে মনে একটা খিস্তি ঝেড়ে নর্থ ক্যালকাটায় চলে এল সে। এখানে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করতেই একটা দোকান খোলা পাওয়া গেল। যা রেট তার ডাবল ধরিয়ে দিতেই দোকানদার বলল, 'হাফ অ্যান আওয়ারের ভেতর করে দিচ্ছি স্যার। অন্য কাজ থাকলে সেরে নিয়ে যাবেন।'

'অন্য কোন কাজ নেই।' পরমেশ্বর বলল, 'আধ ঘণ্টা আমি এখানেই গাড়ি রাখছি।'

পাক্কা আধ ঘণ্টা বাদে একটা খামে পুরে ফোটোটা ডেলিভারি দিল ফোটোর দোকানের লোকটা। ঝট করে এনভেলপটা খুলে ফোটোটা বার করেই টেরিফিক উত্তেজনায় পরমেশ্বরের হার্ট এবং লাংস ফেটে যাবে মনে হল। সিনেমার স্লাইডে যে মার্ডারারটার ছবি দেখা গিয়েছিল, এমন কি মেণ্ডেজদের বাড়ির কাঠের সিঁড়িতে যার সঙ্গে মুখোমুখি প্রায় ধাক্কা লেগেছিল, কুড়ি হাজার টাকা রিওয়ার্ড নিয়ে পুলিস যাকে ধরবার জন্য বসে আছে, ফোটোটা তারই।

সঙ্গে সঙ্গে ব্রেনে ফোর-ফোরটি ভোল্টের বিজলী চমকে গেল যেন। ডেফিনিটলি সোমেশ্বর মাকড়া তার পেছনে এই দুর্ধর্ষ মার্ডারারটাকে ভিড়িয়ে দিয়েছে। খজড়াটা যা মাল আর সিনেমা স্লাইডে তার অ্যাক্টিভিটির যা লিস্ট দেওয়া ছিল তাতে গায়ের সব ক'টা লোম আর মাথার সব ক'টা চুল স্রেফ খাড়া হয়ে যাবার কথা। তবে এটা এখনও পুরোপুরি বোঝা যাচ্ছে না—তাকে মার্ডার করার জন্য না শুধু সুইশ ব্যাঙ্কের সিক্রেট ডকুমেণ্টগুলো হাপিস করার জন্য সোমেশ্বর এই খুনীটাকে সেট করেছেন। যে মতলবেই করে থাকুন, এখন থেকে তাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে।

পরমেশ্বর এক সেকেণ্ডও আর ওয়েট করল না। ফোটোটা এনভেলপ-সুদ্ধু পকেটে পুরে সার্কুলার রোডের অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে ফিরে এল। তবে আগে নিজের ফ্ল্যাটে গেল না। লিফটে করে স্ট্রেট হেমার ওখানে এসে কলিং বেল বাজালো।

হেমাই দরজা খুলে দিল। পরমেশ্বরকে দেখে একটু অবাক হয়েই সে বলল, 'সকালবেলা উঠে কোথায় গিয়েছিলেন? কতবার ফোন করেছি। আপনার বেয়ারাটা কিছুই বলতে পারে না—'

পরমেশ্বর বলল, 'ভেতরে চলুন, সব বলছি।'

ব্যালকনিতে গিয়ে ওরা মুখোমুখি বসল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেয়ারা চা দিয়ে গেল। খেতে খেতে হেমা বলল, 'এবার বলুন—'

পরমেশ্বর পকেট থেকে সেই এনভেলপটা বার করে হেমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

হেমা বলল, 'কী ব্যাপার?'

পরমেশ্বর বলল, 'খুলে দেখুন না—'

খামের ভেতর থেকে ফোটোটা বার করে দেখতে দেখতে চোখের তারা স্থির হয়ে গেল হেমার।

পরমেশ্বর আবার বলল, 'কি, মাকড়াকে চিনতে পারছেন?'

হেমা সামনে এবং পেছনে বার কয়েক আস্তে করে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, স্লাইডের সেই খুনীটা। কিন্তু এর ফোটো আপনি পেলেন কোত্থেকে?' হেমার বিস্ময় ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছিল।

কীভাবে ফোটোটা পেয়েছে ডিটেল সব জানালো পরমেশ্বর।

হেমা সব শুনে বলল, 'আপনাকে এখন থেকে খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে।'

সেটা আগেই ভেবেছিল পরমেশ্বর। আচমকা আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল তার। নিশ্চয়ই শুধু তার পেছনেই সোমেশ্বর মল্লিক ওরকম একটা ডেঞ্জারাস খুনীকে ভেড়ান নি। তার সঙ্গে যাদের খুব ইন্টিম্যাসি এবং মেলামেশা তাদের পেছনেও কি ঐ মালটাকে সোমেশ্বর লাগান নি? যদিও এ ব্যাপারে ডেফিনিট প্রমাণ নেই, তবে এটা পুরোপুরি কমনসেন্সের ব্যাপার

পরমেশ্বর বলল, 'আপনিও সাবধানে থাকবেন ম্যাডাম। আমার সঙ্গে মেশেন। বলা যায় না, মাকড়া হয়ত আপনাকেও ওয়ার্ল্ড থেকে হাপিস করে দেবার প্ল্যান করেছে।'

কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। হেমা আস্তে করে মাথা নাড়ল।

পরমেশ্বর এবার একটু কী ভাবল। তারপর বলল, 'আপনাকে দুটো কাজ করতে হবে ম্যাডাম।'

হেমা তার চোখের দিকে তাকাল, 'বলুন—'

'ফার্স্ট, সুইশ ব্যাঙ্কের ডকুমেন্টগুলো আমার কাছে রাখা আর সেফ না। সোমেশ্বর মল্লিকের এজেন্ট একবার ধোঁকা খেয়ে গেছে। ডেফিনিটলি সে আবার অ্যাটেম্পট্ নেবে। ডকুমেন্টগুলো আপনি ঠিক করে রেখে দেবেন।'

'ঠিক আছে। আপনার সেকেণ্ড কাজটা কী?'

একটু চিন্তা করে পরমেশ্বর বলল, 'আমার মনে হয় সোমেশ্বরের সঙ্গে ঐ খুনীটার রেগুলার কনট্যাক্ট আছে। নজর রাখতে হবে সোমেশ্বরের ওখানে

ও কখন যায়। ওদের প্ল্যানের খবরটা ডিটেলে জানতে পারলে সুবিধা হয়। সোমেশ্বরের সবগুলো টেলিফোনে ট্যাপ করতে হবে। তার থেকে যদি কোন খবর বার করা যায়—'

হেমা বলল, 'কিছু অসুবিধা নেই। সি-আই-ডি'র দু-চারটে এক্সপার্ট লোককে ওদের পেছনে লাগিয়ে দিচ্ছি আর টেলিফোন ট্যাপের ব্যাপারেও কোন অসুবিধা হবে না। আপনি বরং এক কাজ করুন—'

'কী?'

'আজই মার্ডারারটার ফোটোর আরো ক'টা কপি করিয়ে দিন!'

'কেন?'

'সি-আই-ডি'র লোকেরা তা না হলে চিনবে কেমন করে?'

'তা করিয়ে দিচ্ছি কিন্তু আমার কী মনে হয় জানেন, এই ফোটোতে তেমন কাজ হবে না!'

'কেন?'

'সিনেমা স্লাইডে ওর ছবি দেখানোর ফলে সবাই ওকে চিনে ফেলেছে। আমার মনে হয় রাত ছাড়া অন্য সময় ও ডেফিনিটলি অন্য মেক-আপ নিয়ে ঘোরে।'

কথাটা মোটামুটি ঠিকই বলেছে পরমেশ্বর। হেমা বলল, 'তবু ফোটোগুলো করিয়ে দিন। মানুষ তো ভুলও করে বসে। ক্রিমিন্যালদের ব্যাপারে কখন কী কাজে লাগবে, কেউ বলতে পারে না।'

'ও-কে।'

পরমেশ্বর সঙ্গে কথাবার্তা হবার পরই সোমেশ্বরের বাড়ি এবং ফ্যাক্টরির ভেতর সি-আই-ডি এজেণ্ট ঢুকিয়ে দিয়েছিল হেমা। তা ছাড়া তার সবগুলো টেলিফোন লাইনও ট্যাপ করবার পাকা ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। কিন্তু না, সেই মার্ডারারটা তো নয়ই, সন্দেহজনক অন্য কোন লোককেও তাঁর কাছে যেতে দেখা যায় নি। টেলিফোনেও এখন পর্যন্ত সোমেশ্বর যার যার সঙ্গে যে সব কথাবার্তা বলেছেন তা খুবই মামুলী ধাঁচের বা তাঁর বিজনেস সংক্রান্ত। সেখানেও সন্দেহ করবার মতো কিছু পাওয়া যায় নি।

এদিকে চোখ-কান খোলা রেখে চলাফেরা করে যাচ্ছে পরমেশ্বর আর হেমা। কিন্তু এখন পর্যন্ত ভয় পাবার মতো কোন ঘটনা ঘটে নি।

তবে অমিতাভর বিজনেসের ব্যাপারে একটা নতুন অফার এসেছে। সিঙ্গাপুরের একটা ফার্ম বিরাট ইলেকট্রনিক প্ল্যাণ্ট অমিতাভদের কোলাবরেশনে বসাতে চায়। সে সম্পর্কে ডিটেলে আলোচনা করার জন্য অমিতাভকে তারা ইনভাইট করেছে। অমিতাভ যাবে বলে কথাও দিয়েছে, তবে এখনও ডেট

পরমেশ্বর পকেট থেকে সেই এনভেলপটা বার করে হেমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

হেমা বলল, 'কী ব্যাপার?'

পরমেশ্বর বলল, 'খুলে দেখুন না—'

খামের ভেতর থেকে ফোটোটা বার করে দেখতে দেখতে চোখের তারা স্থির হয়ে গেল হেমার।

পরমেশ্বর আবার বলল, 'কি, মাকড়াকে চিনতে পারছেন?'

হেমা সামনে এবং পেছনে বার কয়েক আস্তে করে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, স্লাইডের সেই খুনীটা। কিন্তু এর ফোটো আপনি পেলেন কোত্থেকে?' হেমার বিস্ময় ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছিল।

কীভাবে ফোটোটা পেয়েছে ডিটেল সব জানালো পরমেশ্বর।

হেমা সব শুনে বলল, 'আপনাকে এখন থেকে খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে।'

সেটা আগেই ভেবেছিল পরমেশ্বর। আচমকা আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল তার। নিশ্চয়ই শুধু তার পেছনেই সোমেশ্বর মল্লিক ওরকম একটা ডেঞ্জারাস খুনীকে ভেড়ান নি। তার সঙ্গে যাদের খুব ইন্টিম্যাসি এবং মেলামেশা তাদের পেছনেও কি ঐ মালটাকে সোমেশ্বর লাগান নি? যদিও এ ব্যাপারে ডেফিনিট প্রমাণ নেই, তবে এটা পুরোপুরি কমনসেন্সের ব্যাপার। পরমেশ্বর বলল, 'আপনিও সাবধানে থাকবেন ম্যাডাম। আমার সঙ্গে মেশেন। বলা যায় না, মাকড়া হয়ত আপনাকেও ওয়ার্ল্ড থেকে হাপিস করে দেবার প্ল্যান করেছে।'

কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। হেমা আস্তে করে মাথা নাড়ল।

পরমেশ্বর এবার একটু কী ভাবল। তারপর বলল, 'আপনাকে দুটো কাজ করতে হবে ম্যাডাম।'

হেমা তার চোখের দিকে তাকাল, 'বলুন—'

'ফার্স্ট, সুইশ ব্যাঙ্কের ডকুমেণ্টগুলো আমার কাছে রাখা আর সেফ না। সোমেশ্বর মল্লিকের এজেণ্ট একবার ধোঁকা খেয়ে গেছে। ডেফিনিটলি সে আবার অ্যাটেমপ্ট্ নেবে। ডকুমেণ্টগুলো আপনি ঠিক করে রেখে দেবেন।'

'ঠিক আছে। আপনার সেকেণ্ড কাজটা কী?'

একটু চিন্তা করে পরমেশ্বর বলল, 'আমার মনে হয় সোমেশ্বরের সঙ্গে ঐ খুনীটার রেগুলার কনট্যাক্ট আছে। নজর রাখতে হবে সোমেশ্বরের ওখানে

ও কখন যায়। ওদের প্ল্যানের খবরটা ডিটেলে জানতে পারলে সুবিধা হয়। সোমেশ্বরের সবগুলো টেলিফোনে ট্যাপ করতে হবে। তার থেকে যদি কোন খবর বার করা যায়—'

হেমা বলল, 'কিছু অসুবিধা নেই। সি-আই-ডি'র দু-চারটে এক্সপার্ট লোককে ওদের পেছনে লাগিয়ে দিচ্ছি আর টেলিফোন ট্যাপের ব্যাপারেও কোন অসুবিধা হবে না। আপনি বরং এক কাজ করুন—'

'কী?'

'আজই মার্ডারারটার ফোটোর আরো ক'টা কপি করিয়ে দিন!'

'কেন?'

'সি-আই-ডি'র লোকেরা তা না হলে চিনবে কেমন করে?'

'তা করিয়ে দিচ্ছি কিন্তু আমার কী মনে হয় জানেন, এই ফোটোতে তেমন কাজ হবে না!'

'কেন?'

'সিনেমা স্লাইডে ওর ছবি দেখানোর ফলে সবাই ওকে চিনে ফেলেছে। আমার মনে হয় রাত ছাড়া অন্য সময় ও ডেফিনিটলি অন্য মেক-আপ নিয়ে ঘোরে।'

কথাটা মোটামুটি ঠিকই বলেছে পরমেশ্বর। হেমা বলল, 'তবু ফোটোগুলো করিয়ে দিন। মানুষ তো ভুলও করে বসে। ক্রিমিন্যালদের ব্যাপারে কখন কী কাজে লাগবে, কেউ বলতে পারে না।'

'ও-কে।'

পরমেশ্বর সঙ্গে কথাবার্তা হবার পরই সোমেশ্বরের বাড়ি এবং ফ্যাক্টরির ভেতর সি-আই-ডি এজেণ্ট ঢুকিয়ে দিয়েছিল হেমা। তা ছাড়া তার সবগুলো টেলিফোন লাইনও ট্যাপ করবার পাক্কা ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। কিন্তু না, সেই মার্ডারারটা তো নয়ই, সন্দেহজনক অন্য কোন লোককেও তাঁর কাছে যেতে দেখা যায় নি। টেলিফোনেও এখন পর্যন্ত সোমেশ্বর যার যার সঙ্গে যে সব কথাবার্তা বলেছেন তা খুবই মামুলী ধাঁচের বা তাঁর বিজনেস সংক্রান্ত। সেখানেও সন্দেহ করবার মতো কিছু পাওয়া যায় নি।

এদিকে চোখ-কান খোলা রেখে চলাফেরা করে যাচ্ছে পরমেশ্বর আর হেমা। কিন্তু এখন পর্যন্ত ভয় পাবার মতো কোন ঘটনা ঘটে নি।

তবে অমিতাভর বিজনেসের ব্যাপারে একটা নতুন অফার এসেছে। সিঙ্গাপুরের একটা ফার্ম বিরাট ইলেকট্রনিক প্ল্যাণ্ট অমিতাভদের কোলাবরেশনে বসাতে চায়। সে সম্পর্কে ডিটেলে আলোচনা করার জন্য অমিতাভকে তারা ইনভাইট করেছে। অমিতাভ যাবে বলে কথাও দিয়েছে, তবে এখনও ডেট

ফিক্সড হয় নি। এ ব্যাপারে তার সঙ্গে যাবার জন্য পরমেশ্বরকে সে রিকোয়েস্টও করেছে এবং একটা ইণ্টারন্যাশনাল পাশপোর্ট'ও করিয়ে নিতে বলেছে।

পরমেশ্বরের কাছে রণজয় হালদারের ইণ্টারন্যাশনাল পাশপোর্ট'টা রয়েছে। সোমেশ্বরই তাকে দিয়েছেন। রণজয় হালদারের ফোটো সরিয়ে সেখানে নিজের ফোটো বসিয়ে পাশপোর্ট অফিসারের সিগনেচার জাল করে ভিসা নিয়ে ওয়াল্ডের্'র যে কোন জায়গায় সে চলে যেতে পারে। পরমেশ্বর কথা দিয়েছে অমিতাভ সেনের সঙ্গে সিঙ্গাপুর যাবে।

আজ শরীরটা খুব ভালো লাগছিল না পরমেশ্বরের। নিজের নকল অফিস থেকে বেরিয়ে অন্য দিন সে অমিতাভর 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজে' চলে যায়। আজ আর সেখানে গেল না। স্ট্রেট ফ্ল্যাটে এসে ড্রইং রুমের ডিভানে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। আর শুয়ে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই।

ঘুম ভাঙল ছোটি সিংয়ের ডাকে। ধড়মড় করে উঠে বসে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'কেয়া হুয়া ?'

ছোটি সিং বলল, 'আপকি ফোন—'

'কার ফোন ?'

'উপরবালে মেমসাবকো।'

অর্থাৎ হেমা ফোন করেছে। ক্রেডেলের একধারে টেলিফোনটা নামানো রয়েছে। সেটা তুলে ছোটি সিংকে বলল, 'ঠিক হ্যায়, তুম যাও।' তারপর ফোনটা কানে লাগিয়ে 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে হেমার গলা ভেসে এল, 'কী ব্যাপার, এই অড টাইমে ঘুমোচ্ছেন ?'

পরমেশ্বর বলল, 'শরীরটা ব্যাগোরবাই করছিল ; তাই—'

'এনিথিং সীরিয়াস ?'

'না-না, তেমন কিছু না।'

'একটা দারুণ সীরিয়াস ব্যাপারে আপনার সঙ্গে ডিসকাসান আছে। তাই ঘুম ভাঙালাম। প্লীজ ডোণ্ট মাইণ্ড।'

'কী ডিসকাসান বলুন—'

'একটু কষ্ট করে আমার এখানে আপনাকে একবার আসতে হবে।'

'ও-কে, যাচ্ছি—' টেলিফোনটা ক্রেডেলে নামিয়ে রেখে উঠে পড়ল পরমেশ্বর। আচমকা ঘুম ভাঙবার জন্য মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে তার। দুম করে কী এমন সীরিয়াস কারবার ঘটল, কে জানে।

একটু পর ওপরে উঠে এসে পরমেশ্বর বলল, 'কী ডিসকাস করতে চান বলুন—'

হেমা উত্তর না দিয়ে একটা ব্যাটারি সেটের টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দিল। কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর সেখান থেকে দুটো গলা শোনা গেল। একটা সোমেশ্বর মল্লিকের, অন্যটি অচেনা। তাঁদের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছে তা এইরকম।

সোমেশ্বর বলছেন, 'মিস্টার এক্স, মিস ব্যারিংটনের কাছ থেকে কোন ইনফরমেসন পেয়েছেন?'

এক্স বলল, 'পেয়েছি মিস্টার মল্লিক। মিস ব্যারিংটন জানিয়েছে, আপনার লণ্ডনের এজেন্ট পিকাডিলি সার্কাসের মিডল ইস্ট ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চের লকারে দশ হাজার পাউণ্ড জমা দিয়েছে। ব্যাঙ্ক থেকে মিস ব্যারিংটনকে লকারের চাবিও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

'আপনি রেমুনারেসন পেয়ে গেছেন। এবার আমার কাজটা শুরু করে দিন।'

'মিস ব্যারিংটন জানাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রাইমারি কাজ স্টার্ট করে দিয়েছি। এ নিয়ে আপনাকে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

'ধন্যবাদ। তবু আপনার কাজের সুবিধার জন্য আমি একটা ভালো খবর দিতে চাই।'

'কী খবর মিস্টার মল্লিক?'

'আপনি তো অপারেশনটা ইণ্ডিয়ার বাইরে করতে চান?'

'সিওর।'

'সে অপরচুনিটি এসে গেছে। আপনার একজন টার্গেট নেক্সট উইকে সিঙ্গাপুর যাচ্ছে।'

'ঠিক বলছেন?'

'আমার এজেন্ট বাজে খবর আনে না।'

'ফাইন। কখন কোন এয়ার লাইন্সের ফ্লাইটে যাচ্ছে একটু খবর দেবেন। কাল এই সময় আবার ফোন করব।'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু টার্গেট নাম্বার টু'র কী হবে? আর সেই ব্যাঙ্কের ডকুমেণ্ট-গুলোর? ব্লাডি সোয়াইনটা আমাকে স্রেফ গাধা বানিয়ে দিয়েছে।'

'আমার ধারণা টার্গেট নাম্বার টু টার্গেট নাম্বার ওয়ানের সঙ্গে সিঙ্গাপুরে যাবে।'

'নাইস।'

'আর যদি না যায়, আমি তার ব্যবস্থা করব। দেখা যাক, কী হয় শেষ পর্যন্ত। একটা কথা—'

'বলুন—'

'আপনার সঙ্গে আর একবার কি দেখা হতে পারে না?'

'নেভার। আপনাকে তো আগেই বলে দিয়েছি, রোজ এই সময় একবার করে আপনাকে ফোন করব।'

এরপর টেপ রেকর্ডারটা চুপ করে গেল। বোতাম টিপে সেটা থামিয়ে হেমা বলল, 'কী বুঝলেন?'

শুনতে শুনতে নার্ভগুলো টান টান হয়ে গিয়েছিল পরমেশ্বরের। সে বলল, 'যা ভেবেছিলাম সেটাই কারেক্ট হল। ওই মার্ডারারটাকেই সোমেশ্বর মাকড়া সেট করেছে। ওর টার্গেট আমরা দু'জন—অমিতাভ আর আমি। আপনাকে দেখছি বাদ দিয়েছে।'

'আমি কেন লিকুইডেসনের লিস্ট থেকে বাদ পড়লাম বুঝতে পারছি না। আমিও আপনার সঙ্গে কম মিশি না!'

'খুব সম্ভব বেনিফিট অফ ডাউটে আপনি বাদ পড়েছেন।'

হেমা একটু হাসল। তারপর বলল, 'ওদের প্ল্যান তো মোটামুটি জানা গেল। এখন আমাদের প্ল্যান কী হবে?'

পরমেশ্বর বলল, 'ওদের ডিসকাসন শুনে মনে হল, ইণ্ডিয়ায় আমাদের ওপর অ্যাটেম্পট হবে না। অমিতাভর সঙ্গে যেভাবেই হোক আমাকে সিঙ্গাপুর যেতে হবে। তার আগে কালই ওকে গিয়ে সোমেশ্বর মল্লিকের এই প্ল্যানটার কথা বলে আসতে হবে। আর একা তো জানিয়েই দিয়েছে রোজ একটা পার্টিকুলার সময়ে সোমেশ্বরকে সে ফোন করবে। ফোনটা ট্যাপ করে টেপ রেকর্ড করে রাখতে হবে।'

ব্যাপারটা মোটামুটি পছন্দ হল হেমার। সে বলল, 'আপাতত এটাই ঠিক থাক। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে।'

একটু চুপচাপ। তারপর পরমেশ্বর বলল, 'আচ্ছা, সোমেশ্বর আর সেই মার্ডারারের গলা টেপ করলেন কী করে?'

হেমা বলল, 'ভেরি সিম্পল। টেলিফোন ট্যাপ করার সময় এক্সচেঞ্জে আমাদের লোক দিয়ে রেকর্ড করিয়ে নিয়েছি।'

'আপনি ডেঞ্জারাস জিনিস ম্যাডাম।'

হেমা হাসতে হাসতে বলল, 'আপনার আর সোমেশ্বর মল্লিকের অনেক কথাও এই রকম টেপ করে রেখেছি।'

পরমেশ্বর বলল, 'জানি। ওগুলো দিয়ে কী করবেন?'

'আমার কথামতো না চললে ইউজ করতে হবে।'

'আপনি মাইরি টেরিফিক।'

হেমা উত্তর না দিয়ে হাসতে লাগল।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা কে কোন লাইন থেকে ফোন করছে টেলিফোনের লোকেরা তা বার করতে পারে?'

হেমা ঘাড় কাত করল, 'পারে।'

'তা হলে এক্স যেখান থেকে ফোন করেছে সেটা বার করার চেষ্টা করলে পারতেন। মার্ডারারটার একটা খোঁজ-টোজ পাওয়া যেত। যেভাবেই হোক তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। ওকে ধরতে পারলে সোমেশ্বর মল্লিককে ফাঁসানো অনেক ইজি হয়ে যাবে।'

'এক্স যেখান থেকে ফোন করেছিল সেটা বার করা হয়েছে।'

'কোত্থেকে ফোন করেছিল?'

'দমদম এয়ারপোর্টের পাবলিক বুথ থেকে।'

'শলা একটি ফার্স্ট গ্রেডের হারামী। এরকম মালের সঙ্গে লড়ে আনন্দ আছে।'

হেমা হাসল।



পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট-ট্রেকফাস্ট করে এক সেকেণ্ডও দেরি করল না পরমেশ্বর। সোজা নিচে এসে তার লিমুজিনটা বার করে যোধপুর পার্কের দিকে ছুটিয়ে দিল। যোধপুরে অমিতাভদের বাড়ি। এক্সের ব্যাপারে তাকে আগে থেকেই সাবধান করে দেওয়া দরকার।

দশটা সাড়ে দশটার আগে কোনদিনই 'ইটার্নাল ইণ্ডাষ্ট্রিজে' আসে না অমিতাভ। এখন সবে আটটা। কাজেই পরমেশ্বর তার বাড়ি ছুটছে। মোট কথা সোমেশ্বর মল্লিকের ডেঞ্জারাস প্ল্যানটার কথা অমিতাভকে না জানানো পর্যন্ত সে ভাল করে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিল না।

আগে আর কখনও অমিতাভদের বাড়ি আসে নি পরমেশ্বর। যদিও অমিতাভ অনেক বার আসতে বলেছে। তার মা-ও বহুবার পরমেশ্বরকে নিয়ে যেতে বলেছেন। না এলেও ওদের বাড়ির অ্যাড্রেসটা পরমেশ্বরের জানা।

রাস্তায় দু-একজনকে জিজ্ঞেস করে বাড়িটা বার করে ফেলল পরমেশ্বর। বিরাট কমপাউণ্ডওলা মডার্ন আর্কিটেকচারের ছিমছাম তেতলা বাড়ি অমিতাভদের। চারদিকে উঁচু কমপাউণ্ড ওয়ালের গায়ে এবং মাথায় ঝাড়ানো লতায় কভার ভারী লোহার গেটটা ভেতর থেকে বন্ধ।

গাড়িটা বাইরের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে বারকয়েক হর্ন দিতেই গেট খুলে গেল এবং একটা গুর্খা দারোয়ানের মুখ দেখা দিল।

পরমেশ্বর বলল, 'সেনসাহাব হ্যায় ?'

এত বড় লিমুজিনের মালিক ভেবে গুর্খা লম্বা স্যালুট হাঁকালো। তারপর বলল, 'জী সাব—'

পরমেশ্বর আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। গাড়িটা ভেতরে নিয়ে লক করে চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে নেমে পড়ল।

সামনের দিকে চমৎকার বাগান। মাঝখান দিয়ে নুড়ির রাস্তা। রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েচে বাড়িটা সেখানে।

এই সকালবেলায় তিন চারটে মালী বাগানে কাজ করছে। আগাছা তুলছে, 'মোয়ার' দিয়ে ঘাস সমান করছে, নানা রকম গাছের বাজে পাতা ছেঁটে দিচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। বাগানের একধারে দাঁড়িয়ে দারুণ অ্যারিস্টোক্রাট চেহারার এক মধ্যবয়সী বিধবা মহিলা মালীদের কাজ দেখছিলেন এবং মাঝে মাঝে তাদের এটা-ওটা নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

মহিলাটির দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল পরমেশ্বর। অমিতাভর সঙ্গে সুনেত্রার বিয়ের কথা যেদিন ফাইনাল হয় সেদিন মণিমোহন চ্যাটার্জির সঙ্গে গাড়িতে এঁকে দেখেছিল সে। আলাপ-টালাপ হবার চান্স হয়নি, তবে এই মুহূর্তে পরমেশ্বর আন্দাজ করল, মহিলাটি নিশ্চয়ই অমিতাভর মা।

কিন্তু এই মহিলাটিকে শুধু আজ বা অমিতাভর বিয়ের অ্যানাউন্সমেণ্টের দিনই না, আগেও যেন কোথায় দেখেছে। কোথায়? সেদিন মনে করতে পারে নি পরমেশ্বর কিন্তু আজ বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ে গেল। পুরুলিয়ার অরফ্যানেজে থাকতে এঁকে সে প্রথম দেখেছিল। ভদ্রমহিলা তখন প্রায় প্রতি মাসেই একবার করে ওখানে যেতেন। ওখানকার বাপ-মায়ের পরিচয়হীন বাস্টার্ড ছেলে-মেয়েগুলোকে দারুণ ভালবাসতেন। আবছা আবছা তার মনে আছে, যখনই তিনি যেতেন সঙ্গে অরফ্যানেজের ছেলে-মেয়েদের জন্য থাকত গাদা গাদা নতুন জামা-প্যাণ্ট, লজেন্স, খেলনা, ছবির বই, এমনি আরো অনেক জিনিস। তিনি গেলেই গোটা অনাথ আশ্রম জুড়ে ফেস্টিভ্যাল শুরু হয়ে যেত।

এই মহিলার দারুণ টান ছিল পরমেশ্বরের ওপর। অন্য ছেলেদের তিনি যা দিতেন তার চাইতে অনেক বেশী পেত পরমেশ্বর। লুকিয়ে লুকিয়ে মহিলা তাকে চকোলেট বার, ড্রইং সেট, এমনি অনেক জিনিস দিয়ে যেতেন।

এভাবে কিছুদিন চলার পর পরমেশ্বর শুনলেন, ভদ্রমহিলার ছেলে-পুলে নেই এবং তিনি তাকে পোষ্যপুত্তুর হিসেবে অ্যাডপ্ট করতে চান। অরফ্যানেজের হেড ফাদার ডিকিনসন এতে দারুণ খুশী হয়েছিলেন। তিনি মহিলাকে শ্রদ্ধা-ট্রদ্ধা করতেন। পরমেশ্বরকে ফাদার বুঝিয়েছিলেন, মহিলার কাছে গেলে সে ভালো থাকবে সুখে থাকবে কিন্তু এ ব্যাপারটা ভীষণ খারাপ লেগেছিল পরমেশ্বরের, খুব ভয়ও পেয়ে গিয়েছিল সে। কেন না সে শুনেছে ঐ অরফ্যানেজ থেকে তার আগে আরো কয়েকটা ছেলেকে কেউ কেউ অ্যাডপ্ট করে নিয়ে গিয়ে নাকি ফরেনারদের কাছে কায়দা করে বেচে দিয়েছে কিংবা তাদের দিয়ে চাকর-বাকরের মতো খাটিয়েছে।

তখন পরমেশ্বরের বয়েস খুব কম। ফাদার ডিকিনসনের মুখের ওপর 'না' বলার মতো শিরদাঁড়ায় জোর ছিল না। তবে মনে মনে একটা প্ল্যান করে ফেলেছিল সে। যেদিন পুরুলিয়ার অরফ্যানেজ থেকে ভদ্রমহিলা তাকে নিয়ে যাবেন তার আগের রাতে সে পালিয়ে গিয়েছিল। আর কোনদিন পরমেশ্বর অরফ্যানেজে ফিরে যায় নি।

যাই হোক, পরে তা হলে ভদ্রমহিলার ছেলে হয়েছে! আর সেই ছেলেই অমিতাভ সেন। শলা, লাইফ একটা টেরিফিক ব্যাপার। ঘুরে ফিরে মহিলার সঙ্গে এতদিন বাদে আবার দেখা হয়ে গেল। সেদিন যদি পোষ্যপুত্তুর হয়ে এখানে 'ইন' করত, তা হলে অমিতাভ তার ভাই হয়ে যেত। গলা জড়াজড়ি করে দুই ভাই সুখের মহাসমুদ্রে সাঁতার কাটতে পারত। অবশ্য উলটোটাও হতে পারত। অমিতাভ হবার পরই 'বাটকে' একটি হাই কিক খেয়ে এ বাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে হতো।

নুড়ির রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছা হল, মহিলার সঙ্গে একটু কথা বলবে।

পরমেশ্বর বাগানের দিকে পা বাড়াতে যাবে, সেই সময় আচমকা চিৎকার ভেসে এল, 'রাসকেল, সোয়াইন—'

চেনা গলা। চমকে ঘাড় ফেরাতেই পরমেশ্বর দেখতে পেল দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে অমিতাভ সেন। চোখাচোখি হতেই হেসে পরমেশ্বর বলতে যাচ্ছিল, 'গুড মর্ণিং' কিন্তু বলা হল না। অমিতাভ আবার গর্জে উঠল, 'চীট, ফোরটোয়েন্টি—তোমার এত বড় সাহস, আমার বাড়ি এসে ঢুকেছ!'

পরমেশ্বর হকচকিয়ে গেল। তা হলে এই বাছা বাছা খিস্তিগুলো তারই উদ্দেশ্যে ইউজ করা হচ্ছে! কাল সন্ধ্যে বেলাতেও অমিতাভর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তখনও তার সঙ্গে ফাইন ব্যবহার করেছে অমিতাভ, সিঙ্গাপুরে যাবার জন্য বার বার রিকোয়েস্ট করেছে। একটা রাত মানে বারো তেরো ঘণ্টার মধ্যে কী এমন ঘটে গেল যাতে অমিতাভ এত ক্ষেপে উঠেছে?

পরমেশ্বর জানে না, কাল অমিতাভর সঙ্গে সে দেখা করে আসার পর সোমেশ্বরের সিক্রেট এজেণ্ট তার কাছে গিয়ে পরমেশ্বরের আসল নাম, রীয়েল অ্যাড্রেস, প্রফেসান এবং আইডেনটিটি জানিয়ে আসে। তবে সোমেশ্বরের সঙ্গে পরমেশ্বরের যে রিলেসান ছিল এবং অমিতাভকে ফিনিশ করার জন্য তাকে যে রিক্রুট করা হয়েছিল, এজেণ্ট সেটা অবশ্য বলে নি। এজেণ্টের কাছ থেকে খবর পেয়েই তা যাচাই করার জন্য কাল রাতেই বি. টি. রোডের বস্তি আর জগদীশের বাঙলা মালের দোকানে লোক পাঠায় অমিতাভ।

লোক এসে জানায় পরমেশ্বর সম্পর্কে সোমেশ্বরের এজেন্ট যা বলে গেছে তার প্রতিটি অক্ষর কারেক্ট।

পরমেশ্বর অবাক হয়ে বলল, 'এ আপনি কী সব বলছেন !'

অমিতাভ গলার শির ছিঁড়ে চেঁচাল, 'কী বলছি ? রাসকেল তুমি রণজয় হালদার ! তুমি পরমেশ্বর—বি. টি. রোডের স্লামে থাকো। তোমার প্রফেসান হচ্ছে ফেরেববাজি, জালিয়াতি, ফোর-টোয়েন্টিগিরি। আই উইল হ্যান্ড ইউ ওভার টু দা পুলিস।'

পরমেশ্বর টের পেল ঘামে তার জামা ভিজে উঠেছে এবং শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বরফের মতো কিছু একটা ওঠানামা করছে। কিন্তু এখন নার্ভাস হয়ে গেলে বারোটা বেজে যাবে। কিছুই যেন বুঝতে পারছে না, মুখে এমন একটা অবাক হবার পোজ ফুটিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'আপনার কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল !'

'মাথা আমার খারাপ হয়েছে ? মনে করেছ তোমার মতলব আমি টের পাই নি রাসকেল ! বন্ধু হয়ে ঢুকে আমার সর্বনাশ করতে চাও। আই থিংক আমার ফ্যাক্টরি নষ্ট হবার ব্যাপারে তোমার হাত আছে।'

পরমেশ্বর চমকে উঠল। যখন সত্যি সত্যি সে অমিতাভর বারোটা বাজাচ্ছিল তখন ছিল তার ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড। আর রীয়ালি যখন সে তার উপকার করতে এসেছে এবং একটা দুর্ধর্ষ মার্ডারারের হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে তখন অমিতাভ তাকে কমপ্লীট ভুল বুঝেছে। অবশ্য ভুল বোঝাটাই স্বাভাবিক। কেননা তার সম্বন্ধে যা যা অমিতাভ জানতে পেরেছে সে সবের কোনটাই মিথ্যে নয়। আর এইরকম একখানা টেরিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড জানার পর কেউ কাউকে রেড কার্পেট পেতে নিশ্চয়ই রিসেপশান দেবে না। পরমেশ্বর বলল, 'আপনার কোথাও ভুল হয়ে যাচ্ছে মিস্টার সেন।'

তার কথা কানে তুলল না অমিতাভ। গলার শির ছিঁড়ে চেঁচাতে চেঁচাতে দারোয়ান, মালী এবং বাড়ির চাকর-বাকরদের বলল, 'পাকড়ো পাকড়ো, ইয়ে হারামজাদকো আভভি পাকড়ো—'

দারোয়ান টারোয়ানরা স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ দুর্দান্ত একখানা ড্রামা দেখছিল। এবার মালিকের হুকুম পেয়ে পায়ে পায়ে তারা এগিয়ে আসতে লাগল।

পরমেশ্বর বুঝতে পারছিল, ব্যাপারটা তার পক্ষে খুবই ডেঞ্জারাস হয়ে উঠছে। এখনই এখান থেকে 'আউট' হয়ে যেতে না পারলে টেরিফিক ঝামেলায় পড়তে হবে। তবু লাস্ট একটা অ্যাটেমপ্ট করল সে। দোতলার

ব্যালকনির দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, 'দেখুন, একটা দারুণ জরুরী কাজে আপনার কাছে এসেছি। আপনার লাইফ—'

তার কোন কথা শুনতেই পেল না অমিতাভ। উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে যেতে লাগল, 'পাকড়ো পাকড়ো—'

দারোয়ান মালীরা এবার ক্ষ্যাপা মোষের মতো পরমেশ্বরের দিকে দৌড়ে আসতে শুরু করেছে। অমিতাভকে হাজার বোঝাতে চেষ্টা করলেও এখন বোঝানো যাবে না। মাকড়ার ব্লাড প্রেসার হাই জাম্প মেরে একটা ডেঞ্জারাস জায়গায় পেঁছে গেছে। দু হাত বাড়িয়ে মাতাদোরের স্টাইলে ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে গুর্খা দারোয়ানটা একেবারে সামনে এসে পড়েছে। ও যদি জাপটে ধরে ছাড়িয়ে যাওয়া মুশকিল হবে। কেন না ও ধরলেই চারদিক থেকে মালী-ফালীরা তাকে ঘিরে ফেলবে।

এক সেকেণ্ডের ভেতর ডিসিসান নিয়ে নিল পরমেশ্বর। এমনিতে সে নন-ভায়োলেণ্ট—সেণ্ট পারসেণ্ট অহিংস। কিন্তু এই মোমেণ্টে বডিটা স্লাইট একধারে হেলিয়ে গুর্খাটার চোয়ালে একটা ভালো ওজনের আপার কাট ঝেড়ে দিল। গুর্খাটা উড়ে বাগানের ভেতর তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেল।

দারোয়ানের হাল দেখে মালী-ফালীরা থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পরমেশ্বর তক্ষুণি সেই চান্সটা নিল, স্প্রিনটারের মতো দৌড়ে গিয়ে তার লিমুজিনে উঠে পড়ল।

আধ ঘণ্টা বাদে ময়দানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে গাড়িটা পার্ক করে ভেতরের গার্ডেনে গিয়ে খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল পরমেশ্বর। একটু আগে অমিতাভ সেনের বাড়িতে যা ঘটে গেল তাতে তার নার্ভগুলো একেবারে লুজ হয়ে গেছে। সেগুলোকে টান টান করে বেঁধে নেবার জন্য খানিকক্ষণ তাকে চুপচাপ বসে থাকতে হবে।

ঘণ্টাখানেক লম্বা হয়ে শুয়ে থাকার পর পরমেশ্বরের ব্রেন-ট্রেন নর্মাল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় একটা নতুন ওয়েভ চলে এল। অমিতাভ নিশ্চয়ই তাকে সহজে ছাড়বে না। একবার যখন সে তার রীয়েল আইডেণ্টিটি জেনে গেছে তখন হাজার চেষ্টা করলেও বোঝানো যাবে না, সে অমিতাভর সত্যিকারের ওয়েলউইশার এবং একটা মারাত্মক খুনীর হাত থেকে তাকে বাঁচাতে চায়। অমিতাভ তার সার্কুলার রোড আর বি. টি. রোড দু জায়গারই অ্যাড্রেস জানে। সে যে রকম ক্ষেপে আছে এবং ফ্যাক্টরির বারোটা বাজাবার ব্যাপারে তাকে সন্দেহ করছে তাতে ডেফিনিটলি দুই ঠিকানাতেই পুলিস-টুলিস পাঠিয়ে দিতে পারে। এদিকে মার্ডারারটা ঘাড়ের

ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে। অমিতাভর কমপ্লেন অনুযায়ী পুলিস যদি তাকে ক্যাচ করে হাজতে পুরে ফেলে নানা দিক থেকে ঝামেলা বেধে যাবে। কিছুদিন মেলামেশার ফলে অমিতাভ মাকড়াটাকে ভালো লেগে গেছে। তা ছাড়া ওর মা একদিন তাকে অ্যাডপ্টও করতে চেয়েছিলেন। করলে পোষ্যপুত্তুর হওয়ার চান্সে সে অমিতাভর ভাইও হয়ে যেতে পারত। খুনীটার হাত থেকে ওকে বাঁচাতে পারলে প্রুভ করা যাবে সে অমিতাভর রীয়েল শুভাকাঙ্ক্ষী। সেই চান্সটা পাওয়ার জন্য এখন সে সার্কুলার রোডেও থাকবে না, বি. টি. রোডেও না। তবে সোমেশ্বর মল্লিকের এই লিমুজিনটা এক ফাঁকে অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসের পার্কিং এরীয়ায় রেখে আসার এবং সুইশ ব্যাঙ্কের সেই ডকুমেণ্টগুলো হেমার হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। পরমেশ্বর ঠিক করল, আপাতত সব প্রবলেম না মেটা পর্যন্ত সদর স্ট্রীটের সেই হোটেলটায় তাঁবু ফেলে থাকবে। কম্পাউণ্ডের ভেতর এসে গাড়ি পার্ক করে রিসেপশানে চলে এল সে।

আগের বার মিডল এজেড অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের মেক-আপ নিয়ে এই হোটেলে দিনকতক কাটিয়ে গেছে পরমেশ্বর। এবার আর মেক-আপ নেই, নিজের আসল চেহারাতেই সে এখানে ঢুকেছে। তবে রিসেপশানে স্যুইট 'বুক' করার সময় হোটেল রেজিস্টারে নিজের নাম লেখালো ঃ হরেকৃষ্ণ চাকলাদার।

খাতার খোপকাটা ঘরগুলো ফিল-আপ করে রিসেপশানের সেক্সি চেহারার ছুকরিটার কাছ থেকে চাবি নিয়ে লিফটে করে তেতলায় নিজের সুইটে এসে হেমাকে ফোন করল, 'ম্যাডাম, দারুণ ঝামেলা হয়ে গেছে। আপনি এক্ষুণি একবার এখানে চলে আসুন।' বলে হোটেলের নাম এবং স্যুইট নাম্বার হেমাকে জানিয়ে দিল।

হেমা অবাক, 'আবার কী ঝামেলা বাধালেন আপনি, হোটেলে গিয়েই বা উঠলেন কেন?'

'সে অনেক কারবার, ফোনে অত বলা যাবে না। প্লীজ একটু কষ্ট করে চলে আসুন।'

কিছুক্ষণ বাদে পরমেশ্বরের স্যুইটে এসে বসতে বসতে বলল, 'বলুন স্যার—'

অমিতাভর বাড়ির ঘটনাটা ডিটেলে জানিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন কেন আমি হোটেলে এসে তাঁবু খাটিয়েছি।'

'হুঁ।'

একটু ভেবে পরমেশ্বর বলল, 'কে যে অমিতাভকে আমার সব খবর দিল কিছুই বুঝতে পারছি না।'

হেমা বলল, 'দিস ইজ ভেরি সিম্পল। এটা নিশ্চয়ই সোমেশ্বর মল্লিকের

কাজ। সে ডেফিনিটলি আন্দাজ করেছে অমিতাভর সঙ্গে আপনার ইন্টিম্যাসি হয়েছে আর আপনারা তার বিরুদ্ধে কিছু একটা প্ল্যান করছেন।'

আরে তাই তো! তা না হলে তাদের দু'জনের পেছনে বা একটা দুর্দান্ত খুনীকে কেনই বা 'সেট' করবেন সোমেশ্বর। পরমেশ্বর ভাবল, এটা অনেক আগেই তার মাথায় আসা উচিত ছিল।

হেমা বলতে লাগল, 'তাই আপনার আর অমিতাভর মধ্যে একটা মিস-আন্ডারস্ট্যান্ডিং ঘটিয়ে দিতে চাইছে। এতে আপনারা নিজেদের মধ্যে ফাইট করতে থাকবেন, তাতে সোমেশ্বর মল্লিকের কত সুবিধা ভাবুন!'

'রাইট—' আস্তে মাথা নাড়ল পরমেশ্বর।

'এখন আপনি কিছুদিন এখানে থেকেই যান। এক্স আর সোমেশ্বর মল্লিকের টেলিফোন রোজই ট্যাপ করে যাব। শীগগিরই ওরা একটা 'মুভ' নেবে বলে আমার ধারণা। সেটা জানতে পারলে আমরা কাউণ্টার মুভ নেব। তা হলে এখন আমি চলি—'

'আরেকটু বসে যান।'

'কেন, দরকার আছে?'

'হ্যাঁ। আমার লিমুজিনটা হোটেলের পার্কিং এরিয়াতে রয়েছে। এই নিন চাবি। কোন একসময় এসে ওটাকে অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে নিয়ে ফেলে রাখবেন।'

'আচ্ছা।'

আর সেই সুইশ ব্যাঙ্কের ডকুমেণ্টগুলো আমার বেডরুমের খাটের মাথার দিকের পায়া দুটোর গর্তের ভেতর রয়েছে। আজই ওগুলো বার করে আপনার কাছে নিয়ে রাখবেন। আমি ফ্ল্যাটে থাকব না। ডেফিনিটলি সোমেশ্বর মল্লিক লোক পাঠিয়ে ওগুলো বার করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। ডকুমেণ্টগুলো সাবধান মতো রাখবেন।'

তা না হয় রাখব। কিন্তু ওগুলো পাব কী করে? আপনি না থাকলে ছোটি সিং আমাকে কি আপনার বেডরুমে ঢুকতে দেবে?'

'আমি ছোটি সিংকে ফোন করে দু'দিনের ছুটি দিয়ে দিচ্ছি। আপনি চান্স বুঝে জানলার কাটা গ্রিল দিয়ে 'ইন' করে মালটা হাপিস করে আনবেন।'

'ও-কে—' লিমুজিনের চাবি নিয়ে উঠে পড়ল হেমা।

পরমেশ্বর বলল, 'রাত সাতটা থেকে আটটার মধ্যে এক্স রোজ সোমেশ্বরকে ফোন করে। ওরা কী কথা বলে জেনে নিয়ে আমাকে ফোন করবেন।'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনার ফোন পাবার পর একবার বেরুব।'

'ঠিক আছে।'

হেমা চলে যাবার পর অমিতাভর মেজাজ বোঝার জন্য বারকয়েক তাকে ফোন করল পরমেশ্বর। কিন্তু তার গলা পাওয়ামাত্র চিৎকার করে ওঠে অমিতাভ, 'রাসকেল চীট, তোমাকে আমি পাঁচ বছর জেলে যদি না খাটাতে পারি তবে আমার নাম অমিতাভ সেন না।'

'জেল খাটাবেন, ঠিক আছে। কিন্তু আমার কথাটা শুনুন।'

'তোমার মতো একটা থার্ড ক্লাস ক্রিমিনালের কোন কথা আমি শুনতে চাই না। দু'বার তোমার ঠিকানায় পুলিস পাঠিয়েছি। তোমাকে পায় নি। আমার ধারণা তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ। কতদিন পুলিসকে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে বেড়াবে—আই ওয়াণ্ট টু সী।' বলেই ঝড়াং করে লাইন কেটে দেয় অমিতাভ সেন।

পরমেশ্বর যখন সোমেশ্বর মল্লিকের এজেণ্ট ছিল তখন ডেঞ্জারাস মতলব নিয়েই অমিতাভর সঙ্গে মিশেছে। এখন তার কোনরকম খজড়া মোটিভ নেই। এখন সত্যি সত্যিই সে অমিতাভর শুভাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু এ কথাটা বলার চান্সই পাওয়া যাচ্ছে না। যতবার ফোনে এসব কথা বলতে চাইছে ততবারই তাকে থামিয়ে দিয়ে শাসিয়ে যাচ্ছে অমিতাভ।

শেষ পর্যন্ত অমিতাভকে ফোন করা বন্ধ করেছে পরমেশ্বর। আপাতত কিছুদিন যাক; মাকড়ার মেজাজটা স্লাইট ঠাণ্ডা হোক; তারপর ওকে কনট্যাক্ট করা যাবে।

হোটেলে আসার পর হেমার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলা আর অমিতাভকে বারকতক ফোন করা—এছাড়া আর কিছুই করে নি পরমেশ্বর। শুয়ে, ঘুমিয়ে, রেডিও বা রেকর্ড শুনে গোটা দিনটা কাটিয়ে দিয়েছে। তারপর ঠিক সোয়া-আটটার সময় হেমার ফোন এল, 'এক্স আর সোমেশ্বর মল্লিক কথা বলেছে।'

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'এনিথিং ইমপর্টাণ্ট?'

'নো, নাথিং। কাল আবার ফোন করব।'

'ও-কে।' ফোনটা নামিয়ে রেখে পরমেশ্বর উঠে পড়ল।

খানিকক্ষণ পর দেখা গেল, একটা মিনি বাস থেকে বি. টি. রোডে নেমে পড়েছে সে। তারপর ট্যারাবাঁকা গলি-ফলি পেরিয়ে জগদীশের বাংলা মালের দোকানের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। পুলিসের একটা কালো ভ্যান মালের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। গোটাকতক পুলিসকেও শুঁড়িখানার দরজায় দেখা গেল।

নার্ভের মধ্যে কীসের একটা সিগন্যাল পেয়ে গেল যেন পরমেশ্বর। সামনেই একটা ভাঙাচোরা পুরানো বাড়ির দেয়াল খাড়া হয়ে রয়েছে। সট করে সে সেটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। তার মনে হল, এখন শুঁড়িখানায় 'ইন' করাটা ঠিক হবে না।

মিনিট পাঁচেক ওয়েট করার পর পরমেশ্বরের চোখে পড়ল, ফাণ্টা মালের দোকান থেকে বেরিয়ে সামনের খোয়া-ওঠা লঝঝড় রাস্তা দিয়ে চলেছে। ফাণ্টা জগদীশের শুঁড়িখানায় কাজ করে; খদ্দেরদের মাল-ফাল সার্ভ করে থাকে। হয়ত কোন দরকারে বেরিয়ে এসেছে।

পরমেশ্বর আস্তে করে ডাকল, 'আই ফাণ্টা—'

একটু চমকে উঠে এদিক সেদিক তাকাতেই দেয়ালের ওধারে পরমেশ্বরকে দেখতে পেল ফাণ্টা। পরমেশ্বর এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে, দেখেও প্রথমটা যেন বিশ্বাস করতে পারল না সে। ঝট করে রাস্তার ধারের কাঁচা নর্দমা ডিঙিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়াল। চাপা নিচু গলায় বলল, 'গুরু, তুমি এখানে কী করছ? পুলিস মাকড়ারা তোমার খোঁজে এসে সেই সন্ধ্যে থেকে আমাদের মালের দোকানে তাঁবু খাটিয়ে বসে আছে। কেটে পড় গুরু—'

'পুলিশ কেন আমার খোঁজ করছে জানিস?' পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল।

'না।'

ফাণ্টা খুবই তুখোড় মাল। ব্রেনে ভালো জিনিস আছে। কিছু বললে চট করে বুঝে ফেলে। পরমেশ্বর বলল, 'তোদের মালের দোকানে লোলে আছে?'

'আছে—' ফাণ্টা ঘাড় কাত করল।

'লোলেকে একবার আসতে বল। এমনভাবে বলবি, কেউ যেন টের না পায়। বুঝলি?'

ফাণ্টা বলল, 'সমঝ গিয়া গুরু ফিকর মাত করো—' মুড এসে গেলে মাকড়া দু-চারটে হিন্দী-ফিন্দী ঝেড়ে দেয়।

ফাণ্টা চলে গেল। দু মিনিট পর লোলে এসে পড়ল। গলাটা খাদে নামিয়ে দারুণ উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, 'গুরু অ্যাদ্দিন পর কি সত্যি সত্যি ফাঁসলে! পুলিসের ভ্যান আজ তিন চারবার এসেছে। একবার বস্তিতে যাচ্ছে, একবার জগদীশের মালের দোকানে আসছে। তোমার হাতে লোহার ব্যাঙ্গল পরাবার জন্যে ওয়ারেণ্ট বার করে এনেছে। আর জেরা করে করে আমাদের ফোরটীন জেনারেশনের নাম ভুলিয়ে দিচ্ছে। কী হবে গুরু?' শেষ দিকে তার গলা কেঁপে গেল। মনে হল, মাকড়া দস্তুরমতো নার্ভাস হয়ে গেছে।

হেমাকে বললে পুলিসের এই ঝামেলাটা ঠেকানো যায়। হেমা ডেফিনিটলি তা হলে তার অথরিটিকে রিকোয়েস্ট করবে আর তাতেই এসব হ্যারাসমেণ্ট বন্ধ হয়ে যাবে। একবার পরমেশ্বর ভাবল, হেমাকে বলবে কিন্তু পরমুহূর্তেই ঠিক করল, না, বলার দরকার নেই। পুলিস তার পেছনে একটু নাচুক। সে বলল, 'কিস্সু হবে না ; তুই এক কাজ করবি—'

'কী ?'

'অমিতাভ মাকড়ার ফ্যাক্টরি ওড়াবার সময় যে হোটেলটায় ছিলাম কাল সকালে আমার ক'টা প্যাণ্ট-ফ্যাণ্ট আর মেক-আপের ট্রাঙ্কটা নিয়ে সেখানে চলে আসবি।'

'অত বড় ট্রাঙ্কটা এনে কী হবে ? তুমি কী মেক-আপ নেবে বল ; তার জিনিসপত্তর নিয়ে আসব।'

'কী মেক-আপ নিতে হবে এখন জানি না। তাই সব মাল নিয়ে আসতে বলছি।'

'ও-কে গুরু।'

'আরেকটা কথা। রোজ সকালে একবার করে ঐ হোটেলে আসবি। ওখানে আমার নাম হরেকৃষ্ণ চাকলাদার।'

'আগের বার তুমি না কী এক ট্যাঁশ হয়ে ওখানে বডি ফেলেছিলে ?'

'ইয়েস মাকড়া। শ্রীকেষ্টর মতো একশো আটটা নাম আমার। মাথায় ঢুকল ?'

'স্লাইট ঢুকেছে। তোমার জবাব নেই গুরু।'

লোলের নাকে টুসকি মেরে পরমেশ্বর বলল, 'এখন চলি রে। ফির মিলেঙ্গে—'



পরের দিনটাও হোটেলের স্যুইটে শুয়ে বসে ঘুমিয়ে এবং গান-ফান শুনে কাটিয়ে দিল পরমেশ্বর। অবশ্য সকালে মেক-আপের ঢাউস ট্রাঙ্কটা দিয়ে গেছে লোলে। তাকে দুপুর পর্যন্ত আটকে রেখেছিল সে। আর রাত সাড়ে-আটটায় হেমার ফোন এসেছে। এক্স এবং সোমেশ্বর অন্যদিনের মতো ফোনে কথা বলেছেন কিন্তু তার মধ্যে কাজের কিছুই নেই। হেমা আরো জানিয়েছে, ছোটি সিং ছুটি নিয়ে চলে গেছে এবং কাটা গ্রিলের ভেতর দিয়ে পরমেশ্বরের বেডরুমে ঢুকে খাটের পায়ার ভেতর থেকে সুইশ ব্যাঙ্কের ডকুমেণ্টগুলো সে বার করে নিয়ে এসেছে।

পরের দিন রাত সাড়ে-আটটায় আবার হেমার ফোন এল। তার গলায় দারুণ উত্তেজনা, 'একটা গুড নিউজ আছে—'

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'কী খবর ?'

'এক ঘণ্টার মধ্যে আমি আসছি। তখন বলব।'

এক ঘণ্টাও লাগল না, হেমা এসে পড়ল। তারপর একটা সোফায় বসে কোন কথা না বলে ব্যাটারি সেটের একটা টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সোমেশ্বর আর এক্সের গলা শোনা গেল।

সোমেশ্বর বলছেন, 'আমার এজেণ্ট আজই খবর এনেছে, নেক্সট উইকের বুধবার অমিতাভ সেন একটা বিজনেস ডীল করতে সিঙ্গাপুর যাচ্ছে। এয়ার-ইণ্ডিয়ার প্লেনে টিকেট 'বুক' করা হয়ে গেছে। থাকবে র‍্যাফলস স্কোয়ারের 'হোটেল ম্যাগনিফিসেণ্টে।'

'ফাইন।'

'এবার আপনার অপারেশন স্টার্ট করতে হবে।'

'সে দায়িত্ব আমার। আপনাকে আর ভাবতে হবে না। কিন্তু এক ঝামেলা থেকে যাচ্ছে।'

'কী ?'

'আপনার সঙ্গে দু'জনের ব্যাপারে আমার কনট্রাক্ট হয়েছে। একজনের ব্যবস্থা সিঙ্গাপুরে হয়ে যাবে। কিন্তু টার্গেট নাম্বার টু'র কী হবে ? ওটা না করতে পারলে ব্রীচ অফ কনট্রাক্ট হয়ে যাবে যে।'

'আপনাকে আগেই বলে দিয়েছি টার্গেট টু'র জন্য ভাবতে হবে না। আই উইল টেক কেয়ার অফ হিম।'

এক্স একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আই অ্যাম প্রফেসানাল। কনট্রাক্ট অনুযায়ী কাজ করতে না পারলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। যদি টার্গেট ওয়ানের সঙ্গে টার্গেট টু সিঙ্গাপুর যেত, একসঙ্গে দুটো অপারেশন করতে পারতাম। কনসেন্সের দিক থেকে আমি ক্লিয়ার হয়ে, যেতাম। অ্যাডভান্স ফী নিয়ে কাজ করে দিতে না পারলে কার ভালো লাগে ?'

'কিন্তু টার্গেট ওয়ানের সঙ্গে টার্গেট টু যাবে বলে মনে হয় না। দু'জনের রিলেশান এখন খুব খারাপ।'

কথাবার্তা এই পর্যন্তই।

টেপ রেকর্ডারটা বন্ধ করে হেমা বলল, 'সব শুনলেন। এবার কী করা যায় ?'

পরমেশ্বর বলল, 'সিংগাপুরে যাব। যেভাবেই হোক, এক্সকে অপারেশনের সময় ক্যাচ করতে হবে। এক্সকে কব্জা করতে পারলে সোমেশ্বরকে ফাঁসাতে পাঁচ সেকেণ্ডও লাগবে না।'

'আজ মঙ্গলবার। নেক্সট উইকের বুধবার অমিতাভ সেন আর তার পেছনে এক্স যাচ্ছে। তার মানে হাতে হার্ডলি একটা উইক রয়েছে। এর ভেতর আপনার পাসপোর্টের আর ভিসার অ্যারেঞ্জমেণ্ট করে ফেলতে হবে।'

'কিচ্ছু দরকার নেই। ও ব্যাপারটা আমি নিজেই ম্যানেজ করে ফেলতে পারব। আপনাকে শুধু একটা উপকার করে দিতে হবে।'

'বলুন।'

'কিছু সিংগাপুর কারেন্সি আমি নিয়ে যেতে চাই। একটু বেশিই নিতে হবে। আর চাই সাফিসিয়েণ্ট ডলার। কাস্টমস থেকে এগুলো পার করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেবেন।'

'অসুবিধা হবে না। তবে হায়ার অথরিটির সঙ্গে কথা বলে অ্যারেঞ্জমেণ্ট করতে হবে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর হেমা বলল, 'এক্সের আসল চেহারাটা হাজার হাজার লোক সিনেমা, টি. ভি. আর নিউজ পেপারে দেখেছে। তার ফটোগ্রাফ—থানা,

রেল স্টেশন, পোর্ট, এয়ারপোর্ট—সব জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। খবর পেয়েছি লোকটা যত খুন করেছে তার বেশির ভাগই পলিটিক্যাল নেতাদের মার্ডার। ওকে কনট্রাক্ট দিয়ে অন্য কাণ্ট্রির দু-একজন ডিপ্লোম্যাটকেও খুন করানো হয়েছে। ইণ্ডিয়ার বাইরে যাতে ও পালাতে না পারে সেই জন্য চারদিকে কড়া নজর রাখা হয়েছে। আমার ধারণা, ও মেক-আপ নিয়ে চেহারা পাল্টে বাইরে যাবে।'

'কারেক্ট। একটা জিনিস আপনাকে নিতে হবে ম্যাডাম।'

'কী জিনিস?'

'নেক্সট উইকের বুধবার এয়ার-ইণ্ডিয়ার ঐ সিংগাপুর ফ্লাইটটায় ইণ্ডিয়া থেকে কে কে যাচ্ছে তার একটা লিস্ট আমাকে যোগাড় করে দেবেন। একেবারে শেষ পর্যন্ত, যতক্ষণ না 'বুকিং' ফুল হচ্ছে মার্ক করে যাবেন।'

'নো প্রবলেম। এয়ার-ইণ্ডিয়ার বুকিং অফিসে সিক্রেট ইনস্ট্রাকসান দিয়ে রাখব। ওরা ডেফিনিটলি যারা যাবে তাদের নাম, অ্যাড্রেস, সব জানিয়ে দেবে।'

'ফাইন।'

'আর কিছু?'

'এই মোমেণ্টে আর কিছু মনে পড়ছে না। পড়লে পরে বলব।'

খানিকক্ষণ কী ভেবে হেমা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি তো সিংগাপুর যাবেন। অমিতাভ সেন আপনাকে প্লেনে দেখলে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে না।'

পরমেশ্বর বলল, 'আই নো, আই নো। আপনার কি ধারণা আমার এই চেনা থোবড়া নিয়ে এয়ার-ইণ্ডিয়ার প্লেনে উঠব?'

'আপনিও কি অন্যের মেক-আপ নিয়ে যেতে চাইছেন?'

'তা ছাড়া অলটারনেটিভ নেই।"

'কী ছদ্মবেশ ধারণ করবেন?'

'এখনও ঠিক করিনি। পরে আপনাকে জানাবো।'

বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে যায় পরমেশ্বরের। সে বলে, 'অন্য একটা ব্যাপারেও আমাকে হেল্প করতে হবে।'

'বলুন—'

'যে ছাপানো ফর্ম বা কার্ডে সিংগাপুরের ভিসা দেওয়া হয় তার একটা স্যাম্পল আজ-কালের ভেতর আমাকে যোগাড় করে দেবেন। এক রাত রেখেই ফেরত দিয়ে দেব।'

'সিওর—'



সোমেশ্বর মল্লিকের সিক্রেট এজেণ্ট এক সেকেণ্ডের জন্য পরমেশ্বরকে তার চোখের বাইরে যেতে দেয় নি। সেদিন অমিতাভ সেনের দিক থেকে ঝামেলা হবার পর সে যে সদর স্ট্রীটের হোটেলে এসে হরেকৃষ্ণ চাকলাদার হয়ে 'ইন' করেছে, সেটাও তার জানা। হোটেলের উল্টোদিকে একটা ট্যারাবাঁকা চেহারার লোক কখনও ট্যাক্সি নিয়ে, কখনও বা পাগলের মেক-আপে দিনরাত বসে বা দাঁড়িয়ে থাকে।

সোমেশ্বর মল্লিক চেয়েছিলেন পরমেশ্বর এবং অমিতাভ সেনের মধ্যে মিস-আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিংটা হোক। সেটা হয়েছেও। তিনি ভাবতে পারেন নি ক্ষেপে গিয়ে অমিতাভ পরমেশ্বরের পেছনে পুলিস লেলিয়ে দেবে! পুলিস যে সার্কুলার রোডের অ্যাপার্টমেণ্ট হাউস এবং বি. টি. রোডের বস্তিতে অনবরত হানা দিয়ে যাচ্ছে, এ খবর তিনি পেয়েছেন। ইচ্ছা করলে সিক্রেট এজেণ্ট পাঠিয়ে তিনি অমিতাভকে পরমেশ্বরের হোটেলের স্যুইট নাম্বারটা জানিয়ে দিতে পারেন। তা হলে এক ঘণ্টার ভেতর পরমেশ্বর লক-আপে ঢুকে যাবে। এতটা ড্রাস্টিক অ্যাকসান সোমেশ্বর চান না। কেননা, পরমেশ্বরের কাছে সুইস ব্যাঙ্কের সিক্রেট ডকুমেণ্টগুলো রয়েছে। তা ছাড়া এই প্রথম শ্রেণীর হারামীটা তাঁর সম্বন্ধে আরো কত সিক্রেট খবর জেনেছে, কে জানে! পুলিসে ছুঁলে পরমেশ্বর কোন্ গর্ত থেকে কোন্ সাপ বার করে আনবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তাই সোমেশ্বর এজেণ্ট মারফত অমিতাভকে হোটেলের খবরটা দেন নি। অমিতাভর সঙ্গে পরমেশ্বর ঘেঁষাঘেঁষি না করুক, দু'জনের মধ্যে টেরিফিক মিস-আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হোক, সোমেশ্বর মল্লিক আপাততঃ এর বেশি কিছু চান না। দুজনের ভেতর গোলমাল বাধিয়ে দেবার পরও তিনি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। পরমেশ্বর যে টাইপের হারামজাদা, তাতে তাকে চোখে চোখে রাখা দরকার। তাই এখনও

তিনি তার ওপর নজর রেখে চলেছেন। পরমেশ্বরের মুভমেণ্ট মার্ক করার জন্য স্পাই রাখা হয়েছে, সেটা কিন্তু এখনও টের পায় নি সে। পরমেশ্বর বরং টেরিফিক নিশ্চিন্ত একটা অ্যাটিচুড নিয়ে নেক্সট উইকের বুধবার সিঙ্গাপুর যাবার জন্য প্রিপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে।

আজ শুক্রবার। তার মানে হাতে মোটে চারটে দিন রয়েছে। বুধবার মর্নিং-এ সিঙ্গাপুরের ফ্লাইট। যা করার চার দিনের মধ্যেই পরমেশ্বরকে কমপ্লিট করে ফেলতে হবে।

হেমা সিঙ্গাপুর ভিসা কার্ডের একটা নমুনা দিয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে জাল করার যন্ত্রপাতির সেটটা পরমেশ্বর বি. টি. রোডের স্লাম থেকে লোলেকে দিয়ে আনিয়ে নিয়েছে। তা ছাড়া কাল রাত্তিরে একটা বুড়ো পার্শীর মেক-আপ নিয়ে পরমেশ্বর নিজে সেই কাটা গ্রিলটা দিয়ে সার্কুলার রোডের ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল। কারণ সোমেশ্বরের দেওয়া রণজয় হালদারের পাসপোর্টটা আর সেই পাওয়ারফুল ক্যামেরাটা বার করে আনা। সিঙ্গাপুর যাবার ব্যাপারে ঐ পাসপোর্টটার ওপর কিছু কাজ করতে হবে।

পার্শীর মেক-আপটা পরমেশ্বর নিয়েছিল এই কারণে, যাতে কেউ তাকে চিনতে না পারে। কেননা পুলিসের লোক চারদিকে ব্লাড হাউণ্ডের মতো ঘুরছে। বাই চান্স তাদের কেউ তাকে যদি চিনে ফেলে, মহা ঝামেলা হয়ে যাবে। সে জানত না, হোটেলের উল্টোদিকে সোমেশ্বর মাকড়ার এজেণ্ট হাণ্টিং ডগের মতো বসে আছে। অজান্তে মেক-আপটা নেওয়ার ফলে ঐ এজেণ্টটাকেও ধোঁকা দেওয়া গেছে।

ফ্ল্যাটে ঢুকে চোখের তারা হাই জাম্প দিয়ে ব্রহ্মতালুতে গিয়ে ঠেকেছিল পরমেশ্বরের। আগে একবার সাইক্লোন বয়ে গিয়েছিল এই ফ্ল্যাটে। এবার সাইক্লোন, টাইফুন, আর্থকোয়েক—একসঙ্গে সব যেন ঘটে গেছে। সোফাগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে ভেতরের ফোম আর স্প্রিং বার করা। খাট, ডিভান, আলমারি ওয়ার্ডরোব—সব ভাঙাচোরা। এমন কি বাথরুম আর বেডরুমগুলোর টাইলস পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় উপড়ে ফেলা হয়েছে। টের পাওয়া যাচ্ছে এসব এক্সের হ্যাণ্ডিক্র্যাফট। সুইস ব্যাঙ্কের ডকুমেণ্টগুলোর খোঁজে আরো কতবার যে এক্স এই ফাঁকা ফ্ল্যাটটায় হানা দিয়েছিল, কে জানে। কিন্তু মাকড়া যত বার এখানে এসেছে ততবার নিশ্চয়ই দু হাতের দুটো বুড়ো আঙুল চুষতে চুষতে ফিরে গেছে। ডকুমেণ্টগুলো এখন হেমার কাছে সেফ কাস্টডিতে রয়েছে। ওখান থেকে এক্স কেন, এক্সের ফোরফাদারও ওগুলো বার করতে পারবে না।

যাই হোক, আজ সকালে উঠে পুরোদমে পাসপোর্টের ব্যাপারে অ্যাক্টিভিটি

শুরু করে দিয়েছে পরমেশ্বর। অনেক চিন্তা-ফিন্তা করে সে এক আধ-বুড়ো শিখের মেক-আপ নিয়ে ক্যামেরা রেডি করে বসে রইল। সাড়ে-আটটায় লোলে আসবে। এসেই তার ছবি তুলে ডেভেলাপ করবার জন্য পার্ক স্টীটে ফোটোগ্রাফারের দোকানে ছুটবে। এক ঘণ্টার ভেতর ছ সাতটা পাসপোর্ট সাইজের ফোটো করিয়ে আবার ফিরে আসবে।

পাক্কা সাড়ে-আটটায় লোলে এসে হাজির। মাকড়ার পা দুটো ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে আটকানো।

লোলে পরমেশ্বরকে দেখে খানিকক্ষণ হাঁ হয়ে থাকল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এটা তুমি কী ম্যাজিক দেখাচ্ছ গুরু?'

পরমেশ্বর বলল, 'আমি এখন যশমিন্দর সিং গিল—পাঞ্জাবের গুরগাও জেলার সর্দার।'

'তোমার জাদুকি খেলের শেষ নেই গুরু।'

লোলেকে আর দেরি করতে দিল না পরমেশ্বর। ঝটপট ছবি তুলিয়ে ডেভালাপ করার জন্য ফোটোগ্রাফারের কাছে পাঠিয়ে দিল। তারপর শিখের মেক-আপ খুলে আবার অরিজিন্যাল পরমেশ্বর হয়ে গেল।

ঘণ্টাদেড়েক বাদে লোলে যশমিন্দর সিংয়ের আট কপি পাসপোর্ট ফোটো করিয়ে আনল।

পরমেশ্বর রণজয় হালদারের ইণ্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট থেকে তার ফোটোটা তুলে সর্দারজীর অর্থাৎ যশমন্দিরের ফোটো বসিয়ে দিল। আগে থেকেই খানিকটা মিহি ফিনফিনে ধুলো আর কেমিক্যাল যোগাড় করে রেখেছিল সে। পাসপোর্টের ফোটোটার ওপর সেই ধুলো টুলো ঘষে ঘষে ওটার অবস্থা এমন করল যাতে দেখামাত্র মনে হবে ফোটোটা বেশ কিছুদিন আগের তোলা।

ফোটোটা পেস্ট করার পর কেমিক্যাল দিয়ে রণজয় হালদারের নামটা তুলে যশমিন্দর সিংয়ের নাম লিখল পরমেশ্বর। রণজয় হালদারের অ্যাড্রেস যা ছিল তা-ই থেকে গেল। এবার সিঙ্গাপুরের ভিসা কার্ডটার ওপর নজর দিল সে। অবিকল ঐ রকম কার্ড এর ভেতর বানিয়ে ফেলেছে সে। এমন কি ভিসা কার্ডে যে রাবার স্ট্যাম্প আর এমব্যাসির ইস্যুইং অফিসারের যে সিগনেচার রয়েছে সেগুলো হুবহু নকল করে তার নতুন কার্ডে বসিয়ে দিয়েছে।

গোটা ব্যাপারটা চোখের তারা ফিক্সড করে মার্ক করে যাচ্ছিল লোলে। পরমেশ্বরের কাজটা কমপ্লিট হলে সে জিজ্ঞেস করল, 'গুরু, সর্দারের দাড়ি আর পাগড়ি চড়িয়ে তুমি বাইরে যাচ্ছ নাকি?'

পরমেশ্বর ঘাড় কাত করল, 'ইয়েস।'

'সিঙ্গাপুর?'

'হুঁ।'

'সে জায়গাটা কোথায় গুরু?'

'সোনারপুরের ওধারে।'

'যখন মেক-আপ চড়িয়ে যাচ্ছ তখন জরুর কিছু গড়বড় আছে।'

'তা স্লাইট আছে।'

'কোন অপারেশনের ব্যাপার?'

'হুঁ।'

লোলে বলল, 'কেসটা যদি বেশী ঝামেলার হয় আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চল। আমি জিন্দা থাকতে তোমার চামড়ায় কেউ টাচ করতে পারবে না।'

মাকড়াটা তাকে খুবই ভালোবাসে, পরমেশ্বর ভাবল। বলল, 'তেমন ঝামেলা হবে না। ভাবিস না; আমি ম্যানেজ করে নিতে পারব।'

'না পারলে লজ্জা-ফজ্জা করো না।'

'আরে বাবা, দরকার হলে তোকে ঠিকই সঙ্গে করে নিতাম। একটা কথা—'

'বল।'

'আমি যে বাইরে যাচ্ছি, এ খবর কেউ যেন জানতে না পারে। তা হলে সব কিচাইন হয়ে যাবে। এমন কি মাদার, জোড়া মানকে, টগর, লক্ষ্মীদেরও বলবি না।'

'ক্ষেপেছ গুরু। তুমি একবার যখন অর্ডার দিয়েছ তখন ঠোঁট স্টিকিং গাম দিয়ে আটকে দিলাম। পেটে অ্যাটম বোমা চার্জ করলেও কেউ খবর বার করতে পারবে না। ও-কে?'

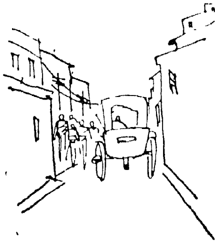
'ও-কে?'

'সিঙ্গাপুরে অপারেশন ফিনিস করতে ক'দিন লাগবে তোমার?'

একটু ভেবে পরমেশ্বর বলল, 'ম্যাক্সিমাম দশ-বারো দিন।'

লোলে জিজ্ঞেস করল, 'তারপর আর ফরেনে বডি ফেলে রেখো না।'

'পাগল হয়েছিস মাকড়া! তোদের ফেলে বাইরে গিয়ে থাকতে পারি?'



বুধবার সকালে সিঙ্গাপুরের ফ্লাইট। মঙ্গলবার রাত্তিরে হেমা পরমেশ্বরের হোটেলে চলে এল।

এর মধ্যে একটা নতুন সিনথেটিকের স্যুটকেসে দশবারোটা স্যুট, ব্রাশ, পেস্ট এবং টুকিটাকি অনেক জিনিস পুরে নিয়েছে। তা ছাড়া একটা কিট-ব্যাগও জুটিয়ে নিয়েছে। যেসব মাল স্যুটকেসে ধরে নি সেগুলো কিট ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়েছে সে। আর লোলেকে দিয়ে বি. টি. রোডের বস্তি থেকে আনিয়ে নিয়েছে একটা রিভলভার। রিভলবারটা অদ্ভুত টাইপের। সেটা এক সময় মেণ্ডেজই বানিয়ে দিয়েছিল; ওটার জন্য স্পেশ্যাল বুলেটও সে করে দিয়েছে। রিভলবারটা আটটা পার্টে ভাগ করা যায়। প্রত্যেকটা পার্ট আলাদা করে নিলে একেকটা কসমেটিকের কৌটো হয়ে দাঁড়ায়। সেগুলোর মধ্যে সেণ্ট, ক্রিম, হেয়ার টনিক লোশন ভরে নিলে কারো ফাদারের ক্ষমতা নেই যে সবগুলো পার্ট একসঙ্গে জোড়া লাগালে বুঝতে পারে একটা ডেঞ্জারাস কারবার হয়ে দাঁড়ায়। বুলেটগুলো পর পর সাজিয়ে কিট-ব্যাগের হ্যাণ্ডেল বানিয়ে নিয়েছে সে।

এমনিতে পরমেশ্বর হানড্রেড পারসেণ্ট নন-ভায়োলেণ্ট—পাক্কা অহিংস। কোনদিন রিভলবারটা কোন কারণেই সে কাজে লাগায় নি। ফরেনে ওটা নিয়ে যাচ্ছে, তার কারণ এই রকম। যে এক্স অমিতাভ সেনের পেছন পেছন সিঙ্গাপুর চলেছে সে গব্য-ঘৃতে ভাজা সুজির মালপো-খাওয়া নন-ভায়োলেণ্ট মাল নয়। পঁচিশটা খুনের রেকর্ড রয়েছে তার ক্রেডিটে। তা ছাড়া আচমকা একটা কথা মনে পড়ে গেল পরমেশ্বরের। মেণ্ডেজকে দিয়ে একটা ডেঞ্জারাস 'গান' তৈরি করিয়ে নিয়েছে সে। খালি হাত-পায়ে ঐ রকম একখানা খজড়ার সঙ্গে ফাইট চালানো কোন কাজের কথা নয়।

এ ছাড়া সিংগাপুরের টিকিটও কাটা হয়ে গেছে তার।

হেমা স্যুটকেস, কিট-ব্যাগ ইত্যাদি দেখার পর বলল, 'আপনার পাসপোর্ট আর ভিসাটা আরেক বার দেখান।' আগেও একবার ওগুলো দেখেছে সে।

পরমেশ্বর নকল ভিসা এবং পাসপোর্টটা হেমার হাতে দিল। উলটে পালটে দেখতে দেখতে সে বলল, 'একেবারে অরিজিন্যাল মনে হয়। আপনার হাতের কাজ একসেলেণ্ট যশমিন্দর সিংজী।'

পরমেশ্বর বলল, 'এখন থেকে আপনিও আমাকে যশমিন্দর সিং বলবেন নাকি ?'

'ওটা অভ্যাস করা ভালো। কখন মুখ থেকে স্লিপ করে রণজয় হালদার কি পরমেশ্বর সাহেব বেরিয়ে পড়বে ; তাতে নতুন এক প্রবলেম তৈরি হয়ে যাবে।'

'সেটা ঠিক। কিন্তু নতুন নামে ডাকার হ্যাবিট করবেন যে, তার সময় পাচ্ছেন কোথায় ? আমি তো কাল মর্নিং-য়েই ইণ্ডিয়া থেকে ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছি।'

'তাই তো। এনিওয়ে, আজকের রাতটা তো অন্ততঃ প্র্যাকটিশ করি।'

উত্তর না দিয়ে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'আমার সিঙ্গাপুর কারেন্সি ?'

হেমা তার ব্যাগ থেকে একটা মোটা কাগজের ঢাউস এনভেলাপ বার করে পরমেশ্বরকে দিতে দিতে বলল, 'এর মধ্যে সিঙ্গাপুর কারেন্সি ছাড়া বিশ হাজার ডলারও রয়েছে। আশা করি কাজে লাগবে।'

'এয়ারপোর্ট কাস্টমসের ব্যাপারটা কী হবে ?'

'ওখানে ইনস্ট্রাকশান দেওয়া আছে। কেউ আটকাবে না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'নো মেনসান। এই নিন, কালকের ফ্লাইটে সিঙ্গাপুরের প্যাসেঞ্জারদের লিস্ট। যশমিন্দর সিংকে নিয়ে টোটাল একচল্লিশ জন। তার মধ্যে আঠারো জন জাপানী স্টুডেণ্ট। ইণ্ডিয়া দেখে সিঙ্গাপুর হয়ে ওরা টোকিও যাবে। জেনুইন জাপানীজ টুরিস্টস। দু'জন হলেন যশমিন্দর সিং আর অমিতাভ সেন। এঁদের বাদ দিলে থাকে একুশজন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন মেম্বারের একটা সিন্ধী গিধোয়ানি ফ্যামিলি রয়েছে। ওরাও জেনুইন—তিন জেনারেশন ধরে সিঙ্গাপুরে ডোমিসাইল্ড। কলকাতায় আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মাসখানেক কাটিয়ে ফিরে যাচ্ছে। একজন আছে একচোখ কানা প্রফেসর মধুকর শ্রীবাস্তব—এলাহাবাদের বাসিন্দা ; সিঙ্গাপুরের একটা কলেজে চাকরি নিয়ে যাচ্ছেন, তিনিও জেনুইন। বাকী পনের জনের তিনজন ব্যাডমিণ্টন স্টার, ইণ্ডিয়াকে ওরা রিপ্রেজেণ্ট করে। খুবই ফ্যামিলিয়ার নাম আর চেহারা। প্রায়ই নিউজপেপারের স্পোর্টস পেজে ওদের ছবি বেরোয়। ওরা সিঙ্গাপুর চলেছে কী একটা এশিয়ান টুর্নামেণ্টে খেলতে। এই ব্যাডমিণ্টন প্লেয়ারগুলো সম্পর্কেও সন্দেহ করার কিছু নেই। এদের বাদ দিয়ে থাকে বারো জন।

এই বারো জনের মধ্যে আটজন ইউরোপীয়ান আর আমেরিকান টুরিস্ট। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে তারাও জেনুইন—কোন রকম ভেজাল নেই।

আটজন মাইনাস করার পর যে চার জন থাকে তাদের একজনও ক্যালকাটার নয়। ওরা আসছে অন্য প্রভিন্স থেকে, আর আজকেই টিকেট 'বুক' করেছে। ওদের একজন হলেন এম-পি'র এক মিশনের ফাদার—ফাদার মাইকেল ডি মেলো; মনে হয় ইণ্ডিয়ান কৃশ্চান। সেকেণ্ড মনসুখলাল ভাটিয়া—দিল্লীর এক বিজনেসম্যান। থার্ড স্যামুয়েল কৃষ্ণমূর্তি—বাঙ্গালোরের এক ইঞ্জিনিয়ার। ফোর্থ হলো এক মহিলা ফ্লোরা নাইট। ইনি আসছেন পাটনা থেকে। মনে হয় ইনিও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। সবাইকেই জেনুইন মনে হয়। তবু ফাদার ডি মেলো, ভাটিয়া, কৃষ্ণমূর্তি, শ্রীবাস্তব আর ফ্লোরা নাইট সম্পর্কে ডিটেল খবর নেবার জন্য এম-পি, দিল্লী, বাঙ্গালোর, এলাহাবাদ আর পাটনায় টেলেক্স পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কাল বিকেলের আগে খবর আসবে না।'

'ফ্লোরা নাইট তো মেয়েমানুষ। তার সম্পর্কে খবর নেবার দরকার কী?'

'মেয়েমানুষ হলে কী হয়। সে এক্সের একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হতে পারে। সন্দেহের লিস্ট থেকে কাউকে বাদ দেওয়া ঠিক নয়।'

'কিন্তু যে লিস্ট প্লেস করলেন তাতে এক্সের গন্ধ পর্যন্ত কোথাও নেই।'

'তাই তো দেখছি। তবু একটু নাড়াচাড়া দিয়ে খোঁজখবর নিয়ে দেখা যাক। আরেকটা কথা—'

'বলুন।'

'সিঙ্গাপুর যাবার আগে এই আমাদের শেষ দেখা। কাল সকালে আমার একটা ইমপরট্যাণ্ট অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে। এয়ারপোর্টে যেতে পারব না। উইশ ইউ এ সেফ অ্যাণ্ড একসেলেণ্ট ফ্লাইট অ্যাণ্ড অলরাউণ্ড সাকসেস ইন দা মিশন।'

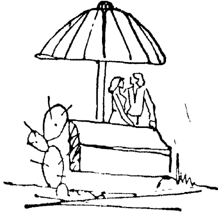
'থ্যাঙ্কস।' বলে একটু চুপ করে থেকে পরমেশ্বর ফের শুরু করল, 'আমি তো সিঙ্গাপুর যাচ্ছি; আর যদি না ফিরি?'

হেমা বলল, 'আমার হাতের বাইরে যাবার ক্ষমতা আপনার নেই।'

'ইণ্ডিয়ান ইনটেলিজেন্সের রাজত্ব কি সিঙ্গাপুর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে?'

'নো। ফিরে না এলে আপনার নিজেকে জানবেন কী করে? ওটা কিন্তু আমার হাতেই থেকে গেছে।'

এ কথাটা এই মোমেণ্টে ভাবে নি পরমেশ্বর। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সে বলল, 'রাইট; আমাকে কব্জা করার বেস্ট অস্ত্রটাই নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন। আমাকে সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে আসতেই হবে।'



এয়ারপোর্টের ইণ্টারন্যাশনাল উইং-এ সিঙ্গাপুরের প্যাসেঞ্জাররা পাসপোর্ট ভিসা হাতে করে মালপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একচল্লিশ জন প্যাসেঞ্জারের লম্বা 'কিউ'র একেবারে শেষে পরমেশ্বর। পরমেশ্বর নয়, সর্দার যশমিন্দর সিং গিল। ইচ্ছে করেই লাইনের লেজের দিকে দাঁড়িয়েছে সে। কারণ এখান থেকে অন্য প্যাসেঞ্জারদের ওপর নজর রাখতে সুবিধা হয়।

একেবারে সামনে রয়েছে জাপানী স্টুডেণ্টরা, তারপর অমিতাভ সেন; অমিতাভর পর অন্য সব লোকজন। তাদের মধ্যে একজন মধ্যবয়সী মিশনারী ফাদারকে দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই ফাদার মাইকেল ডিমেলো। পরনের ঢোলা সারপ্লিস তাঁকে ফাদার বলে চিনিয়ে দিল। প্রফেসর শ্রীবাস্তবকেও চিনতে অসুবিধা হলো না। তাঁর একটা চোখ ভালো, আরেকটা খারাপ। ভালো চোখে অল্প পাওয়ারের লেন্স, অন্ধ চোখটায় কালো ঠুলি।

পরমেশ্বরের ঠিক আগে রয়েছে দামী স্কার্ট-পরা ব্লণ্ড একটি যুবতী; বাদামী ভুরুর তলায় তার লম্বাটে চোখ। মনে হয় মেয়েটি ইউরেশিয়ান। হয়ত কাল রাত্তিরে হেমা যার কথা বলেছিল সেই ফ্লোরা নাইটই হবে। কেননা, চল্লিশ জন প্যাসেঞ্জারের ভেতরে সে ছাড়া অন্য কোন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, ইওরোপীয়ান বা ইউরেশিয়ান যুবতী নেই।

এই দু'জন এবং জাপানী স্টুডেণ্টগুলো আর ব্যাডমিণ্টন প্লেয়াররা ছাড়া আর কার যে কী আইডেণ্টিটি এবং কী নাম, জানার উপায় নেই। এনিওয়ে সে সবার ওপর নজর রেখে যাবে।

পাসপোর্ট ভিসা দেখা, প্রতিটি প্যাসেঞ্জারের ব্যাগ স্যুটকেশ চেক করা ইত্যাদি ফর্মালিটি কমপ্লীট করতে অনেকটা করে সময় লেগে যাচ্ছে।

পরমেশ্বরের সামনে যে ইউরেশিয়ান মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে সে নিজের মনেই পারফেক্ট অ্যাকসেণ্টে বলে উঠল, 'টেকিং সো মাচ টাইম।' তবে গলার স্বর তার কিছুটা চাপা; ইংরেজিতে যাকে বলে হাস্কি।

মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা হচ্ছিল পরমেশ্বরের। পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত ছুঁড়িটার হোল বডি জুড়ে টেরিফিক সেক্স। মেয়েটা যেন একখানা হাই এক্সপ্লোসিভ বম্ব। ওর সঙ্গে আলাপ করার কারণ একটাই। কাল রাত্তিরে হেমা পরমেশ্বরের ব্রেনে একটা কথা ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। মেয়েমানুষ হলেও ছেড়ে দেওয়া ঠিক না। এক্সের অ্যাসিস্টাণ্ট বা সহকারিণী হতে পারে সে। পরমেশ্বর আস্তে করে কমেণ্ট করল, 'রীয়ালি টায়ারসাম।'

ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটি এক সেকেণ্ড পরমেশ্বরের দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'ওহ সিওর—এয়ারপোর্টের এই ফর্মালিটিগুলো দু-এক মিনিটের মধ্যে শেষ করে ফেলা উচিত।'

মাথা ঝাঁকিয়ে তক্ষুণি সায় দিল পরমেশ্বর, 'রাইট। এতে প্যাসেঞ্জারদের অনেক সুবিধা হয়।'

দশ মিনিটের মধ্যে পরমেশ্বর মেয়েটির সঙ্গে জমিয়ে ফেলল। জানা গেল, তার নাম ফ্লোরা নাইট। এটাই অবশ্য আন্দাজ করেছিল পরমেশ্বর। আরো জানা গেলো, ফ্লোরা নাইট জাতে ইউরেশিয়ান। তার বাবা ইওরোপীয়ান, ব্রিটিশ; মা ইণ্ডিয়ান, তামিলনাড়ুর ব্রাহ্মণ ফ্যামিলির মেয়ে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সে; পাটনায় থাকে—ওখানকার মেডিক্যাল কলেজের 'গাইনি' ডিপার্টমেণ্টের ডাক্তার। সিঙ্গাপুরের একটা প্রাইভেট কোম্পানির মেডিক্যাল ইউনিটে ভালো অফার পেয়ে যাচ্ছে। আপাতত এক বছরের কনট্রাক্ট; জায়গাটা পছন্দ হলে আরো এক বছর থাকা যেতে পারে। তবে পার্মানেণ্টলি সিঙ্গাপুরে সেটেল করার একেবারেই ইচ্ছা নেই। আফটার অল, নিজের কান্ট্রি ছেড়ে অন্য দেশে থাকতে কারই বা ভালো লাগে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইউরেশিয়ান বা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েরা যেমন হয়, ফ্লোরা নাইটও হুবহু তা-ই। ড্যাম ফ্রি এবং কিছুটা সরলও।

মেয়েটা যখন নিজের থেকে প্রায় গায়ে বডি ফেলেই এত কথা বলছে তখন পরমেশ্বর অর্থাৎ যশমিন্দর সিংকেও নিজের সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলতে হয়। পরমেশ্বর জানালো সে কলকাতার একজন বিজনেসম্যান; সিঙ্গাপুরে বেড়াতে যাচ্ছে। রথ দেখা কলা বেচার মতো বেড়াতে গিয়ে যদি ওখানে বিজনেসের কিছু ধান্দা হয়ে যায়, নাথিং লাইক ইট।

ফ্লোরা নাইট জিজ্ঞেস করল, 'কত দিন সিঙ্গাপুরে থাকছেন?'

পরমেশ্বর বলল, 'তিন মাসের ভিসা পেয়েছি। তবে পনের কুড়ি দিনের বেশি থাকার ইচ্ছা নেই। জায়গাটা ভালো লেগে গেলে অবশ্য অন্য কথা।'

'আশা করি সিঙ্গাপুরে যে ক'দিন থাকছেন, দেখা হবে।'

'অফ কোর্স।'

ফ্লোরার সঙ্গে পরমেশ্বর কথা বলছিল ঠিকই, তবে তার চোখ অনবরত চরকির মতো অন্য প্যাসেঞ্জারদের মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে যাচ্ছিল। এর মধ্যে জাপানী স্টুডেন্টগুলো কাস্টমস, পাসপোর্ট আর সিকিউরিটি এনক্লোজারের সব ফর্মালিটি কমপ্লীট করে ডিপারচার লাউঞ্জে ঢুকে গেছে। বাকী যারা রয়েছে তাদের কারো সঙ্গেই এক্সের চেহারার এতটুকু মিল নেই। তবে একটা ব্যাপার তার চোখে পড়েছে, ঘন জঙ্গলের মতো কাঁচা-পাকা দাড়ি গোঁফওলা ফাদার মাইকেল ডি. মেলোর ডান পা'টা ডিফেকটিভ। 'কিউ'টা নড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফাদার পা টেনে টেনে এগিয়ে যাচ্ছেন। ভালো করে মার্ক করতেই সে দেখতে পেল, ফাদারের ডান পায়ে হাঁটু পর্যন্ত একটা প্ল্যাস্টার। এই ওল্ড এজে ফাদার পা'টা ভাঙ্গল কী করে? ভদ্রলোকের জন্য মনে মনে খানিকটা সিমপ্যাথি হতে লাগল পরমেশ্বরের।

আরো এক ঘণ্টার মধ্যে বাকী প্যাসেঞ্জারদের সব রকম ফর্মালিটি কমপ্লীট হয়ে গেল।

কাস্টমস বা সিকিউরিটি এনক্লোজারে যাবার সময় হৃৎপিণ্ডটা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য যেন থমকে গিয়েছিল পরমেশ্বরের। পাসপোর্ট বা ভিসা যতটা সম্ভব নিখুঁতভাবে জাল করেছে সে। তবু বলা যায় না, যদি কোথাও কিছু খুঁত-টুঁত থেকে যায়। তাছাড়া তার কাছে প্রচুর ডলার-টলার রয়েছে; আগা-পাশতলা 'চেক' করলে ঝামেলা হয়ে যাবে। যদিও হেমা কাল রাত্তিরে লিবারেল চেকিংয়ের ভরসা দিয়ে গিয়েছিল তবু কমপ্লীটলি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না পরমেশ্বর।

কিন্তু কাস্টমস, পাসপোর্ট বা সিকিউরিটিতে প্রায় কিছুই চেক করা হল না। এতগুলো এনক্লোজার পেরুতে মোটে তিন মিনিট সময় লাগল পরমেশ্বরের। তারপর বোর্ডিং কার্ড আর ব্যাগেজের কুপন হাতে নিয়ে ডিপারচার লাউঞ্জে আসতেই দেখা গেল এয়ারক্র্যাফটে নিয়ে যাবার জন্য বাইরে দুটো কোচ দাঁড়িয়ে আছে। কাজেই আর লাউঞ্জে বডি রেখে বসবার সময় পাওয়া গেল না। অন্য প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে 'কিউ' দিয়ে কোচের দিকে হাঁটতে লাগল পরমেশ্বর। এদিকে লাউড স্পীকারে অনবরত অ্যানাউন্সমেণ্ট হয়ে যাচ্ছেঃ ফ্লাইট নাম্বার অমুক বাউণ্ড ফর সিঙ্গাপুর ইজ গোয়িং টু টেক অফ অ্যাট নাইন টোয়েণ্টি আওয়ার্স—প্যাসেঞ্জারস আর রিকোয়েস্টেড টু প্রসীড···

পরমেশ্বর আশা করেছিল এয়ারক্র্যাফ্‌টে সে আর ফ্লোরা পাশাপাশি বসতে পারবে। কেননা এয়ারপোর্টে ফর্মালিটির জন্য তারা 'কিউ'তে পর পর দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু প্লেনে উঠতে দেখা গেল ফাদারের সীটটা পড়েছে ঠিক তারই পাশে। ঐ রকম একখানা এইট-এইটি ভোল্টের টেরিফিক সেক্সি জিনিসের পাশে বসলে ব্লাড সার্কুলেশন ভালো থাকে; চোখে সারাক্ষণ সুইট ড্রিম নেচে যায়। তার বদলে শ্লা ঠ্যাঙে প্ল্যাস্টারওলা, আধবুড়ো, সারা মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, ঢোলা আলখাল্লায় ঢাকা বডি একটি মালের সঙ্গে সাড়ে-তিন ঘণ্টা কাটাতে হবে। ভাবতেই ব্লাড প্রেসার হুড় হুড় করে 'ফল' করে যেতে লাগল। কিন্তু কী আর করা যাবে। শ্লা কপাল!

ঘড়ির কাঁটায় নাইন টোয়েন্টি আওয়ার্সে অর্থাৎ ন'টা কুড়িতেই প্লেন টেক-অফ করল। এয়ার-বোর্ন হবার পর সীট বেল্ট খুলতেই এয়ার হোস্টেস ফ্রুট-জুস, লজেন্স, চকোলেট, মৌরি ইত্যাদি সার্ভ করে গেল।

সী লেভেল থেকে পঁচিশ-তিরিশ হাজার ফুট উঁচুতে অ্যাটমসফীয়ারের এয়ার প্রেসারে হয়ত কিছু গোলমাল ছিল; এয়ার-ক্রাফ্‌টটা বার বার বাম্প করছে।

ফাদার ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হোয়াটস রং ইন দা অ্যাটমসফীয়ার?'

খুব সম্ভব ফাদারের এই প্রথম প্লেনে চড়া। তাই হাই অলটিটিউডের কারবার জানে না। পরমেশ্বর আগে নানা অপারেশনের জন্য অনেকবার প্লেনে উঠেছে। সে বাম্পের কারণটা জানিয়ে দিল।

আস্তে আস্তে আলাপ জমে উঠল ফাদারের সঙ্গে।

ফাদার জানালেন, এই প্রথম তিনি ফরেনে যাচ্ছেন। যাবার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। তবে সিঙ্গাপুরের চার্চ অনেক দিন ধরে তাঁকে ইনভাইট করছে, না গেলে ভীষণ খারাপ দেখায়। তাই যাওয়া। দিন সাতেক ওখানে থাকতে হবে।

এর পর ক্রিশ্চানিটি, প্রোটেস্টাণ্ট, ক্যাথলিক, নানা মেথডিস্ট চার্চের তফাত ইত্যাদি ইত্যাদি সম্পর্কে বক্তব্য ঝেড়ে ব্রেন এবং কানের মেশিনারি কমপ্লীটলি লুজ করে ফেললেন ফাদার। শুধু কি তাই, বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেণ্ট আর নিউ টেস্টামেণ্টটাও পরমেশ্বরের কানের ভেতর ঠেসে ঠেসে গুঁজে দিতে লাগলেন। মনে হল, মাকড়া তার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে।

বাইবেল-টাইবেল থেকে ফাদারের অ্যাটেনসান অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'ফাদার, আপনার পায়ে প্ল্যাস্টার দেখছি। ফ্র্যাকচার-ট্র্যাকচার হয়েছে নাকি?'

খুব সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলেন ফাদার ডি মেলো। মধ্যপ্রদেশে

যেখানে তিনি থাকেন সেটা পাহাড়ী রিজিয়ন। দিন সাতেক আগে একটা টিলা থেকে পা ফসকে পড়ে গিয়ে পায়ে ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে। এদিকে সিঙ্গাপুরের ইনভিটেসনটা নিয়ে বসে আছেন। না গেলে ভীষণ খারাপ দেখায়। তাই পায়ে প্ল্যাস্টার নিয়ে তাঁকে প্লেনে চড়তে হয়েছে।

কথা ক'টা শেষ করেই আবার মেথডিস্ট চার্চ আর বাইবেলে ফিরে গেলেন ফাদার ডি মেলো। পরমেশ্বর ভাবল আজ মর্নিং-এ কার মুখ দেখে যে উঠেছিল! ফাদার কি টের পেয়ে গেছেন যে সে একজন উৎকৃষ্ট ফোর টোয়েন্টি, ফার্স্ট গ্রেডের চীট? বড় বড় সাধু ফকির আর ক্লার্জিম্যানরা নাকি মুখ দেখে লোকের ক্যারেক্টার বুঝতে পারে। তার চরিত্র শোধনের জন্য কি বাইবেল-টাইবেল আউড়ে যাচ্ছেন ফাদার? কিন্তু ফাদার তো জানেন না, সে যা মাল তাতে ওয়ার্ল্ডের সব সাধু সব ফকির সব বিশপ বা আর্চবিশপ মিলিয়েও তার সিন শোধরাতে পারবে না। সে সবরকম পিউরিফিকেসনের বাইরে।

যেভাবে অনবরত ফাদার ডি মেলো বকে যাচ্ছেন তাতে পরমেশ্বরের মনে হল, আর বসে থাকা ঠিক হবে না। এবার খানিকক্ষণ ঘুরে-টুরে আসা ভালো। তাতে ফাদারের হাত থেকে অন্ততঃ কিছুটা সময়ের জন্যে রেহাই পাওয়া যাবে; তাছাড়া এয়ারক্রাফ্‌টের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত একবার ঘুরে আসতে পারলে সবগুলো প্যাসেঞ্জারকেও একবার ভালো করে দেখে নিতে পারবে। 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাউকে তখন তেমন মার্ক করা যায় নি।

টয়লেটে যাবার নাম করে উঠে পড়ল পরমেশ্বর। প্লেনের সামনে এবং পেছনে দু'দিকেই টয়লেট। সীটগুলো তিন ভাগে সাজানো। দু' ধারের জানলার পাশে ছাড়াও মাঝখানে সীটের 'রো' রয়েছে।

এয়ার ক্রাফটটা 'ফুল' না; মাঝে মাঝে দু-চারটে সীট ফাঁকা পড়ে রয়েছে। সীটের রোয়ের পাশ দিয়ে দিয়ে কার্পেট-পাতা প্যাসেজ। তার ওপর দিয়ে প্লেনের সামনের দিক থেকে পেছনে চলে গেল পরমেশ্বর। তারপর মাঝখানের সীটগুলোর ওধার দিয়ে আবার পেছন থেকে সামনে চলে এল।

এই প্লেনটা ডাইরেক্টলি কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুর যাচ্ছে না; এটা আসছে রোম বাহেরিন কায়রো দিল্লী টাচ করতে করতে। কলকাতায় স্টপওভারের পর নন-স্টপ যাবে সিঙ্গাপুর। সেখানে থেকে ম্যানিলা হয়ে স্ট্রেট টোকিও।

কাজেই কলকাতার প্যাসেঞ্জার ছাড়াও আগে থেকে অন্য প্যাসেঞ্জাররা ছিলই। কিন্তু আগের এয়ারপোর্টের প্যাসেঞ্জারদের নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই।

মার্ক করে করে যে ক'জন ক্যালকাটার যাত্রী পাওয়া গেল, তাদের লক্ষ্য করতে লাগল পরমেশ্বর ; কিন্তু না, সন্দেহ করবার মতো একটা মাকড়াকেও পাওয়া গেল না। অবশ্য এয়ারক্র্যাফটের লেজের দিকে অমিতাভ সেনকে দেখতে পেয়েছে সে। ব্রিফ কেস খুলে টেরিফিক অ্যাটেনশান দিয়ে কী সব কাগজপত্র দেখছে সে। খুব সম্ভব সিঙ্গাপুরে যে বিজনেসের ব্যাপারে যাচ্ছে তারই ডকুমেন্ট-টকুমেন্ট।

ওধারের প্যাসেজ ধরে ঘুরতে ঘুরতে আচমকা কার ডাক কানে ভেসে এল, 'হাই—'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই পরমেশ্বর দেখল, ফ্লোরা নাইট হাসছে। সে-ও খানিকটা হাসি তাকে প্রেজেন্টেসন দিয়ে হাত নাড়ল। তারপর এগিয়ে চলল। ছুকরি দারুণ ভালো টাইপের খেলোয়াড় তো! নিজে ডেকে ডেকে যখন চুলকে দিচ্ছে তখন সিঙ্গাপুরে যাবার পর ডেফিনিটলি আরো খেল-টেল দেখাবে। অন্য সময় হলে লড়ে যেত পরমেশ্বর। কিন্তু এখানে সে টেরিফিক সীরিয়াস ব্যাপারে এসেছে। তবু তারই মধ্যে যদি চান্স পাওয়া যায়, তখন কী করবে, এই মোমেন্টে বলা সম্ভব না।

ফ্লোরা নাইটের 'রো'য়ে তার থেকে তিনটে সীট পর বসে আছে এক-চোখ কানা শ্রীবাস্তব। তার দিকে ভালো করে তাকালেই না পরমেশ্বর।

কাল রাত্রে হেমা বলেছিল, সিঙ্গাপুরের এই ফ্লাইটে যে একচল্লিশ জন যাচ্ছে তাদের পঁয়ত্রিশ জন সম্পর্কেই খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। তাদের আইডেনটিটিতে কোন রকম গোলমাল নেই। বাকী ছ' জনের একজন যশমিন্দর সিং অর্থাৎ পরমেশ্বর নিজে। তার পরও যে পাঁচজন থাকে তাদের দু'জন—ফ্লোরা নাইট এবং ফাদার ডি-মেলোর সঙ্গে এর মধ্যেই আলাপ-টালাপ জমিয়ে নিয়েছে পরমেশ্বর। কিন্তু বাকী তিনজনের সঙ্গে কথা বলার চান্স পাওয়া যায় নি। এয়ারপোর্টের ইন্টারন্যাশনাল উইং-এ যখন 'কিউ'র শেষ মাথায় সে দাঁড়িয়ে ছিল সেই সময় 'কিউ'র সামনের দিকে ছিল ভাটিয়া, শ্রীবাস্তব আর কৃষ্ণমূর্তি। অবশ্য তারাই যে কৃষ্ণমূর্তি এবং ভাটিয়া সে সম্পর্কে পরমেশ্বর পুরোপুরি নিশ্চিত না। জাপানী, আমেরিকান, ইউরোপীয়ান, গিধোয়ানী ফ্যামিলি ইত্যাদি বাদ দিতে দিতে যে দু'জন বাকী থাকে তাদের একজনের ভাটিয়া এবং আরেকজনের কৃষ্ণমূর্তি হওয়া উচিত। এইভাবে সে ধারণা করে নিয়েছে।

প্যাসেজ দিয়ে যেতে যেতে মাঝখানের 'রো'গুলোর মাঝামাঝি একটা সীটে ওদের দু'জনের একজনকে দেখতে পেল পরমেশ্বর। লোকটা দারুণ গুড স্টুডেন্টের মতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। বাকী মালটি

বসেছে একেবারে ফ্রণ্ট 'রো'য়ে। সে মাকড়া তার সামনের সীটের ব্যাক থেকে ইমপ্রোভাইজড টেবল বার করে পোর্টেবল টাইপ রাইটারে টকটক করে কী টাইপ করে যাচ্ছে। শালা ড্যাম বিজি ম্যান।

এই লোকটার দুধারের দুটো সীট খালি। এক সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াল পরমেশ্বর। মওকা যখন পাওয়া গেছে তখন পুরোপুরি সেটা কাজে লাগানো দরকার। সে বলল, 'এক্সকিউজ মী—'

'কিউ'তে দাঁড়িয়ে দূর থেকে বোঝা যায় নি। এবার দেখা গেল লোকটার ওজন পাক্কা আড়াই কুইণ্টলের মতো। ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা একটা ফ্যাটের ঢিবি। সন্দেহের লিস্ট থেকে এক্ষুণি এই মাকড়াকে বাদ দেওয়া যায়। এক্সের শরীর হল পাতলা, মেদশূন্য, বেতের মতো ধারালো। এই হিপোপটেমাসটার সঙ্গে তার চেহারার এতটুকু মিল নেই। তবু মালটাকে স্লাইট চুলকোবার ইচ্ছা হল পরমেশ্বরের। সে বলল, 'এক্সকিউজ মী—'

ঘন লোমওলা মোটা ভুরু কুঁচকে তাকাল লোকটা। বোঝা গেল, যথেষ্টই বিরক্ত হয়েছে সে। বাজখাঁই গলায় বলল, 'ইয়েস—' ভয়েসটা যেন তার পেটের ভেতর থেকে উঠে এল।

'আপনার পাশে একটু বসতে পারি?'

'এই সীটটা কি আপনার?'

'না।'

'তা হলে এখানে বসবেন কেন? আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট ইট।'

পরমেশ্বর বুঝতে পারল, মালটি টেরিফিক খজড়া। তাকে কাছে ঘেঁষতে দিতে চাইছে না। তবু পরমেশ্বর জানে তার নিজের দু'কান কাটা। বত্রিশখানা দাঁত বার করে সে বলল, 'আপনার কাছে দু-একটা ব্যাপার জানতে চাই।' কথা বলতে বলতে চোখের কোণ দিয়ে টাইপ-করা কাগজগুলো দেখে যাচ্ছে সে।

'কী কথা?'

'আপনি কি সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন?'

'ইয়েস, কেন?'

'আমি এই প্রথম ওখানে যাচ্ছি। সিঙ্গাপুর সম্পর্কে নানা রকম কথা শুনতে পাই। দ্যাটস এ প্যারাডাইস ফর দা হুডলামস। একটা ভালো হোটেল-টোটেলের খবর দিতে পারেন যেখানে সেফলি থাকা যায়?'

'আমাকে দেখে কি মনে হয়েছে, আমি একজন হোটেল গাইড?'

'না, মানে—' বলতে বলতেই পরমেশ্বরের চোখে পড়ে গেল, যে কাগজে লোকটা টাইপ করছে সেটা একটা প্যাডের পাতা। লেটার হেডের মাথায় ছাপা রয়েছে: মনসুখলাল ভাটিয়া,—কনট সার্কাস, নিউ দিল্লী।

অর্থাৎ এই মাকড়াটাই ভাটিয়া। কাল রাত্তিরে হেমা জানিয়ে দিয়েছে দিল্লীর বিজনেসম্যান মনসুখলাল ভাটিয়া একজন জেনুইন মাল, তার মধ্যে ভেজাল নেই। যে উদ্দেশ্যে এই হারামীটার পাশে বসার ধান্দা করেছিল পরমেশ্বরের তা জানা হয়ে গেছে। ভাটিয়াকে আর চুলকানোর দরকার নেই।

ভাটিয়া বলল, 'আফটার ল্যাণ্ডিং অ্যাট সিঙ্গাপুর ইউ মে কনট্যাক্ট সিঙ্গাপুর ট্যুরিজম কাউণ্টার। তারা ভালো হোটেলের খবর দিতে পারবে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ—' বলেই পরমেশ্বর সামনের দিকে পা বাড়াতে যাবে, আচমকা তার চোখে পড়ল ভাটিয়ার চোখ দুটো নীলচে। কিন্তু তার বডির যা ওয়েট, চেহারার যা ফ্রেম তাতে তাকে সন্দেহের বাইরেই রাখতে হয়। তা ছাড়া হেমা এ ব্যাপারে তাকে তো জানিয়েই দিয়েছে।

এখন বাকী রইল ব্যাঙ্গালোরের স্যামুয়েল কৃষ্ণমূর্তি আর ফাদার ডি মেলো। ফাদার সম্পর্কে খবর পাওয়া না গেলেও তাঁকে সন্দেহ করার কথা ভাবা যায় না। বাকী রইল শুধু কৃষ্ণমূর্তি। ওর আইডেণ্টিটি যেভাবেই হোক জানতেই হবে। কৃষ্ণমূর্তির পাশে গিয়ে যে বসবে তার উপায় নেই। তার দু'ধারেই অন্য প্যাসেঞ্জাররা বসে রয়েছে। কিন্তু যাবে কোথায় মানিক, সিঙ্গাপুরে তো নামতেই হবে।

খানিকক্ষণ পর পরমেশ্বর আবার তার নিজের সীটে ফিরে এল। ধোঁয়াটে ব্রুকস লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকে দেখতে দেখতে ফাদার ডি মেলো ওল্ড আর নিউ টেস্টামেণ্ট সম্পর্কে বাকী লেসনগুলো শুরু করে দিলেন। কলে পড়বার পর ইঁদুরের যে রকম হাল হয় পরমেশ্বরের এখন সেই অবস্থা। কাচুমাচু মুখ করে ফিলজফি আর রিলিজিওনের ফাইন ফাইন বাণীগুলো শুনে যেতে লাগল সে।

•

সাড়ে তিন ঘণ্টা বাদে ঠিক বারোটা পঞ্চাশে পরমেশ্বরদের এয়ারক্র্যাফট সিঙ্গাপুরে ল্যাণ্ড করল।



আগে থেকেই স্টেয়ারকেস নিয়ে ট্রলিগুলো রেডি হয়ে ছিল। প্লেন টারমাকে থামতেই এয়ারক্র্যাফটের সামনের এবং পেছনের দরজা খুলে গেল এবং সিঁড়িগুলো সেখানে এসে লাগল।

পরমেশ্বর আগে থেকেই লক্ষ্য রেখেছিল। প্লেনটা থামতেই স্যামুয়েল কৃষ্ণমূর্তি উঠে পেছনের দরজার দিকে গেছে। এক সেকেণ্ড সে আর ওয়েট করল না, হ্যান্ডব্যাগ হাতে নিয়ে উঠে পড়ল।

ফাদার ডি মেলো বললেন, 'সিঙ্গাপুরই আপনার ডেস্টিনেসন মিস্টার সিং?'

পরমেশ্বর বলল, 'ইয়েস ফাদার।'

'এত তাড়া কীসের? আমিও তো নামব। একসঙ্গেই যাওয়া যাবে'খন।'

পরমেশ্বর ভাবল, তোমার সঙ্গে যাই আর ওদিকে স্যামুয়েল হাওয়া হয়ে যাক। সে বলল, 'আমার এক জানাশোনা ভদ্রলোক পেছনে রয়েছেন। ওঁর সঙ্গেই যাব ভাবছি।'

ফাদার ডি মেলো বললেন, 'সিঙ্গাপুরে কোথায় উঠবেন?'

'কোন হোটেলে-টোটেলে।'

'আর দেখা হবে না?'

'নিশ্চয়ই। আপনার অ্যাড্রেস দিয়ে দিন। হোটেল ঠিক করে কালই আপনার কাছে চলে যাব।'

ফাদার ডি মেলো বললেন, 'পাসির পানজঙে যে সী-বীচ রয়েছে তার কাছাকাছি জেভিয়ার মেথডিস্ট চার্চে।'

'আই উইল ফাইণ্ড ইট আউট—' পরমেশ্বর আর দাঁড়াল না, হ্যাণ্ডব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে ফাদারের পাশ দিয়ে এয়ারক্রাফটের পেছন দিকে স্যামুয়েল কৃষ্ণমূর্তির গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ততক্ষণে সিঙ্গাপুরের প্যাসেঞ্জাররা নামতে শুরু করেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পরমেশ্বর বলল, 'এক্সকিউজ মী, আই অ্যাম যশমিন্দর সিং গিল, বিজনেসম্যান ফ্রম ক্যালকাটা।'

কৃষ্ণমূর্তি ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'আই অ্যাম স্যামুয়েল কৃষ্ণমূর্তি, ইঞ্জিনীয়ার ফ্রম ব্যাঙ্গালোর। আমি সিঙ্গাপুরের ডেলভি ইলেকট্রনিকসে কাজ করি।'

'দেখুন আমি ফার্স্ট টাইম সিঙ্গাপুরে এলাম। কোথায় উঠব বুঝতে পারছি না।' ভাটিয়াকে সিঙ্গাপুর হুডলামদের শহর বলে যা বলেছিল কৃষ্ণমূর্তিকেও তাই বলল।

ক্যারেক্টার এবং ব্যবহারের দিক থেকে কৃষ্ণমূর্তি ভাটিয়ার একেবারে উলটো। দারুণ হৈ-চৈ করা আমুদে হেল্পফুল টাইপের লোক বলেই তাকে মনে হল। সে বলল, 'দিস ইজ এ ফাইন সিটি। ইউ নীড নট বী স্কেয়ার্ড। আমার অ্যাড্রেস দিয়ে যাচ্ছি, হোটেল অ্যাকমোডেসনে যদি কোন অসুবিধা হয়, বা ইফ ইউ ফীল আনকমফোর্টেবল কাম স্ট্রেট অ্যাট মাই প্লেস। আপনি আমার দেশের লোক, আই মাস্ট লুক আফটার ইওর এভরিথিং। ও-কে?' বলে সিঙ্গাপুরের আউটস্কার্টে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সে ডেলভি ইলেকট্রনিকসের ঠিকানা দিয়ে জানালো, ওখানেই রেসিডেন্সিয়াল কোয়ার্টারে সে থাকে। একটা ফোন নাম্বারও সে দিয়ে দিল।

পরমেশ্বর ভাবল, যে লোক তার অ্যাড্রেস দিয়ে তার সঙ্গে থাকার জন্য ইনভাইট করে, আফটার অল সে প্রফেসানাল মার্ডারার এক্স হতে পারে না। তবু কিছুই জোর দিয়ে বলা যায় না। সে-ও তো যশমিন্দর সিংয়ের নাম কাঁধে চড়িয়ে জেণ্টলম্যান হয়ে সিঙ্গাপুরে টুরিস্ট-কাম-বিজনেসম্যান সেজে হাজির হয়েছে। কিন্তু তার আসল আইডেণ্টিটি কী? আচমকা একটা কথা মনে পড়তে ঝট করে পরমেশ্বর কৃষ্ণমূর্তির চোখের দিকে তাকাল। চোখের তারার রঙ কি বদলানো যায়? রঙিন কনট্যাক্ট লেন্স লাগিয়ে? পরমেশ্বর ঠিক জানে না। কৃষ্ণমূর্তির অ্যাড্রেসটা মেমোরির মধ্যে পুরে রেখে দিল সে।

সিঁড়ি দিয়ে রানওয়েতে নেমে আসতেই দেখা গেল, প্যাসেঞ্জারদের এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবার জন্য দু'ধারের দরজার নিচে দুটো লাক্সারি কোচ দাঁড়িয়ে আছে। কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে পেছনের কোচটায় উঠে পড়ল পরমেশ্বর। সামনের দিকের সিঁড়ি দিয়েও প্যাসেঞ্জাররা নামছে এবং ওখানকার লাক্সারি কোচে উঠে পড়ছে।

ভেতরে যেতে যেতে চেনা কয়েকটা মুখ চোখে পড়ল পরমেশ্বরের। গিধোয়ানি ফ্যামিলি, আমেরিকান এবং ইওরোপীয়ান ট্যুরিস্টের দল, জাপানী ছাত্ররা, ফ্লোরা নাইট, ফাদার ডি মেলো, ভাটিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

সিঙ্গাপুরের কাস্টমস ফর্মালিটিতে বেশি সময় লাগল না। পাসপোর্ট

ভিসা এবং স্যুটকেশ-টুটকেশ দেখানোর ফর্মালিটি মিনিট চল্লিশের মধ্যে কমপ্লীট হয়ে গেল।

কাস্টমস এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে এয়ারপোর্টের প্রকাণ্ড লাউঞ্জে আসতেই দেখা গেল প্রচুর লোকজন। তাদের ভেতর দিয়ে রাস্তা করে করে একে একে ভাটিয়া, শ্রীবাস্তব, ব্যাডমিণ্টন প্লেয়াররা, জাপানী এবং আমেরিকান টুরিস্টরা সিটির দিকের গেটে চলে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে টয়লেটে যাবার দরকারটা তলপেটে ফীল করছিল পরমেশ্বর। এয়ারপোর্টের একজিটের দিকে যেতে গিয়ে ডান ধারে ঘুরল সে। প্রায় দুশো গজ দূরে পর পর অনেকগুলো লেডীজ অ্যাণ্ড জেণ্টস টয়লেট দেখা যাচ্ছে। পা বাড়াতে যাবে, পেছন থেকে ফ্লোরা নাইটের গলা ভেসে এল, 'হাই সিং—'

পরমেশ্বর দেখতে পেল, একটা পোর্টারের ট্রলিতে মালপত্র চাপিয়ে ফ্লোরা নাইট কাস্টমস এনক্লোজারের দিক থেকে আসছে, যাবে একজিটের দিকে। সে হাত তুলে বলল, 'হাই।'

চলতে চলতেই ফ্লোরা নাইট বলল, 'আশা করি খুব শীগগিরই আবার আমাদের দেখা হচ্ছে।'

'সিওর। তোমার মতো বিউটিফুল ইয়াং গার্লের সঙ্গে তাড়াতাড়ি দেখা না হলে এই ফরেনে আমি নির্ঘাত মরে যাব।'

'নটি বয়।' বলে দারুণ কায়দা-টায়দা করে চোখ টিপল ফ্লোরা নাইট। বলল, 'আই উড লং টু মীট ইউ।' তারপর বিশাল লাউঞ্জের গিজগিজে ভিড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল।

আর পরমেশ্বর গেল জেণ্টস টয়লেটগুলোর দিকে।

সব মিলিয়ে এক ডজন টয়লেট। সবগুলোর মাথায় ইলেকট্রনিকসে লাল সাইন জ্বলছে। অর্থাৎ টয়লেটগুলো অকুপায়েড, ভেতরে লোক রয়েছে।

আরো অনেকে পেচ্ছাপ কি ওয়াশের জন্য ওয়েট করছে। পরমেশ্বর একটা টয়লেটের সামনে দাঁড়াল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মিনিট দুই বাদে দরজা খুলে যিনি বেরিয়ে এলেন তিনি ফাদার ডি মেলো। পরমেশ্বরকে দেখে একটু থমকে দাঁড়ালেন, 'সী ইউ—'

পরমেশ্বরও হাত নেড়ে টয়লেটের ভেতর ঢুকে পড়ল। আর ঢুকেই কমোডের কাছে আসতেই তার ভুরু কুঁচকে গেল। ভাঙা প্ল্যাস্টারের টুকরো টয়লেট এবং কমোডের এধারে ওধারে ছড়িয়ে রয়েছে। এমন কি কয়েকটা টুকরো কমোডের জলেও ভাসছে। বোঝা যায়, প্ল্যাস্টার ভেঙে কমোডে

ফেলে ফেলে ফ্লাশ টেনে টেনে হাওয়া করে দেওয়া হয়েছে। তবে সবটা পারা যায় নি, এখানে-ওখানে কিছু ছড়িয়ে আছে।

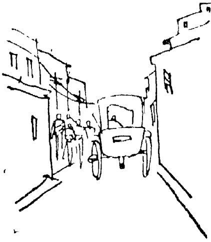
ফ্লাশ বাল্ব জ্বলার মতো পরমেশ্বরের ব্রেনে কিছু একটা খেলে গেল। ফাদার ডি মেলোর ডান পায়ে গোটা প্লাস্টার ছিল। তিনি বলেছিলেন কয়েক দিন আগে মধ্যপ্রদেশের এক টিলা থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে ফ্র্যাকচার করে বসেছেন। তা হলে ঐ প্ল্যাস্টারটা কি স্রেফ ধোঁকাবাজি? চোখে ধুলো ছিটোবার জন্য এই ব্যবস্থা?

তবে কি যশমিন্দর সিংয়ের মেক-আপ নিয়ে যার খোঁজে সিঙ্গাপুর আসা প্রায় সাড়ে-তিন ঘণ্টা তারই পাশে বসে ওল্ড আর নিউ টেস্টামেণ্ট শুনতে হয়েছে? সাড়ে-তিন ঘণ্টার মধ্যে একবারও ফাদার ডি মেলোর ওপর সন্দেহ হল না! নাঃ, ব্রেনের ভালো ম্যাটারগুলোর বারোটা বেজে গেছে। মাথার ভেতরটা এখন তার স্রেফ স্ক্র্যাপ আয়রনে বোঝাই।

শলা, এ আফসোস পরমেশ্বরের যাবে না। তলপেটের হেভি প্রেসারের কথা মনে রইল না তার, এক সেকেণ্ডও আর দেরি না করে টয়লেট থেকে বেরিয়ে একজিটের দিকে ছুটল। কিন্তু না, ফাদার ডি মেলোকে লাউঞ্জে বা বাইরে কোথাও দেখা গেল না। তিন-চার মিনিটের মধ্যে লোকটা স্রেফ হাওয়ায় ভ্যানিশ হয়ে গেছে।

বিরক্ত, হতাশ পরমেশ্বর একটা ট্যাক্সি নিয়ে বলল, 'র‍্যাফল স্কোয়ার—' হেমা সোমেশ্বর আর এক্সের টেলিফোনের কথাবার্তার যে টেপ করেছিল তাতে জানা গেছে, অমিতাভ র‍্যাফল স্কোয়ারের 'হোটেল ম্যাগনিফিসেণ্টে' উঠবে। এক্সও নিশ্চয়ই তার কাছাকাছি কোথাও তাঁবু ফেলবে।

পরমেশ্বর ভেবে রেখেছে, সে-ও ওখানেই কোন হোটেলে ঘাঁটি গাড়বে।



এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে চওড়া মসৃণ হাইওয়ের ওপর দিয়ে ট্যাক্সি আশি মাইল স্পীডে ছুটে যাচ্ছে। দু-ধারে সিঙ্গাপুর ডাউন টাউনে ছবির মতো বাড়ি-ঘর, গ্যাছপালা, এটসেটরা। এসব দৃশ্য-টৃশ্যের দিকে নজর নেই পরমেশ্বরের। সে নিজের গালে মনে মনে মিনিটে ছত্রিশবার করে জুতোর বাড়ি মারছিল। সাড়ে-তিন ঘণ্টা পাশাপাশি বসে থেকেও ফাদার ডি মেলোকে বুঝতে পারল না সে? নিজের প্রফেসান ছেড়ে এখন থেকে গরুর মতো মাল টানার কাজ নিতে হবে দেখা যাচ্ছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আউটস্কার্ট পেরিয়ে মেইন সিটিতে এসে পড়ল ট্যাক্সিটা। এখন চারদিকে শুধু স্কাই-স্ক্রেপার। যেদিকে তাকানো যায় হাই রাইজ বিল্ডিংয়ের ছড়াছড়ি। সাজানো শপিং সেণ্টার, কিউরিও হাউস, বিশাল বিশাল ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর, হোটেল, ইত্যাদি ইত্যাদি। রাস্তায় যে সব লোকজন দেখা যাচ্ছে তাদের ফর্টি পারসেণ্ট চীনা। তা ছাড়া ওয়াল্ডের নানা দেশের নানা চেহারার নানা কমপ্লেকসানের নিগ্রো, মঙ্গোলিয়ান, প্রোটো-অস্ট্রলয়েড, সেমেটিক—এমনি ডিফারেণ্ট টাইপের টুরিস্ট চারদিকে গিজগিজ করছে।

র‍্যাফল স্কোয়ারে আসতেই রাস্তার কোনাকুনি সব চাইতে উঁচু যে হাই রাইজ বিল্ডিংটা প্রথমেই চোখে পড়ে সেটার মাথায় বিশাল কাচের সাইন বোর্ড। তাতে লেখা রয়েছেঃ হোটেল ম্যাগনিফিসেণ্ট। ওখানেই অমিতাভর থাকার কথা।

চাইনীজ ট্যাক্সিওলা বাচ্চাদের মতো আধো আধো উচ্চারণে ইংরেজিতে বলল, 'স্যার র‍্যাফল স্কোয়ার এসে গেছে।'

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'আমি হোটেলে উঠব। এখানে ভালো হোটেল কী কী আছে?'

গড় গড় করে নামতা পড়ার মতো ট্যাক্সিওলা মুখস্থ বলে যেতে লাগল, 'হোটেল ম্যাগনিফিসেণ্ট, হোটেল সিঙ্গাপুর, পার্ল হোটেল, প্রাইড অফ দা ইস্ট হোটেল—'

মাঝখানে তাকে থামিয়ে দিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'হোটেল সিঙ্গাপুরটা কোথায় ?' সিঙ্গাপুরে যখন এসেছে তখন 'হোটেল সিঙ্গাপুরে' ওঠাই ভালো। অবশ্য সেখান থেকে যদি 'হোটেল ম্যাগনিফিসেণ্টের' উপর নজর রাখা যায়।

ট্যাক্সিওলা ডান দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'দেয়ার ইট ইজ—'

পরমেশ্বর দেখল, ওধারের স্কোয়ারের ট্রাফিক সিগনালের মুখোমুখি 'হোটেল সিঙ্গাপুরে'র প্রকাণ্ড বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। 'হোটেল সিঙ্গাপুরে'র কোনাকুনি একশো গজের মধ্যে 'হোটেল ম্যাগনিফিসেণ্ট'। 'হোটেল সিঙ্গাপুরে' উঠলে অমিতাভর হোটেলের ওপর নজর রাখতে অসুবিধা হবে না। সে বলল, 'ওখানে চল।'

হোটেল সিঙ্গাপুরে রিসেপশানে এসে পরমেশ্বর বলল, 'ফোরটীনথ থেকে টোয়েণ্টি সেকেণ্ড ফ্লোরের ভেতর রাস্তার দিকের একটা স্যুইট চাই।' রাস্তার দিকটার ওপর খুব জোর দিল সে।

রিসেপশানের ছুকরিটা অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেভেনটীনথ ফ্লোরে একটা স্যুইটের ব্যবস্থা করে ফেলল। রেজিস্টারের খোপ-কাটা ঘরগুলোতে নাম-ধাম ইত্যাদি বসিয়ে ফর্মালিটি কমপ্লীট করে পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা বয়ের সঙ্গে লিফটে করে নিজের স্যুইটে পৌঁছে গেল পরমেশ্বর। বয়টা ঘাড়ে করে তার মালপত্র নিয়ে এসেছিল। সেগুলো একধারে নামিয়ে রেখে টিপস নিয়ে সে চলে গেল।

পরমেশ্বর এখন ডগ টায়ার্ড। কাল রাত তিনটের সময় উঠে তাকে এয়ারপোর্টে ছুটতে হয়েছে। তারপর প্লেনে হাজার কয়েক কিলোমিটার পার হয়ে এই সিঙ্গাপুর। দারুণ খিদে এবং ঘুম, দুটোই একসঙ্গে পাচ্ছে তার। কিন্তু তার আগে অন্য একটা জরুরী কাজ আছে। দৌড়ে সে জানলার দিকে চলে গেল। হোটেলটা আগাগোড়া এয়ার-কণ্ডিসানড্। ভারী সিল্কের দামী পর্দা সরিয়ে জানলার কাচের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকাল সে। এখান থেকে 'হোটেল ম্যাগনিফিসেণ্টের' গেট, লন, সুইমিং পুল এবং ছাব্বিশ তলা বাড়িটার রাস্তার দিকের সবগুলো ফ্লোরের ওপর নজর রাখা যায়, অবশ্য জানলার পর্দা সরানো থাকলেই। তবু গেট দিয়ে কারা যাওয়া-আসা করছে সেটা মার্ক করা যাবে। এটা ঠিক, এক্স যদি আসে নিজের আসল চেহারা নিয়ে ঢুকবে না, নিশ্চয়ই অন্য মেক-আপ নিয়ে আসবে।

সে অমিতাভর ওপর অপারেশান চালাবার ব্যাপারে কী প্ল্যান নিয়েছে, কে জানে। পরে এ নিয়ে ভাবা যাবে।

জানলার কাছ থেকে সরে আসার আগে আচমকা ডাইনে বাঁয়ে কোনাকুনি, সব দিকে চোখ পড়ল পরমেশ্বরের। 'হোটেল ম্যাগনিফিসেণ্ট'-এর কোনাকুনি যেমন 'হোটেল সিঙ্গাপুর' তেমনি আরেকটা কোণের দিকে রয়েছে 'হোটেল প্লাজা' আর মুখোমুখি 'প্রাইড অফ দি ইস্ট' হোটেল। এছাড়া আরো কয়েকটা হোটেলও দেখা যাচ্ছে। আর যা সে-সব অফিস বিল্ডিং, ডিপার্ট-মেণ্টাল স্টোর্স ইত্যাদি।

একটা ব্যাপার পরমেশ্বর লক্ষ্য করল, প্লাজা, ম্যাগনিফিসেণ্ট, সিঙ্গাপুর এবং প্রাইড অফ দি ইস্ট বা অন্য হোটেলগুলোর যে কোন একটা থেকে অন্যগুলোর ওপর নজর রাখা যায়। এই তিনটে হোটেলের যে কোনোটায় নিশ্চয়ই এক্স উঠেছে, অবশ্য যদি সে তার সঙ্গে একই প্লেনে সিঙ্গাপুর এসে থাকে। কে বলতে পারে এক্স এই হোটেল সিঙ্গাপুর কিংবা অমিতাভর হোটেল ম্যাগনিফিসেণ্টে ওঠে নি। যেখানেই উঠুক, চোখ-কান নাক-মুখ তাকে সজাগ রাখতেই হবে।

এর পর ঘণ্টাখানেকের ভেতর স্নান এবং লাঞ্চ সেরে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল পরমেশ্বর এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম।

ঘুম ভাঙল টেলিফোনের একটানা আওয়াজে। হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলে কানে লাগতেই হোটেলের অপারেটর টেরিফিক সুইট গলায় বলল, 'স্যার, আপনার লাইন। দেব কী?'

পরমেশ্বর অবাক। এই সিঙ্গাপুরে কে তাকে ফোন করতে পারে! যাদের সঙ্গে প্লেনে আলাপ-টালাপ হয়েছে তাদের অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার সে-ই নিয়েছে। সে যে 'হোটেল সিঙ্গাপুরে' উঠবে, তা কেউ জানে না। সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে নামার পর পরমেশ্বর নিজেও জানত না। র‍্যাফল স্কোয়ারে এসে ট্যাক্সিওলার সঙ্গে কথা বলে সে এই ডিসিসান নিয়েছে।

টেলিফোন অপারেটর আবার বলল, 'ইনি আগে আরো তিনবার ফোন করেছিলেন। আপনার স্যুইট থেকে 'নো রিপ্লাই' হচ্ছিল। মনে হয় আপনি স্যুইটে ছিলেন না।'

তা হলে দেখা যাচ্ছে সিঙ্গাপুরে আসার পর থেকেই কেউ তার ওপর নজর রাখছে। কে হতে পারে? এক্সের লোক কী? কিন্তু তার আসার খবর এক্স কী করে জানবে? তা হলে কি তারও একটা স্পাই রিং রয়েছে? অন্যমনস্কর মতো সে বলল, 'স্যুইটেই ছিলাম, ঘুমোচ্ছিলাম।'

'লাইনটা দেব স্যার ?'

'দিন।'

'হ্যালো, বলতেই ওধার থেকে একটা অচেনা মেয়েগলা ভেসে এল, 'গুড ইভনিং মিস্টার সিং—গলার স্বরটা বেশ চাপা এবং খসখসে, ইংরেজিতে যাকে বলে 'হাস্কি'।

দারুণ সতর্কভাবে পরমেশ্বর বলল, 'গুড ইভনিং। আমি কার সঙ্গে কথা বলছি, জানতে পারি কী ?'

'আমার গলা শুনে চিনতে পারছেন না ?' বলে শব্দ করে হাসল ছুকরিটা। নাকি বয়স্ক মেয়েমানুষ সে ? কষে-বাঁধা এস্রাজের তারে টোকা দিলে যেমন আওয়াজ বেরোয় তার হাসিটা অবিকল সেরকম।

পরমেশ্বর বলল, 'না, মানে ঠিক—'

মেয়েটা—হ্যাঁ তাকে মেয়েই ভাবা যাক—ওধার থেকে এবার বলল, 'খুবই দুঃখ পেলাম মিস্টার সিং—গলা শুনে আমাকে চিনতে পারলেন না। অথচ আপনাকে আমি মনে করতাম জিনিয়াস। ভাবতাম আপনার নাক-কান-চোখ সব দুর্দান্ত শার্প।'

পরমেশ্বরের মতো তুখোড় হারামীও কী বলবে ভেবে পেল না। ছুকরি কদ্দুর যেতে পারে সেটাই দেখা যাক।

ছুকরি ফের বলল, 'যখন চিনতেই পারলেন না তখন নিজের মুখে আমার আইডেণ্টিটি ফাঁস করতে চাই না। এখন বলুন ক্যালকাটা-টু-সিঙ্গাপুর ফ্লাইটটা কেমন এনজয় করলেন ?'

দারুণ স্মার্ট জবাব দিল পরমেশ্বর, 'ফাইন।'

'ফাইন তো হবেই। ফ্লোরা নাইটের মতো ঐরকম একটা দুর্দান্ত চেহারার বাক্সম ইয়াং গার্ল থাকলে ফ্লাইট তো এনজয় করারই কথা !'

পরমেশ্বর চমকে উঠল। ফ্লোরা নাইটের কথা এই ছুকরি জানলো কী করে ? তবে কি সে-ও একই ফ্লাইটে সিঙ্গাপুর এসেছে ? কিন্তু কে হতে পারে ! ফ্লোরা নাইট ছাড়া ঐ ফ্লাইটে ক'টা আমেরিকান আর জাপানী মেয়ে ছিল। আর ছিল মধ্যবয়সী মিসেস গিধোয়ানী এবং তার বারো চোদ্দ বছরের ছোট একটি মেয়ে। আফটার অল মিডল-এজেড মিসেস গিধোয়ানী আর তার বাচ্চা মেয়েটা তার পেছনে স্পাইং করে নি। হেমা কাল জানিয়েও দিয়েছিল, ওরা জেনুইন প্যাসেঞ্জার। ওদের আইডেণ্টিটিতে কোনরকম ভেজাল নেই। যাই হোক, এই ছুকরি কতদূর খেলাতে পারে সেটাই আপাতত দেখা যাক। পরমেশ্বর বলল, 'কারেক্ট কারেক্ট। এমন একটা ছুকরি একই এয়ারক্রাফটে থাকলে আমার মতো ইয়াং ম্যানের ভালো লাগারই কথা।'

লাইনের ওধার থেকে ছুঁড়িটা এবার বলল, 'যে কাজের জন্য সিঙ্গাপুর এসেছেন ফ্লোরা নাইটের কথা ভেবে ভেবে স্পয়েল করে ফেলবেন না।'

'আমি কী জন্যে এসেছি, আপনি জানেন ?' কথা বলতে বলতে বিছানায় টান টান উঠে বসল পরমেশ্বর।

উত্তর না দিয়ে ছুকরি বললে, 'আপনার হোটেল থেকে চারপাশে যে সব হোটেল রয়েছে সেগুলোর ওপর একটু নজর রাখবেন। পারলে আজ যারা স্যুইট-ট্যুইট 'বুক' করেছে তাদেরও একটু খোঁজ নেবেন।'

গোটা ব্যাপারটা অদ্ভুত মিস্টিরিয়াস মনে হচ্ছে পরমেশ্বরের। সে বলল, 'তা না হয় নেব।' বলেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কে আপনি ?'

মেটালিক সাউন্ড অর্থাৎ ধাতব শব্দের মতো আওয়াজ তুলে ছুকরি হাসতে লাগল, 'আমার পরিচয় ঠিক সময়েই পাবেন। একটা ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছি ; নিজে খুব কেয়ারফুল থাকবেন।'

'কেন বলুন তো ?'

'এমনি—মনে হল, তাই বললাম।'

'প্লীজ আপনার পরিচয়টা বলুন—'

আগের মতো শব্দ করে হাসতে লাগল ছুকরি। তবে আর একটা কথাও বলল না।

পরমেশ্বর চিৎকার করে উঠল, 'হ্যালো শুনুন—শুনুন—' কিন্তু তার আগেই লাইন কেটে গেল। অগত্যা ফোনটা ক্রেডেলে নামিয়ে রেখে বিমূঢ়ের মতো অনেকক্ষণ বসে রইল সে। ছুকরি আবার ফোন না করলে তাকে ধরার উপায় নেই।

অন্য হোটেলগুলোর ওপর নজর রাখার কথা আগেই ভেবে রেখেছিল পরমেশ্বর। কিন্তু ঐ অচেনা ছুকরিটা তাকে এ ব্যাপারে বলল কেন ? যাই হোক, এ নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার মানে হয় না। পরে যদি ছুঁড়িটা তাকে আবার ফোন টোন করে তখন জিজ্ঞেস করা যাবে।

পরমেশ্বর আর বসে থাকল না। যে জন্য এতদূরে এই সিঙ্গাপুর পর্যন্ত ছুটে আসা এখনই সেই কাজটা স্টার্ট করা দরকার। সে উঠে গিয়ে কাচের জানলার কাছে দাঁড়াল।

এখন সিঙ্গাপুরে সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে। তবে স্কাই লাইনের অনেক ওপরে ছাড়া আর কোথাও অন্ধকার-টন্ধকার নেই। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মার্কারি আর নিওন আলো জ্বলে উঠেছে। নানা রঙের আলোয় সিঙ্গাপুরকে টেরিফিক দেখাচ্ছে।

পরমেশ্বর যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে হোটেল প্লাজা, পার্ল

হোটেল, প্রাইড অফ দি ইস্ট আর হোটেল ম্যাগনিফিসেণ্টের সামনের দিকগুলো অর্থাৎ গ্রাউণ্ড ফ্লোর থেকে টপ ফ্লোর পর্যন্ত দেখা যায়।

প্লাজা, পার্ল, প্রাইড অফ দি ইস্ট, ম্যাগনিফিসেণ্ট—গুনে গুনে পরমেশ্বর দেখল, এখানকার সব হোটেলই বাইশ থেকে সাতাশ তলার মধ্যে। একেকটা হোটেল যেন ছোটখাটো একেকটা টাউন। এখানে দাঁড়িয়েই বোঝা যাচ্ছে, ঐ হোটেলগুলোতে সুইমিং পুল, বিউটি পার্লারই শুধু নয়, রয়েছে বিরাট বিরাট শপিং আর্কেড, সিনেমা হল, টেনিস কোর্ট, বল-রুম, পার্কিং এরিয়ায় লেটেস্ট মডেলের ফরেন কার, ইত্যাদি ইত্যাদি। নানা দেশের গাদা গাদা টুরিস্ট হোটেলগুলোতে ঢুকছে, বেরুচ্ছে। এর ভেতর থেকে আসল লোকটিকে খুঁজে বার করা আর খড়ের গাদা থেকে আলপিন বার করা একই ব্যাপার। কাজেই এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হবে না। অচেনা ছুকরিটা টেলিফোনে একটা ক্লু দিয়েছে। সামনের ঐ হোটেলগুলোতে, এমন কি তার নিজের হোটেলেও আজ কোন ইণ্ডিয়ান এসেছে কিনা, তার একটা খোঁজ নিতে হবে। এখনই একবার সবগুলো হোটেল সার্ভে করা দরকার।

জানলার কাছ থেকে সরে এসে ঘরের আলো জ্বালল পরমেশ্বর। তারপর বেরুতে গিয়ে আচমকা একটা কথা মনে পড়ে গেল। কাল রাত্তিরে হেমা জানিয়েছিল ফাদার ডি মেলো, ফ্লোরা নাইট, শ্রীবাস্তব, ভাটিয়া আর স্যামুয়েল কৃষ্ণমূর্তি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে পারে নি। অর্থাৎ তারা জেনুইন মাল না নকলী মাল, সেটা অত অল্প সময়ের ভেতর যাচাই করা সম্ভব হয় নি। ফ্লোরা নাইট, কৃষ্ণমূর্তি আর ফাদার ডি মেলোর ঠিকানা সে কায়দা করে জোটাতে পেরেছে। ফাদারের চার্চ আর ফ্লোরা নাইটের কোম্পানির হাসপাতাল 'সোয়ান সান ইঞ্জিনিয়ারিং'এ হসপিটালের নাম যখন জানে তখন টেলিফোন ডাইরেক্টরি থেকে ফোন নাম্বার আর অ্যাড্রেস বার করা এমন কিছু ঝামেলার ব্যাপার নয়।

পরমেশ্বর প্রথমে ডেলভি ইলেকট্রনিকসের রেসিডেন্সিয়াল কোয়ার্টারে ফোন করে কৃষ্ণমূর্তিকে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণমূর্তির গলা ভেসে এল। দারুণ আগ্রহের সঙ্গে সে জানতে চাইল, পরমেশ্বর হোটেলে জায়গা পেয়েছে কিনা। যখন জানলো পেয়েছে তখন জিজ্ঞেস করল, সেখানে কোন রকম অসুবিধা হচ্ছে কিনা, অসুবিধা হলে উইদাউট হেজিটেশন পরমেশ্বর তার কাছে চলে আসতে পারে। আফটার অল সে তার কাণ্ট্রিম্যান। দেশোয়ালী যখন, তখন তার সুখসুবিধা দেখতে হবেই।

পরমেশ্বর তাকে বাইশ বার 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে, কোন রকম অসুবিধা হচ্ছে না জানিয়ে এবং আবার ফোন করবে বলে টেলিফোন নামিয়ে রাখল। তারপর ওধারের ছোট্ট টেবল থেকে সিঙ্গাপুরের টেলিফোন ডাইরেক্টরিটা

নিয়ে ফ্লোরা নাইটের হাসপাতাল এবং ফাদার ডি মেলোর চার্চের ফোন নাম্বার দুটো বার করে হোটেলের অপারেটরকে লাইন দুটো ধরে দিতে বলল।

একটু পরেই সোয়ান সান ইঞ্জিনীয়ারিং-এর হাসপাতালের স্টাফ কোয়ার্টারে ফ্লোরা নাইটকে পাওয়া গেল। এত তাড়াতাড়ি পরমেশ্বর অর্থাৎ যশমিন্দর সিংয়ের ফোন পেয়ে সে যেমন অবাক তেমন খুশী। অবাক হওয়া—যশমিন্দর কী করে তার ফোন নাম্বার পেল, এই কথা ভেবে। খুশী হওয়া নতুন ফ্রেণ্ড তার কথা মনে রেখেছে বলে।

পরমেশ্বর মনে মনে বলল, 'যদিও তুমি একখানা টেরিফিক ভলাপচুয়াস মাল, লাইফে তোমাকে শলা কোন পুরুষের ভোলা উচিত না, তবু তোমাকে এখন যে ফোন করছি তা একেবারে সেপারেট কারণে। তুমি জেনুইন জিনিস কিনা সেটা দেখতে চাই।' মুখে বলল, 'একা একা হোটেলে বসে আছি। আজ কোন প্রোগ্রাম নেই। ভাবলাম আপনাকে ফোন করে খানিকক্ষণ আড্ডা দিই। তা ছাড়া আপনাকে একটা সারপ্রাইজও দেওয়া যাবে। টেলিফোন ডাইরেক্টরি থেকে থেকে আপনার নম্বারটা বার করে ফেললাম—'

'রীয়ালি ফাইন—'

কিছুক্ষণ গল্পটল্প করে লাইন কেটে দিল পরমেশ্বর।

অপারেটরকে সিঙ্গাপুরের আউটস্কার্টে জেভিয়ার মেথডিস্ট চার্চের নাম্বার দেওয়াই ছিল। এবার সে পরমেশ্বরকে সেই লাইনটা ধরে দিল।

ওধার থেকে 'হ্যালো' শুনতেই পরমেশ্বর বলল, 'আমি যশমিন্দর সিং। কামিং ফ্রম ইণ্ডিয়া। ফাদার ডি মেলোর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'হু ইজ ফাদার ডি মেলো?'

'হী ইজ অ্যাটাচড টু ইওর জেভিয়ার মেথডিস্ট চার্চ। আমরা আজই একসঙ্গে একই ফ্লাইটে ক্যালকাটা থেকে সিঙ্গাপুর এসেছি।'

'ফাদার ডি মেলো নামে আমাদের চার্চে কোন মিশনারি নেই।'

'আর ইউ সিওর স্যার?'

'মোর দ্যান সিওর।'

তাহলে ফাদার ডি মেলো মালটি নকলী জিনিস! এয়ারক্রাফটে পাশাপাশি বসে আসার সময় তাকে একটুও সন্দেহ হয়নি। অথচ হওয়া উচিত ছিল। মাকড়া যেভাবে সাড়ে-তিন ঘণ্টা ধরে ওল্ড আর নিউ টেস্টামেণ্টের সবগুলো পাতা তার কানের ভিতর গুঁজে গুঁজে দিচ্ছিল, তখনই মালুম পাওয়া উচিত ছিল—এত ধর্মের বুলি কপচানো ভালো নয়। অবশ্য সন্দেহ তার নিশ্চয়ই হয়েছিল—হয়েছিল এয়ারপোর্টের টয়লেটে প্ল্যাস্টারের টুকরো টুকরো দেখে।

শালা মেক-আপটা নিয়েছে টেরিফিক। খ্রীস্টান সাধ্মহাত্মা সেজে পায়ে প্ল্যাস্টার চড়িয়ে এমনভাবে সে এসেছে, কার গ্র্যাণ্ডফাদারের সাধ্য ধরে যে সে — দুর্ধর্ষ হারামী! কৃশ্চান ফাদারের ড্রেসে একজন নোটোরিয়াস মার্ডারার। ভাবতে বেশ মজা লাগল পরমেশ্বরের। সে আরো ভাবল, ঠিক হ্যায় ফাদার ডি মেলো, এবার আমার কাজ হল, সিঙ্গাপুরের কয়েক মিলিয়ন লোকের ভেতর থেকে তোমাকে ঢুঁড়ে বার করা। নিশ্চয়ই তুমি মাকড়া অমিতাভর কাছাকাছি কোথাও তাঁবু ফেলেছ।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে পকেটে সবরকম তালা খোলার একগোছা মাস্টার 'কী' আর ম্যাগনিফাইং গ্লাস আর একটা ইমপ্রোভাইজড লাইটার-কাম-টেপ রেকর্ডার পুরে স্যুইট থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে এল। রিসেপশানে নিজের স্যুইটের চাবিটা দিতে দিতে আচমকা একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। সঙ্গে সঙ্গে উঁচু ডেস্কের ওধারে দুর্ধর্ষ ছুঁড়িটাকে জিজ্ঞেস করল, 'একটা নতুন মডেলের ইমপালা কয়েক দিনের জন্য ভাড়া নিতে চাই।'

ছুঁড়িটা বলল, 'নো প্রবলেম স্যার। কবে থেকে দরকার?'

আজ তো রাত হয়েই গেছে। অমিতাভর ওপর আজই কোন অপারেশন হবে বলে মনে হয় না। অবশ্য জোর দিয়ে কিছু বলা সম্ভব না। যতটা পারা যায়, আজকের রাতটা অমিতাভর ওপর সে নজর রাখবে। পরে কাল থেকে যা করার করা যাবে। পরমেশ্বর বলল, 'কাল মর্নিং থেকে।'

ছুঁড়িটা বলল, 'ও-কে স্যার। উইদ শোফার?'

'নো নীড। আমার ইণ্ডিয়ার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে।' সবরকম তালা খোলার চাবি, মেক-আপের সরঞ্জাম এবং জাল করার ছোটখাটো যন্ত্রপাতি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে পরমেশ্বর। আজ রাতেই একটা জাল ড্রাইভিং লাইসেন্স বানিয়ে ফেলবে সে।

আচমকা সেই কথাটা মনে পড়ে গেল পরমেশ্বরের। তক্ষুণি রিসেপশানের ছুকরিটাকে জিজ্ঞেস করল, 'ওয়েল ম্যাডাম, একটা খবর দিতে পারো?'

দারুণ স্মার্ট মেয়েটা বলল, 'উইদ প্লেজার স্যার। ইফ আই এ্যাট অল নো—'

'আজ তোমাদের হোটেলে কোন ইণ্ডিয়ান উঠেছে?'

'একজনই উঠেছেন স্যার। অ্যাণ্ড দ্যাটস ইউ। আপনি ছাড়া লাস্ট এক উইকের ভেতর এখানে আর কোন ইণ্ডিয়ান আসে নি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ডার্লিং, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ ফর দি ইনফরমেসন। শুধু একটা কথা—'

'বলুন স্যার—'

'এখন থেকে যদি কোন ইণ্ডিয়ান এখানে আসে আমাকে জানিয়ে দিও। পারবে?'

'সিওর স্যার।'

পরমেশ্বর আর দাঁড়াল না। রিসেপশানের ছুকরিটার দিকে একবার চোখ টিপে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল। তারপর র‍্যাফল স্কোয়ারে রাস্তা পেরিয়ে প্রথমে প্লাজা হোটেলে গিয়ে ঢুকল। আর ঢুকতে ঢুকতেই মনে হল, সর্দারজী মেক-আপটা বদলে আসাই উচিত ছিল। ফাদার ডি মেলো যদি এক্স হয় তাহলে তাকে দেখামাত্র চিনে ফেলবে। কেননা সাড়ে তিন ঘণ্টা এয়ারক্রাফটে তার পাশাপাশি কাটিয়েছে। অবশ্য সে-ই যে পরমেশ্বর তা হয়ত এক্স জানে না। তবে কিছুই জোর দিয়ে বলা যায় না। হয়ত তার আইডেনটিটি জেনেই গেছে এক্স।

পরমেশ্বর একবার ভাবল, হোটেলে ফিরে মেক-আপটা পাল্টে আসবে। পরের মোমেণ্টে ঠিক করল, যা হবার হবে। যদি চিনেই ফেলে একটা ডাইরেক্ট কনফ্রনটেশন হয়ে যাবে। মনে মনে এর জন্য সে হানড্রেড পারসেণ্ট প্রিপেয়ার্ড।

অন্য সব হোটেলের মতো প্লাজা হোটেলের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে সুবিশাল লাউঞ্জের একধারে রিসেপশান। সেখানে গিয়ে রিসেপশানিস্ট ছুকরিটাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, আজই না, এক সপ্তাহের মধ্যে কোন ইণ্ডিয়ান 'ইন' করে নি।

প্লাজা থেকে পার্ল হোটেলে চলে এল পরমেশ্বর। এখানকার রিসেপশানে দারুণ স্মার্ট চেহারার এক মঙ্গোলিয়ান ইয়াং গার্ল তাকে দেখেই বলে উঠল, 'ইয়েস স্যার—'

পরমেশ্বর বলল, 'ওয়েল ম্যাডাম, আমি সিঙ্গাপুরের একজন ডোমিসাইল্ড বিজনেসম্যান। আমার এক ইণ্ডিয়ান ফ্রেণ্ডের আজ সিঙ্গাপুরে আসার কথা। বুঝতে পারছি না, কোথায় উঠেছেন। হোটেলে হোটেলে ঘুরে তাঁর খোঁজ করছি। উড ইউ কাইণ্ডলি গিভ মী ইনফরমেসন ইফ হী অ্যাট অল—'

'বলুন—'

'আপনাদের হোটেলে উঠেছে কিনা।'

'জাস্ট এ মিনিট স্যার। আপনার ফ্রেণ্ডের নাম কী?'

'ছবিলাল প্যাটেল।'

হোটেল রেজিস্টার বার করে দ্রুত রিসেপশানের ছুঁড়িটা বলল, 'স্যারি স্যার। আজ একজন ইণ্ডিয়ানই স্যুইট বুক করেছেন। তাঁর নাম মার্টিন বাসুদেব পণ্ডিত।'

'ওঁর স্যুইট নাম্বারটা দয়া করে একটু দেবেন ? মানে মিস্টার পণ্ডিতের কাছে খবর পেতে পারি—প্যাটেল বলে কেউ তাঁর সঙ্গে একই ফ্লাইটে এসেছেন কিনা।'

'সিওর স্যার। মিস্টার পণ্ডিতের স্যুইট নাম্বার হলো—ওয়ান সিক্স সেভেন ফোর। সিক্সটীন্থ ফ্লোর, স্যুইট নাম্বার সেভেনটি ফোর।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

রিসেপশানের উলটো দিকে পর পর আট-দশটা অটোমেটিক লিফট। একটা লিফটে ঢুকে কিছুক্ষণের মধ্যে সিক্সটীন্থ ফ্লোরে চলে এল পরমেশ্বর। তারপর কার্পেট পাতা করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে চুয়াত্তর নম্বর স্যুইটটা বার করে ফেলল। কিন্তু দরজার হ্যাণ্ডেলের কাছে একটা বোর্ড ঝুলছে ঃ DON'T DISTURB.

এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে অন্যমনস্ক হবার পোজ নিয়ে কলিং বেল টিপল পরমেশ্বর। একটু পরেই স্লিপিং গাউন পরা মধ্যবয়সী একটা লোক দরজা খুলে মুখোমুখি দাঁড়াল। সারা মুখে চমৎকার করে ছাঁটা দাড়ি, নাকের একধারে বড় আঁচিল, চোখে ধোঁয়াটে চশমা, ঘাড় পর্যন্ত ঝাঁকড়া চুল। ভুরু কুঁচকে কিছু বলতে গিয়েই লোকটা হঠাৎ যেন চমকে উঠল। তারপরেই বোমা ফাটানোর মতো শব্দ করে চিৎকার করে উঠল, 'হ্যাভ ইউ নট সীন ইট ?' বলেই দরজার হাতলে ঝোলানো 'DON'T DISTURB' বোর্ডটা দেখিয়ে দিল।

টেরিফিক ব্যস্তভাবে ঘাড় তুলে স্যুইটের দরজার মাথায় নাম্বারটা দেখে নিয়ে মুখে দুর্দান্ত একখানা করুণ পোজ মেরে পরমেশ্বর বলল, 'স্যরি, এক্সট্রিমলি স্যরি। ভুল করে আপনার ঘরের বেল বাজিয়ে ফেলেছি। আমার যাবার কথা ছিল সেভেনটীনথ ফ্লোরের সেভেনটি ফোর নাম্বার স্যুইটে। ভুল করে সিক্সটীন্থ ফ্লোরে এসে গেছি। এক্সকিউজ মী স্যার—'

দাঁতে দাঁত ঘষে লোকটা বলল, 'ড্যাম ইট!' বলেই ঝড়াং করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল।

কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে করিডর দিয়ে ফের লিফটের দিকে হাঁটতে লাগল পরমেশ্বর। একটা কথা সে ভাবছে। ধরা যাক, লোকটা অর্থাৎ মার্টিন বাসুদেব পণ্ডিত এক্স নয়। এর চোখ দুটোর রং কী, ধোঁয়াটে চশমার ভেতর দিয়ে তা বোঝা যাচ্ছে না। যদি এ কমপ্লীটলি আলাদা লোকই হয়, তাহলে তাকে দেখামাত্র এক সেকেণ্ডের জন্য চমকে উঠল কেন ? ভাবতে ভাবতে করিডরের শেষ মাথায় লিফটগুলোর কাছে গিয়ে কী ভেবে পেছন ফিরল পরমেশ্বর। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল মার্টিন বাসুদেব পণ্ডিত

দরজা খুলে মুণ্ডু বার করে তাকেই মার্ক করছে। চোখাচোখি হতেই সট করে মুণ্ডুটা ভেতরে ঢুকিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে দিল।

সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কেমন যেন সন্দেহের গন্ধ রয়েছে। মাকড়ার মধ্যে যদি কোন গোলমাল না-ই থাকে, আবার দরজা খুলে তাকে দেখবে কেন? শালা মার্টিন বাসুদেব, তোমাকে এমনি এমনি ছাড়া হবে না। মনে হচ্ছে তোমার ভেতর যথেষ্ট ঝামেলা রয়েছে। কালই তোমাকে একটু টোকা মেরে দেখতে হচ্ছে।

বোতাম টিপতেই লিফট এসে গেল। ভেতরে ঢুকে গ্রাউণ্ড ফ্লোরের সুইচ টিপল পরমেশ্বর। নামতে নামতে একটা কথা তার মনে হল, মার্টিন বাসুদেব পণ্ডিতের স্যুইটটা র‍্যাফল স্কোয়ারের রাস্তার দিকে। অর্থাৎ পরমেশ্বরের হোটেল থেকে তার স্যুইটটার ওপর নজর রাখা যাবে।

নিচে নেমে ডান দিকে সোজা অনেকদূর পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল পরমেশ্বর। বলা যায় না, মার্টিন বাসুদেব পণ্ডিত হয়ত জানলার কাছে বসে তার ওপর লক্ষ্য রাখছে।

যাই হোক, এধারে-ওধারে এ-রাস্তায় সে-রাস্তায় খানিকক্ষণ ঘুরে নিজের হোটেলে গিয়ে তিব্বতীদের মেক-আপ নিল পরমেশ্বর। তারপর স্যুইটের চাবিটা পকেটে নিয়েই এবার এসে উঠল 'প্রাইড অফ দি ঈস্ট' হোটেলে। চাবিটা রিসেপশানে দিতে গেলে প্রচুর ঝঞ্চাট। সর্দারজীর জায়গায় তিব্বতীকে দেখলে ডেফিনিটলি সন্দেহ হবে।

অন্য সব হোটেলের মতো 'প্রাইড অফ দি ইস্টে'র রিসেপশানে ইণ্ডিয়ান ফ্রেণ্ডের খোঁজ করতেই জানা গেল, আপাতত বত্রিশ জন ইণ্ডিয়ান আছে এখানে। তাদের ষোল জন এসেছে সাতদিন আগে, ন'জন বারো দিন আগে, ছ'জন চারদিন আগে। আর একজন—মিস্টার রামনরেশ হিঙ্গোরানি আজই এখানে হাজির হয়েছেন।

পার্লের মতোই পরমেশ্বর হিঙ্গোরানির স্যুইট নাম্বারটা জেনে নিয়ে বলল, প্যাটেল নামে যে বন্ধুর জন্য সে এখানে এসেছে, হিঙ্গোরানির কাছে তার খবর নেবে—যদি তারা ক্যালকাটা থেকে একই ফ্লাইটে এসে থাকে।

রিসেপশানের ছুকরিটা বলল, 'হিঙ্গোরানি সাহেব ক্যালকাটা থেকে আসছেন না তো?'

'তাহলে কোত্থেকে?'

'বম্বে থেকে। হোটেল রেজিস্টারে ওঁর বম্বের অ্যাড্রেস রয়েছে।'

ভেতরে ভেতরে খানিকটা থতিয়ে গেল পরমেশ্বর। হিঙ্গোরানির ঠিকানা

যখন বম্বের তখন তাকে সন্দেহের লিস্ট থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। একটু চুপ করে থেকে সে জিজ্ঞেস করল, 'ইণ্ডিয়া থেকে দিনে ক'টা ফ্লাইট আসে সিঙ্গাপুরে?'

মেয়েটা বলল 'কারেক্ট বলতে পারব না। তবে মিনিমাম তিনটে তো হবেই।'

পরমেশ্বর ভাবল, তিনটে ফ্লাইটের একটা বম্বে থেকে হওয়া অসম্ভব কিছু না। তাহলে হিঙ্গোরানি বম্বে থেকে এলেও আসতে পারে। ভাবতে গিয়ে অন্য একটা কথা মনে পড়ল পরমেশ্বরের। কেউ যদি কলকাতা থেকে এসে বলে বম্বে মাদ্রাজ হাভানা বা হনুলুলু থেকে এলাম তা হলে হোটেলের রিসেপশানিস্ট কী করতে পারে? সে তো আর বম্বে বা হুনুলুলু গিয়ে ঠিকানাটা যাচাই করে আসবে না! তার কাজ হলো বোর্ডার যা বলবে হুড় হুড় করে রেজিস্টারে তা বসিয়ে যাওয়া। কাজেই হিঙ্গোরানি মালটাকে বোধ হয় ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। রিসেপশানিস্ট ছুকরিটাকে থ্যাঙ্কস জানিয়ে লিফট বক্সের দিকে গেল পরমেশ্বর। এখন তাকে সেভেনটীনথ ফ্লোরের বারো নম্বর স্যুইটে হানা দিতে হবে। মার্টিন বাসুদেব পণ্ডিতকে পার্লে দেখে এসেছেন। দেখা যাক 'প্রাইড অফ দি ইস্টে'র হিঙ্গোরানি মালখানা কী রকম!

এখানে পর পর বারোটা লিফট। একটা লিফটের 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পরমেশ্বর হঠাৎ লক্ষ্য করল, পাশের লিফটটা ওপর থেকে নিচে নেমে এসেছে। কাচের দরজা খুলে যারা ওটা থেকে বেরিয়ে এল তাদের একজনের দিকে নজর যেতেই চমকে উঠল পরমেশ্বর। লোকটার একটা গাল পোড়া ঝামার মতো। আরেক গালে অল্প অল্প খাপচা খাপচা দাড়ি। মাথায় ফেল্ট হ্যাটটা সামনের দিকে এমনভাবে ঝোঁকানো যাতে কপাল এবং চোখের অনেকটাই ঢাকা পড়ে। তা সত্ত্বেও এক মোমেন্টের জন্য খজড়াটার চোখ দেখে ফেলল পরমেশ্বর। চোখের রং নীলচে।

এখন কী করা উচিত তা ভাবার আগেই পরমেশ্বর দেখল গালপোড়া লোকটা অন্য সবার সঙ্গে লম্বা লম্বা পায়ে রিসেপশানের দিকে চলে গেল এবং চাবিটাবি কিছু একটা ওখানে জমা দিয়ে বাইরের দিকে চলল।

ঝট করে এবার যেন ইলেকট্রিসিটি খেলে গেল পরমেশ্বরের মধ্যে। লিফটের 'কিউ' থেকে বেরিয়ে দৌড়ে রিসেপশানের পাশ দিয়ে সে ছুটল মেইন গেটের দিকে। কিন্তু বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে আসতে যেটুকু সময় লাগে তার মধ্যে সেই মালটা র‍্যাফল স্কোয়ারের গিজগিজে ভিড়ের ভেতর ভ্যানিশড হয়ে গেছে।

এবার কী করা উচিত, পরমেশ্বর ভাবতে চেষ্টা করল। নীলচে চোখে

ঐ গালপোড়া খচ্চরটা হাতের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে গেল। ও কি এই হোটেলেই উঠেছে? এখানে উঠলে নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে। আপাতত হিঙ্গোরানির পাত্তা লাগানো যাক।

পরমেশ্বর আবার 'প্রাইড অফ দি ইস্ট' হোটেলে ফিরে এসে লিফটে করে সেভেন্টীনথ ফ্লোরে চলে এল। কার্পেটমোড়া লম্বা করিডরের দু' ধারে পর পর স্যুইটটা দরজার মাথায় নাম্বার দেখতে দেখতে বারো নম্বর স্যুইটটা পেয়ে গেল পরমেশ্বর। এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে পেছন ফিরল সে, দূরে করিডরের মাথায় ফ্লোর বয়টাকে দেখা যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকলে বয়টা সন্দেহ করতে পারে। পরমেশ্বর মুখটা তেরছা করে পেছন দিকে তাকাতে তাকাতে খুব আস্তে আস্তে সামনে এগুতে লাগল। কয়েক স্টেপ যাবার পর তার চোখে পড়ল, ফ্লোর বয়টা ওধারের একটা স্যুইটে ঢুকছে। হয়ত এখানকার বোর্ডার বেল বাজিয়ে তাকে ডেকেছে।

এক সেকেণ্ডও সময় নষ্ট করল না পরমেশ্বর। দৌড়ে বারো নম্বর স্যুইটের কাছে এসেই পকেট থেকে একগোছা চাবি বার করে একটার-পর-একটা কী-হোলে ঢুকিয়ে যেতে লাগল। তিন-চারটে লাগাবার পর আচমকা 'লক'-টা খুলে গেল। দরজার স্লাইট ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল পরমেশ্বর; আর ঢুকেই সেটা বন্ধ করে দিল।

স্যুইটের ভেতর অল্প পাওয়ারের আলো জ্বলছিল। পরমেশ্বর চারদিকে তাকাতে লাগল। একটা বেডরুম, বসার ঘর আর অ্যাটাচড বাথরুম নিয়ে এই মাঝারি মাপের স্যুইটটা।

বসার ঘরে পুরু কার্পেটের ওপর সোফা-টোফা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। পরমেশ্বর এবার সোজা বেডরুমে ঢুকে গেল। এ ঘরটা অন্ধকার। পরমেশ্বর সুইচ টিপে আলো জ্বালল।

বাঁ দিকে বিছানাটার ওপর যেন টাইফুন বয়ে গেছে। বেশ বোঝা যায়, হিঙ্গোরানি মাকড়াটা সারাদিন ওটার ওপর পড়ে ধামসেছে। বিছানার শিয়রের কাছে একটা ছোট্ট টেবলে হুইস্কির বোতল, অ্যাশ-ট্রেতে ছাই আর পোড়া সিগারেটের টুকরোর পাহাড়।

হিঙ্গোরানি আসল না নকল মাল, সেটা জানতে হলে তার মালপত্র স্লাইট সার্ভে করা দরকার। দুটো বড় বড় ঢাউস স্যুটকেশ রয়েছে একদিকে। চোখের পলকে একটা স্যুটকেশ খুলে ফেলল পরমেশ্বর। এটাতে বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না। খানকতক গেঞ্জি, জাঙিয়া, জাপানী বা ফার ইস্টের কোন দেশের টেরিফিক চেহারার ক'টা যুবতী ছুঁড়ির ন্যুড ফটো। আর গোছা গোছা আমেরিকান ডলারের বাণ্ডিল।

এক নম্বর সন্যুটকেশটা বন্ধ করে যখন দু নম্বরটা খনুলতে যাবে সেই সময় সন্যইটের বাইরের দরজায় খনুট করে চাবি ঘোরাবার আওয়াজ হল।

পরমেশ্বরের কান এমনিতে কুকুর বা খরগোশের মতো সজাগ। তা ছাড়া অচেনা এক খচ্চরের ঘরে ঢনুকে তার সন্যুটকেশ ঘাঁটতে ঘাঁটতে টেরিফিক সতর্কভাবে কান দুটো বাইরের দরজার দিকেই খাড়া করে রেখেছিল সে। বলা যায় না, হিঙ্গোরানি যে কোন সময় ফিরে আসতে পারে।

এখন কী করা যায় ? এক সেকেণ্ডের মধ্যে পরমেশ্বর তা ভেবে ফেলল। ঝট করে ঘরের আলো নিবিয়ে দেয়ালের গায়ের প্রকাণ্ড ওয়ার্ডরোবে ঢনুকে পড়ল সে।

খনুবই লাকি পরমেশ্বর। ওয়ার্ডরোবে অগনুনতি কোট, শার্ট, ট্রাউজার্স, ওভারকোট ইত্যাদি ইত্যাদি এমনভাবে টাঙানো রয়েছে যে সেগনুলোর পেছনে গিয়ে বসলে সহজে কেউ দেখতে পাবে না। সে পেছনে গিয়ে গনুটিসনুটি মেরে বসে ওয়ার্ডরোবের পাল্লা দুটো এমনভাবে বন্ধ করল যাতে অল্প ফাঁক থেকে যায় এবং হাওয়া ঢনুকতে পারে।

ভেতরে বসেই পরমেশ্বর টের পেল, কেউ একজন ঘরে ঢনুকে আলো জনালিয়েছে। ওয়ার্ডরোবের পাল্লায় যে ফাঁকটনুকু রয়েছে তা দিয়ে আলোর সরনু একটা লাইন ভেতরে ঢনুকতে পেরেছে। শরীরের সবটনুকু জোর চোখে এনে পরমেশ্বর ফাঁকটা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। দারনুণ এক উত্তেজনা তার নার্ভের ভেতর দিয়ে ঝড়ের স্পীডে ছোটাছনুটি করতে লাগল। যদি খজড়াটা একবার টের পায় চুরি করে সে এই সন্যইটে ঢনুকে এখন এই ওয়ার্ডরোবে বসে আছে তা হলে নীট রেজাল্টখানা কী হবে তা খনুব সহজেই আন্দাজ করা যায়। হয় তাকে পনুলিসে হ্যাণ্ড-ওভার করবে আর নইলে চিৎকার করে লোকজন ডেকে তাকে কিমা বানাবার চেষ্টা করবে।

পরমেশ্বর ভাবল, যা হবার হোক। এখন লোকটাকে ওয়াচ করা ছাড়া আর কিছনুই করার নেই।

টের পাওয়া যাচ্ছে, লোকটা তার জনুতো-ফনুতো খনুলে বিছানায় চিত হয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ এইভাবে পড়ে থাকার পর কাত হয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

কাত হবার সঙ্গে সঙ্গে লোকটার মনুখের একটা সাইড দেখতে পেল পরমেশ্বব এবং দেখেই চমকে উঠল। সেই গালপোড়া ব্লনু-আইড অর্থাৎ নীলচোখো লোকটা। এই মালটাই তা হলে হিঙ্গোরানি! পরমেশ্বরের নার্ভগনুলো মনুহনুর্তে টান টান হয়ে গেল।

ওদিকে হিঙ্গোরানি হনুইস্কির বোতল খনুলে গলার ভেতর খানিকটা ঢেলে দিয়ে আবার চিত হয়ে শনুলো। দশ মিনিট এভাবে শোবার পর ফের

কাত হয়ে হুইস্কি খেল। এইভাবে দশ মিনিট পর পর চিত এবং কাত হওয়া আর হুইস্কি খাওয়া চলল।

মাকড়া যে কতক্ষণ ঐরকম নবাবী চালে মাল খেয়ে যাবে, কে জানে। এভাবে ওয়ার্ডরোবে বুকের কাছে হাঁটু ঢুকিয়ে ঠায় একভাবে বসে থাকতে মনে হচ্ছিল বডির নিচের দিকটায় প্যারালিসিস হয়ে যাবে। পা আর হাত দুটো এখন একটু ছড়িয়ে নেওয়া দরকার। কাত হবার জন্য ডান দিকে হাত বাড়িয়ে ওয়ার্ডবোরের কাঠের তাকে ভর দিতে গেল পরমেশ্বর। সঙ্গে সঙ্গে নরম কিছুর ওপর হাতটা পড়ল। হাতের চাপে জিনিসটা খানিকটা হড়কে গিয়ে ঘষটে যাবার মতো একটু শব্দ হল।

শব্দটা বোধ হয় গালপোড়া হিঙ্গোরানির কানে গিয়েছিল। মাথা তুলে সে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর আবার শুয়ে পড়ল।

বুকের ভেতর শ্বাস আটকে গিয়েছিল পরমেশ্বরের। বডির সবগুলো মাসল আর টিস্যুও ইটের মতো শক্ত হয়ে উঠেছিল। আস্তে আস্তে বুকের ভেতর থেকে আটকানো বাতাসটা বার করে দিল পরমেশ্বর; শরীরের শক্ত মাংসের ডেলা এবং নার্ভগুলো নরম হয়ে এল। হিঙ্গোরানি মাকড়টা যাই হোক সন্দেহ টন্দেহ করে নি। আসার সময় রিভলবারটা সঙ্গে আনে নি পরমেশ্বর। দারুণ ভুল হয়ে গেছে। এবার থেকে সারাক্ষণ ওটা সঙ্গে সঙ্গে রাখতে হবে।

হিঙ্গোরানি ফের শুয়ে পড়তে হাতের তলার সেই জিনিসটা খুব সতর্ক ভঙ্গিতে তুলে নিয়ে এল পরমেশ্বর। ওটা একটা ফোমের ব্যাগ। কোনরকম শব্দ না করে আস্তে আস্তে ব্যাগের মুখটা খুলল সে। আর খুলতেই সরু লাইনের মতো আলোয় দেখা গেল, ভেতরে চারটে পাশপোর্ট রয়েছে। তার একটায় গালপোড়া হিঙ্গোরানির ফোটো রয়েছে, আরেকটায় এক চোখে ঠুলিলাগানো মধুকর শ্রীবাস্তবের ফোটো, থার্ডটায় একজন চীনা, নাম সিন লাও আর ফোর্থটায় একজন বৃটিশ—নাম রবার্ট ইলিংওয়ার্থের ফোটো সেট করা রয়েছে।

দেখেই পরমেশ্বর টের পেয়ে গেল, সবগুলো ফোটোই জাল এবং হিঙ্গোরানি, শ্রীবাস্তব, সিন লাও আর ইলিংওয়ার্থ—সবাই আসলে একই মাল। এতগুলো নকল পাশপোর্ট সে যে বানিয়ে রেখেছে তার কারণ ডেফিনিটলি একটাই—যখন যেটা কাজে লাগে। কিন্তু এগুলো দিয়ে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না যে এই মালটা এক্সই। তবে একটা ব্যাপার মাথা থেকে কিছুতেই বার করা যাচ্ছে না। সেটা হল হিঙ্গোরানি এবং এক্স, দুজনেরই চোখ নীলচে। অবশ্য ওয়ার্ল্ডে তিনশো সাড়ে-তিনশো কোটি মানুষের

ভেতর দেড় দু কোটি ব্লু-আইড লোক নিশ্চয়ই আছে। তারা সবাই ডেফিনিটলি এক্স নয়। হিঙ্গোরানি এক্স হোক আর না-ই হোক, একটা টেরিফিক হারামী যে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। এতগুলো জাল পাশপোর্ট নিয়ে যে ঘোরাঘুরি করে তার স্লেট নিশ্চয়ই 'ক্লীন' নয়।

পরমেশ্বর একবার ভাবল, নকল পাশপোর্টে বোঝাই চামড়ার ব্যাগটা পকেটে পুরে ফেলে। পরের মোমেণ্টে তার মনে হল এটা নিয়ে গেলে হিঙ্গোরানি খুব কেয়ারফুল হয়ে যাবে। কেউ তার স্যুইটে ঢুকেছিল, এটা টের পেলে মাকড়া তক্ষুণি এখানকার তাঁবু গুটিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে। তার চাইতে দু-একটা দিন মালটার অ্যাকটিভিটি লক্ষ্য করা যাক। তা হলেই আসল উদ্দেশ্য টের পাওয়া যাবে।

পরমেশ্বর আস্তে করে ব্যাগটা জায়গামতো নামিয়ে রাখার আগে নামতা মুখস্থ করার মতো হিঙ্গোরানি, শ্রীবাস্তব, সিন লাও এবং ইলিংওয়ার্থের নাম আর ঠিকানাগুলো মনে মনে পড়ে মেমোরির ভেতর ঢুকিয়ে 'সীল' করে রাখল। লাইফে এগুলো কোনদিনই সে ভুলছে না।

ব্যাগটা নামিয়ে রাখার পরও বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেল। কিন্তু হিঙ্গোরানি খচ্চরটা সেই যে বিছানায় বডি ফেলে রেখেছে আর ওঠার নামগন্ধ নেই। শালা কি আজ আর উঠবে না? হোল নাইট, কিংবা কাল সকাল এবং দুপুর, যতক্ষণ না মাকড়া স্যুইট থেকে বেরুচ্ছে ততক্ষণ তাকে এই ওয়ার্ডরোবের ভেতর স্ট্যাচু হয়ে বসে থাকতে হবে?

নাঃ, লাকটা ভালোই বলতে হবে। হিঙ্গোরানি আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই উঠে পড়ল। কিন্তু এ কী, শালা যে এদিকেই আসছে! সত্যি সত্যিই ওয়ার্ডরোবের সামনে এসে সে দাঁড়াল এবং পাল্লা দুটো ফাঁক করে অনেকটাই খুলে ফেলল। এখন যদি খচ্চরটা কোন কারণে নিচের দিকে ঝোঁকে, একেবারে তলার তাকে পরমেশ্বরকে দেখতে পাবে।

কোট-ট্রাউজার্স শার্ট-টার্টের ফাঁক দিয়ে পরমেশ্বর হিঙ্গোরানির পা দুটো দেখতে পাচ্ছে। বুকের ভেতর নিঃশ্বাস আটকে গেল তার। টের পেল, গলগল করে ঘাম বেরিয়ে তার সারা শরীর ভিজে সপসপে হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত আর ঝুঁকল না হিঙ্গোরানি। ওপরে তাক থেকে একটা স্ট্রাইপড পাজামা আর ঘরে পরার পাতলা হাউসকোট নিয়ে পাশের বাথরুমে ঢুকল। ওয়ার্ডরোবের পাল্লা দুটো খোলাই পড়ে রইল।

একটু পর বাথরুম থেকে শাওয়ারের ঝর ঝর আর গুনগুন করে হামিং এর আওয়াজ ভেসে এল। খচ্চরটা দেখা যাচ্ছে একটা সিঙ্গিং স্টার—বিং ক্রসবি না কিশোরকুমার?

যাই হোক, এই হল মওকা। এই চান্সে বেরুতে না পারলে আজ আর বেরুবার আশা নেই। তা ছাড়া একবার ওয়ার্ডরোবের নিচের দিকে ঝোঁকে নি বলে আর ঝুঁকবে না, এমন কোন গ্যারান্টি নেই। এখনই এখান থেকে হড়কে বেরিয়ে যেতে হবে। বাথরুমে শাওয়ারের ছর ছর শব্দ হচ্ছে। সে বেরুবার সময় যদি স্লাইট আওয়াজও হয় শাওয়ারের শব্দে তা ঢাকা পড়ে যাবে। তবু সামনের কোর্ট-শার্টের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে কচ্ছপের মতো বাইরে গলা বাড়াল পরমেশ্বর। ওধারে বাথরুমের দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। অর্থাৎ হিঙ্গোরানি ওটা পুরোপুরি বন্ধ করেনি।

পরমেশ্বর এবার একটা কাজ করল। পকেট থেকে সেই ইমপ্রোভাইজড লাইটার-কাম-টেপ রেকর্ডারটা বার করে হাতের আড়াল দিয়ে ফস করে একবার ধরিয়ে ফেলল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে দিল। তারপর লাইটারটা ওয়ার্ডরোবের পাল্লার একটা খাঁজে এমনভাবে একটা সেট করে দিল যাতে না জানা থাকলে খুঁজে বার করা অসম্ভব।

লাইটারটার ভেতরে টেরিফিক পাওয়ারফুল ব্যাটারি রয়েছে। আগুন জ্বললেই টেপ রেকর্ডার চালু হয়ে যায় এবং চালু অবস্থায় একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা থাকতে পারে। রেকর্ডারটা এতই পাওয়ারফুল যে তিরিশ গজ দূর থেকেও যে কোন শব্দ ক্যাচ করতে পারে। মালটা পরমেশ্বর যোগাড় করেছিল এক আমেরিকান হাসিস স্মাগলারের কাছ থেকে। তার ইচ্ছা যদি হিঙ্গোরানি বা তার ঘরে যদি অন্য কোন মাকড়া আসে বা ফোনে সে যদি কারো সঙ্গে কথা-টথা বলে, সেই সব ডায়লগ থেকে কিছু সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে।

লাইটার-কাম-রেকর্ডারটা সেট করার পর এক সেকেণ্ডও ওয়েট করল না পরমেশ্বর। বেড়ালের মতো চুপচাপ ওয়ার্ডরোব থেকে বেরিয়ে এল। তারপর বেডরুম থেকে বসবার ঘরের দিকে যেতে যেতে আচমকা তার চোখে পড়ল, হিঙ্গোরানির স্যুইটটা র‍্যাফল স্কোয়ারের রাস্তার দিকে। এখান থেকে প্লাজা হোটেল, হোটেল ম্যাগনিফিসেণ্ট, পার্ল হোটেল এবং হোটেল সিঙ্গাপুরের সামনের দিকগুলো সবই দেখা যায়।

বসার ঘর থেকে বেরিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে স্যুইটের বাইরে চলে এল পরমেশ্বর। আরো কয়েক মিনিট বাদে তাকে দেখা গেল র‍্যাফল স্কোয়ারের রাস্তায়।

খানিকক্ষণ এলোমেলো ঘুরে পরমেশ্বর ঠিক করলো, এবার হোটেল ম্যাগনি-ফিসেণ্টে যাবে। অমিতাভর সঙ্গে একবার মোলাকাত হওয়া দরকার।



হোটেল ম্যাগনিফিসেণ্টের রিসেপশান থেকে অমিতাভর স্যুইট নাম্বারটা জেনে স্ট্রেট সিক্সটীনথ ফ্লোরে চলে এল পরমেশ্বর। করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ছিয়াশি নম্বর স্যুইটের সামনে এসে বেল বাজালো।

একটু পরেই দরজা খুলে মুখোমুখি দাঁড়াল অমিতাভ। একজন তিব্বতীকে দেখে সে টেরিফিক অবাক হয়ে গেছে। আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, 'হুম ডু ইউ ওয়াণ্ট ?'

পরমেশ্বর বলল, 'স্যার, আই অ্যাম অ্যাস্ট্রোলজার ফ্রম তিবেত। সিঙ্গাপুরের হোটেলে হোটেলে ঘুরে মানুষের ফিউচার বলাটা আমার প্রফেশান। পরমেশ্বরের যতদূর মনে আছে অমিতাভ বেশ কয়েক বার তাকে অ্যাস্ট্রোলজি-টজি সম্পর্কে বলেছে। ফরচুন টেলারদের ব্যাপারে তার দুর্দান্ত আগ্রহ।

অমিতাভ বলল, 'কিন্তু আমি তো হরস্কোপ কিছুই সঙ্গে করে আনি নি।'

দরকার নেই। আপনার সঙ্গে আপনার হাত আর কপালই তো আছে। আমি পামিস্ট্রিও জানি। কপাল দেখেও ফিউচার বলতে পারি।'

একটু ভেবে অমিতাভ বলল, 'আচ্ছা আসুন—'

পরমেশ্বর এটাই চাইছিল। ভেতরে 'ইন' করতে করতে সে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

প্রকাণ্ড স্যুইট অমিতাভর। দরজা বন্ধ করে বিরাট বসবার ঘরে নিয়ে সে পরমেশ্বরকে বসাল এবং নিজে মুখোমুখি বসল।

অমিতাভর এই স্যুইটটাও রাস্তার দিকেই। তা হলে দেখা যাচ্ছে, মার্টিন বাসুদেব পণ্ডিত, গালপোড়া হিঙ্গোরানি বা শ্রীবাস্তব বা পাশপোর্টের সেই চীনা বা ব্রিটিশ, অমিতাভ এবং পরমেশ্বর স্বয়ং—সবার স্যুইটগুলোই রাস্তার দিকে। পরমেশ্বর লক্ষ্য করল, ওধারের কাচের টানা জানলাটা খোলা রয়েছে। বসে বসেই সে প্লাজা, পার্ল, প্রাইড অফ দি ইস্ট এবং হোটেল সিঙ্গাপুরের সামনের দিকের সবটাই দেখা যাচ্ছে।

অমিতাভ বলল, 'আপনার জন্যে কী বলব ? হুইস্কি, রাম না জিন ?'

পরমেশ্বর বলল, 'থ্যাঙ্কস স্যার, আমার ওসব চলে না। টী অর কফি উইল ডু।' আজই সিঙ্গাপুর এসেছে সে। কাল সন্ধ্যেবেলা সেই যে বাংলা মাল একটু খেয়েছিল তারপর থেকে গলা শুকিয়ে ঝামা হয়ে আছে। এই সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশের আগমার্কা ধান্যেশ্বরী কোথায় পাবে সে ? যে ক'টা দিন এখানে আছে, ব্রহ্মচারী হয়েই কাটাতে হবে।

অমিতাভর চোখমুখ দেখে মনে হল, হুইস্কি-টুইস্কির বদলে চা বা কফি আনতে বলায় পরমেশ্বর সম্পর্কে মাকড়ার টেরিফিক শ্রদ্ধ-ট্রদ্ধা হয়েছে। শালা তাকে জিতেন্দ্রিয় লামা-টামা ঠাউরে বসল নাকি ?

পরমেশ্বরের জন্য কফি বিস্কুট আর নিজের জন্য হুইস্কি আনিয়ে খেতে খেতে হাত বাড়িয়ে দিল অমিতাভ। বলল, 'দেখুন কী আছে—'

পরমেশ্বর অমিতাভর হাত নিজের দু'হাতে তুলে নিয়ে পকেট থেকে একটা ম্যাগনিফাইয়িং গ্লাস বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, ভুরু-টুরু কুঁচকে, ঘাড় বাঁকিয়ে, চোখ তেরছা করে অনেকক্ষণ কী সব রেখা-রেখা দেখল। সেই সঙ্গে চোখের তারা ফিক্সড করে কপালটাও মার্ক করতে লাগল। তারপর বলল, 'আপনি কি ইনডেপেণ্ডেণ্ট প্রফেশানে আছেন ?'

'মানে ?'

'এই ধরুন বিজনেস-টিজনেস।'

'তা বলতে পারেন। আমার ছোটখাটো দু-একটা ফ্যাক্টরি আছে ইণ্ডিয়ায়।'

পরমেশ্বর ভাবল, চোখ বুজে গড়গড় করে তোমার ফোরটিন জেনারেশনের হিস্ট্রি আমি বলে দিতে পারি। কিন্তু এভাবে বললে ডেফিনিটলি তোমার সন্দেহ হবে। আমি তা চাই না। চোখ বুজে প্রচুর চিন্তা-ফিন্তা করে সে এবার বলল, 'ভেরি রিসেণ্টলি ড্রাগনস হেড আর মার্সের (রাহু ও মঙ্গল) কনজাংসনে আপনার দারুণ ক্ষতি হয়ে যাবার কথা।'

অমিতাভ আগ্রহে ঝুঁকে পড়ল, 'কী ধরনের ক্ষতি বলুন তো ?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে পরমেশ্বর বলল, 'ড্রাগনস হেড আর মার্স তো। এই ধরুন যন্ত্রপাতি মানে মেসিন-টেশিনের ক্ষতি।'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমার দুটো ফ্যাক্টরির প্রচণ্ড ড্যামেজ হয়েছে।'

'এটা স্যাবোটেজ। মানে, আপনার কোন শত্রু এটা করিয়েছে।'

'কারেক্ট কারেক্ট। আমারও সেরকমই ধারণা।'

পরমেশ্বর বলল, 'আপনার হাতে আর কপালে দুটো করে লাইন দেখছি।

এটা খুবই খারাপ। রিসেণ্টলি সত্যিকারের একজন ওয়েল উইশারের সঙ্গে আপনার ভুল বোঝাবুঝি হবার কথা। এ ব্যাপারে আপনিই তাঁকে ভুল বুঝেছেন।'

একটু চিন্তা করে অমিতাভ বলল, 'একজনের কথা আমার মনে হচ্ছে। কিন্তু তার ব্যাকগ্রাউণ্ড ভালো না।'

'সেটা আমি বলতে পারব না। যদি ভেরি রিসেণ্টলি তার সঙ্গে মিস-আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হয়ে থাকে, সে যেমনই হোক—আপনার রীয়াল ফ্রেণ্ড।'

'বলছেন?'

'সিওর', বলে একটু থেমে পরমেশ্বর ফের শুরু করল, 'দু-চারদিনের মধ্যে আপনার খুব বড় একটা কাজ হবে। একটা বিরাট প্রোজেক্টে আপনি জড়িয়ে পড়বেন। আর সেটা আপনার পক্ষে খুবই প্রফিটেবল।'

অমিতাভ বলল, 'এ প্রোজেক্টটা শেষ পর্যন্ত হবে কি?'

'নিশ্চয়ই।'

'ধন্যবাদ।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'স্যার, আপনার একটা বিপদ দেখতে পাচ্ছি।'

অমিতাভকে এবার রীতিমতো চিন্তাগ্রস্ত দেখাল। সে জিজ্ঞেস করল, 'কী রকম বিপদ?'

'কোন শত্রু আপনার লাইফের ওপর অ্যাটেমপ্ট নিতে পারে। বী কেয়ারফুল।'

অমিতাভ চমকে উঠল, 'মারা যাবো নাকি?'

কপালে গোটাকতক ভাঁজ দেখে পরমেশ্বর বলল, 'না, মারা যাবেন না। তবে ইনজিওরড হতে পারেন। আপনাকে এখন থেকে কয়েকটা দিন সাবধানে থাকতে হবে।'

অমিতাভকে এবার ভীষণ নার্ভাস দেখাল, 'কত দিন?'

'এই ধরুন দিন পাঁচেক।' পরমেশ্বরের ধারণা দিন চার-পাঁচেকের মধ্যেই অমিতাভর ওপর যা অ্যাটেমপ্ট হবার হবে।

'আপনার কথা আমার মনে থাকবে। আপনার ফী-টা?'

'আপনি যা দেবেন। তবে ডলারে দিলে ভালো হয়।'

অমিতাভ পার্স থেকে কুড়ি ডলার বার করে পরমেশ্বরকে দিতে দিতে বলল, 'আপনি খুশী?'

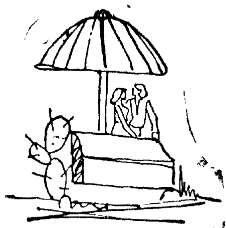
পরমেশ্বর বলল, 'এক্সট্রিমলি। মেনি মেনি থ্যাঙ্কস স্যার।' বলেই উঠে পড়ল।

বাইরের দরজা পর্যন্ত পরমেশ্বরকে এগিয়ে দিয়ে অমিতাভ বলল, 'ইটস এ নাইস মীটিং। আপনার অ্যাড্রেস বা ফোন নাম্বার দিয়ে যান। কনট্যাক্ট করব। দু-একদিনের ভেতর আরেকবার বসা যাবে।'

'স্যার, ডাউন টাউনে খুব ছোট আর গরীব হোটেলে আমি থাকি। সেখানে ফোন নেই। আমিই আপনার সঙ্গে কনট্যাক্ট করে নেব। কবে এলে আপনার সুবিধা হয়?'

অমিতাভ একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'পরশু—না, তারপর দিন সন্ধ্যেবেলা চলে আসুন। আমি ঐ সময়টা ফ্রী থাকব।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।' পরমেশ্বর বাইরের করিডরে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল।



'হোটেল ম্যাগনিফিসেণ্ট' থেকে বেরিয়ে আবার র‍্যাফল স্কোয়ারের রাস্তায়। সেখানে নেমে স্ট্রেট নিজের 'হোটেল সিঙ্গাপুরে' চলে এল পরমেশ্বর। তার গায়ে তিব্বতীদের মেক-আপ। কসমোপলিটান মেট্রোপলিসের হোটেলগুলোতে ওয়ার্ল্ডের নানা দেশ থেকে নানা জাতের লোক এসে থাকছে। সাঙ্ঘাতিক কোন ব্যাপারে, যেমন মার্ডার-ফার্ডার না হলে এখানে কেউ খোঁজ রাখে না।

কোনদিকে না তাকিয়ে গ্রাউণ্ড ফ্লোরের প্রকাণ্ড লাউঞ্জ পেরিয়ে লিফটে গিয়ে ঢুকল পরমেশ্বর। তার সঙ্গেই স্যুইটের চাবিটা রয়েছে।

একটু পর ঘরে ঢুকে প্রথমে তিব্বতী থেকে আবার সর্দার যশমিন্দর সিং গিল হয়ে গেল পরমেশ্বর। তারপর সুটকেশ থেকে একটা পাওয়ারফুল বাইনোকুলার বার করে ঘরের আলো নিভিয়ে রাস্তার দিকের কাচের জানালার পাশে গিয়ে বসল। এলান থেকে প্লাজা, পার্ল, প্রাইড অফ দি ইস্ট আর হোটেল ম্যাগনিফিসেণ্টের ওপর খানিকক্ষণ নজর রাখবে।

চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে প্রথমে প্রাইড অফ দি ইস্ট হোটেলের সেভেনটীনথ ফ্লোরে হিঙ্গোরানির স্যুইটের দিকে তাকাল। সন্দেহ-টন্দেহ করার মতো কোন ব্যাপার নেই। হিঙ্গোরানি মাকড়া পাজামার ওপর একখানা হাউসকোট চাপিয়ে বিছানায় কাত হয়ে বেশ মেজাজে হুইস্কি টেনে চলেছে। খানিকক্ষণ আগে পরমেশ্বর যখন তার ওয়ার্ডরোবের ভেতর ঢুকে বসেছিল তখন স্ট্রেট হুইস্কির বোতলটাই গলায় ঢালছিল মাকড়া। এখন গেলাসে ঢেলে খাচ্ছে।

হিঙ্গোরানির স্যুইট থেকে পরমেশ্বরের বাইনোকুলার হোটেল ম্যাগনিফিসেণ্টের সিক্সটীনথ ফ্লোরে ছিয়াশি নম্বর স্যুইটে গিয়ে থামল। জোরালো আলো জ্বলছে সেখানে। দেখা গেল, বসার ঘরে একটা ডিভনে কাত হয়ে শুয়ে

কী সব কাগজপত্র দেখছে অমিতাভ। খুব সম্ভব এখানে যে প্রোজেক্টের ব্যাপারে এসেছে তারই ড্রাফট্-ট্রাফট্ হবে।

হোটেল ম্যাগনিফিসেণ্ট থেকে পরমেশ্বরের বাইনোকুলার ঘুরতে ঘুরতে এসে থামল পার্ল হোটেলে। সিক্সটীনথ ফ্লোরে চুয়াত্তর নম্বর স্যুইটের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল পরমেশ্বর। ওখানে একটা খুব কম পাওয়ারের নীলচে আলো জ্বলছে। মার্টিন বাসুদেব পণ্ডিত তারই মধ্যে জানলার ধারে বসে চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে একবার হোটেল ম্যাগনিফিসেণ্ট, আরেকবার অন্য সব হোটেল দেখে যাচ্ছে। কী দেখছে সেটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। তবে মালের মতলব যে খুব ভালো নয়, সেটা মালুম পেতে অসুবিধা হয় না।

যতক্ষণ মার্টিন বাসুদেব পণ্ডিত চোখে বাইনোকুলার ফিট করে রাখল ততক্ষণ পরমেশ্বরও চোখ থেকে বাইনোকুলার নামাল না।

ঘণ্টা ছয়েক বাদে বোধহয় টায়ার্ড হয়েই বাসুদেব পণ্ডিত বসবার ঘর থেকে বেডরুমে চলে গেল। যাবার সময় বাইনোকুলারটা বাইরের ঘরের সেণ্টার টেবলের ওপর ফেলে রেখে গেছে সে।

পরমেশ্বর আরেকবার হিঙ্গোরানি আর অমিতাভকে দেখে নিল। হিঙ্গোরানি আগের মতো মাল খেয়ে যাচ্ছে। মাকড়াটার স্টমাকটা যেন হুইস্কির একখানা গো-ডাউন। অমিতাভকে আর বাইরের ঘরে দেখা যাচ্ছে না ; নিশ্চয়ই সে খেয়েদেয়ে বেডরুমে ঢুকে শুয়ে পড়েছে।

এখন প্রায় এগারোটার মতো বাজে। র‍্যাফল স্কোয়ারের চোখধাঁধানো আলোয় এখনও অগুনতি মানুষ দেখা যাচ্ছে আর দেখা যাচ্ছে হাজার প্রাইভেট কার। সিঙ্গাপুর কি শালা রাত্তিরে ঘুমোয় না ?

পরমেশ্বর জানলার ধার থেকে উঠে এল একসময়। বাইনোকুলারটা সেলফে ছুঁড়ে দিয়ে ফোন তুলে রুম সারভিসকে রাতের খাবার-টাবার পাঠাতে বলল। তারপর টেলিফোন ক্রেডেলে নামিয়ে রাখল। পনের সেকেণ্ডের পার হল না, ফোন বেজে উঠল। সেটা কানে তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে মেয়ে-গলা ভেসে এল। বিকেলেই সেই মেয়ে বা মেয়েমানুষটা। সে বলল, 'সিঙ্গাপুরে সময় কেমন কাটছে মিস্টার সিং ?'

পরমেশ্বরের নার্ভগুলো টান টান হয়ে গেল। সে বলল, 'ফাইন।'

'সারাদিনই কি হোটেলে বসে ছিলেন ?'

'না, একবার একটু বেরিয়েছিলাম।'

'বেরিয়ে যেখানে-যেখানে গিয়েছিলেন সে সব জায়গায় কাজ হয়েছে ?'

পরমেশ্বর খুব সতর্কভাবে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কোথায় গিয়েছিলাম আপনি জানেন নাকি ?'

উত্তর না দিয়ে মেয়েটি বলল, 'আমার ধারণা আপনি কারেক্ট জায়গাগুলোতেই গিয়েছিলেন। এভাবেই চালিয়ে যান।'

মেয়েটা কি তার ওপর ওয়াচ রাখছে? তাকে স্লাইট বাজিয়ে নেবার জন্য পরমেশ্বর হাল্কা গলায় বলল, 'আমার দু-একজন ফ্রেণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।'

'জানি তো। ওরা আপনার বুজম ফ্রেণ্ড, বেস্ট ওয়েল-উইশার। এনিওয়ে আপনাকে একটা খবর দেবার আছে।'

'বলুন।'

'আপনি এলাহাবাদের শ্রীবাস্তব সম্পর্কে যা জেনেছিলেন সেটা কারেক্ট নয়। মধুকর শ্রীবাস্তব নামে একজন নিশ্চয়ই ছিলেন কিন্তু তিনি বেঁচে নেই। ছ'মাস আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে আর মৃত্যুর কয়েকদিন বাদেই তাঁর ইণ্টারন্যাশনাল পাশপোর্টটা অন্য জিনিসপত্রের সঙ্গে চুরি হয়ে যায়। ঐ পাশপোর্টটা নিয়ে যে সিঙ্গাপুর এসেছে সে ডেফিনিটলি জেনুইন প্যাসেঞ্জার নয়।'

খানিকক্ষণ আগে হিঙ্গোরানির ওয়ার্ডরোবে শ্রীবাস্তবের পাসপোর্টটা দেখে পরমেশ্বরের এইরকমই সন্দেহ হয়েছে। সে কিছু বলবার আগেই মেয়েটা আবার বলে উঠল, 'ফাদার ডি মেলো সম্পর্কে আপনি কিছু জেনে আসতে পারেন নি। ফর ইওর ইনফরমেশন বলছি মধ্যপ্রদেশের ফাদার ডি মেলোও দু বছর আগে মারা গেছেন।'

এ খবরটাও পরমেশ্বরের কাছে নতুন কিছু নয়। আজই সিঙ্গাপুরের ডাউন টাউনে জেভিয়ার মেথডিস্ট চার্চে ফোন করে সে জেনেছে ফাদার ডি মেলো বলে ওখানে কেউ নেই। কিন্তু এত সব খবর মেয়েটা জানলো কী করে? তবে কি—তবে কি—তবে না, নিশ্চয়ই মেয়েটা হেমা। সে ছাড়া এত সিক্রেট ব্যাপার কারো পক্ষেই জানা কোনভাবেই সম্ভব না। আস্তে করে পরমেশ্বর বলল, 'আপনি যা যা বলবেন সবই আমি জেনে ফেলেছি মিস সারিন।'

মেয়েটি থতিয়ে থতিয়ে বলল, 'হু ইজ মিস সারিন?'

'ভয়েস পাল্টে একবার আমাকে বুদ্ধু বানিয়েছেন। আর পারবেন না।'

'হিয়ার ইউ আর। ধরে ফেলেছেন তা হলে?'

'এ ব্যাপারে আমার এতটুকু ক্রেডিট নেই। আপনিই আমাকে ধরতে হেল্প করেছেন। কাইণ্ডলি শুধু বলুন, আপনি কি এই ফ্লাইটে আমার সঙ্গে সিঙ্গাপুর এসেছেন?'

'অফ কোর্স।'

'কী মেক-আপে ছিলেন—ফ্লোরা নাইটের ?'

'ফ্লোরা নাইটকে বুঝি ভোলা যাচ্ছে না!' দারুণ মজার গলায় হেমা বলল।

'ভোলা কি উচিত, আপনিই বলুন। মালখানা কীরকম—'

বলেই জিভ কাটল পরমেশ্বর। তক্ষুণি আবার বলল, 'ক্ষমা ম্যাডাম, ক্ষমা—ফর দা ল্যাঙ্গুয়েজ। প্লীজ বলুন, প্লেনে আপনি কোন্ চেহারায় কার নাম বডিতে সেট করে ছিলেন—'

'মিসেস গিদোয়ানি। গিদোয়ানি সাহেবের স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ফ্লাইট ক্যানসেল করলেন। তখন ওঁর সঙ্গে অ্যারেঞ্জমেণ্ট করে চান্সটা নিয়ে নিলাম।'

'হ্যাটস অফ। আমার এতটুকু সন্দেহ হয় নি। এবার একটা কথা বলুন তো—'

'কী ?'

'আমার ওপর আপনার কি পুরোপুরি ভরসা নেই ? না ভেবেছিলেন আমি ইণ্ডিয়া থেকে বেরিয়ে হাওয়া হয়ে যাব ?'

'তার মানে ?'

'মানেটা ভেরি সিম্পল। আপনি আমাকে পুরোটা বিশ্বাস করেন নি। তাই পেছন পেছন চলে এসেছেন।'

'একেবারেই না। আপনি আমায় মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ড করছেন।'

পরমেশ্বর উত্তর দিল না।

হেমা আবার বলল, 'আপনি যে কাজে এসেছেন সেটা কত ডেঞ্জারাস, নিশ্চয়ই জানেন। আপনার অপোনেণ্টরা না পারে এমন কাজ নেই। আপনাকে হেল্প করতেই আমার এত দূরে ছুটে আসা।'

পরমেশ্বর ভেতরে ভেতরে ক্ষেপে গিয়েছিল। সে গজ গজ করে উঠল, 'এই ফরেন কাণ্ট্রিতে আপনি আমাকে কী হেল্প করতে পারেন ?'

'আপাততঃ দুটো খুব ইমপর্টেণ্ট খবর দিতে পারি। আশা করি তাতে আপনার যথেষ্ট উপকার হবে।'

'কী খবর ?'

'নাম্বার ওয়ান—সোমেশ্বর মল্লিক ঐ একই ফ্লাইটে সিঙ্গাপুর এসেছে। নাম্বার টু—মল্লিক জেনে গেছে, আপনিও ঐ একই ফ্লাইটে এখানে এসেছেন।'

পরমেশ্বর অবাক। বলল, 'তাই নাকি ? আপনি জানলেন কী করে ?'

'এক্ষুনি সেটা বলছি না। তবে আপনাকে একটা টেপ বাজিয়ে শোনাতে পারি।'

'শোনান।'

একটু পর টেলিফোনের তারের ভেতর দিয়ে টেপ রেকর্ডার থেকে দুটো চেনা গলা ভেসে এল। সোমেশ্বর এবং এক্সের গলা।

এক্স বলছে, 'আপনি সিঙ্গাপুর পর্যন্ত আমাকে ফলো করে চলে এলেন! আপনার কি ধারণা, টাকাটা মেরে আমি পালিয়ে যাব! প্রফেশনালরা এভাবে কাউকে ঠকায় না।' বোঝা যাচ্ছে, মাকড়া টেরিফিক ক্ষেপে গেছে।

সোমেশ্বর গলায় মাখন লাগিয়ে বলল, 'আমাকে ভুল বুঝবেন না। খুব সম্ভব আপনার জানা নেই সেই দুর্ধর্ষ হারামজাদা পরমেশ্বরটাও এখানে হাজির হয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'ইয়েস। সেই হারামীটা কী ডেঞ্জারাস জিনিস, আপনি জানেন না। আপনার অপারেশনের ব্যাপারে হেল্প করার জন্যই চলে এসেছি। কখন কী অসুবিধায় পড়ে যাবেন আগে থেকে তো বলা যায় না।'

এক্স এবার একটু নরম হল, 'পরমেশ্বর কী মেক-আপে এসেছে?'

'সেটাই তো ধরতে পারছি না। কলকাতায় ও যে হোটেলে গা ঢাকা দিয়ে ছিল সেখানে স্পাই রেখেছিলাম। তাকে পোঁকা দিয়ে হারামীটা চলে এসেছে। এক পাঞ্জাবী সর্দারকে আমার সন্দেহ হয় তবে আমি ঠিক সিওর না। এনিওয়ে অমিতাভ সেনের কাছাকাছি কোন হোটেলে, এমন কি একই হোটেলে সে উঠতে পারে। আমি নজর রেখে যাচ্ছি। আপনিও খোঁজ করবেন আর কেয়ারফুল থাকবেন।'

'হুঁ।'

'আরেকটা কথা, আমি খবর পেয়েছি, কাল বিকেল চারটেয় অমিতাভ সিঙ্গাপুর ইলেকট্রনিকসের সঙ্গে কনট্রাক্ট সাইন করবে। তারপর কোম্পানির তরফ থেকে ওকে হোল সিটিটা ঘুরিয়ে দেখানো হবে।'

'গুড ইনফর্মেসন।'

টেপ বন্ধ হয়ে গেল। টেলিফোনে এবার হেমার গলা ভেসে এল, 'শুনলেন?'

'শুনলাম। গুড ইনফর্মেসন।'

'তা হলে দেখতে পাচ্ছেন, আমি এখানে আপনাকে হেল্প করতেই এসেছি।'

'তাই তো দেখছি। এবার কাইন্ডলি আরেকটু হেল্প করুন তো।'

'বলুন কী করতে হবে?'

'আপনি কোথায় আছেন, কাইন্ডলি সেটাই বলতে হবে।'

হয়েছে। তার হাতে একটা পোর্ট ফোলিও ব্যাগ। তার বসার ঘরে আরো দুটো লোককে দেখা গেল। একজনের মেক-আপ শোফারের মতো, আরেক জনের পরনে দুর্দান্ত স্যুট। শোফারটা একধারে অ্যাটেনশনের পোজে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় যে কোম্পানির সঙ্গে অমিতাভর কনট্রাক্ট হচ্ছে, ওরা সেখানকার শোফার এবং টপ অফিসার-টফিসার, অমিতাভকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছে।

শোফারটা অমিতাভর হাত থেকে পোর্ট ফোলিও ব্যাগটা নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ওরা বেরুবে।

পরমেশ্বর এক সেকেণ্ডও দেরি করল না। তার রিভলবার গোটাকয়েক পারফিউমের কৌটোতে ভাগ করে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসানো ছিল। সেগুলো জোড়া লাগিয়ে রিভলবার বানিয়ে পকেটে পুরে ফেলল সে, তারপর ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল। নিচে নেমে রিসেপশানের ছুঁড়িটাকে স্যুইটের চাবি দিয়ে তার কাছ থেকে ইমপালার চাবিটা নিয়ে নিল। একটা হোটেল বয় তাকে সঙ্গে করে পার্কিং জোনে এসে ইমপালাটা চিনিয়ে দিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল, পরমেশ্বর তার ইমপালাটা নিয়ে হোটেল ম্যাগনিফিসেন্টের বিশ গজের মধ্যে চলে এসেছে। ওখান থেকে সে দেখতে পেল, হোটেল কম্পাউণ্ড থেকে অমিতাভদের একটা বটল গ্রীন রঙের লিমুজিন বেরিয়ে আসছে। গাড়িটার ফ্রণ্ট সীটে শোফার আর সেই অফিসার; ব্যাক সীটে অমিতাভ।

গাড়িটা বেরিয়ে র‍্যাফল স্কোয়ার বাঁয়ে রেখে রবিনসন রোডের দিকে এগুতে লাগল। দশ গজের একটা গ্যাপ রেখে পরমেশ্বর পিছু পিছু চলেছে। তার ধারণা, এক্স যদি সিঙ্গাপুরে এসে থাকে ডেফিনিটলি সে-ও অমিতাভকে 'ফলো' করে চলেছে। কেননা হোটেলের বাইরে তার ওপর অ্যাটেম্পট নেবার সুবিধা অনেক। কাজ হয়ে যাবার পর রাস্তার হাজার হাজার মানুষ আর গাড়ির মধ্যে মিশে যাওয়া যায়। তখন তাকে খুঁজে বার করা মুশকিল। আর হোটেলে অ্যাটেম্পট করতে গেলে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি এবং সেখান থেকে পালাবার স্কোপ খুবই কম।

অমিতাভদের লিমুজিনটা একসময় রবিনসন রোডে সিঙ্গাপুর ইলেকট্রনিকসের বিশাল হাই রাইজ অফিস বিল্ডিংটার ভেতর ঢুকে পড়ল।

পরমেশ্বর এখন কী করবে? গাড়িটা কোথাও পার্ক করে ভেতরে ঢুকবে কি? পরক্ষণেই তার মনে হল অফিসের এত লোকজনের মধ্যে তার ওপর নিশ্চয়ই অ্যাটেম্পট হবে না। এক্স নিশ্চয়ই কোন ফাঁকা নির্জন জায়গায় অপারেশন চালাবে।

রাস্তার ওধারেই 'ফী পার্কিং জোন।' কিছু মালকড়ি দিলে ওখানে গাড়ি রাখা যায়। পরমেশ্বর তার ইমপালাটা ওপারে নিয়ে এমনভাবে রাখল যাতে যখন খুশি স্টার্ট দিয়ে বেরুনো যায়।

মিনিট পঁয়তাল্লিশ ওয়েট করার পর দেখা গেল, অমিতাভদের সেই বটল গ্রীন রঙের লিমুজিন সিংগাপুর ইলেকট্রনিকসের বিরাট কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে এল। এবারও সেই শোফারটা রয়েছে। তবে হোটেল থেকে বেরুবার সময় অন্য যে লোকটিকে দেখা গিয়েছিল, এবার তার বদলে দুজন মধ্যবয়সী লোক চোখে পড়ল! চেহারা এবং পোশাক-টোশাক দেখেই টের পাওয়া যায় এই লোক দুটি সিংগাপুর ইলেকট্রনিকসের ডাইরেক্টর চেয়ারম্যান বা ঐ জাতীয় বিগ্ 'বস্'-টস হবে।

অমিতাভদের গাড়িটা র‍্যাফল স্কোয়ার পেছনে ফেলে আচার্ড রোডে আর নর্থ ব্রিজ রোডের শপিং সেন্টারের ভেতর দিয়ে, টংলিং এরিয়া একধারে রেখে জুরোং-এর বার্ড স্যাংচুয়ারির দিকে চলল। বোঝা যাচ্ছে, ইলেকট্রনিকস কোম্পানির অথরিটিরা অমিতাভকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সিংগাপুর দেখাচ্ছে।

পরমেশ্বর মোটামুটি পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ গজের একটা গ্যাপ রেখে অমিতাভদের পিছু পিছু চলেছে। রবিনসন রোড থেকে বেরুবার পর থেকেই সে মার্ক করেছে মাঝে মাঝেই আরো তিনটে ইমপালা তার আর অমিতাভর গাড়ির ফাঁকে ঢুকে যাচ্ছে। এই গাড়িগুলোয় একটা চালাচ্ছে একজন চীনা ছুকরি, দু নম্বর গাড়িটা যে চালাচ্ছে সে-ও মঙ্গোলিয়ান। সে চীনাও হতে পারে; বার্মিজ জাপানী বা ফিলিপিনো হওয়াও আশ্চর্য কিছু না। তার গাড়িতে সে ছাড়া আর কেউ নেই। তিন নম্বর গাড়িটা যে চালাচ্ছে সে অ্যাংলো এশিয়ান হতে পারে কিংবা ইন্ডিয়ান তবে ডেফিনিট করে কিছু বলা যায় না।

গাড়ি তিনটে যে একই সঙ্গে পরমেশ্বরের ইমপালা আর অমিতাভ-র লিমুজিনের ফাঁকের ভেতর ঢুকে পড়েছে তা নয়। কখনো চীনা ছুকরি, কখনো অ্যাংলো এশিয়ান বা ইন্ডিয়ানটা, আবার কখনো বর্মিজ বা জাপানীটা ঢুকে পড়ছিল।

এইভাবে মাইলকয়েক যাবার পর যেখানে ওরা এসে হাজির হল, দেখেই বোঝা যায় সেটা একটা বার্ড স্যাংচুয়ারি অর্থাৎ পাখিদের আস্তানা। একধারে সাইন বোর্ডে লেখা আছে 'জুরোং বার্ড স্যাংচুয়ারি'।

একধারে দেখা গেল, গোটাকতক গাড়ি পার্ক করা রয়েছে। পার্কিং এরিয়ায় অমিতাভদের গাড়িটা থামতেই পরমেশ্বর অন্তত ষাট-সত্তর গজ দূরে নিজের গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিল এবং লক্ষ্য করল, তার ঠিক পেছনেই সেই

চীনা ছুকরিটাও তাঁর ইমপালা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সেই মঙ্গোলিয়ানটা তার গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করল না; এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে ঘাড় নিচু কবে ব্রেক-ফ্রেক কী সব দেখতে লাগল। তার থেকে একটু দূরে সেই অ্যাংলো-এশিয়ান বা ইণ্ডিয়ানটা গাড়ির স্পীড কমিয়ে খুব আস্তে আস্তে এমনভাবে এগুতে এবং পিছোতে লাগল যাতে মনে হয় ইঞ্জিনে কিছু একটা ট্রাবল হয়েছে।

সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। এ দিকটায় লোকজন বিশেষ নেই। অন্য যারা মেইন সিটি থেকে পাখি দেখতে এসেছে তারা সবাই গাড়ি-টাড়ি পার্ক করে স্যাংচুয়ারির ভেতর ঢুকে গেছে।

অমিতাভ এবং তার সঙ্গীরা গাড়ি থেকে নেমে স্যাংচুয়ারির দিকে পা বাড়াতে যাবে, এমন সময় ব্যাপারটা ঘটে গেল। আচমকা রিভলবারের গুলির শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভর সঙ্গীদের একজন রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল। অমিতাভরা চিৎকার করে উঠল। দূরে দূরে যে দুচারজন লোক ছিল তারা এবং স্যাংচুয়ারির গার্ডরা হৈ চৈ করতে করতে দৌড়ে চলে এল।

এদিকে চমকে পরমেশ্বর এদিক সেদিক তাকাচ্ছে। কোত্থেকে গুলিটা আসতে পারে? চোখ দুটো দ্রুত এক শো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘোরাতে গিয়েই নজরে পড়ল, সেই মঙ্গোলিয়ানটা তার ইমপালার মুখ ঘুরিয়ে চুপচাপ চলে যাচ্ছে।

একটা লোক যেখানে জখম হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় কাতরাচ্ছে এবং চার-পাশের মানুষজন তাকে সাহায্য করবার জন্য ছুটে আসছে তখন ঐ মাকড়াটার গাড়ি নিয়ে ওভাবে কেটে পড়াটা কেমন যেন সন্দেহজনক।

আচমকা ফোর-ফর্টি ভোল্টের বিজলী পরমেশ্বরের ব্রেনের ভেতর দিয়ে খেলে গেল। এ চীনা হারামীটাই গুলি মেরে ঐ লোকটাকে জখম করে নি তো? এমন কি হতে পারে ঐ লোকটা টার্গেট ছিল না; আসল লক্ষ্য ছিল অমিতাভ? বাই চান্স টার্গেট মিস করে গুলিটা অন্য জায়গায় লেগেছে? পরমেশ্বরের মনে কেন যেন হল সে যা ভাবছে সেটাই ঠিক। এক্স খজড়াটা ডেফিনিটলি চীনার মেক-আপে অমিতাভর পিছু পিছু এত দূরে চলে এসেছে।

এই কথাগুলো ভাবতে যতটা সময় লাগল তার মধ্যে চীনাটা তার ইমপালা কমপ্লীটলি ঘুরিয়ে নিয়েছে। এদিকে আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। সেই চীনা ছুকরিটা তার গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে আর সেই অ্যাংলো-এশিয়ান বা ইণ্ডিয়ানটা যে তার গাড়ি ইঞ্জিন ট্রাবলের জন্য বার বার সামনে

এগিয়ে দিয়ে আবার পিছিয়ে নিচ্ছিল সে-ও গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে সিঙ্গাপুর সিটির দিকে আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল। এই তিন হারামীই এক চেইনে বাঁধা এবং ওদের যে কোন একজনকে ধরতে পারলে এক্সের ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

পরমেশ্বর আর দেরি করল না; সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট দিল। কিন্তু এরই মধ্যে চীনাটার গাড়ি বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। হঠাৎ কী হয়ে গেল পরমেশ্বরের, পকেট থেকে রিভলবার বার করে চীনাটার ইমপালাটার টায়ার মার্ক করে ট্রিগার টিপল। গুলিটা পারফেক্ট নিশানায় লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে চাকা ফুটো হয়ে হুস হুস করে হাওয়া বেরিয়ে যেতে লাগল।

চীনাটা কিছু একটা টের পেয়েছিল। চলন্ত গাড়ির দরজা খুলেই সে লাফ দিল; তারপর হাইওয়ের ধার দিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে দৌড়ুতে লাগল। আবছা অন্ধকারে তাকে একটা টসিলুয়েট ছবির মতো দেখাচ্ছে।

পরমেশ্বর চীনাটার পেছনে গাড়ি ছুটিয়ে দিল কিন্তু তার কাছাকাছি পেঁছুবার আগেই আরেকটা ব্যাপার ঘটে গেল। পরমেশ্বরের সামনে প্রায় দুশো গজ আগে সেই অ্যাংলো-এশিয়ান বা ইণ্ডিয়ানটার গাড়ি মিডিয়াম স্পীডে এগিয়ে যাচ্ছিল। চীনাটা সেটার কাছে চলে এসেছে। আচমকা গাড়িটার ডান পাশের দরজা খুলে গেল এবং অ্যাংলো-এশিয়ান বা ইণ্ডিয়ানটা মুখ বাড়িয়ে চীনাটাকে কিছু বলতেই সে ঝট করে গাড়ির ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর ইমপালাটার দেড়শো কিলোমিটারের মতো স্পীড উঠে গেল।

পরমেশ্বরও অ্যাকসিলেটারে চাপ দিয়ে স্পীড তুলল; তারপর অ্যাসফাল্টের ঝকঝকে তেলতেলে বিশাল হাইওয়ের ওপর দিয়ে তার গাড়িটাকে উড়িয়ে নিয়ে চলল। এদিকে আরো একটা ব্যাপার চলছিল। সেই চীনা ছুকরিটাও কখন যেন এই 'চেজে'র মধ্যে ঢুকে গেছে। মাঝে মাঝে ওভারটেক করে সে অ্যাংলো-এশিয়ান বা ইণ্ডিয়ান আর পরমেশ্বরের গাড়ির ভেতর চলে আসছিল; আবার পিছিয়ে যাচ্ছিল।

মতলব কী ছুঁড়িটার? পরমেশ্বর ভাবতে চেষ্টা করল। চীনা আর অ্যাংলো-এশিয়ানটাকে যাতে সে ঠিকমতো ফলো করতে না পারে সেই জন্যই কি ছুঁড়িটা চেষ্টা করছে? দেখাই যাক শেষ পর্যন্ত!

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা সিঙ্গাপুরের মেইন সিটিতে এসে পড়ল! মেট্রোপলিসে ঢুকে ফার্স্ট ট্রাফিক সিগনালেই ঝামেলা হয়ে গেল। অ্যাংলো-এশিয়ান বা ইণ্ডিয়ানটার গাড়ি থেকে দু-আড়াই শো গজ পেছনে ছিল পরমেশ্বর। তার চোখের সামনেই ওই গাড়িটা ট্রাফিক আইল্যাণ্ড পেরিয়ে গেল। সে

বেরুতে যাবে, সেই সময় সিগন্যালে লাল আলো জ্বলে উঠল। অগত্যা ব্রেক কষতে হল পরমেশ্বরকে। দাঁতে দাঁত চেপে একটা খিস্তি ঝাড়ল সে, ‘শলা, হারামীকা বাচ্চে—’ হাতের ভেতর থেকে মাকড়ারা হড়কে বেরিয়ে গেল। রাগে এবং হতাশায় হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছিল পরমেশ্বরের।

মিনিট তিনেক বাদে আবার যখন গ্রীন সিগন্যাল জ্বলল, গাড়িতে স্টার্ট দিল পরমেশ্বর। সে যখন জেব্রা লাইন ক্রস করছে, পাশ থেকে কে যেন খাঁটি বাংলা ভাষায় বলে উঠল, ‘ঠিকই ফলো করেছিলেন কিন্তু ব্যাড লাক।’

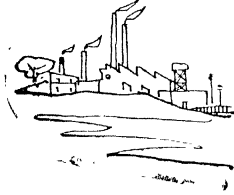
চমকে ঘাড় ফেরাতেই পরমেশ্বর দেখতে পেল, সেই চীনা ছুকরিটা তার গাড়ির গা ঘেঁষে গাড়ি চালাচ্ছে। চোখাচোখি হতেই এক হাত স্টিয়ারিং-এ রেখে আরেক হাত তুলে নাড়তে নাড়তে সে হাসল!

পরমেশ্বর এবার বুঝতে পারল, চীনা ছুঁড়িটা আর কেউ না—হেমা সারিন। হেমাই তা হলে ঐ মেক-আপে এতক্ষণ মোটর চেজের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল! পরমেশ্বর বলল, ‘মেক-আপটা কিন্তু টেরিফিক নিয়েছেন। মুখ দিয়ে বাংলা ডায়লগ না বার করলে আমার ফোরটীন জেনারেশনও আপনাকে চিনতে পারত না।’

‘বলছেন!’

‘হুঁ। হারামীগুলো যখন হাতের ভেতর থেকে স্লিপ করে বেরিয়েই গেল তখন চলুন কোথাও গিয়ে একটু বসি। শালারা মাথার ভেতর বহুত চক্কর দিয়ে গেল।’

‘এখন কোথাও বসব না। আচ্ছা চলি। বাই—’ বলেই কিছু বুঝবার আগেই আচমকা গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে বাঁ দিকের রাস্তায় ঢুকে পড়ল হেমা সারিন।



হেমা চলে যাবার পর পরমেশ্বর স্ট্রেট র‍্যাফল স্কোয়ারে তার হোটেল সিঙ্গাপুরে চলে এল। ইমপালাটা পার্কিং এরিয়ায় রেখে রিসেপশান থেকে চাবি নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে নিজের স্যুইটে এসে ঢুকল। আর ঢুকেই বাইনোকুলার নিয়ে সোজা চলে গেল রাস্তার দিকে জানলার পাশে। কিন্তু না, পার্ল, প্রাইড অফ দি ইস্ট এবং ম্যাগনিফিসেণ্ট—তিনটে হোটেলে যে তিনজনকে সে খুঁজল অর্থাৎ মার্টিন বাসুদেব, হিঙ্গোরানি এবং অমিতাভ এদের কাউকেই পাওয়া গেল না। তিন হোটেলে ওদের তিনটে স্যুইট এখন পুরোপুরি অন্ধকার। অমিতাভদের পাওয়া গেল না বলে উঠে পড়ল না পরমেশ্বর ; জানলার ধারে ঠায় বসে রইল সে।

ঘণ্টাখানেক বাদে রাত আরেকটু বাড়লে প্রথমে গালপোড়া হিঙ্গোরানির স্যুইটে আলো জ্বলল। তার আধঘণ্টা বাদে জ্বলল মার্টিন বাসুদেবের স্যুইটে এবং তারও ঘণ্টা দুই বাদে প্রায় দশটায় অমিতাভর স্যুইটে।

তিন স্যুইটের কোনটাতেই বেশিক্ষণ আলো থাকল না। সাড়ে-দশটার ভেতর লাইট অফ করে দিয়ে তিন মাকড়াই শুয়ে পড়ল।

সবাইকে বিছানায় সেট করে পরমেশ্বর চোখ থেকে বাইনোকুলার নামালো। তারপর ডিনার আনিয়ে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে আচমকা তার মনে হল একটা টেরিফিক ভুল হয়ে গেছে। চীনা আর অ্যাংলো এশিয়ান বা ইণ্ডিয়ানটার গাড়ির নাম্বার দুটো নেওয়া উচিত ছিল। নাম্বার দেখে খজড়াদুটোকে পরে ট্রেস করা যেত। কিন্তু এখন আর হাত কামড়ে লাভ কী ? অবশ্য আরেকটা কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল। হেমা হয়ত নাম্বার দুটো টুকে নিয়েছে। সে নিশ্চয়ই কোন-না-কোন সময়ে ফোন করবে। তখন তার কাছ থেকে জেনে নেওয়া যাবে।

রাত দেড়টায় টেলিফোনের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল পরমেশ্বরের। কার ফোন হতে পারে, সে জানে। ঝট করে ক্রেডেল থেকে টেলিফোনটা তুলে কানে ফিট করতে করতে বলল, 'কী ব্যাপার?'

হেমা ওধার থেকে বলল, 'এত রাত্তিরে ঘুম ভাঙালাম বলে চটে যাবেন না প্লীজ।'

'একেবারেই না। নিশ্চয়ই কিছু আর্জেণ্ট মামলা রয়েছে!'

'হ্যাঁ। এই টেপটা শুনুন—' বলেই টেলিফোনে টেপ বাজিয়ে দিল হেমা।

সঙ্গে সঙ্গে এক্স এবং সোমেশ্বরের গলা ভেসে এল।

সোমেশ্বর বললেন, 'এবার বুঝতে পারছেন কেন সিঙ্গাপুর এসেছিলাম। বার্ড স্যাংচুয়ারিতে আমি গাড়িতে তুলে না নিলে কী হতো নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন।'

এক্স মাকড়া জড়ানো গলায় কী বলল, বোঝা গেল না।

সোমেশ্বর এবার বললেন, 'আপনার গাড়ির টায়ার ফুটো করার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছি কেউ আমাদের পেছনে লেগেছে। আই অ্যাম সিওর—হী মাস্ট বী পরমেশ্বর।'

এক্স বলল, 'আমারও তাই মনে হয়। কাল কেউ আমার স্যুইটে ঢুকেছিল।'

'তাই নাকি?' সোমেশ্বরের গলার স্বরটা চমকে উঠল যেন, 'কী করে বুঝলেন?'

আমার পাশপোর্টগুলো যেভাবে ব্যাগের ভেতর সাজানো ছিল, পরে দেখলাম সেগুলো ওলট-পালট হয়ে রয়েছে। তা ছাড়া আমার স্যুটকেসও ঘাঁটাঘাঁটি করা হয়েছে।'

শুনতে শুনতে পরমেশ্বরের মনে হল, কাল হিঙ্গোরানির স্যুইটে ঢোকার পর খানিকটা কাঁচা কাজই করে ফেলেছে সে। পাশপোর্ট-টাসপোর্ট আর সুটকেস-ফুটকেস এমনভাবে গুছিয়ে রেখে আসা উচিত ছিল যাতে মাকড়াটা সন্দেহ করতে না পারে। কিন্তু তার সময় পাওয়া যায় নি। এক্স খজড়াটা দুম করে ফিরে এল; আর তাড়াহুড়ো করে সুটকেস বন্ধ করে তাকে ওয়ার্ডরোবে ঢুকতে হয়েছিল।

হিঙ্গোরানি বা এক্স আবার বলল, 'কেউ ঢুকেছিল, এই ডাউটটা মাথায় আসতেই গোটা স্যুইট আমি তোলপাড় করে খুঁজেছি যদি হারামীটা কোন ক্লু ফেলে রেখে যায়। খুঁজতে খুঁজতে টেলিফোনের কাছে একটা ইমপ্রোভাইজড লাইটার-কাম-টেপ রেকর্ডার পেয়ে গেলাম। ওটা খুলে টেপের রীল বার করে বাজাতে কী শুনতে পেলাম জানেন?'

'কী ?' হিক্কা তোলার মতো শব্দ হল সোমেশ্বরের গলায়।

'আপনি আর আমি ফোনে কাল যে সব কথা বলেছি সব তাতে রেকর্ড হয়ে গেছে।'

'ডেঞ্জারাস।'

'টেপটা কী করেছেন ?'

'আমার কাছেই আছে ; পরে আপনাকে বাজিয়ে শোনাব।'

'ওটা আমার চাই। আমার কোন কাজের আমি রেকর্ড রাখতে চাই না। কবে ওটা আমাকে দেবেন ? অন্য কারো কাছে ওটা থাকলে আমার ঘুম হবে না।' সোমেশ্বরের গলা থেকে ভয় এবং আতঙ্ক যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে লাগল।

সোমেশ্বরের মনোভাবটা যেন বুঝতে পারল এক্স। সে বলল, 'ডোণ্ট ওরি। আপনাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি আমি প্রফেশানাল মার্ডারার। ব্ল্যাকমেল করার মতো ছ্যাঁচড় ডার্টি কারবার করে হাত নোংরা করি না।'

'তা হোক, তবু ওটা আমার চাই।'

'বলছি তো পাবেন। ঘাবড়াবার কিছু নেই। ঠিক সময়েই মালটা আপনার কাছে পেঁছে যাবে।' বলে একটু থামল এক্স। কয়েক সেকেণ্ড বাদে আবার শুরু করল, 'টেপ টেপ করে রাতের ঘুম নষ্ট করবেন না। আপনি টেপটা চাইছেন ঠিকই, ইচ্ছা করলে আমি ওটা থেকে নতুন একটা টেপও তো করিয়ে রাখতে পারি। তখন ওটা আর কতটুকু কাজে লাগবে ?'

সোমেশ্বরের গলাটা এবার ঝট করে কয়েক পর্দা নিচে নেমে দারুণ করুণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'আপনিই তো বললেন ব্ল্যাকমেলের মতো ডার্টি কাজ করেন না।'

'তা হলে আমার ওপর ভরসা রাখুন।'

সোমেশ্বর এবার একেবারে আলাদা টপিকে চলে গেলেন। বললেন, 'আমাদের পেছনে যখন ফেউ লেগেছে তখন ইমিডিয়েটলি হোটেল চেঞ্জ করা দরকার।'

এক্স বলল, 'রাইট। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ওটা করে নিতে হবে।'

একটু চুপ। তারপর সোমেশ্বর শুরু করলেন, 'দেখুন, আমার বিশ্বাস পরমেশ্বরই আমাদের পেছনে লেগেছে। কিন্তু সে তো আর নিজের আসল চেহারায় নেই ; অন্য কারো ডিসগাইসে আছে। একটা লোককে আমার সন্দেহ হয়।'

'আমারও একটা সান অফ এ বীচকে সন্দেহ হয়।'

'কাকে ?'

'আপনি যাকে সন্দেহ করছেন—'

'আমি কাকে সন্দেহ করছি আপনি কী করে বুঝলেন ?'

'ভেরি সিম্পল। আপনার আর আমার মতো হারামীরা একই মেটিরিয়াল দিয়ে তৈরি। দু'জনের ভাবনা, দু'জনের সন্দেহ, দু'জনের অ্যাক্টিভিটি একরকম হতে বাধ্য। কাজেই আপনি যাকে ডাউট করছেন আমিও তাকেই ডাউট করছি। এখন তার নাম বলার দরকার নেই। পরে দেখবেন দু'জনের সন্দেহ মিলে গেছে। খুব শীগগির হারামীটার একটু খবর-টবর নিতে হচ্ছে। এনিওয়ে আর কিছু বলার আছে ?'

সোমেশ্বর বললেন, 'আছে—'

এক্স জিজ্ঞেস করল, 'কী ?'

'কাল হোটেল সী ভিউতে সিঙ্গাপুর ইলেকট্রনিকস অমিতাভ সেনের অনারে একটা পার্টি দিচ্ছে। হিউজ পার্টি। পার্টি উইল কমেন্স অ্যাট সেভেন থার্টি অ্যান্ড কন্টিনিউ টু মিড নাইট। ঐ পার্টির একটা কার্ড আপনার জন্য যোগাড় করেছি। দেখুন ওখানে কোনরকম অপারেশন চালানো যায় কিনা।' বলে একটু থেমে সোমেশ্বর আবার শুরু করলেন, 'তার আগে এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে ডিটেলে ডিসকাস করা দরকার।'

এক্স বলল, 'অল রাইট, বলে যান—'

'ফোনে না। আপনার সঙ্গে পরে কনট্যাক্ট করে সামনা-সামনি বলব।'

'ঠিক আছে।'

টেপ বন্ধ করে হেমা বলল, 'এক ঘণ্টা আগে এই ডায়োলগ রেকর্ড করা হয়েছে।'

পরমেশ্বর অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে বলল, 'কী করে বার বার এই মাল দুটোর ভয়েস টেপ রেকর্ড করছেন ম্যাডাম ?'

'যেভাবে ক্যালকাটায় আপনার আর সোমেশ্বর মল্লিকের ডায়লোগ রেকর্ড করেছিলাম।'

'ক্যালকাটায় আপনার টেরিফিক ইনফ্লুয়েন্স আছে। কিন্তু এখানে—'

'আমি ইণ্ডিয়ায় যে ডিপার্টমেন্ট আর পজিশনে কাজ করি সেটা সিঙ্গাপুরে কাজে লাগাতে হয়েছে। এখানকার টপ অথরিটি আমাকে হেল্প করছেন। ব্যাপারটা রেসিপ্রোকাল। এঁদের যদি ইণ্ডিয়ায় কোন দরকার হয় তখন আমরাও সাহায্য করব।'

'কিন্তু মাকড়া দুটোকে ট্রেস করলেন কী করে ?'

'এমন কিছু কঠিন ব্যাপার না। প্রথম বার যে টেপটা আপনাকে শুনিয়েছিলাম তখন অবশ্য ট্রেস করতে পারি নি। যে সব ইণ্ডিয়ান

আমাদের সঙ্গে একই ফ্লাইটে সিঙ্গাপুর এসেছে এবং যেখানে যেখানে উঠেছে তার খবর আগে থেকেই নিয়েছি। তারপর পুলিস অথরিটির হেল্প নিয়ে টেলিফোন এক্সচেঞ্জগুলোর সঙ্গে অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি—এই সব ইণ্ডিয়ানরা যখন যার সঙ্গে কথা বলবে সব যেন টেপ করে নেওয়া হয়। ওরা কাল গাদা গাদা টেপ দিয়ে গিয়েছিল। তার ভেতর থেকে সোমেশ্বর মল্লিক আর এক্সের গলা খুঁজে বার করে আপনাকে শুনিয়েছি। কিন্তু এক্সচেঞ্জগুলোকে একটা ইন্সট্রাকসান দিতে ভুলে গেছি। কোন্ টেপটা কোন্ ফোন নাম্বারের সেটা আর মার্ক করে রাখা হয় নি। পরে ইন্সট্রাকসান দিতে ওরা ফোন নাম্বার দিয়ে টেপগুলো পাঠিয়েছে। তাতেই বোঝা গেছে সোমেশ্বর আর এক্স হল মার্টিন বাসুদেব পণ্ডিত আর হিঙ্গোরানি। যাই হোক, যে টেলিফোন থেকে সোমেশ্বর আর এক্স কথা বলেছে সেখানে রিং করে কয়েক মিনিট আগে জেনেছি, ওরা ওখান থেকে চলে গেছে।'

'চলে গেছে!'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা ঐ ফোন নাম্বার দুটো কি দুটো হোটেলের?'

'হ্যাঁ।'

একটু চুপচাপ। তারপর পরমেশ্বর ফের বলল, 'যেভাবেই হোক ওদের খুঁজে বার করতেই হবে।'

হেমা বলল, 'হ্যাঁ। আমি একটা কাজ করেছি। কাল হোটেল 'সী ভিউ'তে অমিতাভ সেনের অনারে যে পার্টি হবে সেখানে যাবার জন্য আপনার নামে একটা কার্ড জুটিয়েছি। কার্ডে আপনার নাম থাকবে মিস্টার লী হুয়া—এ চাইনীজ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ফ্রম মালয়েশিয়া। কাল সকালে আপনার হোটেলের রিসেপশান থেকে কার্ডটা নিয়ে নেবেন। আমার মনে হয় এক্স ওখানে একটা অপারেশন চালাবে।'

'হ্যাঁ।' বলে একটু থামল পরমেশ্বর। আর তখনই কী মনে পড়ে গেল তার। দ্রুত বলে উঠল, 'জানেন একটা টেরিফিক ভুল করে ফেলেছি।'

'কী?'

'বার্ড স্যাংচুয়ারির সেই চীনা আর অ্যাংলো-এশিয়ানটার গাড়ির নাম্বার দুটো নেবার কথা তখন মনে আসে নি।'

'আমি নিয়েছিলাম। ভেরিফাই করে দেখেছি দুটোই ফলস নাম্বার।'

'মাল দুটো দারুণ হারামী।'

'তাই তো মনে হয়। আরেকটা কথা—'

'কী?'

'খবর পেয়েছি পরশু ইভনিং ফ্লাইটে অমিতাভ সেন ক্যালকাটায় ফিরে যাচ্ছে। আজ এখন থেকে পরশু সন্ধ্যে পর্যন্ত টাইমটা ডেঞ্জারাস।'

'কথাটা আমার মনে থাকবে।'

হেমা বলল, 'গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

লাইন কেটে যাবার পর কী ভেবে প্রাইড অফ দি ইস্ট আর প্লাজা হোটেলে ফোন করলে পরমেশ্বর। হেমা যদিও জানিয়ে দিয়েছে মার্টিন বাসুদেব আর হিঙ্গোরানি খানিকক্ষণ আগেই চেক আউট করে চলে গেছে তবু ফোন করার কারণ আছে। পরমেশ্বরের আশা—এক্স আর মার্টিন বাসুদেব নতুন কোন্ অ্যাড্রেসে এখন তাঁবু খাটিয়েছে যদি তার হদিস পাওয়া যায়, এই আর কী! কিন্তু দুই হোটেল থেকেই জানানো হল, মার্টিন বাসুদেব পণ্ডিত আর হিঙ্গোরানি কোথায় গিয়েছে তা তারা জানে না।

এটাই স্বাভাবিক। ড্রাম বাজিয়ে নতুন অ্যাড্রেস জানিয়ে দুই হারামী হড়কে যাবে, এটা ভাবাই ঠিক না।

অগত্যা ফোনটা ক্রেডেলে নামিয়ে রাখতে রাখতে পরমেশ্বরের ব্রেনে ফ্ল্যাশ বাল্ব জ্বলে উঠল। ঐ মাকড়া দুটো হয়ত তার পাত্তা লাগিয়ে ফেলেছে। সুতরাং আজ এখনই এখান থেকে তাকেও তাঁবু গুটিয়ে ফেলতে হবে। কেননা তার ওপরও একটা মেজর অপারেশন না চালিয়ে খজড়া দুটো ছাড়বে না।

ভাবতে ভাবতে পরমেশ্বরের খেয়াল হল, হেমাকে ব্যাপারটা জানানো হল না। সে হোটেল বদলালে হেমা তাকে কনট্যাক্ট করবে কী করে? পরক্ষণে ভাবল, ছুকরি যা খলিফা, ঠিক তার পাত্তা লাগিয়ে ফেলবে।

পরমেশ্বর আর ওয়েট করল না; আরেক বার ফোন তুলে রিসেপশানকে জানালো, 'আমি একটু নিচে আসছি। জরুরী কাজ আছে।'



ফোন হয়ে যাবার পর এক মিনিটও দেরি করল না পরমেশ্বর। নিজের স্যুইট থেকে বেরিয়ে সেন্ট্রট গ্রাউণ্ড ফ্লোরের রিসেপশান কাউণ্টারে চলে এল। সেই ভলাপচুয়াস সেক্সি ছুকরিটা মুখে টেরিফিক একখানা হাসি ফুটিয়ে বলল, 'ইয়েস স্যার, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ ?'

পরমেশ্বর বলল, 'আমার স্যুইটটা চেঞ্জ করতে চাই।'

'নো প্রবলেম স্যার। হয়ে যাবে।'

'আজ এখনই স্যুইটটা চেঞ্জ করবো। ষোরটীনথ থেকে ফিফটীনথের ভেতর যে কোন ফ্লোরে রাস্তার দিকে স্যুইট দিতে হবে।'

একটা ঢাউস বাঁধানো খাতা বার করে রিসেপশানিস্ট ছুঁড়িটা পাতা উলটে উলটে কী দেখল। তারপর বলল, 'ফোরটীনথ ফ্লোরে স্যুইট পাওয়া যাবে।'

পরমেশ্বর বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ। এক্ষুণি আমার শিফট করার অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিন।'

'আপনি স্যার আপনার স্যুইটে চলে যান। আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনার মালপত্র ষোরটীনথ ফ্লোরে রেখে আসবে।'

পরমেশ্বর আবার তার স্যুইটে ফিরে এল। তারপর পনের মিনিটও কাটল না, একটা হোটেল বয় এসে সুটকেস-ফুটকেস সুদ্ধু পরমেশ্বরকে ফ্লোরে সেট করে দিল।

নতুন স্যুইটে আসার আধ ঘণ্টার ভেতর রাতের ডিনার আনিয়ে খেয়েদেয়ে বিছানায় টানটান শুয়ে পড়ল পরমেশ্বর। বার্ড স্যাংচুয়ারির সেই ঘটনাটার পর থেকে নার্ভের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। দারুণ টায়ার্ড লাগছিল তার। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল টেরিফিক একটা আওয়াজে। অত্যন্ত

পাওয়ারফুল গ্রেনেড্ ট্রেনেড ফাটলে যেরকম শব্দ হয়, আওয়াজ অবিকল সেইরকম।

শব্দটা এত জোরালো যে র‍্যাফল স্কোয়ারের ওপর এই বিশাল মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিংটা থরথর করে কেঁপে উঠেছে।

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল পরমেশ্বর। এখনও তার চোখে প্রচুর ঘুম। তারই মধ্যে সে ভাবতে চেষ্টা করল—শব্দটা কোত্থেকে আসতে পারে। ভাবাটা শেষ হল না, তার আগেই বাইরের করিডর থেকে হৈচৈ এবং অজস্র মানুষের ছোটাছুটি আর চিৎকারের শব্দ ভেসে এল।

একটা ঝাঁকুনি খেয়ে এবার ঘুম-টুম ছুটে গেল পরমেশ্বরের। এই হোটেলেই কি তা হলে কিছু হয়েছে? লং জাম্পের স্টাইলে বিছানা থেকে দরজার কাছে চলে এল সে; সেটা খুলে বাইরে আসতেই গল ওধারের লিফটগুলোর কাছে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্লোর বয় আর নানা কাণ্ট্রির লোকজন এধারের সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। সবার চোখে-মুখে ভয় এবং টেরিফিক উত্তেজনা।

একটা ফ্লোর বয়কে থামিয়ে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

বয়টা বলল, 'এক্সপ্লোসান স্যার—বোমা ফেটেছে।'

'কোথায়?'

'আমাদের হোটেলে; সেভেনটীনথ ফ্লোরে।'

দুম করে ইলেকট্রিক চার্জ লাগার মতো মাথার ভেতর কী যেন ঘটে গেল পরমেশ্বরের। দম আটকানো গলায় সে বলল, 'সেভেনটীনথ ফ্লোরে কোথায়?'

বয়টা বলল,—স্যুইট নাম্বার সিক্সটীনথ ফোরে। স্যুইটটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে স্যার। সোফা, বেড, আলমারি, ডিভান—কিচ্ছু আস্ত নেই। এভরিথিং ফিনিশড।' বলে আর দাঁড়াল না বয়টা; দৌড়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে একটা বরফের স্রোত বয়ে গেল পরমেশ্বরের। সেভেনটীনথ ফ্লোরের সিক্সটী ফোর নাম্বার স্যুইটটা কয়েক ঘণ্টা আগে তারই ছিল। ওখান থেকে শিফট না করলে কী হতে পারত ভাবতে গিয়ে গায়ে যেমন কাঁটা দিল, তেমনি খানিকটা মজাও লাগল।

নিজের অজান্তে এক সময় পায়ে পায়ে সেভেনটীনথ ফ্লোরে সিক্সটি ফোর নাম্বার স্যুইটের সামনে চলে এল পরমেশ্বর। এখানে এখন দারুণ ভিড়। কনুই দিয়ে রাস্তা বানিয়ে বানিয়ে পরমেশ্বর একেবারে দরজার ওপর এসে দাঁড়াল। স্যুইটের ভেতরটা আর চেনা যায় না। পোড়া কাঠ আর ছাই ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। এখান থেকে ফোরটীনথ ফ্লোরে

শিফট না করলে তার বডিও এতক্ষণে সোফা বা কার্পেট-ফার্পেটের মতো পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

তা হলে যা সে সন্দেহ করেছিল তা-ই। এক্সরা তার ওপর এভাবেই অ্যাটেমপ্ট নিল! নিশ্চয়ই খুব পাওয়ারফুল টাইম বম্ব-টম্ব এখানে সেট করে রেখে গিয়েছিল এক্স। মনে মনে তাকে দু'বার স্যালুট করে পরমেশ্বর বিড়বিড় করল, 'ভেরি গুড অ্যাটেমপ্ট বাট ব্যাড লাক।' বলে আস্তে আস্তে ফের নিজের নতুন স্যুইটে ফিরে এল।

আবার যখন পরমেশ্বর সেকেণ্ড রাউণ্ড ঘুমের জন্য বিছানায় বডি ফেলতে যাবে সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

এত রাতে কে তাকে ফোন করতে পারে? সে যে স্যুইট চেঞ্জ করেছে তা তো হেমা জানে না। তা হলে?

কিছুক্ষণ ভেবে শেষ পর্যন্ত ফোনটা তুলেই নিল পরমেশ্বর। 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে মোটা ভারী গলা ভেসে এল, 'হু ইজ অন দা লাইন প্লীজ—মিস্টার সিং?'

পরমেশ্বর বলল, 'ইয়াস—' বলে নার্ভগুলো টানটান করে দারুণ সতর্ক ভঙ্গিতে অপেক্ষা করতে লাগল।

'কনগ্র্যাচুলেশনস।'

'হু আর ইউ?'

'আমি এই হোটেলের ম্যানেজার।'

এবার নার্ভের টেনসান খানিকটা কমল পরমেশ্বরের। সে বলল, 'কী ব্যাপার, হঠাৎ কনগ্র্যাচুলেশন কেন?'

হোটেল ম্যানেজার এবার যা বলল তা এই রকম। পরমেশ্বর যে স্যুইটে আগে ছিল, সেখানে একটা এক্সপ্লোসান হয়ে গেছে। লর্ড যেশাসের অপার করুণা, তাই পরমেশ্বর সেই স্যুইটটা চেঞ্জ করে নতুন স্যুইটে গেছেন। নইলে কী ঘটতে পারত, ভাবতেও সাহস হয় না তার। পরমেশ্বরের কিছু হলে হোটেলের সুনাম নষ্ট হত। তা ছাড়া এখানে এসে যাঁরা ওঠেন, তাঁদের সিকিউরিটির দায়িত্ব হোটেল ম্যানেজমেণ্টের। কোন বিপদ ঘটলে ভবিষ্যতে এই বিজনেস চালানোই মুশকিল। যাক, পরমেশ্বর যে প্রাণে বেঁচে আছে সে জন্য প্রভু যীশুর কাছে ম্যানেজার কৃতজ্ঞ এবং পরমেশ্বরের কাছেও তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কথা শেষ করে আরো বার কতক সে কৃতজ্ঞতা জানালো।

পরমেশ্বর তাকে গুনে গুনে এক ডজন ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'এবার আমাকে বিছানায় বডি ফেলতে দিন। অনেক রাত হয়ে গেছে।' বলেই লাইন কেটে দিল।

কিন্তু তক্ষুণি শুতে পারল না পরমেশ্বর। আবার টেলিফোন বেজে উঠল।

এবার কোন্ মাকড়া? ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফোনটা তুলে নিল পরমেশ্বর। মাউথপীসের কাছে মুখটা এনেও প্রথমটা চুপ করে থাকল সে। ম্যানেজারের পক্ষে তার স্যুইট বদলাবার ব্যাপারটা জানা সম্ভব। তার সঙ্গে কথা হয়েই গেল। তবে কি হোটেলেরই আর কেউ এবার ফোন করছে? কিন্তু কথা না বললে সেটা জানার উপায় নেই। অগত্যা আস্তে করে সে বলল, 'হ্যালো—'

লাইনের ওধার থেকে হেমার গলা ভেসে এল, 'কে, মিস্টার পরমেশ্বর? আমি হেমা।'

হেমা যে, সেটা আগেই বোঝা গিয়েছিল। নার্ভগুলো আলগা করে পরমেশ্বর হালকা গলায় কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই হেমা ফের বলে উঠল, 'দারুণ বুদ্ধি খাটিয়ে স্যুইটটা চেঞ্জ করেছিলেন, নইলে—'

পরমেশ্বর বলল, 'নইলে আমার বডিটা এতক্ষণে মুরগি রোস্ট হয়ে যেত, না কি বলেন? যাক গে, আমি যে স্যুইট চেঞ্জ করেছি আপনি জানলেন কী করে?'

'আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমার চোখে ধুলো দিয়ে আপনি কিচ্ছু করতে পারবেন না। আপনি কখন কী করছেন, কী ভাবছেন, সব আমি জানি। আপনার প্রত্যেকটা মুভমেন্ট আমার কাছে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে।'

পরমেশ্বর মজা করে বলল, 'আমার হোটেলেও স্পাই বসিয়ে রেখেছেন নাকি?'

হেমা মজা করে হাসল। পরমেশ্বরের কথাটার উত্তর না দিয়ে বলল, 'কাল সেই পার্টিটার কথা মনে আছে?'

'নিশ্চয়ই। অমিতাভ সেনের অনারে তো?'

'হ্যাঁ। কী করতে হবে তার একটা প্রিপারেশন নেওয়া দরকার।'

'কম করে আঠার-উনিশ ঘণ্টা সময় হাতে আছে। সাফিসিয়েণ্ট টাইম। প্রিপারেশন ঠিক নিয়ে নেব। ডোণ্ট ওরি।'



সিঙ্গাপুরের ডাউন টাউনে সমুদ্রের ধারে ফাইভ স্টার সী ভিউ হোটেলের বিশাল ব্যাঙ্কোয়েট হলে পার্টি চলছে। ইন্ডাস্ট্রি ওয়ার্ল্ডের প্রায় একশো-দেড়শো টাইকুন গেস্ট হিসেবে এসেছে। এ ছাড়া রয়েছে দারুণ দারুণ চেহারার সব চীনা, মালয়েশিয়ান এবং সিঙ্গাপুরী বিউটি কুইনরা। সবাই যেন একেকটা দুর্ধর্ষ সেক্স বম্ব। এদের মধ্যে মালয়েসিয়ার চীনা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট লী হুয়া অর্থাৎ পরমেশ্বরকেও দেখা যাচ্ছে। কারও ফাদারের ক্ষমতা নেই তাকে চিনতে পারে। একেবারে পাক্কা পারফেক্ট চাইনীজ।

ড্রিঙ্ক সেসান চলছে পুরোদমে, গোটা ব্যাঙ্কোয়েট হলে হুইস্কির স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

পরমেশ্বর এমনিতেই সোনার বাংলা ছাড়া কিছু খায় না। কিন্তু যাতে কেউ সন্দেহ না করতে পারে সেজন্য একটা হুইস্কির গেলাস হাতে নিয়ে অমিতাভর গায়ে একেবারে চামড়ার মতো সেঁটে রয়েছে। আর সেখান থেকেই প্রত্যেকটা লোকের ওপর নজর রেখে যাচ্ছে। এতগুলো টাইকুনের মধ্যে ডেফিনিটলি এক্স রয়েছে। সে যে কী মেক-আপ নিয়েছে এবং অমিতাভর ওপর কীভাবে অপারেশন চালাবে, কে জানে। তবে নাকমুখ চোখকান খুলে নার্ভগুলোকে টানটান করে রেখেছে সে।

হয়ত পার্টিতে হেমা এবং সোনেশ্বর মল্লিকও রয়েছেন। তাঁরা কে কী চেহারায় আছেন, কে বলবে?

ড্রিঙ্ক সেসানের সঙ্গে ওয়েস্টার্ন মিউজিক আর ড্যান্স-ট্যান্সও চলছে। সেই সঙ্গে হাসি, ঠাট্টা, জোক, হিউমার এবং হইচই।

আচমকা হোটেলের সব আলো দুম করে নিভে গেল। এই রকম ব্ল্যাক আউটের জন্য প্রিপেয়ার্ড ছিল না পরমেশ্বর। তবু তার মধ্যে কী একটা

রিঅ্যাকসান যেন হয়ে গেল; নিজের অজান্তেই এক ধাক্কায় অন্ততঃ দশ ফুট দূরে সে ঠেলে দিল অমিতাভকে। সঙ্গে সঙ্গে গুলির আওয়াজ এবং প্রাণফাটানো চিৎকার। তৎক্ষণাৎ পুরুষ এবং মেয়েদের ঠেলাঠেলি এবং ভীত চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল।

এ সব ঝামেলা যখন চলছে তখন এক সেকেণ্ডও আর দাঁড়াল না পরমেশ্বর। অন্ধকারে ভিড়ের ভেতর দিয়ে রাস্তা করে ব্যাঙ্কোয়েট হলের বাইরে বেরিয়ে এল। সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে স্ট্রেট 'কার পার্কিং জোনে' গিয়ে নিজের ইমপালায়।

বুলেট, চিৎকার, অ্যাটেমপ্ট অফ মার্ডার। এর পরই পুলিস ছুটে আসবে এবং ব্যাঙ্কোয়েট হলেই গেস্টদের নিশ্চয়ই টানাহ্যাঁচড়া করবে; পরমেশ্বরের কাছে অবশ্যই সেটা খুব একটা সুখের ব্যাপার হবে না।

ইমপালা চালিয়ে বাইরের রাস্তায় যখন পরমেশ্বর এসে পড়েছে, সেই সময় হোটেলের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। র‍্যাফল স্কোয়ারের দিকে যেতে যেতে তার মনে হল, নিশ্চয়ই কেউ কয়েক মিনিটের জন্য মেইন সুইচ অফ করে হোটেল অন্ধকার করে দিয়েছিল। উদ্দেশ্য একটাই—অমিতাভর ওপর অপারেশন চালানো।

পরমেশ্বর যদিও অমিতাভকে দশ ফুট দূরে ঠেলে দিয়েছে, তবু পুরোপুরি উদ্বেগটা যাচ্ছে না। অন্ধকারে বুলেট যে তার গায়ে লাগে নি, এমন কোন গ্যারান্টি নেই।

সিটির মাঝামাঝি এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে 'সী ভিউ হোটেলে' ফোন করে পরমেশ্বর জানতে পারল, অমিতাভ নয়, রিভলবারের গুলিতে চৌ সান নামে একজন সিঙ্গাপুরী বিজনেসম্যান মারা গেছেন। থ্যাঙ্ক গড।

জোরে শ্বাস টেনে পরমেশ্বর ফোন নামিয়ে তার ইমপালায় গিয়ে উঠল।



হোটেলে ফিরে পরমেশ্বর ঠিক করে ফেলল, কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত এক সেকেন্ডের জন্যও অমিতাভকে চোখের আড়াল হতে দেবে না। তার ওপর দু-দুটো অ্যাটেম্পট হয়ে গেছে। বরাতের জোরে দু'বারই বেঁচে গেছে সে, কিন্তু বারবার বেঁচে যাবে, এমন কোন গ্যারান্টি নেই।

পরমেশ্বর চীনা মেক-আপ ছেড়ে আবার সর্দার যশমিন্দর সিং গিল হয়ে গেল। তারপর জানলার ধারে বাইনোকুলার নিয়ে বসল। ওখানে বসেই রাতের ডিনার আনিয়ে খেল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে হোটেল ম্যাগনিফিসেন্টের সিক্সটীনথ ফ্লোরে ছিয়াশি নম্বর স্যুইটের দিকে তাকিয়ে রইল।

এর মধ্যে সী ভিউ হোটেল থেকে অমিতাভ চলে এসেছে। মাকড়াকে হেভি খারাপ দেখাচ্ছে। মুখফুখ শুকনো। হবারই কথা। দু দুবার তার সামনে দুটো মার্ডার হয়েছে। অমিতাভ আর ওয়েট করল না, স্ট্রেট বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

ওয়ার্লেড'র যার যখন ইচ্ছা ঘুমোক। পরমেশ্বর এই একটা রাত আর কালকের গোটা দিনটা এক মোমেন্টের জন্যও চোখ বুজবে না। তার ধারণা, এক্স হোটেল ছাড়লেও অমিতাভর কাছাকাছি কোথাও থাকবে। আর এক্স যেখানে, সোমেশ্বরেরও সেখানেই থাকার কথা। শালারা একেবারে মেড ফর ইচ আদার। কাজেই পরমেশ্বরের পক্ষে নেকসট কুড়ি-বাইশ ঘণ্টা ঘুমোনো অসম্ভব।

জানলার ধারে বসে বসেই হোল নাইট কাটিয়ে দিল পরমেশ্বর। কিন্তু না, এই ক'ঘণ্টার মধ্যে অমিতাভর স্যুইটে কোন রকম অ্যাটেম্পটই হয় নি।

রাত জাগার জন্য চোখ জ্বালা জ্বালা করছিল পরমেশ্বরের। মাথাটাও

ভীষণ ভারী লাগছে, যেন সেখানে বিশ টনের মতো ওয়েট চাপানো রয়েছে। নার্ভ ছিঁড়ে যাক, মাথায় বডির সব রক্ত উঠে আসুক, পরোয়া নেই। আজ সন্ধ্যে পর্যন্ত অমিতাভর দিকে চোখের তারা ফিক্সড করে তাকিয়ে থাকতেই হবে।

শুধু মিনিট পাঁচেকের জন্য একবার উঠে গিয়ে বাথরুম থেকে পরমেশ্বর মুখ ধুয়ে এল। তারপর রুম সারভিসে ফোন করে ব্রেকফাস্ট আনিয়ে নিল।

টোস্ট ডিম ইত্যাদি খাবার পর সে যখন কর্নফ্লেকসে দুধ মেশাচ্ছে, সেই সময় হেমার ফোন এল। হেমা দারুণ খারাপ একটা খবর দিল, সোমেশ্বর মল্লিক আর এক্সকে কোথাও ট্রেস করা যাচ্ছে না। তারা যেন সিংগাপুর থেকে একেবারেই ভ্যানিশ হয়ে গেছে। কথাবার্তা শুনে মনে হল, ব্যাপারটা নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়েছে হেমা।

পরমেশ্বর জানালো দুশ্চিন্তার কিছুই নেই। সোমেশ্বর এবং এক্স দুই মাকড়াই অমিতাভর কাছাকাছি কোথাও তাঁবু ফেলে আছে। যেখানেই ওরা থাক, পরমেশ্বর চোখ টান করে অমিতাভর ওপর নজর রেখে যাচ্ছে। এটা সিওর যে সোমেশ্বর এবং এক্স আজ সন্ধ্যের ভেতর অমিতাভর ওপর একটা অ্যাটেমপ্ট নেবেই। তার জন্য পরমেশ্বর তৈরি হয়েই আছে।

হেমা জানালো, সে-ও অমিতাভর স্যুইটের ওপর নজর রেখে যাচ্ছে। এর পর দেখা যাক কী হয়।

শুধু মুখটুখ ধুতেই যা মিনিট পাঁচেকের জন্য বাথরুমে ঢুকেছিল পরমেশ্বর। তা ছাড়া জানলার ধার থেকে আর সে ওঠে নি। চোখে বাইনোকুলার ফিট করে হোটেল ম্যাগনিফিসেন্টের একটা বিশেষ স্যুইটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

অমিতাভ আজ এখন পর্যন্ত হোটেল থেকে বাইরে কোথাও বেরোয় নি। সারাক্ষণই সে তার বেডরুমে রয়েছে। শুধু কিছু সময়ের জন্য বার-দুই বাইরের ঘরে এসে বসেছিল; কেননা কয়েকজন ভিজিটর তার সংগে দেখা করতে এসেছিল। খুব সম্ভব ওরা সিংগাপুর ইলেকট্রনিকসের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঐ জাতীয় কেউ হবেন। আর মাত্র একবারই শুধু জানলার ধারে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে র‍্যাফল স্কোয়ারের দৃশ্য-টৃশ্য দেখেছে অমিতাভ।

এখন একটা মতো বাজে। রুম সারভিসে ফোন করে লাঞ্চ আনালো পরমেশ্বর। খেতে খেতে এক আধ মিনিট পর পর বাইনোকুলারটা চোখে লাগিয়ে অমিতাভর স্যুইটের দিকে নজর রাখছে।

হঠাৎ এক সময় পরমেশ্বরের মনে হল, সে শুধু অমিতাভর দিকেই লক্ষ্য রেখে যাচ্ছে। সোমেশ্বর এবং এক্স যখন ক্যালকাটা থেকে এতদূর দৌড়ে এসেছে, লাস্ট একটা চেষ্টা না করে এখান থেকে কিছুতেই নড়বে না। কিন্তু অমিতাভর কাছাকাছি তাঁবু গাড়লে তারা কোথায় গাড়তে পারে? নিশ্চয়ই কোন হোটেল-টোটেল ছাড়া আর কোথাও না। ডেফিনিটলি অন্য কোন মেকআপে এবং অন্য কোন নামে তারা আশেপাশের কোন হোটেলে উঠে থাকতে পাবে। বলা যায় না, হোটেল ম্যাগনিফিসেণ্টেই শেষ পর্যন্ত তারা তাঁবু ফেলেছে কিনা?

ভাবনাটা মাথায় ফ্ল্যাশ করতেই খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে আবার বাইনোকুলারটা চোখে লাগাল পরমেশ্বর এবং দ্রুত গ্রাউণ্ড ফ্লোর থেকে টপমোস্ট ফ্লোর পর্যন্ত সবগুলো হোটেলের যতটা দেখা যায়, দেখে যেতে লাগল।

দেখতে দেখতে আচমকা পরমেশ্বরের চোখ ওপারের প্লাজা হোটেলের এইটীনথ্ ফ্লোরের একটা স্যুইটে আটকে গেল। একটা ইওরোপীয়ান—খুব সম্ভব ব্রিটিশ বা আইরিশ হবে—জানলার কাছে বসে লম্বা স্টীলের রড, জুতোর হীল ইত্যাদি টুকরো টুকরো জিনিস জোড়া দিয়ে কী যেন বানাচ্ছে।

ভালো করে খানিকক্ষণ লক্ষ্য করতেই ~~সোমেশ্বর~~ পরমেশ্বর দেখতে পেল ইওরোপীয়ানটার হাতের সেই জিনিসগুলো ক্রমশঃ একটা বন্দুকের শেপ নিচ্ছে। বিদ্যুৎচমকের মতো তার মনে পড়ে গেল, মেণ্ডেজ নীলচোখা এক্স হারামীটাকে এইরকম একটা মাল বানিয়ে দিয়েছে। নিশ্চয়ই এটা সেই 'গান'।

পর পর অনেকগুলো ভাবনা এক সেকেণ্ডের মধ্যে পরমেশ্বরের ব্রেনে ফ্ল্যাশ বাল্বের মতো জ্বলে জ্বলে উঠল। এক্স মাকড়া তা হলে এখন ইওরোপীয়ানের মেকআপ চড়িয়ে প্লাজা হোটেলে গিয়ে ভিড়েছে!

পরমেশ্বর এবার হোটেল ম্যাগনিফিসেণ্টের দিকে তাকাল। প্লাজার এইটীনথ ফ্লোর থেকে ম্যাগনিফিসেণ্টের সিক্সটীনথ ফ্লোরে বন্দুক দিয়ে তাক করা এমন কিছু ডিফিকাল্ট ব্যাপার না। শুধু অমিতাভ একবার র‍্যাফল স্কোয়ারের দিকের জানলার কাছে এসে দাঁড়ালে হয়। হাজার হাজার গাড়ি চলেছে র‍্যাফল স্কোয়ারে। গাড়ির শব্দে বুলেটের আওয়াজ ঢাকা পড়ে যাবে। এইভাবেই তা হলে লাস্ট অ্যাটেমপ্টটা নিতে চলেছে এক্স।

পরমেশ্বর আর এক সেকেণ্ডও বসল না। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে রিভলবারটা পকেটে পুরে নীচে নেমে এল। তারপর কী ভেবে পার্কিং জোনে গিয়ে তার সেই ভাড়া করা ইমপালাটা করে দু'মিনিটের মধ্যে প্লাজা হোটেলে।

গাড়িটা তলায় রেখে লিফটে করে এইটীনথ ফ্লোরে উঠে আসতে কয়েক মিনিট লাগল। ইওরোপীয়ানের মেকআপ নেওয়া এক্সের স্যুইটটা খুঁজে বার করতে আরো খানিকটা সময় কেটে গেল। কেননা তাড়াহুড়োয় ভুল করে অন্য দুটো স্যুইটে ঢুকে পড়েছিল সে।

এক্সের স্যুইটটা ভেতর থেকে 'লক' করা ছিল। পরমেশ্বর তার সেই চাবির গোছা থেকে পর পর ট্রাই করতে করতে দরজাটা খুলে ফেলল। আর খুলতেই দেখতে পেল, বাইরের ঘরে রাস্তার দিকের কাচের জানলাটা স্লাইট ফাঁক করে হোটেল ম্যাগনিফিসেন্টের দিকে তার 'গানটা তাক করে আছে এক্স।

কাচের জানলা দিয়ে তিনশো ফুট দূরে রাস্তার ওপারে ম্যাগনিফিসেন্টের সিক্সটীনথ ফ্লোরের ছিয়াশী নম্বর স্যুইটটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেখানে রাস্তার দিকের জানালা খানিকটা খোলা। সেটার কাছে দাঁড়িয়ে রাস্তার গাড়ি, মানুষজন, শপিং আর্কেড, ইত্যাদি দৃশ্য-টৃশ্য দেখছিল অমিতাভ।

পরমেশ্বর লক্ষ্য করল, 'গানে'র ট্রিগারের ওপর আঙুলটা চেপে বসে যাচ্ছে এক্সের। সে কিছু করার বা বোঝার আগেই শব্দ করে বুলেট ছুটল।

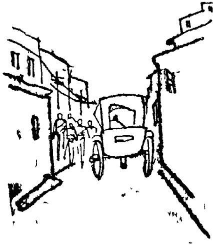
চোখ প্রায় বুজেই ফেলেছিল পরমেশ্বর। অমিতাভকে বাঁচাবার জন্য সিঙ্গাপুর পর্যন্ত দৌড়ে আসা কি তা হলে সার হল? কিন্তু না, পরের সেকেণ্ডেই সে দেখতে পেল, এক্সের বুলেট টার্গেটে হিট করে নি। ট্রিগার টানার সময় কী কারণে যেন মাথাটা একদিকে হেলিয়ে দিয়েছিল অমিতাভ। বুলেট তার মাথায় না লেগে জানলায় হিট করেছে। আর তাতে জানলার কাচ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

আচমকা জানলায় এসে কী লাগল, অমিতাভ বুঝতে পারছে না। মাকড়া জানে না, এক চুলের জন্য নির্ঘাৎ ডেথ থেকে সে বেঁচে গেছে। হতভম্বের মতো অমিতাভ এধারে ওধারে তাকাতে লাগল।

এদিকে গুলিটা টার্গেটে না লাগায় রাগে এবং হতাশায় দাঁতে দাঁত চাপল এক্স। টের পাওয়া যাচ্ছে, তার নার্ভগুলো টেনসান এবং উত্তেজনায় যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। সে লক্ষ্য করল, শিকার এখনও তিনশো ফুট দূরের সেই জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক্স আর একটা মোমেণ্টও বাজে নষ্ট করল না; আবার টার্গেট ঠিক করে ট্রিগারে আঙুল সেট করল। এক্ষুণি সেকেণ্ড বুলেটটা বন্দুকের মুখ থেকে বেরিয়ে যাবে। চোখের পাতা পড়তে যতটা সময় লাগে তার ওয়ান-ফোর্থ টাইমে ঝট করে পকেট থেকে নিজের রিভলবারটা বার করে ফেলল পরমেশ্বর। তারপর একটা

স্টেপ কোণের দিকে গিয়ে পজিশন নিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক্সের হাতের 'গান'টার মাথায় টার্গেট করে গুলি ছুড়ল। মেন্ডেজের তৈরি এক্সের 'গান'টা কয়েকটা ছোট বড় পার্টস দিয়ে বানানো। সেটার মুখের দিক থেকে আট-দশ ইঞ্চির মতো একটা টুকরো চোখের পাতা পড়বার আগেই উড়ে বেরিয়ে গেল আর 'গান'টাও ছিটকে পড়ল মেঝের কার্পেটে।

ধাঁ করে ঘুরে দাঁড়াল এক্স। তার নীল চোখের ভেতর থেকে আগুনের একটা হল্কা ঝলকে উঠল যেন। পরমেশ্বর কিছু বুঝবার আগেই ওধার থেকে একটা ভারী মেটালের ফ্লাওয়ার ভাস তুলে ছুড়ে মারল এক্স। ফ্লাইং সসারের মতো সেটা এসে পরমেশ্বরের মাথায় লাগল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য হোল ওয়ার্ল্ড তার কাছে পুরো ব্ল্যাক-আউট হয়ে গেল। তারপর যখন চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠল তখন পরমেশ্বর দেখতে পেল, কেউ কোথাও নেই! এক্সের এই ঘরটা একেবারে ফাঁকা। মাবড়াটা কোন ম্যাজিক শোয়ের মতো এখান থেকে ভ্যানিশ হয়ে গেছে।



এক সেকেণ্ডও আর বসে থাকল না পরমেশ্বর। স্প্রিংয়ের পুতুলের মতো ধাঁ করে উঠে দাঁড়াল। এক্স নিশ্চয়ই এখনও খুব বেশী দূরে যেতে পারে নি। সুযোগ বার বার আসে না। এই চান্সটা হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যেতে দিলে এক্সকে ক্যাঁচাকলে ফেলা মুশকিল হবে।

স্যুইট থেকে বেরিয়ে পরমেশ্বর যখন বাইরে এল তখন করিডোরের শেষ মাথায় একটা লিফটে ঢুকছে এক্স। বডির সবটুকু শক্তি পায়ে জড়ো করে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট স্প্রিন্টারের মতো সেদিকে ছুটল সে। কিন্তু না, এক্সকে ধরা গেল না। তার লিফট ততক্ষণে নিচে নেমে গেছে।

হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছিল পরমেশ্বরের, কিন্তু এখন তারও সময় নেই। ঝড়ের স্পীডে সে পাশের অন্য একটা লিফটে ঢুকে পড়ল।

নিচে নেমেই রিসেপশন লাউঞ্জের দিকে দৌড়ুল পরমেশ্বর। আর লাউঞ্জটার মাঝামাঝি জায়গায় আসতেই তার চোখে পড়ল একটা ইমপালায় করে এক্স হোটেল কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

পার্কিং জোনে পরমেশ্বরের সেই গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। নষ্ট করার মতো একটা সেকেণ্ডও এখন তার হাতে নেই। অলিম্পিকে চারশো মিটার দৌড়ের সময় যেভাবে কমপিটিটররা ছোটে হুবহু সেইভাবে লাউঞ্জ থেকে ছুটে গাড়িতে গিয়ে উঠল পরমেশ্বর।

এখন এই হোটেলে জাপানী, চীনা, রাশিয়ান, আমেরিকান, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, ফরমোজান, বৃটিশ, ফ্রেঞ্চ, নাইজেরিয়ান—ওয়ার্ল্ডের সব জাতের টুরিস্ট ফুরিস্টের ভিড়। একটা লোককে আচমকা ওভাবে দৌড়ে গিয়ে ইমপালায় উঠতে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল।

কিন্তু কোন দিকে লক্ষ্য নেই পরমেশ্বরের। এক্সকে এক মোমেণ্টের জন্য চোখের বাইরে যেতে দেওয়া ঠিক হবে না। ইমপালায় স্টার্ট

দিয়ে চোখের পলকে সেটাকে হোটেল কম্পাউণ্ডের বাইরে নিয়ে এল সে।

এক্কের ইমপালা খুব বেশী দূর যেতে পারে নি। আড়াই শো তিন শো গজ সামনে রয়েছে। পরমেশ্বর অ্যাকসিলেটারে চাপ দিয়ে স্পীড তুলল। এক্ক কিছু বুঝতে পেরেছে কিনা কে জানে। তবে স্টিয়ারিং-এ হাত রেখেই সে একবার ঘাড় ফেরাল। তারপর গাড়িতে আরো স্পীড তুলল।

অগত্যা পরমেশ্বরকেও স্পীড বাড়াতে হল। চারদিকে হাজার হাজার গাড়ি স্রোতের মতো ছুটছে, আর রয়েছে স্থানীয় সিঙ্গাপুরী ছাড়াও ওয়ার্ল্ডের নানা প্রান্তের লোকজন। এ সবের ভেতর দিয়ে রাস্তা বানিয়ে যেতে যেতে এক সময় র‍্যাফল স্কোয়ার পেরিয়ে গেল ওরা। তারপর একে একে নর্থ ব্রিজ রোড, রবিনসন রোড, আর্চার্ড রোড।

টংলিং এরিয়ায় এসে একটা ঝামেলা হয়ে গেল। ট্রাফিক সিগন্যালে রেড লাইট জ্বলে উঠেছে। ফলে সব গাড়ি পর পর দাঁড়িয়ে গেল। ভাগ্য ভালই বলতে হবে, এক্কের গাড়ি লাল আলো জ্বলার আগে বেরিয়ে যেতে পারে নি। ট্রাফিক সিগন্যালের এধারেই থেকে গেছে। এধারে থাকলেও পরমেশ্বরের কাছাকাছি নেই। তার ইমপালা এবং এক্কের ইমপালার মাঝখানে খান পঞ্চাশেক গাড়ি।

এখানে কম করে তিন-চার মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। পরমেশ্বর একবার ভাবল, ঝট করে নেমে এক্ককে গিয়ে ধরবে কিনা। এ ব্যাপারে দু-এক মিনিট দোনামনা করল সে। তারপর সত্যি সত্যিই যখন নামার জন্যে দরজা খুলতে যাবে সেই সময় পাশের গাড়িটা থেকে কে যেন চাপা গলায় ইংরেজিতে বলে উঠল, 'ডোণ্ট গেট ডাউন। দি সাইন ইজ নাউ অ্যাম্বার।' অর্থাৎ ট্রাফিক সিগন্যালে হলুদ আলো জ্বলে উঠেছে।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পরমেশ্বর দেখল, সত্যি হলুদ আলো। তার মানে দু-চার সেকেণ্ডের মধ্যে সবুজ আলো জ্বলে উঠবে। তখন এই নিশ্চল গাড়ির ঝাঁক স্রোতের মতো ছুটতে থাকবে।

পরমেশ্বর ঘাড় ফিরিয়ে এবার পাশের গাড়িটার দিকে তাকাল। একটা দুর্দান্ত চেহারার চীনা যুবতী স্টীয়ারিং ধরে বসে আছে। সে ছাড়া গাড়িতে আর কেউ নেই। চোখাচোখি হতেই পরমেশ্বর বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্য কসান।' বলে দু পাটির বত্রিশটা দাঁতের পেখম মেলে দিল।

'নো নীড অফ থ্যাঙ্কস।' বলেই গলার স্বর ঝপ করে আরো নামিয়ে দেয় চীনা ছুঁড়িটা। তারপর আগমার্কা খাঁটি বাংলায় বলে ওঠে, 'সবুজ

আলো জ্বলে উঠেছে। আমার দিকে না তাকিয়ে যেখানে নজর রাখা দরকার সেখানে রাখুন। নইলে পাখি ফ্লাই-ফ্লু-ফ্লোন হয়ে যাবে।'

পরমেশ্বর চমকে উঠল, 'আরে! মিস সারিন—আপনি!'

হেমা যে এভাবে মোটর চেজিং-এ ঢুকে যাবে, ভাবা যায় নি। বোঝা যায়, হোল অপারেশনটার ওপর সেও নজর রেখে যাচ্ছিল। টেরিফিক খলিফা মাল একখানা!

চীনা ছুঁড়িটা অর্থাৎ হেমা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, 'স্টপ। লুক স্ট্রেট। আগে কাজ—আসল গাড়িটা যেন হাওয়া হয়ে না যেতে পারে।'

সামনের গাড়িগুলো চলতে শুরু করেছে। চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট দিল পরমেশ্বর। তারপর আবার নাছোড়বান্দা ছায়ার মতো পিছু পিছু ছোটা। কিন্তু যতই সে স্পীড তুলুক মাঝখানের গ্যাপটা কিছুতেই ঘোচানো যাচ্ছে না। দু আড়াই শো গজ তফাতেই থেকে যাচ্ছে এক্সের চকোলেট রঙের ইমপালাটা।

পরমেশ্বর ঠিক করে ফেলল, যে ভাবেই হোক গ্যাপটা ঘুচিয়ে ফেলতে হবে। অ্যাকসিডেণ্ট যাতে না ঘটে মোটামুটি সে ব্যাপারে চোখ আর নার্ভ সজাগ রেখে আরো স্পীড তুলল সে। হাতে স্টীয়ারিং থাকলে জলের ভেতর মাছের মতো খেলা করতে পারে পরমেশ্বর। গাদা গাদা অন্য সব গাড়ির ভেতর দিয়ে কখনও পাশ কাটিয়ে, কখনও পুরো ওভারটেক করে এক্সের অনেকটা কাছাকাছিও এসে পড়ল।

এখন চকোলেট রঙের একটা ইমপালাকে টার্গেট করে বুকের ভেতর দম আটকে ছুটে চলেছে পরমেশ্বর; অন্য কোন দিকে তাকাবার মতো সময় তার নেই। তবু এরই মধ্যে দু-একবার চীনা ছুঁড়ির মেক-আপে হেমা সারিনকে দেখতে পেয়েছে সে।

টংলিং এরিয়ার মাঝামাঝি এসে একটা দারুণ ঝামেলা হয়ে গেল। এখন এক্সের আর পরমেশ্বরের ইমপালার মধ্যে মাত্র পাঁচটা গাড়ি। পরমেশ্বর আন্দাজ করল দু'জনের মাঝখানে গ্যাপটা কমতে কমতে এক শো ফুটের ভেতর দাঁড়িয়েছে। উত্তেজনায় গোটা শরীর বেয়ে গলগল করে ঘাম ছুটতে শুরু করেছে তার; মনে হচ্ছে নার্ভগুলো ছিঁড়ে যাবে।

পরমেশ্বর আরো দুটো গাড়ি ওভারটেক করে গ্যাপ ছোট করে আনল। মাত্র পঞ্চাশ ফুটের দূরত্ব। মনে মনে সে ভাবল, আরেকটু কাছে গিয়েই এক্সের টায়ারে গুলি করবে। আজ বেরুবার সময় রিভলবারে সাইলেন্সার লাগিয়ে এসেছিল সে।

আচমকা সামনের ট্রাফিক সিগন্যালটার লাল আলো জ্বলে উঠল। এপাশে

ওপাশে এবং সামনে সব গাড়ি স্পীড কমিয়ে দিতে শুরু করেছে। একটু পরেই সব ডেড স্টপ হয়ে যাবে। এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে পরমেশ্বরের ব্রেনটা কমপিউটারের মতো কাজ করে ফেলল। সে ভাবল, গাড়িগুলো এখানে কম করে তিন-চার মিনিটের মতো থমকে থাকবে। থামামাত্র সে লাফ দিয়ে নেমে এক্সের গাড়ির দিকে দৌড়ুবে। কিন্তু তার ক্যালকুলেশন পুরোপুরি গোলমাল হয়ে গেল। অন্য সব গাড়ি থামলেও এক্স কিন্তু রেড সিগন্যাল গ্রাহ্য করল না। বিশাল চওড়া রাস্তা ক্রশ করে ওপারে চলে গেল।

এখন কী করা দরকার? মনে মনে সেটা ঠিক করে নিতে এক সেকেণ্ডের বেশী লাগল না পরমেশ্বরের। ট্রাফিক রুলকে পরোয়া না করে সে-ও রাস্তা ক্রশ করল। এক্সকে একবার চোখের বাইরে স্লিপ করে বেরিয়ে যেতে দিলে আর তাকে ধরা যাবে কিনা সন্দেহ।

রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ির মিররে পরমেশ্বর দেখল, আরো দুটো গাড়ি রেড সিগন্যাল গ্রাহ্য না করে জেব্রা লাইন পেরিয়ে তার গাড়ির পেছন পেছন রাস্তা ক্রশ করছে। দারুণ অবাক হয়ে গেল সে। তার চোখ এক্সের ইমপালার ওপর ফিক্সড হয়ে থাকার জন্য ভালো করে পেছনের গাড়ি দুটো দেখতে পাচ্ছে না। তবে আবছা ভাবে মনে হল, একটা গাড়িতে সেই চীনা ছুঁড়িটা অর্থাৎ হেমা সারিন রয়েছে। দ্বিতীয় গাড়িটা ড্রাইভ করছে একজন আমেরিকান বা ইওরোপীয়ান। দুম করে পরমেশ্বরের মনে হল, এই আমেরিকান বা ইওরোপীয়ানটা কে হতে পারে? আবছাভাবে একজনের কথা মনে হল। তবু এই মুহূর্তে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মাকড়ার অ্যাকটিভিটি দেখে খানিকটা পর সেটা মালুম পাওয়া যাবে।

এদিকে ওভাবে ট্রাফিক রুল পুরো অগ্রাহ্য করে চারটে গাড়িকে বেপরোয়া ড্রাইভ করতে দেখে চারপাশের হাজার হাজার লোক এবং অগুনতি গাড়ির শোফার আর সওয়ারীরা হাঁ হয়ে গিয়েছিল। সিংগাপুর দারুণ ডিসিপ্লিনড সিটি। যেন 'ওয়েস্টার্ন মেট্রোপলিস অফ দ্য ইস্ট।' এখানে ট্রাফিক সিগন্যাল কেউ এভাবে ভায়োলেট করে না।

এক্স ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি ছুটিয়ে যাচ্ছিল। সে টের পেয়ে গেছে কেউ তাকে ফলো করতে শুরু করেছে। পরমেশ্বরও টপ স্পীড তুলে দিয়েছিল। স্পীডোমিটারের কাঁটা এইটি নাইনটির মার্ক ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

একটা ব্যাপার পরমেশ্বর লক্ষ্য করেছে। বার্ড স্যাংচুয়ারিতে যাবার সময় যেমন হয়েছিল এবারও তাই ঘটছে। হেমার আর ইওরোপীয়ান বা আমেরিকানটার গাড়ি দুটো মাঝে মাঝেই তার এবং এক্সের ইমপালার ভেতর ঢুকে পড়ছে।

দু-চারবার এভাবে ঢুকবার পরই পরমেশ্বর কেমন যেন গন্ধ পেল। ঐ আমেরিকান বা ইওরোপীয়ান মালটি সোমেশ্বর মল্লিক নন তো?

পরমেশ্বরের নার্ভগুলো মুহূর্তে সজাগ হয়ে গেল। তা হলে সোমেশ্বরও এই গেমে নেমে গেছেন? 'ও-কে মাকড়া, আমিও শলা রেডি। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায়—' মনে মনে এইরকম ভেবে নিল পরমেশ্বর।

একের পর এক ট্রাফিক রুল ভেঙে চারটে গাড়ি এলোপাথাড়ি ছুটে যাচ্ছে। মিনিট কয়েক বাদে আচমকা পরমেশ্বরের চোখে পড়ল, তার গাড়ির মিররে একটা পুলিস ওয়ারলেস ভ্যানের ছবি ফুটে উঠেছে। পুলিসের এই রকম পেট্রল ভ্যান সিঙ্গাপুরের যে কোন রাস্তায় দু-চারটে করে চোখে পড়ে। এদের কাজ হল, ট্রাফিক রুল ভাঙিয়েদের ধরে ক্যাঁচাকলে ফেলা।

আরো কিছুক্ষণ বাদে মিররে দেখা গেল একটা নয়, সাত-আটটা পুলিস ভ্যান তাদের পেছনে জুড়ে গেছে আর অনবরত সাইরেন বাজিয়ে তাদের থামতে বলছে। এই বিপজ্জনক মোটর 'চেজ' দেখার জন্য রাস্তার দুধারে গাদা গাদা লোক দাঁড়িয়ে গেছে।

এক্স আরো বেপরোয়া হয়ে উঠল। কখনও ডাইনের রাস্তায়, কখনও বাঁয়ের রাস্তায় মরীয়া হয়ে সে গাড়ি ছুটিয়ে যাচ্ছে। পরমেশ্বর বেশ কয়েক বার তার ইমপালার টায়ারে টার্গেট করে ফায়ার করার অ্যাটেমপ্ট নিয়েছে কিন্তু নিশানা ঠিক করার আগেই হয় হেমা নইলে সেই আমেরিকান বা ইওরোপীয়ানের গাড়িটা মাঝখানে ঢুকে যাচ্ছে।

হট মোটর চেজ, পেট্রল ভ্যানের অনবরত সাইরেন, হাজার হাজার লোকের চিৎকার—সব মিলিয়ে একটা টেরিফিক কারবার চলছে।

পুলিস ওয়ারলেশ ভ্যানগুলো থেকে তাদের হেডকোয়ার্টারে খুব সম্ভব খবর পাঠানো হয়েছিল। ফলে ক্রমশঃ আরো ভ্যান চারদিক থেকে ছুটে আসতে লাগল।

টংলিং এরিয়ার শেষ প্রান্তে পৌঁছে দারুণ মরীয়া হয়ে এক কাজ করে বসল এক্স। আচমকা গাড়ির ব্রেক কষে দরজা খুলে এক লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল সে।

টংলিং এরিয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে সিঙ্গাপুর পোর্ট। এক্স ঊর্ধশ্বাসে পোর্টের দিকে ছুটল।

এভাবে ব্রেক কষে যে এক্স নেমে পড়বে, ভাবতে পারে নি পরমেশ্বর। যাই হোক, সে-ও গাড়ি থামিয়ে চোখের পলকে নেমে পড়ল এবং এক্স যেদিকে গেছে সেদিকে দৌড়ুল।

পেছনে পুলিস ভ্যানগুলো, হেমা এবং সেই আমেরিকান বা ইউরোপীয়ান

মাকড়ার গাড়ি-টাড়ি নিশ্চয়ই টেরিফিক ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেছে। পেট্রল ভ্যানের অনবরত সাইরেন এরিয়াটাকে চমকে দিচ্ছিল।

দৌড়ুতে দৌড়ুতে পরমেশ্বর টের পেতে লাগল, পেছন পেছন অনেক লোক ছুটে আসছে। নিশ্চয়ই সেই পুলিসরা। এক-আধটা গুলিও এপাশ-ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার মানে পুলিস ফায়ার করছে। এই গুলির ব্যাপারটা ডেঞ্জারাস। কিন্তু কী আর করা যাবে! লাইফের পরোয়া না করেই তো সিঙ্গাপুর পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছে সে। এক্স মাত্র তিরিশ ফুট সামনে রয়েছে আর পেছনে পুলিস। হেমার সঙ্গে কনট্রাক্ট হয়ে গেছে এক্সকে এবং তার সঙ্গে সোমেশ্বরকে ইঁদুরকলে ঢোকাবে। তার আগে ফরেন পুলিসের গুলিতে লাট খেয়ে রাস্তায় বডি ফেলে দেবার কোন মানে হয় না। স্ট্রেট লাইনে দৌড়ুলে পেছন থেকে টার্গেট করতে সুবিধা হবে। তাই এঁকেবেঁকে ছুটতে লাগল সে।

এখন তারা যেখানে রয়েছে সেটা সিঙ্গাপুর পোর্টের দক্ষিণ দিক অর্থাৎ এদিকটায় পোর্টের সীমানা এই পর্যন্ত। সীমানা ঘিরে উঁচু বাউণ্ডারি ওয়াল। এতটা উঁচু যে মানুষের পক্ষে লাফিয়ে ওঠা মুশকিল। তা ছাড়া এক শো গজ দূরে পোর্টের ভেতরে ঢোকার যে গেটটা রয়েছে সেখানে বারো-চোদ্দটা আর্মড গার্ডকে দেখা যাচ্ছে। এক্স নিশ্চয়ই সেদিকে যাবে না। আর সামনের দিকে যেভাবে সে দৌড়ুচ্ছে তাতে পোর্টের ওয়ালে গিয়ে তাকে ধাক্কা খেতে হবে।

এখন কোন দিক থেকেই স্লিপ কেটে বেরিয়ে যাবার রাস্তা নেই। এই প্রথম মাকড়াকে রীয়েল ক্যাঁচাকলে ফেলার অ্যারেঞ্জমেণ্ট করা গেছে।

এক্সও তার মতোই এঁকেবেঁকে জিগ্‌জ্যাগ ভঙ্গিতে দৌড়ুচ্ছে। ইচ্ছা করলে পেছন থেকে রিভলবার ছুঁড়তে পারে পরমেশ্বর। এভাবে ছুটলে টার্গেটে হিট করা সম্ভব নয়; তবে দশটা গুলি ছুঁড়লে একটা কি আর লাগানো যায় না? ডেফিনিটলি যায়। খানিকটা আগে এক্সের হোটেলে আরো ভালো চান্স পাওয়া গিয়েছিল। পনের ফুট পেছন থেকে বুলেট চালিয়ে তার বডি তখনই ফেলে দেওয়া যেত। কিন্তু পরমেশ্বর পায়ের তলা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত সেণ্ট পারসেণ্ট নন-ভায়োলেণ্ট। রক্ত-ফক্ত সে একেবারেই পছন্দ করে না। নেহাৎ দারুণ একটা ঝামেলা-ফামেলা হয়ে গেলে ক্যারাটে বা জুডোর স্টাইলে হাত-পা অবশ্য চালায়। তাতে দু-চারটে মাকড়া জখম-টখম যে হয় নি তা নয়। তবে মার্ডার? নেভার ইন লাইফ। তার কেরিয়ার বা ক্রেডিটে খুন-ফুন নেই। থার্ড ক্লাস ক্রিমিনালদের মতো কথায় কথায় যদি খুনই করবে, তা হলে মাথার ভেতর ব্রেন নামে মালটি রয়েছে

কেন ? তা ছাড়া পেছন থেকে কাওয়ার্ডের মতো এক্সকে মার্ডার করে ফেললে সোমেশ্বরের বিরুদ্ধে একটা বড় উইটনেস হাতছাড়া হয়ে যাবে। যেভাবে হোক বাঁচিয়ে রেখে ওকে ধরতেই হবে। ডেড বডি ধরার চাইতে এক্সের মতো সুপার ক্লাসের একজন হারামীকে জ্যান্ত ধরার মধ্যে অনেক সুখ, প্রচুর স্যাটিসফ্যাকসন।

এক্স বাউন্ডারি ওয়ালের কাছাকাছি চলে গেছে। এবার মাকড়া কী করে সেটাই দেখতে হবে।

এক সেকেন্ডর ভেতর এক্স যা করল তাতে চোখের তারা পুরোপুরি ফিক্সড হয়ে গেল পরমেশ্বরের। বডিটাকে স্রেফ হাউইয়ের মতো উড়িয়ে নিয়ে মাকড়াটা বাউন্ডারি ওয়ালের ওপর উঠে পড়ল। সেখান থেকে চোখের পলকে লাফ দিয়ে ওধারে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দৌড়ুতে দৌড়ুতেই মনে মনে এক্সকে দুর্দান্ত তারিফ করল পরমেশ্বর। 'শলা একখানা ফার্স্ট ক্লাস জিনিস। ওর সঙ্গে লড়ে সুখ আছে।' পরমেশ্বরের টেরিফিক গর্ব ছিল তার মতো বডি ওয়ার্ল্ডে আর কারো নেই। এই শরীরটা নিয়ে যা খুশি সে তাই করতে পারে। তিরিশ-চল্লিশ ফুট উঁচু থেকে লাফিয়ে নিচে পড়লে তার কিছুই হয় না। শরীরটাকে হালকা পালকের মতো হাওয়ায় ভাসিয়ে সাত ফুট সাড়ে-সাত ফুট ওপরে তুলে ফেলতে পারে। একশো কুড়ি-বাইশ ডিগ্রি টেম্পারেচার বা বরফ-পড়া ঠান্ডা, কোনটাই তার চামড়ায় স্লাইট আঁচড় পর্যন্ত কাটতে পারে না। জুডো, ক্যারাটে আর যোগ প্র্যাকটিস করে করে বডিটা একেবারে তৈরি করে নিয়েছে। ইচ্ছামতো এটাকে সে স্টীল বা পাখির পালক বানিয়ে ফেলতে পারে।

কিন্তু এইমাত্র দেখা গেল, তারও একজন রাইভ্যাল আছে। এক্স মাকড়াও তার বডিটাকে টেরিফিক বানিয়েছে। মনে মনে পরমেশ্বর শ' খানেক স্যালুট দিল হারামীটাকে এবং দিতে দিতে এক্সের মতোই বডিটাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে কমপাউন্ড ওয়ালের মাথায় উঠে এল। দেয়ালের ওপর তারকাঁটার বেড়া। বেড়া ফাঁক করে ওপারে লাফিয়ে পড়তে পড়তে গুলির আওয়াজ শুনতে পেল পরমেশ্বর। পেছন থেকে পুলিসরা ফায়ার করছে।

লাক ভালোই বলতে হবে। বেশির ভাগ বুলেটই এধার-ওধার দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু একটা পরমেশ্বরের ডান পা থেকে মাত্র ইঞ্চি দশেক নিচে দেয়াল ফুটো করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সিমেন্টের খানিকটা প্ল্যাস্টার ভেঙে নিচে পড়ে গেল।

পোর্টের ভেতর নামতেই ব্রেনে প্রায় চক্কর লেগে গেল পরমেশ্বরের। ক্যালকাটা ছাড়া আর কোন পোর্টে লাইফে কখনও সে 'ইন' করে নি। 'ইন' করার চান্স তো পাওয়া যায়ই নি, দরকারও পড়ে নি।

সিঙ্গাপুরের এই পোর্টটা একটা টেরিফিক ব্যাপার। সামনের দিকে যত দূর চোখ যায়, ডজন ডজন বিশাল বিশাল ক্রেন আকাশের দিকে ঘাড় তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলো কার্গো শিপে মাল ওঠানো-নামানোর জন্য।

ক্রেনগুলোর গা ঘেঁষেই ওয়াটার ফ্রন্ট। সেখানে কিউ দিয়ে লাখ টনের অয়েল ট্যাঙ্কার থেকে শুরু করে পঞ্চাশ হাজার, ষাট হাজার, আশি হাজার টনের কয়েক শো কার্গো শিপ পর পর দাঁড়িয়ে রয়েছে। জাহাজের নামগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত। ওয়ার্ল্ডের সব কাণ্ট্রি থেকেই বোধ হয় এখানে একটা দুটো করে কার্গো শিপ পাঠিয়েছে।

এক পলক দেখেই মালুম হচ্ছে, দশটা ক্যালকাটা পোর্টকে এই সিঙ্গাপুর পোর্টের খোলের ভেতর পুরে দেওয়া যায়। কিন্তু এখন পোর্ট-টোর্ট দেখার সময় নয়। যার জন্য এত দূর দৌড়ে আসা সেই এক্সকে খুঁজে বার করতে হবে।

ওয়ালের এধারে পরমেশ্বর যেখানটায় লাফিয়ে পড়েছে সেটা স্টীল আর আয়রন 'ওর' ইয়ার্ড। কাঁড়ি কাঁড়ি আয়রন 'ওর' আর স্টীলের বিরাট বিরাট থাম এবং নানা আকারের রড চারদিকে প্রায় সিকি মাইল জায়গা জুড়ে পাহাড়ের মতো টাল হয়ে আছে। নিশ্চয়ই নানা কাণ্ট্রি থেকে এগুলো ইমপোর্ট করা হয়েছে।

এধারে-ওধারে তাকিয়ে কোথাও এক্সকে দেখতে পেল না পরমেশ্বর। খজড়াটা কোথায় ভ্যানিশ হয়ে গেল?

স্টীল আর আয়রন 'ওর' ইয়ার্ডের এই জায়গাটায় সেণ্ট্রি-ফেণ্ট্রি চোখে পড়ছে না। প্রায় পাঁচ শো গজ তফাতে ক'টা মঙ্গোলিয়ান আর্মড গার্ড পারচারি করছে। তাদের মুখ উলটো দিকে। দেয়াল টপকে হেভি ওয়েটের আয়রন 'ওর' বা স্টীল বার ঘাড়ে তুলে হাপিস করে দেওয়া কোন চোরের পক্ষেই সম্ভব না। সে মাকড়া যদি ওয়ার্ল্ডের টপ ওয়েট লিফটার হয়—তবুও। কাজেই এদিকটায় পাহারা-টাহারা নেই বললেই হয়।

কিন্তু এক্স শলা কোথায় গেল? ব্রেনের ভেতর সেই কমপিউটারটা কাজ শুরু করে দিয়েছে পরমেশ্বরের। যেদিকে সেণ্ট্রি-ফেণ্ট্রি রয়েছে, মালটা নিশ্চয়ই সেদিকে গা ঘষতে যাবে না। তা হলে উলটো দিকে যাওয়াই সম্ভব। পরমেশ্বর ঘুরে পেছন দিকে তাকাল। আর তখনই আবছাভাবে পুলিস-গুলোর কথা মনে পড়ল তার। ওরা ডেফিনিটলি হাই জাম্প দিয়ে ওয়াল টপকাতে পারে নি। পারলে এতক্ষণে তাদের খোবড়াগুলো ইয়ার্ডের ভেতর দেখা যেত। তবে ওরা নিশ্চয়ই ছাড়বে না, গেট-ফেট দিয়ে পোর্টের ভেতর ডেফিনিটলি ঢুকবে। তার আগেই এক্সকে খুঁজে বার করতে হবে।

এদিক-সেদিক তাকাতে লাগল পরমেশ্বর। পাহাড়ের রেঞ্জের মতো আয়রন 'ওর'-এর স্তূপ বহু দূর পর্যন্ত চলে গেছে। হঠাৎ পরমেশ্বরের চোখে পড়ল প্রায় তিন-চার শো গজ তফাতে একটা টিলার মাথায় এক্স। অর্থাৎ যেদিকে পরমেশ্বর আন্দাজ করেছিল সেইদিকেই গেছে সে। যাই, হোক, বডিটাকে রিয়েলি ভালোই তৈরি করেছে মাকড়া। নইলে এই অল্প সময়ের ভেতর লোহার চাঙড়ের পাহাড় বেয়ে অত দূরে আর অতটা উঁচুতে ওঠা একেবারেই ইমপসিব্‌ল।

এক্স ওখানে উঠে কী করছে? ভালো করে লক্ষ্য করতেই তার মতলব টের পাওয়া গেল। হারামীটা ওধারের ঢাল বেয়ে নেমে যাবার তাল করছে। পরমেশ্বর এক সেকেণ্ডও আর ওয়েট করল না, দারুণ স্পীডে লোহার চাঙড় বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

পরমেশ্বর যখন টিলার মাথায় উঠেছে, এক্স তখন ওপাশের ঢাল দিয়ে নিচে নেমে গেছে। এ ধারের ওয়াটার ফ্রন্টের গা ঘেঁষে সিঙ্গাপুর পোর্টের অনেকগুলো মোটর লঞ্চ আর স্পীড বোট দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অনেক দূরে লোহালক্কড়ের পাহাড় যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে বিরাট বিরাট অগুনতি প্যাকিং বক্স আর কয়েক হাজার ঢাউস ঢাউস ব্যারেল ছড়িয়ে রয়েছে। হয় ওগুলো ফরেন কোন কান্ট্রি থেকে ইমপোর্ট করা হয়েছে, নইলে এক্সপোর্টের জন্য এনে রাখা হয়েছে। ওদিকটায় টেরিফিক পাহারার ব্যবস্থা আছে কিন্তু এক্স যদি একবার কোন রকমে ওধারে ব্যারেল বা প্যাকিং বাক্স-গুলোর আড়ালে চলে যেতে পারে কারো ফোর ফাদারের সাধ্য নেই, তাকে খুঁজে বার করে। আরেকটা ব্যাপারও আছে, এক্স যদি একটা স্পীড বোট বাগাতে পারে, তাহলে পোর্টের বাউন্ডারির বাইরে গিয়ে কোস্টে উঠে হাওয়া হতে পারে। কিন্তু সেটাও কম ডেঞ্জারাস ব্যাপার না। মনে হচ্ছে সব স্পীড বোট আর লঞ্চেই লোকজন রয়েছে। এখন দেখা যাক খজড়াটা কী করে!

আয়রন 'ওরে'র টিলা থেকে নামতে নামতে পরমেশ্বর এক্সের ওপর নজর রাখতে লাগল।

ওদিকে নিচে নেমে কয়েক সেকেণ্ড চারদিক ভালো করে মার্ক করতে শুরু করেছে এক্স। অর্থাৎ কোথায় যাওয়াটা সব দিক থেকে সেফ, সেটাই এবার ঠিক করে নেবে সে।

এধারে-ওধারে তাকাতে তাকাতে আচমকা আয়রন 'ওর'-এর টিলার ঢালে পরমেশ্বরকে দেখতে পেল এক্স। কিছুক্ষণ চোখের তারা ফিক্সড হয়ে রইল তার। তারপরেই দারুণ ডেসপারেট একটা অ্যাটেমপ্ট নিল সে। হেভি আর্মড গার্ডের পাহারায় যেখানে পেট্রোল বা লিকুইড পেইন্টের ব্যারেলগুলো রয়েছে

সেদিকে দৌড়ে গেল। উদ্দেশ্য কোন রকমে একবার ব্যারেল বা প্যাকিং বক্সগুলোর আড়ালে চলে যাওয়া।

মাকড়া টেরিফিক প্ল্যান করেছে তো। তা ছাড়া শলার বুকের ছাতিতে কয়েক কুইন্টাল সাহসও রয়েছে। নইলে অতগুলো রাইফেলওলা পাহারাদারের দিকে দৌড়য় কী করে?

এক্সকে কোনমতেই চোখের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। পরমেশ্বর হুড়হুড় করে লোহার চাঁই বেয়ে বেয়ে নিচে নামতে লাগল।

কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না এক্স। ওয়াটার ফ্রণ্টের গা ঘেঁষে ওড়া প্যারাপেট। দেখা গেল উলটো দিক থেকে প্যারাপেটের ওপর দিয়ে একদল পুলিস রাইফেল উঁচিয়ে দৌড়ে আসছে। তার মানে সেই পুলিসগুলো এক্স এবং তার খোঁজে পোর্টে ঢুকে পড়েছে। তাদের সঙ্গে পোর্টের আর্মড গার্ডরাও ভিড়ে গেছে। এতগুলো পুলিস-টুলিসের ভিতর চীনা ছুকরির মেক-আপে হেমা আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

এক্স খুব সম্ভব ভাবতে পারে নি পুলিসরা এভাবে পোর্টে ঢুকে পড়বে। এক সেকেণ্ড সে থমকে দাঁড়াল। পরমুহূর্তে ঘুরে কখনও প্যারাপেটের ওপর দিয়ে, কখনও প্যারাপেটের নিচে নেমে ওয়ার্ল্ডের সব চাইতে দ্রুতগামী চিতার মতো উলটো দিকে দৌড়ুতে লাগল।

পেছন থেকে পুলিসেরা চিৎকার করছে, 'হল্ট, হল্ট—'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। পুলিস আর এক্সের মধ্যে ফাঁক ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছে।

ঢাল বেয়ে নামতে নামতে এক্সের মতলবটা বুঝতে পারছে পরমেশ্বর। স্পীড বোট নিয়ে মাকড়া লাস্ট একটা অ্যাটেমপ্ট নেবে। এ ছাড়া তার সামনে আর কোন রাস্তাও নেই।

এক হিসেবে পুলিসের তাড়াটা পরমেশ্বরের পক্ষে ভালোই হয়েছে। কোনভাবে ব্যারেল-ফ্যারেলের পেছনে ঢুকে গেলে এক্সকে ট্রেস করতে খুবই অসুবিধা হত। স্পীড বোটগুলোর কাছে পেঁছুবার আগেই মালকে ক্যাচ করে ফেলতে হবে। কিন্তু জান দিয়ে চেষ্টা করেও তাকে ধরা গেল না। পরমেশ্বর নিচে নামার কয়েক সেকেণ্ড আগেই এই জায়গাটা পেরিয়ে এক্স ডান দিকে বেরিয়ে গেল।

কাজেই নিচে নেমে দম নেবার জন্য দাঁড়ানোও গেল না। পরমেশ্বরও ডাইনে দৌড়ুল। অনেকটা পেছন থেকে পুলিসের অনবরত চিৎকার ভেসে আসছে, 'হল্ট হল্ট—উই উইল শুট—' এক্সের মতো পরমেশ্বরেরও পেছনে তাকাবার এখন সময় নেই।

পুলিসের চেঁচামেচি এবং বহু মানুষের ছোটাছুটির শব্দে পোর্টের এই নির্জন দিকটা হঠাৎ সরগরম হয়ে উঠেছে। স্পীড বোট আর লঞ্চের সারেং এবং খালাসী-ফালাসীরা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের খোলা ডেকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আচমকা কী এমন ঘটল, সেটাই বুঝতে চেষ্টা করছে তারা।

এদিকে এক্স স্পীড বোটের আড্ডায় পেঁছে গিয়েছিল। প্যারাপেট থেকে লাফ দিয়ে ওয়াটার ফ্রন্টের দিকের নিচু জমিতে নামল সে। তারপর বডিতে একটা মোচড় দিয়ে আরেক লাফে সামনের একটা স্পীড বোটে উঠে পড়ল। একটা চীনা বা মালয়েশিয়ান সারেং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুলিসের 'চেজ'-টেজ দেখছিল। কিন্তু যাকে 'চেজ' করা হচ্ছে সে যে তারই বোটে চড়াও হবে, এটা বোধহয় বুঝতে পারে নি। কিছু বলার বা বাধা দেবার আগেই এক্সের ডান হাতের একটা আপার কাট তার চোয়ালে এসে নামল। সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গোলিয়ানটা হাওয়ায় দুটো ভল্ট খেয়ে জলে গিয়ে পড়ল। তারপর চোখের পাতা পড়তে যতটা সময় লাগে তারও আগে বোটটার শেডের নিচে ঢুকে গিয়ে চাবি-ফাবি কী সব ঘুরিয়ে স্টার্ট দিল এক্স।

ডেফিনিটলি মাকড়াটা আউটার সী দিয়ে ঘুরে সিঙ্গাপুরের নির্জন কোন কোস্টে উঠে আপাততঃ কেটে পড়ার ধান্দা করছে। পরমেশ্বর মুখে বুড়ো আঙুল পুরে নিশ্চয়ই এই দৃশ্য দেখতে পারে না। হাফ সেকেণ্ডও কাটল না, সে করল কী, পাশের স্পীড বোটটায় লাফিয়ে উঠে পড়ল।

এই বোটটায় একটা সারেং এবং তার অ্যাসিস্টাণ্ট খালাসীও রয়েছে। এক্স যে বোটটা নিয়ে আউটার সী'র দিকে যাচ্ছে সেটার হাল দেখে এই মাকড়াদুটো রেডি হয়েই আছে। তারা বুঝতে পেরেছিল এক্সের মতো পরমেশ্বরও কোন বোটে চড়াও হবে।

পরমেশ্বর উঠতেই দুর্বোধ্য ল্যাঙ্গুয়েজে গোটা কয়েক খিস্তি ঝেড়ে একটা লোহার মোটা ভারী রড তুলল সারেংটা। ওটা ঝাড়লে দেখতে হবে না, বডির যেখানে ওটা পড়বে সে যায়গাটা স্রেফ পাউডার হয়ে যাবে। স্প্রিংয়ের মতো বডিটাকে বাঁ দিকে হেলিয়ে টেরিফিক ক্ষিপ্রতায় মালটার কোমর দু'হাতে ধরে এক সেকেণ্ডের মধ্যে তুলে ফেলল পরমেশ্বর; তারপর নিজের মাথার ওপর দিয়ে পারাপেটের দিকে ছুঁড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সারেং-এর অ্যাসিস্টাণ্টটা পেছন থেকে দাঁত বের করে খিস্তি করতে করতে তেড়ে এল। এ খজড়াটার হাতে রড-ফড কিছু নেই; স্রেফ খালি হাত। ঘাড়ের কাছে ক্যারাটের একটা চোট খেয়ে সে লাট খেয়ে বোটের ডেকে বডি ফেলে দিল। আদর করে বাচ্চাদের যেভাবে কোলে তুলে নেওয়া

হয় সেইভাবে হারামীটাকে তুলে খুব যত্ন করে নিচে ওয়াটার ফ্রন্টের কাছে শুইয়ে দিল পরমেশ্বর। তারপর স্পীড বোটে স্টার্ট দিয়ে সেটাকে এক্সের পেছনে ছুটিয়ে দিল।

এভাবে দু দুটো স্পীড বোটকে ছিনতাই করে নিয়ে যাবার জন্য অন্য স্পীড বোটগুলোতে হইচই চিৎকার শুরু হয়ে গেছে। কয়েকটা স্পীড বোট এক্স আর পরমেশ্বরের পেছনে ধাওয়া করে গেল।

যে পারে 'চেজ' করুক, পেছনে তাকাবার এখন সময় নেই। পাঁচ শো গজ সামনে এক্স তার বোটে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ নটিক্যাল মাইল, পঞ্চাশ থেকে ষাট, ষাট থেকে সত্তর—এইভাবে ঝড়ের বেগে স্পীড বাড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে পরমেশ্বরকেও স্পীড তুলতে হচ্ছে। দুটো বোট সমুদ্র চিরে রকেটের মতো ছুটে চলেছে। ফেনানো ঢেউয়ে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে চারদিক।

পরমেশ্বর যতই স্পীড তুলুক, মাঝখানের ফাঁকটা কিন্তু একই রকম থেকে যাচ্ছে। পাঁচ শো গজটা আর কিছুতেই মেক-আপ হচ্ছে না।

তাকে 'চেজ' করে যে একটা স্পীড বোট আসছে, এক্স টের পেয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে পরমেশ্বরের বোটটা দেখছে সে আর যাতে পরমেশ্বরকে ডাইভার্ট করে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় সেজন্য একবার নিজের বোটটা আউটার সী'র দিকে নিয়ে যাচ্ছে, আবার তক্ষুণি মুখ ঘুরিয়ে কোস্টের দিকে আনছে। এইভাবে যদি পরমেশ্বরকে একবার অন্য দিকে একেবারেই ঘুরিয়ে দেওয়া যায় তা হলে এক্সের পক্ষে স্লিপ কেটে বেরিয়ে যেতে সুবিধা।

কিন্তু একেবারে অ্যাডহেসিভের মতো এক্সের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে পরমেশ্বর। এক্স যেদিকে যাচ্ছে তার বোটের মুখও সেইদিকে ঘুরে যাচ্ছে।

প্রায় পাঁচ সাত মাইল জায়গা জুড়ে পা তোলপাড় হচ্ছে কিন্তু কিছুতেই এক্সের কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। রিভলভারের রেঞ্জের মধ্যে পাওয়া গেলে পরমেশ্বর ডেফিনিটলি স্পীড বোটটার গায়ে গুলি করত। বোটের গা ফুটো করে জল ঢুকিয়ে দিতে পারলে এক্সের পক্ষে এগুনো সম্ভব হত না।

আধ ঘণ্টা এভাবে এলোপাথাড়ি বোট ছোটাবার পর হঠাৎ দেখা গেল উলটো দিক থেকে ঝাঁক-ঝাঁক স্পীড বোট আর লঞ্চ দুর্দান্ত স্পীডে এগিয়ে আসছে। দেখেই মালুম পাওয়া যায় পোর্ট এবং কোস্টাল পুলিসের লঞ্চ আর বোট। সামনের দিকে সেমি-সার্কেলে সমুদ্রের অনেকটা স্পেস কভার করে ছুটে আসছে তারা। অর্থাৎ ওদের স্ট্র্যাটেজিটা এমনভাবে করা যাতে এক্স বা পরমেশ্বর এগুতে গেলেই ধরা পড়ে যাবে।

নিশ্চয়ই পোর্ট এরীয়া ছাড়াও কোস্টাল এবং পোর্ট পুলিসের অন্য কোন

ঘাঁটি আছে। তাদের সিগন্যাল দেওয়া হয়েছে বলেই উলটো দিক থেকে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে পড়েছে।

এক্স সামনের স্পীডবোটগুলোর দিকে একবার তাকালো। তারপর পেছনে। দেখাদেখি পরমেশ্বরও তাই করল। আশ্চর্য ব্যাপার! সামনের দিকের মতো পেছনেও সারেং-খালাসীদের স্পীড বোটের সঙ্গে পোর্ট পুলিসের চল্লিশ-পঞ্চাশটা স্পীড বোট আর লঞ্চ সমুদ্রের জল উথলপাথল করে এদিকেই ছুটে আসছে। অর্থাৎ সামনে বা পেছনে কোন দিকেই যাবার উপায় নেই। যেখানেই যাক ক্যাঁচাকলে পড়ে যেতেই হবে।

এক্স মাকড়া কী ভেবে স্পীডের মাথাতেই কোস্টের দিকে তার স্পীড-বোটের মুখ ঘুরিয়ে দিল। কোস্টের দিকে যাবার কারণ বোধহয় এই রকম। প্রথমতঃ, সামনে এবং পেছনে যেভাবে পোর্ট আর কোস্টাল পুলিস এবং তাদের সঙ্গে সারেঙ-খালাসীরা বোট-টোট সাজিয়েছে তাতে সেই ন্যাভাল ব্লকেড ভেঙে আউটার সী'তে ভ্যানিশ হয়ে যাওয়া খুবই মুশকিল। তা ছাড়া স্পীডবোটে ফুয়েল আর কতটুকু থাকে। মজুদ তেল ফুরিয়ে গেলে বোট আপনা থেকেই থেমে যাবে। আউটার সী'র দিকে যাওয়া আর সুইসাইড করা একই ব্যাপার। তার চাইতে পাড়ে একবার উঠে লাখ লাখ মানুষের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারলে ধরা পড়ার চান্স অনেক কম।

কোস্টে পেঁছুবার অনেক আগেই পেছন থেকে পোর্ট পুলিসের একটা লঞ্চ আর দু-তিনটে স্পীডবোট ঝড়ের গতিতে এগিয়ে এল। লাউড স্পীকারে লঞ্চ থেকে অনবরত হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে, 'স্টপ স্টপ, নইলে ফায়ার করতে বাধ্য হব।'

এক্স বা পরমেশ্বর এ কথায় কান দেওয়া দরকার মনে করল না।

কোস্টের দিকে যেতে যেতে একটা কাণ্ড ঘটল। এক্সের বোটের স্পীড আগের মতো থাকল না, বেশ কমে এল। হয়ত কোন মেকানিক্যাল গোলমালই এর কারণ। ফলে মাঝখানের গ্যাপটা অনেকখানি কমিয়ে আনতে পারল পরমেশ্বর। এখন দুটো বোটের মধ্যে তফাত একশো গজও হবে না। এদিকে পেছন থেকে সেই লঞ্চটা আর চার-পাঁচটা স্পীডবোট প্যারালাল লাইনে এসে গেছে। সমানে লাউড স্পীকারটা চিৎকার করে যাচ্ছিল, 'স্টপ, স্টপ—'

এবারও থামার কোন লক্ষণ নেই পরমেশ্বর বা এক্সের।

হঠাৎ লঞ্চ এবং স্পীডবোট থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ফায়ারিং শুরু হয়ে গেল। বুলেটগুলোর লক্ষ্য হল এক্স এবং পরমেশ্বরের বোট দুটো। গুলি করে যদি ও দুটোর বডি ছেঁদা করে দেওয়া যায় তা হলে ওদের ধরতে অসুবিধা হবে না।

বুলেটের ঘা থেকে বোট দুটোকে বাঁচাবার জন্য এক্স এবং সেই সঙ্গে পরমেশ্বরও স্ট্রেট লাইনে নয়, এঁকে বেঁকে বোট ছোটাতে লাগল। কিন্তু এত করেও শেষ পর্যন্ত বাঁচানো গেল না। কয়েক সেকেন্ড আগে-পরে দু জনের বোটে কম করে চল্লিশ-পঞ্চাশটা বুলেট এসে লাগল।

এক্সের বোটে গুলি লাগতে স্টীলের গা চড়াত করে অনেকটা ফেটে গিয়ে বগবগ করে জল ঢুকতে লাগল। একটা বুলেট খুব সম্ভব অয়েল ট্যাঙ্কে গিয়ে ঢুকেছিল। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ শব্দ করে ট্যাঙ্কটা ফেটে বোটে আগুন ধরে গেল। চোখের পাতা পড়তে যেটুকু সময় লাগে তারও কম টাইমে ছুটতে ছুটতে ডুবে যাওয়া জ্বলন্ত স্পীডবোট থেকে লাফিয়ে জলে পড়ল এক্স।

এদিকে পরমেশ্বরের বোটও বুলেটের চোট খেয়ে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। ভক ভক করে সেখানেও জল ঢুকছে। সেই অবস্থাতেই লাট খেতে খেতে ঢেউয়ের ওপর দিয়ে বোটটা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল। আর চলন্ত অবস্থাতেই লাফিয়ে সমুদ্রে পড়ল পরমেশ্বর।

এতগুলো স্পীডবোট আর লঞ্চের ছোটাছুটির জন্য বড় বড় ঢেউ যেমন উঠছে তেমনি চারদিকের জল ফেনায় ফেনায় ভরে গেছে। তার মধ্যে এক্স মাকড়াকে প্রথমটা দেখতে পেল না পরমেশ্বর। তা ছাড়া যশমিন্দর সিং গিলের মেক-আপে রয়েছে সে। জলে ভিজে দাড়ি, পাগড়ি, জুতো মোজা আর ট্রাউজার্সের ওয়েট এত বেড়ে গেছে যে নড়াচড়া করা প্রায় ইমপসিবল্। জলের তলায় ডুব দিয়ে এক্সট্রা লোড সব খুলে ফেলল পরমেশ্বর। এখন তার পরনে স্রেফ একটা টাইট জাঙ্গিয়া। বডিটা লাইট হওয়ায় খুবই আরাম লাগল তার। এবার চারদিকে তাকিয়ে পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে এক্সকে দেখতে পেল সে। বোঝা যাচ্ছে হারামীটাও তারই মতো স্ট্রিপ করেছে; জামা প্যান্ট খুলে স্রেফ জাঙ্গিয়া দিয়ে লজ্জা ঢেকে সে-ও হালকা হয়ে গেছে। সিনেমা স্লাইডে বা মেন্ডেজের বাড়ির সিঁড়িতে বা সার্কুলার রোডের স্যুইটের 'গোপন' দেয়াল আলমারিতে লুকানো ক্যামেরায় তোলা ছবিতে যে মালকে দেখা গিয়েছিল সেই ওরিজিন্যাল এক্সকে এবার দেখা যাচ্ছে।

পরমেশ্বর ডুব দিয়ে জলের তলায় সাঁতার কেটে পঞ্চাশ-ষাট গজ কভার করে এক্স একটু আগে যেখানে ছিল ভুস করে সেখানে এসে উঠল। কিন্তু না, মাকড়াটা নেই। ওখান থেকে সে বিলকুল ভ্যানিশ হয়ে গেছে। খুব সম্ভব পরমেশ্বরের ওপর সে নজর রেখেছিল। পরমেশ্বর ডুব দিতেই তার মতলব বুঝতে পেরে ওখান থেকে হাওয়া হয়ে গেছে।

এইভাবে সমুদ্রের তলায় ডুব সাঁতার দিয়ে বারকয়েক লুকোচুরি চলল

এক্স এবং পরমেশ্বরের মধ্যে। মাকড়ার টেরিফিক দম; তা ছাড়া সী-তে সাঁতার কাটার ট্রেনিং তার আছে খুব সম্ভব। খজড়াটা হয়ত ইংলিশ চ্যানেলও দু-চার বার ক্রস করেছে।

ওধারে সামনের দিক আর পেছন থেকে স্পীডবোট আর লঞ্চগুলো ন্যাভাল ব্লকেডের স্টাইলে চার পাশ থেকে এক্স এবং পরমেশ্বরকে ঘিরতে ঘিরতে অনেক কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। সেই লঞ্চটা থেকে সমানে ওয়ার্নিং দেওয়া হচ্ছিল, 'স্টপ স্টপ, সারেণ্ডার—'

কিন্তু কোস্টাল আর পোর্ট পুলিসের হাতে নিজেদের তুলে দেবার জন্য কোন রকম গরজ দেখা গেল না দু'জনের কারো।

ডেফিনিটলি ডীপ সী-তে জলের তলায় এনডিওরেন্স সুইমিং-এর প্র্যাকটিস আছে এক্সের। স্পীডবোট-টোটগুলো কাছে এসে স্পীড কমিয়ে দিয়েছিল। ওদের দেখেই এক্স মালটা ডুব দিয়ে জলের অনেকটা তলায় চলে গেল। তারপর ওঠার নাম নেই।

পরমেশ্বর জলের তলায় ভেসে থেকে এক্সের খোঁজে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছিল। তিন-চারটে স্পীডবোট তার দিকে এগিয়ে এল। উদ্দেশ্য একটাই—তাকে ক্যাচ করা। পরমেশ্বর আর ওয়েট করল না, সে-ও জলের নিচে ডুব দিল এবং মিনিট কুড়ি বাদে স্পীডবোটগুলোর অনেক তলা দিয়ে ডীপ সী'তে গিয়ে উঠল। উঠেই চোখে পড়ল শ' খানেক গজ তফাতে শলা এক্সও ভেসে উঠেছে। স্পীডবোটগুলো তাদের দিকে শার্কের মতো তেড়ে এল; সেই লঞ্চটা আগের মতোই হুঁশিয়ারি দিয়ে যাচ্ছে—, 'দু মিনিট সময় দেওয়া হল। এর মধ্যে সারেণ্ডার না করলে গুলি করা হবে।'

এবারও এক্স বা পরমেশ্বর, কারোরই পুলিসের ক্যাঁচাকলে ঠ্যাং ঢোকাবার উৎসাহ দেখা গেল না। এক্স ফের জলের তলায় ভ্যানিশ হয়ে গেল। দেখাদেখি পরমেশ্বরও।

পরমেশ্বরের এমনিতে ভয় নেই। সে ধরা পড়লেও সিঙ্গাপুর পুলিসের হাত থেকে ডেফিনিটলি হেমা তাকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে। কিন্তু সে ধরা পড়ার আগে এক্সকে জ্যান্ত ক্যাচ করা দরকার। খচ্চরটার কাছে সোমেশ্বরকে ফাঁসাবার মতো প্রচুর মাল রয়েছে।

এক্সের জন্য জলের তলায় অন্ধের মতো সাঁতার কাটতে কাটতে একটা কথা ভেবে ভয় হতে লাগল পরমেশ্বরের। সিঙ্গাপুরের এই সী তার কাছে পুরোপুরি অজানা। এখানে শার্ক বা ঐ রকম কোন সামুদ্রিক জন্তু থাকাটা অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়। যে কোন মুহূর্তে তার বা এক্সের পক্ষে ডেঞ্জারাস কিছু ঘটে যেতে পারে। কিন্তু এক্সটা যে টাইপের ডেসপারেডো

তাতে পুলিসের ইঁদুরকলে পা ঢোকাবার চাইতে শার্কের স্টমাকে ঢুকতেই বেশী রাজী হবে।

যাই হোক, স্পীডবোট এবং লঞ্চগুলোর তলা দিয়ে এক্স এবং তার পেছনে ধাওয়া করে পরমেশ্বর একবার ডীপ সী'র দিকে যাচ্ছে, আবার কোস্টের দিকে আসছে।

এধারে লঞ্চটা থেকে যে ওয়ার্নিং দেওয়া হয়েছিল, এবার তা-ই শুরু হয়ে গেছে। জলের ওপর এক্সরা মাথা তুললেই গুলি ছুটে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে আবার জলের তলায় ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে। উথল-পাথল ঢেউয়ের মাথায় অস্থিরভাবে নড়াচড়ার জন্য পুলিসরা টার্গেট ঠিক করতে পারছে না। ফলে বুলেটগুলো এধার-ওধার দিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এভাবে বেশীক্ষণ চলতে পারে না। চারদিক থেকে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছুটে আসছে। যে কোন মুহূর্তে গায়ে লেগে যাবেই।

ঘণ্টা দেড় দুই পুলিসের সঙ্গে খেলবার পর দম হালকা হয়ে আসতে লাগল পরমেশ্বরের। অনেক দিন এনডিউরেন্স সুইমিং-এর অভ্যাস নেই। সে লক্ষ্য করল, এক্স মাকড়াটারও একই হাল।

এখন আর এক্স জলের তলায় ডুব দিচ্ছে না। কুকুরের মতো জিভ বার করে কোন রকমে ঢেউয়ের ওপর ভেসে আছে।

গুলি সমানে চলছিলই। কিন্তু এক্স ডুব না দিয়ে জলের ওপর যে ভাবে ডেডবডির মতো হাত-পা ছড়িয়ে রেখেছে, সেটা খুবই ডেঞ্জারাস ব্যাপার। যে কোন মোমেণ্টে গুলি লেগে যাবে। ওকে এবং নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল পরমেশ্বর। বডিটাকে পায়ের ওপর ভর দিয়ে ভাসিয়ে রেখে দুই হাত উঁচুতে তুলে চিৎকার করে উঠল, 'স্টপ ফায়ারিং, স্টপ ফায়ারিং—'

সঙ্গে সঙ্গে গুলির আওয়াজ থেমে গেল। লঞ্চ থেকে লাউডস্পীকারে জানানো হল, এক্স এবং পরমেশ্বর যেখানে আছে সেখানেই যেন থাকে। জানানোর পর আস্তে আস্তে চারদিক থেকে স্পীডবোট আর লঞ্চগুলো দু'জনকে ঘিরে যে ব্লকেডের সার্কেল তৈরি করেছিল তা ছোট করে আনতে লাগল।

আচমকা একটা ব্যাপার ঘটে গেল। একটা স্পীডবোট সার্কেলের ভেতর থেকে দুর্দান্ত স্পীডে এক্সের দিকে এগিয়ে গেল। কিছুটা অবাক হয়েই পরমেশ্বর মার্ক করল, সেই আমেরিকান বা ইওরোপীয়ানটা বোটটা চালিয়ে যাচ্ছে। ঘণ্টা আড়াই তিন আগে সিঙ্গাপুরের রাস্তায় যখন পরমেশ্বর এক্সের পেছনে ছুটছিল সেই সময় এই মালটাও সেই 'চেজ'-এর ভেতর ছিল। ব্রেনের

ভেতর এক সেকেণ্ডের মধ্যে সেই কমপিউটারটা অ্যাকটিভ হয়ে উঠল। হারামীটার ধান্দা পরিষ্কার ধরা যাচ্ছে। ইওরোপীয়ান বা আমেরিকানের মেক-আপে এ যদি রিয়ালি সোমেশ্বর হয় তা হলে এক্সকে বোটে তুলে নিয়ে কোস্টের দিকে যাবার চেষ্টা করবে।

এক্সের কাছ থেকে শ' খানেক গজ দূরে রয়েছে পরমেশ্বর। আর বোটটা তাদের দু'জনের মাঝখানে ঢুকে পড়েছে। পরমেশ্বর আর দেরি করল না। এমনিতেই সমুদ্রের ভারী নোনা জল টেনে টেনে হাত-পা ছিঁড়ে যাচ্ছে তার। মাসলগুলো এত টনটন করছে যে মনে হয় ফেটে যাবে। তবু বডির শেষ শক্তিটুকু জড়ো করে জলের তলায় ডুবে গেল সে। আর ডুবতে ডুবতেই টাইমের একটা ক্যালকুলেশন করে নিল। স্পীডবোটটা যেভাবে যাচ্ছে তাতে পনের থেকে বিশ সেকেণ্ডের মধ্যে এক্সের কাছে পেঁছে যাবে। তারপর স্পীড থামিয়ে এক্সকে বোটে তুলতে আরও কয়েক সেকেণ্ড। তার মানে আধ মিনিট থেকে পৌনে-এক মিনিটের ভেতর জলের তলা দিয়ে একশো গজ সাঁতরে এক্সের কাছে পরমেশ্বরকে হাজির হতেই হবে।

বোটটার স্পীড কনট্রোলে এনে এক্সের কাছে পেঁছুবার পাঁচ-সাত সেকেণ্ড আগেই ডেস্টিনেসনে পেঁছে গেল পরমেশ্বর। এক্স খানিকক্ষণ ভেসে থাকার ফলে রেস্ট পেয়েছিল। পরমেশ্বরকে তিন ফুটের মধ্যে দেখামাত্র সে হাত চালাল। মাথাটা হানড্রেড এইটি ডিগ্রিতে হেলিয়ে নিজেকে সেভ করল পরমেশ্বর। তারপর একটা ডুব দিয়ে চোখের পলকে এক্সের পেছন দিকে গিয়ে তার ঘাড়ে দু হাতের পাঞ্জা জোড়া দিয়ে চ্যাপ্টা লোহা পাতের মতো করে মাঝারি গোছের ঘা দিল। একটি চোটেই এক্সের চোখ ডেলা পাকিয়ে বেরিয়ে এল যেন। টের পাওয়া গেল, মাকড়া সেন্সলেস হয়ে গেছে। ওয়ারের সময় আন-আর্মড সোলজাররা শত্রুপক্ষের আর্মড সৈন্যদের আচমকা এভাবে মেরে কাত করে ফেলত। পরমেশ্বর যে ধরনের ঘা ঝেড়েছে তার ওপর আরেকটু ওয়েট দিলে এই জলের তলাতেই বাকি লাইফের জন্য পার্মানেণ্টলি এক্সকে বডি ফেলে ঘুমিয়ে থাকতে হত।

পরমেশ্বর এমনিতে হানড্রেড পারসেণ্ট নন-ভায়োলেণ্ট। নিরুপায় হয়ে এক্সকে চোট দিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল তার।

যাই হোক, পরমেশ্বর যে এভাবে শুশুকের মতো এখানে ভেসে উঠবে আমেরিকান বা ইওরোপীন বা সোমেশ্বর মল্লিক তা বুঝতে পারেন নি। তিনি প্রায় হকচকিয়েই গিয়েছিলেন। পরক্ষণেই ঝাঁ করে সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার বার করলেন।

পরমেশ্বরের একটা চোখ ছিল এক্সের দিকে, আরেকটা ওই স্পীডবোটটার

দিকে। "আমেরিকান বা ইওরোপীয়ান বা সোমেশ্বর খজড়াটার মতলব বোঝার সঙ্গে সঙ্গে এক্কের জাঙিয়া ধরে টেনে জলের তলায় ডুবে গেল সে। বাতাসে আলতো করে চাবুক বেরিয়ে যাবার মতো আবছা শব্দ করে পর পর তিনটে বুলেট সমুদ্রের জলে ডুবে গেল।

সেন্সলেস অবস্থায় এক্কাকে জলের তলায় নিয়ে যেতে যেতে পরমেশ্বর ভাবল, মাকড়া মরে-ফরে না যায়। তবু এই ব্যাপারটা না করে উপায় ছিল না। জলের মাথায় ভেসে থাকলে সোমেশ্বরের গুলিতে দু'জনকেই সমুদ্রে শেষ-শোওয়া শুতে হত। পরমেশ্বরের ধারণা, এক্কাকে বাঁচাবার লাস্ট অ্যাটেমপ্ট নিতে এসে যখন আমেরিকান বা সোমেশ্বর দেখলেন সেখানে পরমেশ্বর হাজির, সেই মোমেণ্টে প্রমাণ-ট্রমাণ লোপাট করার জন্য দু'জনকে ওয়াল্ড' থেকে হাপিস করে দেবার ডিসিসান নিয়েছেন। গুলিতে যদি পরমেশ্বর আর এক্কা মরেও, ধরা যাবে না কার গুলিতে মরেছে। একটু আগে তাদের দিকে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছোঁড়া হচ্ছিল। যদি মরে, বলা যাবে তাতেই মরেছে। তা ছাড়া সাইলেন্সার লাগানো থাকায় আমেরিকান বা সোমেশ্বরের রিভলবারে শব্দ নেই। কাছাকাছি এখন আর কেউ নেই যে তাঁকে গুলি ছুঁড়তে দেখেছে। যে সত্যসত্যিই দেখতে পাবে সে তো ফিউচারে উইটনেস হবার জন্যে বেঁচে থাকবে না। যাই হোক, এখন যদি শলা এক্কাটার আয়ু-ফায়ু থাকে, বেঁচে যাবে। মরে গেলে কী আর করা!

জলের নিচে যেতে যেতে আরেকটা ব্যাপার অস্পষ্টভাবে পরমেশ্বরের চোখে পড়েছিল। অন্য একটা স্পীডবোট সোমেশ্বরের স্পীডবোটের দিকে রকেটের মতো ছুটে আসছে। সেটাতে দু-তিনটে খালাসী বা সারেং-এর সঙ্গে যে চীনা ছুকরিটা রয়েছে সে তার খুবই চেনা। সে হেমা সারিন না হয়ে যায় না।

মিনিট দেড় দুই বাদে পরমেশ্বর যখন এক্কাকে নিয়ে আবার ভেসে উঠল তখন দেখা গেল ইওরোপীয়ান বা সোমেশ্বরের স্পীডবোট উদভ্রান্তের মতো কোস্টের দিকে ছুটে যাচ্ছে, আর সেটাকে ধাওয়া করে শুধু হেমার বোটটাই না, আরো দু-তিন ডজন বোট আর লঞ্চ ছুটে চলেছে। সেই লঞ্চটা থেকে অনবরত হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছিল, 'স্টপ স্টপ—' এর মধ্যেই সোমেশ্বরের বোটটার দিকে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছুটতে লাগল।

এদিকে তিন-চারটে স্পীড বোট এসে পরমেশ্বর আর এক্কাকে ঘিরে ফেলেছে। পরমেশ্বর দেখল, বোটগুলোতে কম করে কুড়ি-বাইশটা পোর্ট আর কোস্টাল পুলিস রয়েছে। তাদের হাতে তাক-করা রাইফেল।

পরমেশ্বর বলল, 'রাইফেলের দরকার হবে না। আগে আমাদের তুলুন।'

নাইলনের দড়ির জাল নামিয়ে পরমেশ্বর আর এক্সকে একটা বোটে তোলা হল। ওপরে উঠেই পরমেশ্বর এক্সের নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখল, খুব আস্তে আস্তে অনেকক্ষণ বাদে বাদে নিঃশ্বাস পড়ছে তার। নাঃ, মাকড়াটা বোধ হয় বেঁচেই যাবে। একজন পুলিস অফিসারকে সে বলল, 'প্লীজ, এই খজড়ার জন্যে ডাক্তারের ব্যবস্থা করুন।'

তার কথা শেষ হতে-না-হতেই কোস্টের দিক থেকে এক্সপ্লোসানের প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা গেল। চমকে ঘাড় তুলে পরমেশ্বর দেখল, সোমেশ্বরের বোটটা জ্বলতে জ্বলতে সমুদ্রের ওপর দিয়ে উন্মাদের মতো ছুটে চলেছে। ডেফিনিটলি গুলি-ফুলি লেগে অয়েল ট্যাঙ্কে আগুন ধরে ফেটে গেছে। আরো দেখা গেল, দাউ দাউ করে জ্বলে যাওয়া বোটটা থেকে আমেরিকান বা ইওরোপীয়ান বা সোমেশ্বর মল্লিক জলে লাফিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ক'টা স্পীড বোট থেকে অনেকগুলো পোর্ট পুলিস জলে ঝাঁপ দিল এবং কয়েক মিনিটের ভেতর তাঁকে তুলে নিয়ে এল। জলে আমেরিকান বা ইওরোপীয়ানের মেক-আপ ধুয়ে গিয়েছিল। তাঁকে যখন পরমেশ্বরদের বোটটার কাছাকাছি নিয়ে আসা হল, দেখা গেল ওরিজিনাল সোমেশ্বর মল্লিক বেরিয়ে পড়েছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে তিরিশ-চল্লিশটা স্পীড বোট আর লঞ্চের ফ্লীট সিঙ্গাপুর পোর্টের দিকে ছুটে চলল।



পোর্টে আসার পর সবাইকে পোর্ট পুলিসের অফিসে নিয়ে যাওয়া হল। এদিকে বন্দরের হাজার হাজার ওয়ার্কার ডিউটি-ফিউটি ফেলে, চোখের তারা ফিক্সড করে আর বুকের ভেতর দম আটকে এতক্ষণ সমুদ্রে একখানা টেরিফিক অ্যাকসান-প্যাকড ড্রামা দেখছিল। তারাও পোর্ট পুলিসের অফিসের সামনে ভিড় করে দাঁড়াল। তাদের দূরে হটাতে পুলিসের জিভ বার হয়ে যাচ্ছে।

এখনও এক্সের জ্ঞান ফেরে নি; মাকড়াকে একটা লম্বা বেঞ্চে শুইয়ে দেওয়া হল। ট্রাউজার্স-ফ্রাউজার্স নিয়ে সী'তে ঝাঁপ দিয়েছিলেন সোমেশ্বর মল্লিক। জলে ভিজে তাঁর পোশাক-ফোশাক ঢোল হয়ে গেছে। ক্রাইম ওয়ার্ল্ডের এই খচ্চর সুপার স্টারটি মাথা নিচু করে বসে আছেন। মনে হয় তাঁর ঘাড় ভেঙে বডির ওপর দিকটা ঝুলে পড়েছে।

সোমেশ্বরের মতো এক্স আর পরমেশ্বরেরও ওরিজিনাল চেহারা আগেই বেরিয়ে পড়েছিল। শুধু হেমা বাদ। কেননা তাকে জলে নেমে অ্যাকসান ড্রামায় কোন রকম রোল প্লে করতে হয় নি। এখনও চীনা ছুঁড়ির মেক-আপেই রয়েছে সে।

হেমা পোর্ট পুলিসের অফিসার-ইন-চার্জকে বলল, 'আমাকে একটা ফোন করতে হবে।'

অফিসার বললেন, 'সিওর ম্যাডাম—' টেবিলের ফোনটা হেমার দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি।

হেমা সিঙ্গাপুর পুলিসের হেড কোয়ার্টারে ফোন করে জানালো, 'রোগস আর ইন চেইনস।'

ওধার থেকে খুব সম্ভব কোন টপ পুলিস অফিসার কনগ্র্যাচুলেসনস জানালেন। হেমা বার বার ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'কাইন্ডলি পোর্ট থেকে

আপনাদের হেড কোয়ার্টারে আমাদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। একটা 'রোগ' সেন্সলেস হয়ে আছে; তার জন্য একজন ডাক্তার আনিয়ে রাখবেন। আর 'হোটেল ম্যাগনিফিসেন্টে'র যে অমিতাভ সেনের কথা আপনাদের জানিয়ে রেখেছি আজ ইভনিং ফ্লাইটে তাঁর ক্যালকাটায় ফিরে যাবার কথা। মিস্টার সেনের যাওয়া বন্ধ করুন আর অনুগ্রহ করে তাঁকে আপনাদের হেড কোয়ার্টারে এসে অপেক্ষা করতে বলুন। ও-কে?'

ওধার থেকে কী উত্তর এল, বোঝা গেল না। তবে মনে হয়, হেমার সব কথাতেই রাজী হয়ে গেছেন ও পক্ষ।

টেলিফোন ক্রেডেলে রেখে হেমা এবার পরমেশ্বরের দিকে তাকাল। বলল, 'আপনি যা করেছেন তার জন্য আমি গ্রেটফুল। কোন মানুষের পক্ষে যে এটা করা সম্ভব আগে ভাবতে পারি নি। কনগ্র্যাচুলেসনস—'

পরমেশ্বর বলল, 'কনগ্র্যাচুলেসনস বা গ্রেটফুলনেসের দরকার নেই। আপনার সঙ্গে যে কনট্রাক্ট হয়েছে সেই অনুযায়ী কাজ করেছি। তার বেশী কিছু করি নি।' একটু থেমে ফের বলল, 'ম্যাডাম, আমার শলা লজ্জা ফজ্জা খুবই কম। তবু এতগুলো লোকের সামনে জাঙিয়া পরে বসে থাকতে হেভি খারাপ লাগছে। একটা কিছু ব্যবস্থা করুন।'

হেমা মুখ ফিরিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে স্লাইট লাজুক টাইপের একটু হাসল। তারপর বলল, 'হোটেলে আপনার স্যুইটের চাবিটা কোথায়?'

'আমার ট্রাউজার্সের পকেটে ছিল। সী'তে ট্রাউজার্সের সঙ্গে ওটা ডুবে গেছে।'

হেমা একটু ভেবে বলল, 'নো প্রবলেম। আপনার হোটেলে [illegible] করে দিচ্ছি। ওরা যেন ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে আপনার স্যুইটের দ[illegible] খুলে ট্রাউজার্স শার্ট-ফার্ট নিয়ে আসে।'

চোখের তারা দুটো কোণের দিকে এনে বেহুঁশ এক্সকে দেখিয়ে পরমেশ্বর বলল, 'দুটো করে শার্ট-ট্রাউজার্স আনতে বলবেন। এক সেট এই মাকড়ার জন্যে। খজড়াটার বিকিনি-পরা হাফ-নেকেড বডি চোখে পিন ফোটাচ্ছে।'

হেমা হেসে টেলিফোন ডাইরেক্টরি দেখে হোটেল সিঙ্গাপুরের নাম্বার বার করতে লাগল।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সোমেশ্বর সেই যে বুকের সঙ্গে থুতনি ঠেকিয়ে বসে আছেন তো বসেই আছেন। কোনদিকে তিনি তাকাচ্ছেনও না, কোন কথাও বলছেন না। মাকড়া বিলকুল স্ট্যাচু হয়ে গেছে যেন।

হেমা যখন হোটেল সিঙ্গাপুরে ফোন করছে সেই সময় একজন ডাক্তার এসে এক্স হারামীটার সেন্স ফেরাবার জন্য চামড়া ফুঁড়ে ইঞ্জেকসান দিতে লাগল। পোর্ট পুলিস থেকেও তার জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এদিকে পোর্ট পুলিসের অফিসাররা একটা টেরিফিক ক্রিমিন্যালকে সমুদ্রে ধাওয়া করে ধরার জন্য অনবরত কনগ্র্যাচুলেসনস জানিয়ে যেতে লাগল পরমেশ্বরকে। এভাবে কেউ যে নিজের লাইফের পরোয়া না করে কোন ডেঞ্জারাস ক্রিমিন্যালের পেছনে দৌড়ুতে পারে, আগে নাকি তাঁদের জানা ছিল না। দাঁত বার করে হাসা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না পরমেশ্বরের।

ঘণ্টাখানেক পর একটা স্টেশন ওয়াগনে সিঙ্গাপুর পুলিসের হেড কোয়ার্টার্সে এসে পৌঁছুল পরমেশ্বররা। দুটো আর্মড গার্ড বোঝাই ভ্যান সামনে এবং পেছনে পাহারা দিতে দিতে তাদের নিয়ে এসেছে।

প্রকাশ্য ডে-লাইটে সিটির রাস্তায়, পোর্ট এরিয়ায় এবং সমুদ্রে ক'টা ফরেনার যে একটা দুর্দান্ত কারবার ঘটিয়েছে, হোল সিঙ্গাপুর তা জেনে ফেলেছে। তাই পুলিস ভ্যানের পাহারায় যখন এক্স-টেক্সকে হেড কোয়ার্টারে নিয়ে আসা হচ্ছিল তখন রাস্তার দু'ধার থেকে হাজার হাজার লোক তাদের দেখছিল। শুধু তাই নয়, পুলিস হেড কোয়ার্টারের মেইন গেটের বাইরের রাস্তায় অগুনতি লোক দাঁড়িয়ে ছিল। বাঁচোয়া, তাদের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। তা হলে মানুষের ভিড়ে পুলিস হেড কোয়ার্টারে ছুঁচ ফেলার জায়গা পাওয়া যেত না।

যাই হোক, এখানে আসার পর সিঙ্গাপুর পুলিসের টপ অফিসাররা নতুন করে হেমাকে এত বড় একটা অ্যাচিভমেণ্টের জন্য দফায় দফায় কনগ্র্যাচুলেসনস জানালেন। হেমা তাঁদের সবাইকে বার বার ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনাদের অ্যাকটিভ কো-অপারেসন ছাড়া কিছুই করা যেত না। তা ছাড়া এই অ্যাচিভমেণ্টের নাইনটি পারসেণ্ট কৃতিত্বই এঁর—' বলে পরমেশ্বরকে দেখিয়ে দিল, 'ইনি না থাকলে ক্রাইম-ওয়ার্ল্ডের এত বড় দুটো সুপার স্টারকে কিছুতেই ধরতে পারতাম না।'

এবার পুলিস অফিসারদের গাদা গাদা অভিনন্দন এসে পড়তে লাগল পরমেশ্বরের ওপর। ব্যাপারটা তার খারাপ লাগছে না। বরং একটা কথা

ভেবে রীতিমতো মজাই লাগল। তার মতো একজন ফেরেববাজ ফোর-টোয়েণ্টিকে ক্যাঁচাকলে ঢোকাবার বদলে পুলিসের এতগুলো টেরিফিক টেরিফিক অফিসার কিনা কনগ্র্যাচুলেসনস জানিয়ে যাচ্ছে। ওয়ার্ল্ডের এর চাইতে চমকদার ঘটনা আর বোধ হয় ঘটে নি। মাথা নেড়ে নেড়ে পরমেশ্বর বলে যেতে লাগল, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার—'

এদিকে এক্সের জ্ঞান ফিরে এসেছিল। খানিকটা দূরে একটা চেয়ারে বেপরোয়া ভঙ্গিতে সে বসে আছে। তার পাশের অন্য একটা চেয়ারে বসে আছেন সোমেশ্বর। সী থেকে স্পীডবোটে টেনে তোলার পর সেই যে বুকে থুতনি ঠেকিয়ে মাথা নিচু করে বসে আছেন, সেই মাথা এখনও তোলেন নি।

এদিকে ঘ্যানঘেনে টাইপের বৃষ্টির মতো একনাগাড়ে যখন কনগ্র্যাচুলেসনস আর থ্যাঙ্কস চলছে সেই সময় ঘরে এসে ঢুকল অমিতাভ। তার সঙ্গে সেই মঙ্গোলিয়ান ভদ্রলোকটি। আগেই বাইনোকুলার দিয়ে অমিতাভর হোটেলে, বার্ড স্যাংচুয়ারি এবং হোটেল সী-ভিউর পার্টিতে এঁকে দেখেছে পরমেশ্বর। ভদ্রলোক ডেফিনিটলি সিঙ্গাপুর ইলেকট্রনিকসের একজন ভি. আই. পি.-টি. আই. পি. হবেন। মুখচোখের চেহারা দেখে টের পাওয়া যায়, ফ্লাইট ক্যানসেল করিয়ে পুলিস হেড কোয়ার্টারে ধরে আনার জন্য অমিতাভ দারুণ বিরক্ত আর অসন্তুষ্ট। হয়ত প্রচণ্ড রেগেও গেছে।

অমিতাভ কিছু বলার আগেই তার সঙ্গী রুক্ষ গলায় অফিসারদের বললেন, 'আমি সিঙ্গাপুর ইলেকট্রনিকসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর।' অমিতাভকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি অমিতাভ সেন। আমার বন্ধু এবং ইণ্ডিয়ার একজন টপমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। আজ ইভনিং ফ্লাইটে এঁর ক্যালকাটায় ফিরে যাবার কথা ছিল। আপনারা এঁর যাওয়া বন্ধ করলেন কেন?'

একজন অফিসার উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে থামিয়ে হেমা বলল, 'ওঁরা মিস্টার সেনকে আটকান নি, আমি আটকেছি।'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর হেমার দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাট হোয়াই? অ্যাণ্ড হু আর ইউ?'

দারুণ শান্ত গলায় হেমা বলল, 'নিশ্চয়ই কারণ আছে। সবই বলছি, নিজের পরিচয়ও দেব। তার আগে কাইণ্ডলি আপনারা বসুন।'

'একটা দিন আটকে দেবার জন্য মিস্টার সেনের কতটা ক্ষতি হতে পারে আপনার ধারণা আছে ?' বিরক্ত গলায় গজ গজ করতে করতে সিঙ্গাপুর ইলেকট্রনিকসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

অমিতাভও বসতে যাচ্ছিল। আর তখনই খানিকটা দূরে ডান পাশের একটা চেয়ারে পরমেশ্বরকে দেখতে পেল। কলকাতা থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে সিঙ্গাপুর পুলিসের হেড কোয়ার্টারে তাকে দেখতে পাবে, এটা ভাবতে পারে নি অমিতাভ। কয়েক সেকেণ্ড থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে। তারপর চিৎকার করে উঠল, 'তুমি এখানে! ইউ রাসকেল, সোয়াইন—' বলেই পরমেশ্বরের দিকে ক্ষিপ্তের মতো ছুটে গেল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হল না। হেমা তার একটা হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ডোণ্ট বী এক্সসাইটেড মিস্টার সেন।' তারপর পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলল, 'ঐ রাসকেল আর সোয়াইনটা ছিল বলে এখনও আপনি বেঁচে আছেন, গলার শির ছিঁড়ে চেঁচাতে পারছেন। নইলে এতক্ষণে আপনাকে ওয়ার্লের্ডর মায়া কাটিয়ে—' মাথার ওপরে আকাশের দিকটা দেখিয়ে বলল, 'ওখানে চলে যেতে হত।'

চীনা ছুকরির মুখে পারফেক্ট অ্যাকসেণ্টে আগমার্কা পিওর বাংলা শুনে হকচকিয়ে গিয়েছিল অমিতাভ। সে বলল, 'মানে ?'

'ভেরি সিম্পল। গোটা তিনেক বুলেট আপনার হার্ট আর লাংস ফুটো করে বেরিয়ে যেত। দুপুর বেলা আপনার হোটেলের জানলার কাচ ভেঙেছিল, মনে আছে ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে ?' অমিতাভ অবাক।

'আমি সব জানি। একটা বুলেট লেগে জানলাটার ঐ হাল হয়েছে। আপনার লাক ভালো, বুকে না লেগে গুলিটা জানলার কাচে লেগেছে।'

বিমূঢ়ের মতো অমিতাভ বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি কে ?'

'আমাকে আপনি চেনেন। অনেকবার দেখেছেনও।'

'মনে করতে পারছি না তো।'

'দেখেছেন মিস্টার সেন। তবে চীনা মেয়ের মেক-আপে নয়। আমি হেমা মৈরিন, গারমেণ্ট এক্সপোর্টার। ওরিয়েণ্টাল ক্লাব আর ক্লাব ডে অ্যাণ্ড নাইটে রণজয় হালদার মানে মিস্টার পরমেশ্বরের সঙ্গে একই দিনে মেম্বার

হয়েছিলাম। ক্লাবের সুইমিং পুলের পাশে বসে অনেক দিন আমার সাঁতার দেখেছেন। মনে পড়ছে?'

'পড়ছে। কিন্তু আপনি চীনা মেয়ের মেক-আপ নিয়েছেন কেন?'

'আপনার জন্যে।'

'আমার জন্যে কি সিঙ্গাপুর পর্যন্তও ছুটে এসেছেন?'

'ইয়েস স্যার। শুধু মিস্টার পরমেশ্বর আর আমিই না, আরো দুই মহাপ্রভুও এসেছেন। দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা?' প্রকাণ্ড ঘরটার এক কোণে আঙুল বাড়িয়ে দিল হেমা। সেখানে সোমেশ্বর আর এক্স বসে ছিল।

স্থির চোখে ওদের দেখতে দেখতে চোয়াল স্টীলের মতো শক্ত হয়ে উঠল অমিতাভর। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল, 'সোমেশ্বর মল্লিক!'

'ইয়েস। নানা ব্যাপারে আপনি যাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চাইছেন।'

'কিন্তু ঐ লোকটা কে?'

'মল্লিকের এজেন্ট—মিস্টার এক্স। লোকটা প্রফেসানাল মার্ডারার। পঁচিশ-তিরিশটা মার্ডারের ক্রেডিট ওর একলার। মল্লিক আপনার আর মিস্টার পরমেশ্বরের লিকুইডেসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ওকে দিয়েছিল। যে বুলেটটা আপনার হোটেলের জানলা ভেঙেছে সেটা ওরই "গান" থেকে ছুটে গিয়েছিল।'

শুনতে শুনতে ভয়ে আর বিস্ময়ে চোখের তারা গোল হয়ে যাচ্ছিল অমিতাভর। সে বলল, 'কিছুই বুঝতে পারছি না মিস সারিন। আমার মাথা ভীষণ ঘুরছে।'

'আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তবে ইংরেজিতে বলব। সিঙ্গাপুরের পুলিস বন্ধুরা তা হলে টোটাল একটা পিকচার পাবেন। অবশ্য ওঁদের আমি টুকরো টুকরো ভাবে সবই বলেছি।'

প্রথম থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত দুর্দান্ত অ্যাকসানওলা এক দম-আটকানো কাহিনী বলে গেল হেমা। তার মধ্যে পরমেশ্বরের রোলটা যে কত ইমপর্টাণ্ট সেটা বার বার জানালো।

রুদ্ধশ্বাসে সব শোনার পর অমিতাভ বলল, 'কিন্তু আপনার রীয়েল পরিচয়টা কি?'

'আমার পরিচয়টা পরে জানবেন।' বলেই পুলিস অফিসারদের দিকে ফিরল হেমা, 'যত তাড়াতাড়ি পারেন আমাদের ক্যালকাটায় ফেরার সব অ্যারেঞ্জমেণ্ট করে দেবেন। আর দুই সুপার স্টার ক্রিমিন্যালকে গার্ড দিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাও করবেন। আমি আমাদের এমব্যাসিতেও এ ব্যাপারে আজই কনট্যাক্ট করব।'

অফিসাররা জানালেন, গভর্নমেণ্টের টপ লেভেলে ব্যাপারটা জানিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হেমাদের ক্যালকাটায় ফেরার ব্যবস্থা করে দেবেন।

হেমা এবার অমিতাভর দিকে তাকাল, 'আশা করি, মিস্টার পরমেশ্বর সম্পর্কে আপনার মিস-আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং আর নেই। নিজের লাইফ রিস্ক করে পরমেশ্বর প্রমাণ করে দিয়েছেন উনি আপনার কত বড় শুভাকাঙ্ক্ষী।'

ঘাড় ফিরিয়ে কৃতজ্ঞ চোখে পরমেশ্বরের দিকে তাকাল অমিতাভ। তারপর উঠে গিয়ে তার দুটো হাত ধরে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করুন।'



সব ফর্মালিটি কমপ্লীট করে এবং নানারকম ইণ্টারন্যাশনাল ফ্যাকড়া কাটিয়ে কলকাতায় ফিরতে তিনটে দিন লেগে গেল হেমাদের।

পরমেশ্বরের মোটামুটি আশা ছিল, সোমেশ্বর মল্লিক আর এক্সকে ধরার ব্যাপারে হেল্প করার জন্য হয়ত তাকে হাজত-ফাজতে ঢুকতে হবে না। কিন্তু কলকাতায় আসার পরই দেখা গেল, সে ভুল আইডিয়া নিয়ে বসে আছে। তার স্লেটখানাও তো তকতকে ক্লীন না। মার্ডারটা বাদ দিলে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের এমন কোন ধারা নেই যা দিয়ে তাকে ক্যাঁচাকলে ফেলা না যায়। পরমেশ্বরের ক্রেডিটেও ডজন ডজন ক্রাইমের লিস্ট। কলকাতায় ফিরে নিজের লোক দিয়ে পরমেশ্বরের গোটা ব্যাকগ্রাউণ্ডটা পুলিসকে জানিয়ে দিয়েছেন সোমেশ্বর মল্লিক। সোমেশ্বরের সাইকোলজি অনেকটা এই রকম। আমি যখন ফেঁসেই গেছি তখন শালা তোমাকেও ছাড়ব না। জেলের লাপসি যদি খেতেই হয় দু'জনে ভাগাভাগি করেই খাব। পরমেশ্বরের ক্রাইমের এমন কিছু কংক্রীট একজাম্পল পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে যাতে তাকে বাইরে রাখা ঠিক না। তাই সোমেশ্বরদের সঙ্গে তাকেও প্রসেশান করে লক-আপে ঢুকতে হয়েছে। পরমেশ্বর জানে না, তাকে সেভ করার জন্য হেমা আদৌ কিছু করেছে কি না। তাকে স্রেফ বুদ্ধু বানিয়ে নিজের কাজটি গুছিয়ে হেমাই এখন তার জেলে যাবার রাস্তা সাফ করে দিচ্ছে কিনা, তাই বা কে জানে। প্রথম ধাক্কায় তাকে দিয়ে সে সোমেশ্বর আর এক্সের বারোটা বাজিয়েছে। তারপর তাকেই ক্যাঁচাকলে ঢুকিয়েছে। এই ব্যাপারটা যদি কারেক্ট হয়, বুঝতে হবে মালটি টেরিফিক খলিফা।

তবে তার নামও পরমেশ্বর। তার মতো খজড়াকে পুরে রাখার মতো জেলখানা এখনও ওয়ার্ল্ডে পয়দা হয় নি। কেসে যদি তার পানিশমেণ্ট-টানিশমেণ্ট হয়ে যায়, জেল থেকে হড়কে বেরিয়ে যাবার একটা মাস্টার প্ল্যান করে ফেলতেই হবে। পরমেশ্বর মনে মনে আওড়েছে, ম্যাক্সিমাম ফোর্টি এইট

আওয়ার্স হেমা সারিন ; তার বেশি তুমি আমাকে কব্জা করে রাখতে পারবে না। তবে বি. টি. রোডের স্লাম থেকে তাঁবুটা গুটিয়ে ফেলতে হবে আর জগা মাকড়ার শুঁড়িখানায় তার ইণ্টারন্যাশনাল সারভিস সেণ্টারে ক্লোজার ডিক্লেয়ার করে দিতে হবে। কেন না পুলিস ওখানকার অ্যাড্রেস-ট্যাড্রেস জেনে গেছে। ওয়ার্ল্ড তো দশ-বারো ইঞ্চি মাপের জায়গা নয়। কোথাও না কোথাও একটা আস্তানা আবার জুটিয়ে ফেলা যাবেই।

হেমার কথা যত ভেবেছে ততই মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে পরমেশ্বরের। এগ্রিমেণ্ট হয়েছিল, সে যদি হেমাকে সোমেশ্বরের ব্যাপারে হেল্প করে, হেমাও তার সত্যিকার পরিচয় জানিয়ে দেবে এবং তার অগুনতি ক্রাইমের জন্য যাতে শাস্তি-ফাস্তি না হয় তার চেষ্টা করবে। পরমেশ্বর কনট্রাক্ট অনুযায়ী প্রতিটি কাজ করে গেছে। কিন্তু হেমা এখন পর্যন্ত কিছুই করে নি তার জন্য। এটা স্পোর্টসম্যানশিপ না। জেণ্টলম্যানস এগ্রিমেণ্ট বা বিজনেসও না।

অবশ্য তার জেল লক-আপে ঢোকার ব্যাপার-স্যাপারে সোমেশ্বর মল্লিক যা করেছেন তাতে হেমার সায় আছে কিনা, এখনও বোঝা যাচ্ছে না। দেখাই যাক লাস্ট রাউণ্ড পর্যন্ত।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে পরমেশ্বর। কলকাতায় আসার পর সেই যে তাকে জেল হাজতে পোরা হল, তখন থেকেই হেমার আর পাত্তা নেই। তবে অমিতাভ সুনেত্রাকে নিয়ে রোজ একবার দেখা করে যায়। না জেনে পরমেশ্বরের সঙ্গে যে খারাপ ব্যবহার করেছে সে জন্য সে খুবই অনুতপ্ত। একবার করে এই কারণে রোজই ক্ষমা চায় এবং প্রাণ বাঁচানোর জন্য কৃতজ্ঞতা জানায়। আর বলে, যে ভাবেই হোক জেল-ফেল থেকে পরমেশ্বরকে বাঁচাবেই।

খবর পেয়ে এলিজাবেথ, লোলে, জোড়া মানকে, লক্ষ্মী, টগর, শুঁড়িখানার প্রোপাইটার জগদীশ থেকে শুরু করে বি. টি. রোডের স্লাম থেকে গাদা গাদা লোক ঝেঁটিয়ে এসেছে। এলিজাবেথ, লক্ষ্মী, টগর তো রোজ এসেই কাঁদতে শুরু করে দেয়। জোড়া মানকে মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে থাকে। লোলে বলে, 'গুরু তুমি কি শেষ পর্যন্ত এই জেলে বডি ফেলে রাখবে! আমাদের তা হলে কী হবে! আমরা শ্লা বিলকুল ভেসে যাব।'

পরমেশ্বর এলিজাবেথদের কান্না-ফান্না থামিয়ে লোলেকে বলে, 'ঘাবড়াস না মাকড়া। আরেকটু ওয়াচ করি ; তারপর এখান থেকে হড়কে বেরিয়ে যাবার প্ল্যান করে ফেলব।'

সবাই আসে কিন্তু হেমাই শুধু আসে না। খলিফা ছুকরিটা কী ধান্দা করেছে কে জানে।

আজ সোমবার। জেলের লক-আপের গরাদে হাত রেখে বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে পরমেশ্বর। সে জানে এখানেই অন্য দুটো সেলে রয়েছে এক্স আর সোমেশ্বর। এই তিন দিনে মাকড়াদের সঙ্গে বার দুই মোটে দেখা হয়েছে।

এখন আটটার মতো বাজে। একটা বাঙালী সেণ্ট্রি গরাদের ওধারে এসে দাঁড়াল। তার হাতে একখানা খবরের কাগজ।

পরমেশ্বররা কলকাতায় ফেরার পরদিনই নিউজ পেপারে সোমেশ্বরের মতো পমোস্ট একজন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের অ্যারেস্ট হবার খবর বেরিয়েছে। শুধু তাই না, তাঁকে ঘিরে দুর্দান্ত অ্যাকসান-প্যাকড সেনসেসানাল এক ক্রাইম স্টোরি ক্রমশঃ প্রকাশ্য নভেলের মতো টুকরো টুকরো ভাবে রোজই ছাপা হচ্ছে। এই স্টোরির মধ্যে বার বার তার আর এক্সের রেফারেন্স এসে যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে এই স্টোরিটা লোকে খুব খাচ্ছে। শুধু তাই না, জেল-হাজতের সেণ্ট্রিরা পর্যন্ত এ ব্যাপারে দারুণ কৌতূহলী। সিঙ্গাপুরে গিয়ে সোমেশ্বর আর এক্সকে ধরার ব্যাপারে পরমেশ্বরের যে ভেরি ইমপর্টাণ্ট একটা রোল রয়েছে, কেমন করে যেন সেটা তারা টের পেয়ে গেছে। তাদের কাছে পরমেশ্বর একজন অর্ডিনারি ক্রিমিনাল না, রীতিমতো হীরো। এ ক'দিন বার বার এসে কীভাবে সোমেশ্বরদের ধরা হয়েছে এবং কেনই বা অতবড় দুটো সুপার স্টার ক্রিমিনালকে ধরিয়ে দেবার পরও পরমেশ্বরকে লক-আপে ঢুকতে হয়েছে, সে সব জানতে চেয়েছে তারা। পরমেশ্বর শুধু হেসেছে আর বলেছে, 'স্লাইট ওয়েট করুন না। খবরের কাগজেই সব জানতে পারবেন।'

যতগুলো সেণ্ট্রি এই জেল হাজতে রয়েছে, তার মধ্যে মেঘনাদ অর্থাৎ এই মুহূর্তে যে খবরের কাগজ হাতে গরাদের ওধারে দাঁড়িয়ে আছে, পরমেশ্বরের দারুণ ফ্যান। রোজ সকালে খবরের কাগজ আসামাত্র সে তাকে দিয়ে যায়। পড়া হলে অবশ্য ফেরত নেয়।

কাগজটা পরমেশ্বরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে চকচকে চোখে তাকায় মেঘনাদ। উত্তেজিত মুখে বলে, 'আজ আপনাদের সিঙ্গাপুরে যাওয়ার ব্যাপারটা বেরিয়েছে। পড়তে পড়তে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।'

'তাই নাকি?' অল্প হেসে পরমেশ্বর কাগজটা নিল।

প্রথম পাতায় নিচের দিকে চার কলম জুড়ে খুবই ইমপর্টান্স দিয়ে তাদের কেসটা ছাপা হচ্ছে। দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিল পরমেশ্বর। তার পরেই আচমকা সে দেখতে পেল, যেখানে তাদের ক্রমশ-প্রকাশ্য স্টোরিটার আজকের কিস্তি শেষ হয়েছে তার পাশের কলমে হেমার ছবি বেরিয়েছে। টেরিফিক কৌতূহল হল পরমেশ্বরের। ঝট করে কাগজটা চোখের কাছে

তুলে আনল সে। ছবিটার মাথায় হেডিং রয়েছে এইরকম ঃ পুলিস অফিসারের সম্মান। তলায় যা লেখা আছে তা হল এই ঃ পুলিস অফিসার শ্রীমতী বিশাখা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে দেশের দু'জন ভয়াবহ অপরাধীকে সুদূরে সিঙ্গাপুরে গ্রেপ্তার করেছেন। এই দু'জনের বিরুদ্ধে হত্যা, অন্তর্ঘাত, জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি, গোপনে বিদেশের ব্যাঙ্কে টাকা জমানো ইত্যাদি মারাত্মক মারাত্মক অপরাধের সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এ জাতীয় অপরাধীদের ধরার জন্য শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেপুটি কমিশনার হিসেবে প্রোমোশন দেবার সুপারিশ করা হয়েছে। তা ছাড়া তাঁকে পুলিস গোল্ড মেডাল এবং নগদ পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কারও দেওয়া হবে। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁকে সম্মানও জানানো হবে। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় পুলিস সারভিসের মর্যাদা বাড়িয়েছেন।

পড়তে পড়তে জানা গেল হেমা সারিন আসলে বিশাখা ব্যানার্জি। অবশ্য সে যে নকলী নাম কাঁধে ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছে তার সিগন্যাল আগেই পেয়েছিল পরমেশ্বর। যাই হোক, তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠতে লাগল। পরমেশ্বর ভাবল, খজড়া ছুকরি, তুমি তা হলে আমার ঘাড়ে বন্দুক রেখেই ফায়ার করে গেলে! কেমন ফাইন সব প্রমোশন, রিওয়ার্ড, মেডেল-ফেডেল বাগিয়ে ফেললে! আর আমি শালা তোমার কথায় নেচে তোমার সঙ্গে এগ্রিমেণ্ট করে ফেঁসে গেলাম। কিন্তু মনে রেখো ম্যাডাম, দাবার চালে বার বার তুমি আমাকে কাত করে দেবে, সেটি হবে না। আমারও চান্স ডেফিনিটলি আসবে। বিট্রেয়ার—বেইমান!

দাঁতে দাঁত চেপে পরমেশ্বর ভাবল, হেমা বা বিশাখা তাকে টেরিফিক একখানা লেসন দিয়ে গেছে। লাইফে আর কারো সঙ্গে জেণ্টলম্যানস এগ্রিমেণ্ট করবে না।



খানিকক্ষণ বাদে খবরের কাগজটা নিয়ে সেণ্ট্রি মেঘনাদ কুণ্ডু চলে গেল। তারও ঘণ্টাখানেক পরে অর্থাৎ দশটা সোয়া-দশটা নাগাদ দু'জন পুলিস অফিসার আর ক'টা কনস্টেবল এসে গরাদের ওধারে দাঁড়াল।

পরমেশ্বর আগের মতোই গরাদে হাত রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। পুলিস দেখে চোখ নামিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকাল।

একজন পুলিস অফিসার বললেন, 'আমাদের সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে।'

পরমেশ্বর উত্তর দিল না। মনে মনে শুধু বলল, 'তোমাদের হাতে যতক্ষণ আছি হেভেনে বা হেলে যেখানে নিয়ে যাবে, আমার ফোরটীন জেনারেসন যেতে বাধ্য।'

একটা পুলিস লক-আপের তালা খুলে দিল। পরমেশ্বর বেরিয়ে আসতেই সেই পুলিস অফিসার ফের বললেন, 'আপনার ব্রেকফাস্ট হয়েছে?'

অফিসারটাকে রীতিমতো সিমপ্যাথেটিক মনে হল পরমেশ্বরের। হেমাকেও একদিন এ রকম সহানুভূতির আরকে গলা ভিজিয়ে কথা বলতে দেখেছে পরমেশ্বর। তা সত্ত্বেও এই লক-আপে তাকে ল্যাণ্ড করতে হয়েছে। ওয়ার্ল্ডে কোন মাকড়াকে সে আর বিশ্বাস ফিশ্বাস করে না। মুখের চামড়ার একটা রেখাও চেঞ্জ না করে পরমেশ্বর আস্তে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ তার সকালের খাওয়া হয়ে গেছে।

এর পর আর কোন কথা হল না। জেল হাজতের কমপাউণ্ডের মধ্যে একটা কালো পুলিস ভ্যান দাঁড়িয়ে ছিল। অফিসার দু'জন আর পুলিস ক'টা পরমেশ্বরকে নিয়ে গাড়িটায় উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভ্যানটা স্টার্ট দিয়ে বাইরের রাস্তায় চলে এল।

আধ ঘণ্টা বাদে পরমেশ্বর মার্ক করল, তারা যেখানে এসে পেঁচৈছে

সেটা কোর্ট। পরিষ্কার বাংলায় আদালত। সে জানত, দু-একদিনের মধ্যেই তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হবে। লোলে এবং অমিতাভ তার বেইলের জন্য উকিল-ফুকিল এনগেজ করতে চেয়েছিল। পরমেশ্বর রাজী হয় নি। সে দেখতে চেয়েছে প্রথম দিন কোর্টে প্রডিউস করার পর ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিসের তরফ থেকে কী অ্যাটিচ্যুড নেওয়া হয়। আসলে মনে মনে হেমার মুড-টাই সে দেখতে চেয়েছে। তারপর অবস্থা বুঝে নিজের ডিসিসন নেবে।

যাই হোক, কোর্ট রুমে অন্য একটা কেসের ক্রস-এগজামিনেসন চলছিল। তাই ভ্যানের ভেতরেই পরমেশ্বরকে বসে থাকতে হল। একজন পুলিস অফিসার নেমে গিয়ে কী যেন খবর-টবর আনতে গেলেন। মিনিট পনের বাদে ফিরে এসে তিনি পরমেশ্বরকে বললেন, 'আসুন—'

পুলিস পাহারায় কোর্ট রুমে ঢুকতে ঢুকতে পরমেশ্বর শুনতে পেল, কোর্টের একটা লোক তার নাম ডেকে আসামীর 'ডকে' গিয়ে দাঁড়াতে বলছে।

পুলিস অফিসাররা স্ট্রেট তাকে নিয়ে গিয়ে কাঠগড়ায় সেট করে দিল। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের চেকার্ড কেরিয়ারের রেকর্ড একেবারে ক্লীনই ছিল পরমেশ্বরের। পুলিস তার চামড়া কোন দিন টাচ্ করতে পারে নি। লাইফে আগে আর কখনও তাকে কোর্টে ঢুকতে হয় নি। তার 'গেলারিয়াস' কেরিয়ারে এই ফার্স্ট ব্ল্যাক স্পট পড়ল। ডকে দাঁড়িয়ে এই মোমেণ্টে তার ভীষণ খারাপ লাগছে। কিন্তু এখন কিছু করার নেই।

কোর্ট রুমে প্রচুর লোকজন রয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়াও কালো কোট-পরা গাদা গাদা উকিল, পাবলিক প্রসিকিউটর ইত্যাদি ইত্যাদি তো আছেই। মজা-ফজা দেখার জন্যও ভিড় জমেছে বেশ।

পরমেশ্বর কোন কিছুই ভালো করে লক্ষ্য করছে না। দুর্ধর্ষ একখানা ফিলজফারের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কোর্টের তরফ থেকে এক মাকড়া উঠে এসে তার নাম-ফাম জিজ্ঞেস করল এবং 'সত্য বই মিথ্যে বলব না' জাতীয় কী সব যেন রিসাইট করিয়ে নিল।

কোর্টে কী কারবার-টারবার হয়, সে-সব কিছুই জানে না পরমেশ্বর। এখানকার ব্যাপার-স্যাপার সম্পর্কে আবছা গোছের একটা আইডিয়া ছিল তার।

পরমেশ্বরকে দিয়ে 'সত্য বই মিথ্যা—' ইত্যাদি গৎটা রিসাইট করিয়ে নেবার পর কালো কোট-পরা প্রায় দেড় কুইণ্টাল ওয়েটের একটা লোক উঠে দাঁড়ালেন। খুব সম্ভব সরকারী পক্ষের উকিল। তিনি যা

বললেন তা মোটামুটি এই রকম। পরমেশ্বরের জামিনের জন্য কোর্টে আজি পেশ করা হয়েছে। যদিও পরমেশ্বর সোমেশ্বর আর এক্সকে ধরার ব্যাপারে পুলিসকে প্রচুর সাহায্য করেছে এবং এ ব্যাপারে তার ডেথও হতে পারত তবু এসব কৃতিত্ব স্বীকার করে নিয়েও মনে রাখতে হবে যে সে নিজেও একজন দুর্দান্ত ক্রিমিন্যাল। ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের বেশীর ভাগ ধারা তার পেছনে ফিট করে দেওয়া যায়। কাজেই মী লর্ডের কাছে আবেদন, মন একজন ক্রিমিন্যালকে ভাবাবেগবশতঃ কিছুতেই 'বেইল' দেওয়া যায় না।

সরকারী উকিল তাঁর কথা শেষ করে বসে পড়ার পর ঢ্যাঙা চেহারার আর একটা কালো কোট উঠে দাঁড়াল। তার চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা। চশমাটা খুলে বাঁ হাতে দোলাতে দোলাতে ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে তাকিয়ে কালো কোট যা বলল তার সিনপ্সিস এই রকম। পরমেশ্বর ক্রিমিন্যাল হলেও, তার ব্যাকগ্রাউণ্ডটা গঙ্গাজলে ধোওয়া না হলেও মনে রাখতে হবে—কাণ্ট্রির জন্য সে কী করেছে। ইচ্ছা করলে সিঙ্গাপুর থেকে সে হাওয়া হয়ে যেতে পারত কিংবা সোমেশ্বরদের সঙ্গে হাত মেলাতেও অসুবিধা ছিল না। তার বদলে সে পুলিসকে আর গভর্ণমেণ্টকে প্রাণপণে সাহায্য করেছে।

কালো কোটের ভেতর থেকে ঢ্যাঙা উকিল যখন গাঁক গাঁক করে মিনিটে তিন-চার শো করে ইংরেজি ওয়ার্ড বার করছে সেই সময় তার দিকে তাকিয়ে ক্রমাগত অবাক হয়ে যেতে লাগল পরমেশ্বর। সে তো কোন উকিল বা ব্যারিস্টার লাগায় নি। তা ছাড়া লোলে এবং অমিতাভকে বার বার বারণও করে দিয়েছিল। তা হলে এই ঢ্যাঙা কালো কোট কোত্থেকে এসে জুটল? কে একে তার জন্য ফিট করল?

কালো কোট সমানে নন-স্টপ বলে যাচ্ছে, 'গভর্ণমেণ্টকে হেল্প করা ছাড়াও আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, সোমেশ্বর মল্লিকের কেসটা যিনি সাকসেসফুলি হ্যাণ্ডল করেছেন, যাঁর জন্য কাণ্ট্রির টপমোস্ট দুই ক্রিমিন্যাল ধরা পড়েছে সেই শ্রীমতী বিশাখা ব্যানার্জি মিস্টার পরমেশ্বরের হয়ে জামিন দাঁড়াচ্ছেন। সব দিক কনসিডার করেই তিনি—'

পরের কথাগুলো আর শুনতে পেল না পরমেশ্বর। চমকে চারদিকে তাকাতে লাগল সে এবং কোর্ট রুমের এক ধারে হেমা বা বিশাখাকে দেখতে পেল। বিশাখাই হোক আর যাই হোক, হেমা নামেই তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ঐ নামে ডেকেই তার হ্যাবিট হয়ে গেছে। হেমা যে তার 'বেইলে'-র জন্য দাঁড়াবে, কোর্ট রুমে 'ইন' করার আগে সে ভাবতেও পারে নি। চোখের তারা ফিক্সড করে হেমার দিকে তাকিয়ে রইল পরমেশ্বর।

মার্ক করল, হেমাও তাকে একদৃষ্টে দেখছে। 'বেইল' দিয়ে বার করে নিয়ে আবার কোন্ ক্যাঁচাকলে ঢোকাতে চায় ছুঁড়িটা, কে জানে? মেয়েছেলেদের ব্রেনে যে কী চক্কর অনবরত চলতে থাকে, তাই বা কে বলবে। পরমেশ্বরের নার্ভগুলো টান টান হয়ে গেল মুহূর্তে।

যাই হোক, সরকারী উকিল আর হেমার উকিল গলার শির ছিঁড়ে প্রতি মিনিটে কয়েক শো করে ওয়ার্ড বার করে কোর্ট রুমে একটা টেরিফিক ঝড় বইয়ে দিল। দুই উকিলের সবগুলো কথার আওয়াজ ধরে রাখতে পারলে সাউণ্ড এনার্জিতে কোর্টের ছাদ ফেটে যেত।

সব শোনার পর দুর্দান্ত গম্ভীর ম্যাজিস্ট্রেট আরো গম্ভীর গলায় পরমেশ্বরকে হেমার পার্সোনাল গ্যারাণ্টিতে 'বেইল' মঞ্জুর করলেন।

একটু পরে 'ডক' থেকে নেমে আসতেই হেমা কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'চলুন আমার সঙ্গে।'

পরমেশ্বর বলল, 'কোথায়?'

'ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে।' বলে মজা করে হাসল হেমা।

আর কথা না বলে কোর্টরুমের বাইরে এসে সেই টু সীটারটায় উঠল দু'জনে। হেমা ড্রাইভারের সীটে, তার পাশে পরমেশ্বর।

গাড়িটা রাস্তায় নামতে পরমেশ্বর বলল, 'কনট্রাক্ট অনুযায়ী আমার সব কাজ কমপ্লীট করে দিয়েছি।'

উইণ্ডস্ক্রীনের বাইরে চোখ রেখে ড্রাইভ করতে করতে হেমা বলল, 'ডেফিনিটলি। কনট্রাক্ট অনুযায়ী আমারও এখন কিছু করা দরকার—তাই না?'

মনে মনে একটা খিস্তি ঝাড়ল পরমেশ্বর। ছুঁড়ির খচড়ামো দেখলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। মনে তার যাই রি-অ্যাকসান হোক, মুখে বলল, 'আপনিই সেটা ভেবে দেখুন—'

হেমা উত্তর দিল না।

পরমেশ্বর ফের জিজ্ঞেস করল, 'আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

'গেলেই দেখতে পাবেন।'

একটু চুপচাপ।

তারপর পরমেশ্বর বলল, 'আজ নিউজ পেপারে আপনার ছবি বেরিয়েছে।'

হেমা বলল, 'দেখেছি।'

'টেরিফিক লিখেছে আপনার সম্বন্ধে।'

'দেখেছি।'

'মেডেল পাবেন, ক্যাশ পাবেন, প্রোমোসন পাবেন।'

'দেখেছি।'

'কনগ্র্যাচুলেসনস।'

'ধন্যবাদ।'

একটু ভেবে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'ক্যালকাটায় আসার পর তিন দিন আপনাকে দেখি নি।'

হেমা বলল, 'মেডেল, ক্যাশ আর প্রোমোসনের জন্য নানা জায়গায় ধরাধরি করছিলাম।'

পরমেশ্বর একটু থতিয়ে গেল। তারপর বলল, 'আমাকে 'বেইল' দিয়ে বার করে আনলেন কেন? যার জন্য আমাকে দরকার ছিল সবই তো হয়ে গেছে। 'বেইল'-এর এই ড্রামার কোন মানে হয় না।'

হেমা বলল, 'প্লীজ স্টপ। কয়েকটা মিনিট চুপ করে বসে থাকুন।'

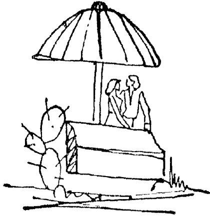
'স্টপ করার আগে শুধু একটা কথা বলব।'

'কী?'

'বেইল' দিয়ে আজ আমাকে বার করে আনবেন জানলে বি. টি. রোডে লোলে, জোড়া মানকে, মাদার এলিজাবেথদের একটা খবর দিতে পারতাম।'

হেমা বলল, 'জামিনের ব্যাপারটা ইচ্ছা করেই আপনাকে জানাই নি।'

পরমেশ্বর আর কিছু বলল না।



এক সময় দেখা গেল, হেমার টু-সীটার সল্ট লেক সিটিতে ঢুকে সেই ফ্যাশনেবল দোতলা বাড়িটার সামনে এসে পার্ক করল। সেই বাড়িটা যার গেটের ওপর পেতলের নেমপ্লেটে লেখা আছেঃ দেবকুমার ব্যানার্জি।

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন?'

উত্তর না দিয়ে হেমা বলল, 'নেমে আসুন।'

ড্রইংরুমে আসতেই দেখা গেল, রিটায়ার্ড ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল দেবকুমার ব্যানার্জি, তাঁর মধ্যবয়সিনী স্ত্রী, ইংরেজির লেকচারার সীমা, ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনীয়ারিং-এর স্টুডেন্ট সুজয় সেখানে বসে আছে। হেমা জানিয়েছিল এঁরা তার মা-বাবা-ভাই এবং বোন। এ সম্পর্কে অবশ্য পরমেশ্বরের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কেননা হেমার কোন্ কথাটা ট্রু আর কোন্ কথাটা ফলস, সে এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। ছুকরির যা খলিফা তাতে অনবরত তার ব্রেনে চক্কর দিয়ে যাচ্ছে।

ড্রইং রুমে শুধু দেবকুমার ব্যানার্জিরাই ছিলেন না, অমিতাভ, অমিতাভর মা আর সুনেত্রাকেও এখানে দেখা গেল। নিশ্চয়ই হেমা তাদের খবর দিয়ে আনিয়েছে। এঁদের ছাড়া আর দেখা গেল একজন বুড়ো পাদ্রীকে। আশির কাছাকাছি তাঁর বয়স। পিঠ অনেকটা বেঁকে গেছে; শরীরের চামড়া ভাঁজ পড়ে জালি জালি দেখাচ্ছে। মাথার চুল সাদা সিল্কের মতো।

পরমেশ্বর ঘরে ঢোকামাত্র চারদিক থেকে সবাই রিসেপসান দেবার স্টাইলে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, 'এসো এসো—' বা 'আসুন আসুন—'

দেবকুমার বললেন, 'বোসো বোসো।' পরমেশ্বর বসার পর বললেন, 'সিঙ্গাপুরে তুমি যা করেছ, সবই রুকুর কাছে শুনেছি। কোন মানুষের পক্ষে এরকম করা সম্ভব, আমার ধারণা ছিল না।'

ঘরের অন্য সবাই ততক্ষণে বসে পড়েছে এবং পরমেশ্বরের দুর্দান্ত

অ্যাচিভমেণ্টের জন্য অনবরত অভিনন্দন জানাচ্ছে, আর বাছা বাছা সব কথায় তারিফ করে চলেছে।

সেই সিঙ্গাপুর থেকে একটানা 'কনগ্র্যাচুলেসনস' শুনতে শুনতে কানের পর্দা ছেঁদা হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। পরমেশ্বর এ সব কিছুই প্রায় শুনছিল না ; চোখের তারা ফিক্সড করে স্ট্রেট বুড়ো মিশনারি ফাদারের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। মুখটা খুব চেনা-চেনা ; কিন্তু কোথায় এঁকে দেখেছে ঠিক মনে করতে পারছে না।

হেমাও পাশের একটা মোড়ায় বসে তাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। অনেকটা ঝুঁকে হেমা আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, 'ফাদারকে চিনতে পারছেন ?'

পরমেশ্বর বলল, 'চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় যেন দেখেছি—'

'ফাদার ডিকিনসন। পুরুলিয়া অরফ্যানেজ—'

এক সেকেণ্ডও লাগল না, স্মৃতির ওপর থেকে ড্রপ-সীন উঠে গেল পরমেশ্বরের। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল সে। তারপর ফাদার ডিকিনসনের কাছে এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, 'কতদিন বাদে আপনাকে দেখলাম ফাদার !' ওয়ার্ল্ডে এই স্নেহময় মানুষটিকেই একমাত্র ভালোবাসত পরমেশ্বর। তার গলা ইমোসানে বুজে আসতে লাগল। ফাদার তার জন্য অনেক করেছেন।

পুরু লেন্সের চশমার ভেতর দিয়ে ঘোলাটে চোখে পরমেশ্বরকে দেখতে লাগলেন ফাদার। তার মাথায় একটা হাত রেখে বললেন, 'গড ব্লেস ইউ মাই সন। কিন্তু তোমাকে ঠিক চিনতে—'

হেমা ওধার থেকে বলল, 'ইনি পরমেশ্বর। আপনার অরফ্যানেজ থেকে সেই ছেলেবেলায় পালিয়ে গিয়েছিলেন।'

ফাদারের ঝাপসা চোখে আচমকা জোরালো আলোর মতো কিছু একটা যেন জ্বলে উঠল। অবাক বিস্ময়ে তিনি প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন, 'ইজ ইট ! আমি কি স্বপ্ন দেখছি ! তুমি না বলে দিলে আমি একে চিনতেও পারতাম না। কত বছর পর ওকে দেখলাম !' একটু থেমে আবার হেমাকে বললেন, 'তুমি পরশু দিন পুরুলিয়ায় গিয়ে যখন বললে, ও বেঁচে আছে, আমার বিশ্বাসই হয় নি।'

পরমেশ্বরের চমক লাগল। মাঝখানে যে তিন দিন হেমার সঙ্গে দেখা হয় নি সেই সময়টা তা হলে সে পুরুলিয়ার অরফ্যানেজ থেকে ফাদার ডিকিনসনকে আনতে গিয়েছিল ! আজ এখানে যারা এসে জমা হয়েছে ডেফিনিটলি হেমাই তাদের ধরে এনেছে। আজকের এই আসরের অ্যারেঞ্জমেণ্টও তারই করা। অথচ তার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করে বসে ছিল পরমেশ্বর।

হেমা কীসের জন্য এতগুলো লোককে এখানে জুটিয়ে এনেছে, এখনও বোঝা যাচ্ছে না। দেখাই যাক শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায়।

এদিকে ফাদার ডিকিনসন পরমেশ্বরের মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগলেন, 'নটি বয়। তুমি অরফ্যানেজ থেকে চলে যাবার পর আমরা কত খুঁজেছি। ভীষণ কষ্ট হয়েছিল আমাদের। অথচ তুমি যাতে ভালো থাকতে পার, সুখে থাকতে পার তার ব্যবস্থা করেছিলাম—' অমিতাভর মাকে দেখিয়ে বললেন, 'উনি তোমাকে অ্যাডপ্ট করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই তুমি পালালে। কেন পালালে বল তো?'

অ্যাডপ্টেড ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা রকম ভয়াবহ গল্প শুনেছে পরমেশ্বর। তাদের স্লেভের মতো নাকি খাটানো হয়, কখনও কখনও ফরেনে বেচেও দেওয়া হয়। ছেলে বয়সে তার সেই ধারণার কথা জানিয়ে ফাদারের কাছে ক্ষমা চাইল পরমেশ্বর। বলল, 'এই জন্যেই পালিয়েছিলাম।'

অমিতাভর মা গাঢ় গলায় বললেন, 'আমাকে দেখে কি মনে হয়, তোমাকে চাকরের মতো খাটাতাম কিংবা বেচে দিতাম? আমি তোমার মা-ই হতে চেয়েছিলাম পরমেশ্বর। তা ছাড়া আর কোন খারাপ ইচ্ছা আমার ছিল না।' একটু থেমে আবার বললেন, 'শুনেছি তুমি অমুর প্রাণ বাঁচিয়েছ; সে জন্য আমি তোমার কাছে চিরকাল ঋণী হয়ে আছি। আমার দরজা সব সময় তোমার জন্যে খোলা; অমুর বড় ভাইয়ের জায়গাটা তোমার জন্যে ফাঁকাই পড়ে আছে।'

পরমেশ্বর টের পেল, একটা টেরিফিক আবেগ টাবেগের মতো ব্যাপার উথলে উথলে বুকের ভেতর থেকে উঠে আসছে। গভীর গলায় সে বলল, 'আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম মা। সেদিন আপনার কাছে চলে গেলে জীবনটা অন্যরকম হয়ে যেতে পারত। ব্যাড লাক।' বলে স্লাইট হাসল।

একটু চুপচাপ।

এই ফাঁকে সামনের দেয়াল থেকে সেই পুরনো হলদে গ্রুপ ফোটোগ্রাফটা নামিয়ে আনল হেমা। তাতে কুয়ালালামপুরের পাহাড় আর লেক অঞ্চলের সীনিক বিউটিওলা জায়গায় একটা পিকনিকের মেমোরি ধরে রাখা হয়েছে। ফোটোটা সেণ্টার টেবলে ফাদার ডিকিনসনের সামনে রেখে হেমা বলল, 'ফাদার, এবার আসল টপিকে গেলে ভাল হয়। সেই জন্যেই তো আমরা সবাই এখানে এসেছি—'

ফাদার মুখ তুলে তাকালেন, 'কী টপিক যেন?'

'ভুলে গেলেন!' হেমা হাসল।

ফাদার বললেন, 'মেমোরিটা মাঝে মাঝে এমন গোলমাল করে।'

পরমেশ্বরকে দেখিয়ে হেমা এবার বলল, 'উনি জানতে চান—কারা ওঁর মা-বাবা, কী ওঁর সোসাল আইডেনটিটি। পৃথিবীতে সত্যি সত্যি ওঁর কোন পরিচয় আছে কিনা—'

'নিশ্চয়ই আছে। তুমি তো সবই জানো। বলে দাও—'

'না ফাদার। আপনিই বলুন। আপনার কাছে যাতে উনি শুনতে পারেন সেই জন্যে এই বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থতা সত্ত্বেও জোর করে আপনাকে পুরুলিয়া থেকে ধরে এনেছি। দয়া করে বলুন। আপনার সামনে সেই পুরনো ফোটোগ্রাফটাও রেখেছি। এতে আপনার সুবিধা হবে।'

পরমেশ্বর নার্ভগুলো টান টান করে বুকের ভেতর নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল। তা হলে তারই পরিচয় জানাবার জন্য সবাইকে জুটিয়ে এনেছে হেমা! ছুকরি তা হলে জেণ্টলম্যানস এগ্রিমেণ্টের কথা ভুলে যায় নি।

ফাদার ডিকিনসন বললেন, 'বেশ—' তারপর সেই পুরনো গ্রুপ ফোটো-খানা তুলে আঙুল দিয়ে একটি পুরুষ, একজন মহিলা এবং একটি বাচ্চা ছেলেকে দেখিয়ে বলতে লাগলেন, 'ইনি সন্দীপন গাঙ্গুলি, ইনি মনোবীণা গাঙ্গুলি—' বলে পরমেশ্বরের দিকে তাকালেন, 'মিস্টার গাঙ্গুলি আর মিসেস গাঙ্গুলি হলেন তোমার বাবা-মা। আর এই বাচ্চাটা হলে তুমি।'

এদের ছবি আগেই দেখে গিয়েছিল পরমেশ্বর। দেবকুমার জানিয়েছিলেন সন্দীপন গাঙ্গুলি তাঁর বন্ধু, মনোবীণা বন্ধুর স্ত্রী, বাচ্চা ছেলেটা ওঁদেরই সন্তান। কিন্তু ছেলেটা যে স্বয়ং পরমেশ্বরই তা বলেন নি। সে ফাদারকে জিজ্ঞেস করল, 'ঐ ছেলেটাই যে আমি তার প্রমাণ কী?'

ফাদার ডিকিনসন বললেন, 'প্রমাণ আছে। তার আগে একটা রেল অ্যাকসিডেণ্টের ঘটনা তোমাকে শোনাই।'

'বম্বে-ক্যালকাটা মেলের অ্যাকসিডেণ্ট তো?'

'হ্যাঁ।'

'আমি আগেই মিস্টার ব্যানার্জির মুখে শুনেছি।' বলে দেবকুমারকে দেখিয়ে দিল পরমেশ্বর।

'সবটা বোধ হয় শোন নি। শুনলেও আরেক বার বললে দোষ হবে না। তোমার মা-বাবার সঙ্গে বম্বে থেকে যে ট্রেনে তুমি আসছিলে সেই ট্রেনটায় আমিও ছিলাম। তবে অন্য কমপার্টমেণ্টে। তোমাদের বগিটা স্ম্যাশড হয়ে গেলেও বাই গড্স্ গ্রেস তুমি বেঁচে গিয়েছিলে। তোমার মা-বাবার বডি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেলেও মুখে কিছু হয় নি। অ্যাকসিডেণ্টের পর পুলিস ওঁদের যে ফোটো তুলেছিলেন আমি তার কপি এনে রেখেছিলাম। তাঁদের সঙ্গে পাসপোর্ট ফোটোও ছিল। সেগুলোও আমি নিজের কাছে এনে

রাখি। তার কারণ তুমি। তুমি তখন এত বাচ্চা যে তোমাকে নিয়ে পুলিস কী করবে ঠিক করতে পারছিল না। নিজের দায়িত্বে আমি তোমাকে নিজের কাছে অরফ্যানেজে নিয়ে গিয়েছিলাম। পুলিসের সঙ্গে আমার কথা হয়, যখনই তোমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনের খোঁজ পাওয়া যাবে তক্ষুনি তোমাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।'

'তারপর ?'

খবরের কাগজে তোমার বাবা-মা আর তোমার ফোটো দিয়ে বেশ কিছু দিন পুলিস থেকে আর আমার তরফ থেকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তোমার কোন আত্মীয়-স্বজন তোমাকে নিতে আসে নি।'

দেবকুমার বললেন, 'আমরা তখন কুয়ালালামপুরে। তাই বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ে নি। পড়লে ছেলেটাকে এত কষ্ট পেতে হতো না।'

এদিকে পরমেশ্বরের বুকের ভেতর থেকে অনেকটা আবদ্ধ বাতাস বেরিয়ে এল। ফাদারের মুখ থেকে সমস্ত শোনা সত্ত্বেও তার সন্দেহ পুরোপুরি কাটছে না। সে বলল, 'সেই পাসপোর্ট, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের কাটিং-ফাটিং আছে ?'

'অবশ্যই।' সেণ্টার টেবলের পাশে একটা মোটা পোর্ট ফোলিও ব্যাগ দাঁড় করানো ছিল। সেটা তুলে মুখটা খুলে ফেললেন ফাদার। ভেতর থেকে প্রচুর পুরনো নিউজ পেপার কাটিং, অ্যাকসিডেণ্টের পর মনোবীণা সন্দীপন আর একটা বাচ্চা ছেলের ফোটো, হলদেটে হয়ে যাওয়া বহুকালের পাসপোর্ট বার করলেন। তিনটে পাসপোর্টের একটায় চার-পাঁচ বছরের ছোট বাচ্চার ফোটোর তলায় লেখা আছে অভিজিৎ গাঙ্গুলি। সন অফ সন্দীপন গাঙ্গুলি, এটসেট্রা।

পাসপোর্টের অভিজিৎ, পিকনিক পার্টির গ্রুপ ফোটোর সেই বাচ্চাটা আর অ্যাকসিডেণ্টের পর পুলিসের তোলা ছেলেটার ফোটো বা বিজ্ঞাপনের বাচ্চাটার মুখ—সবই এক। এবার বুকটা হাল্কা হয়ে গেল পরমেশ্বরের। বত্রিশ-তেত্রিশ বছরের জীবনে এই প্রথম সে জানতে পারল কে তার মা, কে তার বাবা আর কী তার সোসাল আইডেনটিটি। এতকাল পরমেশ্বর, রণজয় হালদার বা এমনি গণ্ডা গণ্ডা ফল্‌স্‌ নাম বাগে ঝুলিয়ে ওয়াল্ডের্ঁ ইমপোস্টার হয়ে সে ঘুরে বেড়িয়েছে। এতদিনে সে জানতে পারল মা-বাবার দেওয়া তার আসল নামটা হল অভিজিৎ গাঙ্গুলি। কৃতজ্ঞ চোখে একবার চারদিকে তাকিয়ে ফাদার ডিকিনসনের কোলে মুখ ডুবিয়ে একজন উৎকৃষ্ট চীট, টেরিফিক ফোরটোয়েণ্টি আর গ্রেট ইমপোস্টার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ঘরের ভেতর সবার নিঃশ্বাস এই মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেছে। প্রতিটি মানুষ

চুপচাপ বসে পরমেশ্বরকে দেখছে। একটা ছুঁচ পড়লে এখন আওয়াজ পাওয়া যাবে।

ফাদার ডিকিনসন শুধু গভীর স্নেহে পরমেশ্বরের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগলেন, 'গড ব্লেস ইউ মাই সন, গড ব্লেস ইউ—'

ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে পরমেশ্বর টের পেতে লাগল, জ্ঞান হবার পর এমন সুখের দিন তার লাইফে আর কখনও আসে নি।

অনেকক্ষণ পর ফাদারের কোল থেকে মাথা তুলে পরমেশ্বর বলল, 'পারমিসান দিলে এবার আমি যেতে পারি।'

'এখন কোথায় যাবে?'

'না—না, এখন তোমাকে ছাড়া হবে না।'

পরমেশ্বরের চলে যাওয়ার ব্যাপারে ঘরের সবারই প্রচণ্ড আপত্তি। হেমার মা বললেন, 'এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। ভেবেছি তোমাকে নিয়ে সবাই মিলে এক সঙ্গে খাব।'

'আজ আমাকে ক্ষমা করুন।

'কোথায় যাবে এই দুপুরবেলা?'

'বি. টি. রোডে। নিজের মা-বাবাকে হারাবার পর যাদের ভালোবাসার মধ্যে বেঁচে আছি—আমার সেই অ্যাংলোইণ্ডিয়ান মা, দুই বোন লক্ষ্মী-টগর, তিন ভাই লোলে আর জোড়া মানকে আর স্লামের হাজার হাজার মানুষের কাছে। তারা আমার জন্যে নিশ্চয়ই অন্যদিনের মতো আজও লক-আপে গিয়েছিল। আমাকে সেখানে না দেখে খুবই চিন্তায় থাকবে।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল পরমেশ্বর।

হেমার মা-বাবা বললেন, 'আবার কবে আমাদের এখানে আসছ?'

'শিগগিরই চলে আসব।'

অমিতাভর মা-ও বললেন, 'কালই তোমাকে আমাদের বাড়ি পেতে চাই।'

পরমেশ্বর বলল, 'কাল আসতে না পারলেও খুব তাড়াতাড়িই হাজির হয়ে যাব মা।'

অমিতাভ বলল, 'আমি গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসব।'

পরমেশ্বর হাসল, কিছু বলল না।

হেমাও এদিকে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, 'চলুন আপনাকে বি. টি. রোডে পেঁাছে দিয়ে আসি।

পরমেশ্বর বলল, 'আপনার বাড়িতে এত গেস্ট। কষ্ট করে আর আমাকে পৌঁছে দিতে হবে না।'

'গেস্টদের জন্যে মা-বাবা আছেন। আপনাকে পৌঁছে দিতে আমার কোন কষ্ট হবে না। চলুন—'

একটু পর টু-সীটারে পাশাপাশি বসে বি. টি. রোডের দিকে যেতে যেতে পরমেশ্বর বলল, 'মা-বাবার পরিচয় জানিয়ে আপনি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আমি যে একটা ব্যাস্টার্ড নই, গলা ফাটিয়ে বলার মতো আমার যে একটা পরিচয় আছে—এটা জানার পর কী আরাম যে লাগছে। চিরকাল আমি আপনার স্লেভ হয়ে থাকব। আঃ, কী আরাম! কী পীস! কী রিলিফ! এবার ক'টা দিন আমি ভালো করে ঘুমুতে পারব। কতকাল যে ঘুমোই নি।'

হেমা বলল, 'আমি আপনার জন্যে স্পেশাল কিছু করি নি। আমাদের মধ্যে যে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল সেই অনুযায়ী কাজ করেছি শুধু।'

'তবু একটা কথা বলছি ম্যাডাম। 'বেইল' দিয়ে বার করে যদিও এনেছেন তবু আমার কেস চলবে। কেস শেষ হবার পর আমার জেল হোক, ফাঁসি হোক, আই ডোন্ট কেয়ার। আপনি আরো মেডেল, আরো রিওয়ার্ড, আরো প্রোমোসন পান। জেলখানায় ঢুকতে ঢুকতে বা ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে পরতে আমি যেন শুনে যাই—'

হঠাৎ তাকে থামিয়ে দিয়ে হেমা বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।'

'কী?'

'আমি চাকরিতে রেজিগনেসন দিয়েছি।'

পরমেশ্বর হকচকিয়ে গেল, 'কেন?'

'এই সব মেডেল, ক্যাশ রিওয়ার্ড, অন্যরা যার পাওয়া উচিত সে ঢুকবে জেলখানায় আর আমি তার প্রাপ্য সব কিছু অন্যায়ভাবে দখল করব! ইমপসিবল!'

হেমার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছিল পরমেশ্বর। সে অবাকই হয়ে গেল। সিঙ্গাপুর থেকে ফেরার পর ক্রমাগত মেয়েটাকে মিস আণ্ডারস্ট্যাণ্ডই করে গেছে। পরমেশ্বর তার দিকে ঝুঁকে বলল, 'কী পাগলামি করছেন! রেজিগনেসনের কথা আপনার মা-বাবাকে বলেছেন?'

'এখনও বলি নি। তবে ওঁরা জানলে খুবই খুশী হবেন। যেদিন এই সারভিসে ঢুকেছি সেদিন থেকেই মা-বাবা রেজিগনেসানের কথা বলে আসছেন। বাবা বোধহয় রেজিগনেসন লেটারটা ড্র্যাফটই করে রেখেছেন। আমি সই করে দিলেই হয়।'

'কিন্তু আপনার সামনে ব্রাইট ফিউচার। আমার মতো একটা থার্ড-ক্লাস ক্রিমিনালের জন্য তা স্যাক্রিফাইস করবেন কেন?'

হেমা বলল, 'তার কারণ দুটো। প্রথমত পুলিস সারভিসে থাকলে নানা ব্যাপারে আমার হাত-পা বাঁধা থাকবে। সেই অবস্থায় আপনার কেসে হেল্প করতে অসুবিধা হবে। নাম্বার টু কারণটা হল—' এই পর্যন্ত বলে আচমকা টু-সীটারটা রাস্তার একধারে থামিয়ে হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে পিকনিকের সেই পুরনো হলদেটে গ্রুপ ফোটোগ্রাফটা বার করল।

ড্রইং রুমে কখন যে হেমা ফোটোটা তুলে হ্যাণ্ডব্যাগে পুরে ফেলেছিল, পরমেশ্বর টের পায় নি। সে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?'

হেমা বলল, 'ফোটোর একটা বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে সবাই তখন হইচই করল কিন্তু একটা ছোট মেয়েও যে পিকনিক পার্টিতে ছিল সেদিকে কারো চোখই পড়ল না। কি ব্যাড লাক মেয়েটোর!' বলে চোখেমুখে নকল হতাশা ফুটিয়ে তুলল।

ফোটোর মেয়েটার দিকে আঙুল সেট করে পরমেশ্বর বলল, 'এর কথা বলছেন?'

'ইয়েস মহাশয়।'

'এ তো রুকু। বড় হয়ে যার নাম হয়েছে বিশাখা ব্যানার্জি। অবশ্য হেমা সারিন নামটাও সে কাঁধে ঝুলিয়ে বেড়ায়।'

'কারেক্ট। কিন্তু একটা কথা কেউ মনে করছে না।'

'কী?'

'গ্রুপ ফোটোর ঐ ছোট ছেলে আর ছোট মেয়েটার মা-বাবারা সেই ছেলেবেলাতেই দু'জনের বিয়ে ঠিক করে রেখেছিলেন; যাতে দুটো ফ্যামিলির রিলেসানটা পার্মানেণ্ট হয়। এখন সেই মেয়েটা যদি সেই ছেলেটার জন্যে কিছু একটা স্যাক্রিফাইস করে, খুব অন্যায় হয়?' বলতে বলতে পরমেশ্বরের হাতের ওপর নিজের একটা হাত রাখল হেমা।

সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিসিটির মতো কিছু একটা বয়ে গেল পরমেশ্বরের সবগুলো নার্ভের ভেতর দিয়ে। চমকে মুখ তুলে দেখল, অদ্ভুত চোখে মেয়েটা তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই সে হাসল। লাইফে মেয়েরা কোন পুরুষের দিকে একবারই মাত্র এভাবে তাকিয়ে আর হাসতে পারে।

পরমেশ্বরের বুকের গভীরে ঝড়ের বেগে অর্কেস্ট্রা বাজতে লাগল।

সমাপ্ত